দেব সাহিত্য কুটীর
কলিকাতা

প্রকাশ করেছেন
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা—৯

সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ
জানুয়ারী
১৯৭৫
৯

ছবি এঁকেছেন
শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

ছেপেছেন
এস সি মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা—৯

॥

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর বই হিসাবে অনুমোদিত

কলিকাতা গেজেট, ২০শে মাচ, ১৯৫২। বিহার গেজেট, ১৯৫৫।

অভিনব সংস্করণ —জানুয়ারী, ১৯৭৫
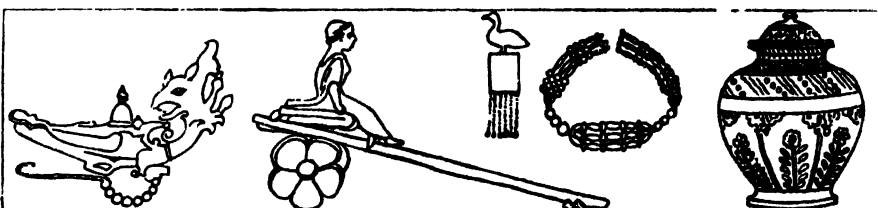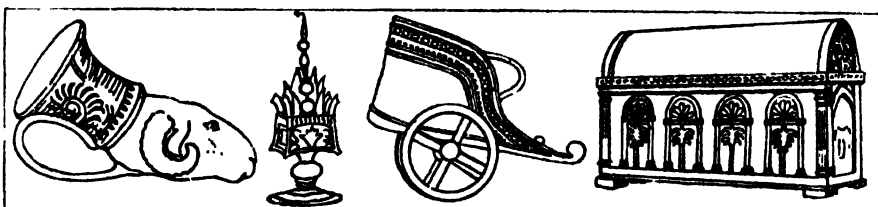
ভূমিকা

এক

সৃষ্টির আদিম যুগে—সে কত লক্ষ কোটি বছর আগের কথা তা কে জানে—অনন্ত আকাশে ঘুরে বেড়াত শুধু ধোঁয়াটে বাষ্পের মত পুঞ্জ পুঞ্জ নীহারিকা। না ছিল রূপ, না ছিল রেখা। কেটে গেল আরো কত শত বছর। তারপর একদিন কোন্ অজানা রহস্যবলে, কেমন করে তারই মাঝে জন্ম নিল পৃথিবী। কিন্তু তখনো সে শুধুই পৃথিবী—জীবধাত্রী বসুন্ধরা নয়, এমন কি সমুদ্রস্তনিতা পৃথ্বীও সে নয়। বন্ধ্যা পৃথিবী—মর্মবেদনায় তার নিজের দেহমনই শিউরে ওঠে নিশিদিন। মনে জাগে তার মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা—আর তারি পরিণতিতে নীলাম্বু মহাসাগর-রূপে তার বক্ষে বুঝি দেখা দিল স্নেহসুধাধারা। তার দেহে জাগল জীবনের স্পন্দন। তারপর নিত্যনূতন জীবনের সংস্পর্শে সসাগরা ধরিত্রী যেন প্রথম সন্তানবতী জননীর মতই সেদিন মহিমময়ী গরীয়সী মূর্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'…শৈবালে শাদ্বলে তৃণে
শাখায় বল্কলে পত্রে, উঠি সরসিয়া
নিগূঢ় জীবন রসে।'

দেহ তার বিচিত্র শোভায় হয়ে ওঠে উদ্ভাসিত। তারপর পৃথিবীতে এল প্রাণী—এল পশুপাখি, এল মানুষ। কবির ভাষায়—

'…প্রাণস্রোত কত বারংবার
তোমারে মণ্ডিত করি আপন জীবনে
গিয়েছে ফিরেছে; তোমার মৃত্তিকা সনে
মিশায়েছে অন্তরের প্রেম, গেছে লিখে
কত লেখা, বিছায়েছে কত দিকে দিকে
ব্যাকুল প্রাণের আলিঙ্গন।'

তাদের বিচিত্র কলরবে, তাদের পদধ্বনিতে পৃথিবী অনুরণিত হয়ে উঠল। খুশিতে ভরে উঠল তার সারা মন। জীবধাত্রীর বাৎসল্যের ধারায় অভিসিঞ্চিত হল জীবকুল।

মানুষ ধরিত্রীমাতার কনিষ্ঠ সন্তান—কনিষ্ঠের মতই তার আবদার আর বায়না। তাই তার আগমনে জটিলতর হয়ে উঠল পৃথিবীর সমস্যা। মানুষ চায় আহার, কিন্তু সে আহার শুধু স্বচ্ছন্দ নবজাত শাকসবজি দিয়ে নয়। বুদ্ধি আর হাতের সাহায্যে সে কৃষিকার্য করে ফসল উৎপাদন করে, তাই দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে সে বেঁচে থাকতে চায় পৃথিবীর বুকে। কাজেই দেখা দিল ভূমির সমস্যা। প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রেরণাতেই তারা বংশবিস্তার করে—আর বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমস্যা উৎকট আকার ধারণ করে। সে সমস্যার সমাধানে মানবসন্তান ছড়িয়ে পড়ে ডাইনে বাঁয়ে, এদিকে সেদিকে।

কিন্তু শুধু ভূমি হলেই তার চলে না—সুস্থদেহে বেঁচে থাকবার প্রেরণায় তার চাই স্বাস্থ্যকর পরিবেশ। শুরু হল প্রতিযোগিতা, আর প্রতিযোগিতা তো চলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ধার ঘেঁষেই। কাজেই শীঘ্রই তাদের মধ্যে শুরু হয়ে গেল ভূমির দ্বন্দ্ব বা জমির লড়াই।

এ লড়াই কিছুকাল সীমাবদ্ধ রইল ব্যক্তি বা দলের মধ্যেই। কারণ, আদিম মানুষ অনেককাল যাপন করেছে যাযাবরের জীবন। তারা যখন যেখানে আহার্যের সন্ধান পেয়েছে অথবা যেখানে পেয়েছে তাদের গৃহপালিত পশুর উপযোগী চারণভূমি, তারা দল বেঁধে ছুটে গেছে সেখানেই। সে ভূমিতে হয়তো লুব্ধ হয়ে ছুটে গেছে অন্য এক মানবগোষ্ঠী—আর তখনি তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে প্রচণ্ড সংঘর্ষ। জীবন-সংগ্রামে তো যোগ্যতমেরই উদ্বর্তন ঘটে। তাই এ সংঘর্ষ, এ শক্তি-পরীক্ষায় যোগ্যতমের আঘাতে হয়তো হীনতেজার বিলোপ ঘটেছে। ধরণীর শ্যামশীতল বক্ষোদেশ তারি সন্তানের উষ্ণপ্রবাহে কর্দমাক্ত হয়ে উঠেছে। বারবার ঘটেছে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। আর ধরণীমাতার কাতর ক্রন্দন যুগে যুগে প্রতিধ্বনিত হয়েছে আকাশে বাতাসে। কবির কথায়—

'অশ্রু তব রক্ত-সাথে মিশে
ভাষাহীন ক্রন্দনের পথ
দিয়েছে পঙ্কিল করি—

দস্যু-পদ-পাদুকার তলে
অশুচি কর্দম সেই
চিরচিহ্ন দিয়ে গেছে তোমার দুর্ভাগা ইতিহাসে।'

এই যাযাবর জাতিই হয়তো বা কখনো রণক্লান্ত হয়ে, কখনো প্রচুর আহার্য ও চারণভূমির সংস্থানে স্থায়িভাবে বেঁধেছে কুটির—মানুষের চিরন্তন আশ্রয়। কুটিরে কুটিরে গড়ে ওঠে জনপদ—গ্রাম আর নগর। আর তারি সমাবেশে গড়ে উঠল সমাজ আর রাষ্ট্র—রচিত হল মানবেতিহাসের প্রথম অধ্যায়। সভ্যতার একটি সোপানে রেখাঙ্কিত হল মানবের পদচিহ্ন।

এইভাবে শান্তি ও শৃঙ্খলার উদ্দেশ্যেই রচিত হল রাষ্ট্র। কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিভিন্ন রুচি ও চিন্তাধারায় সংঘর্ষ বাধল, আর সভ্য রাষ্ট্রের বাইরে পড়ে রইল বিরাট বর্বর জনতা, যারা সভ্যতার সংস্পর্শ পেল না। ফলে সভ্যতা হল বিধ্বস্ত, আবার তারি উপর হয়তো গড়ে উঠল নতুনতর সভ্যতার বুনিয়াদ। প্রলয় আর সৃষ্টি হাত ধরে চলল পাশাপাশি—

'উন্মথিত ইতিহাস
প্রকাশ লভিতেছিল অকস্মাৎ সৃষ্টিতে প্রলয়ে;
বারংবার অবলুপ্ত সভ্যতার ভূগর্ভ বিলীন
কবরের 'পরে
উঠেছে হঠাৎস্ফূর্ত প্রতাপের স্পর্ধিত পতাকা।'

মানুষ আশাবাদী। তাই ধ্বংসের মধ্যেও পরম সৃষ্টির বীজ দেখতে পায়; তাই মানুষ কলিঙ্গযুদ্ধের ভয়াবহ রূপ দেখেই হতাশ হয়ে পড়ে না—ধর্মাশোকের নতুন সভ্যতা-সৃষ্টি তাকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে দেয়! মানুষ সৃষ্টি করে চলে ইতিহাস।

দুই

ইতিহাস বলি কাকে? সে কি শুধুই যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী? সে কি শুধু ক্ষমতালোভীদের শক্তি-পরীক্ষার ফলাফল? সাধারণভাবে কোন দেশের বা জাতির রাষ্ট্রীয় উত্থান-পতনকেই আমরা ইতিহাস বলে মনে করে থাকি। তাই আমরা রাজার জন্ম আর মৃত্যুর তারিখ, তার যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনীকেই ইতিহাসে মুখ্যস্থান দিয়ে থাকি। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস তো তা নয়!

রাজা বা রাষ্ট্রপতি হতে পারেন একটা গোটা দেশের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, হতে পারেন তিনি প্রজাস্বার্থের প্রতিভূ, কিন্তু তিনিই তো সব নন! তার বাইরে যে অগণিত জনসাধারণ রয়েছে, রয়েছে তাদের ভাবনা-কামনা, আশা-নিরাশা আর সুখ-দুঃখময় জীবন, তার সঙ্গে রাজার তো কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নেই! তবে রাজার ব্যক্তিগত জীবন-কাহিনীতে সেই অগণিত জনগণের প্রতিফলন দেখতে পাব কেন? আজ সময় এসেছে, নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে ইতিহাসকে বিচার করতে হবে, ইতিহাসের পুনর্মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। নইলে ইতিহাস রচনার মূল উদ্দেশ্যই আমাদের ব্যর্থ হয়ে যাবে।

সত্য বটে, যুদ্ধবিগ্রহ বা রাজ-রাজড়াদের কাহিনী বাদ দিয়ে ইতিহাস রচিত হতে পারে না; কিন্তু শান্তির কাহিনী, প্রজাদের সুখ-দুঃখের কাহিনীও তার সঙ্গে যুক্ত থাকবে অঙ্গাঙ্গিভাবে—তবেই ইতিহাস হবে সর্বাঙ্গীণ। মানব-সভ্যতার উত্থান-পতনে ছোট বড় যে-সমস্ত উপাদান জড়িয়ে আছে, তাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় যদি থাকে অসম্পূর্ণ, তবে ইতিহাস-পাঠের উপকারিতাকে আমরা কার্য-ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার সুযোগ পাব কী ভাবে? পূবতন ইতিহাসের শিক্ষা এবং তজ্জাত অভিজ্ঞতা যদি সভ্যতাকে একটুখানিও এগিয়ে দিতে না পারে, তবে সে ইতিহাসের সার্থকতা কোথায়?

'ইতিহ' + 'আস' = 'এইরূপই ছিল' এইটেই আমাদের জানবার কথা। তারপর বিচার-বুদ্ধি দিয়ে এর সারটুকু আহরণ করে আমাদের শিক্ষাকে করব সম্পূর্ণ, অভিজ্ঞতাকে করব কার্যোপযোগী। এমনিভাবে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে যে-কোন দেশের বা জাতির শুধু যুদ্ধে উত্থান-পতনের ইতিহাসই নয়, তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদির সর্বাঙ্গীণ ইতিহাস-রচনাই ঐতিহাসিকের কর্তব্য।

তিন

আরও একটা কথা। যেদিন ধরিত্রীমাতার কনিষ্ঠ সন্তান সভ্যতার প্রথম স্বাদ পেয়েছিল, সেদিন থেকে আজকের দিনের মধ্যে পার্থক্য অনেকখানি। মানুষ রচনা করে চলেছে ইতিহাস, গড়ে তুলেছে সভ্যতার দৃঢ় বুনিয়াদ। সে আর কোনক্রমেই স্বতন্ত্র বা একক নয়। কোন কাজের ফলই আর

তাকে একলা ভোগ করতে হয় না। বিজ্ঞান আজ আর প্রকৃতির কোন বাধাকেই স্বীকার করছে না। দুই দেশের মধ্যবর্তী ভৌগোলিক সীমানা সত্যি সত্যি আজ আর কোন বাধা নয়। বিজ্ঞান দূরকে করেছে নিকট, পরকে করেছে আপন। ফলে কোন রাষ্ট্র বা জাতিই আজ আর অন্য-নিরপেক্ষ নয়—একের অপরাধের বোঝা অপরের কাঁধে চড়ে বসে; উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে যে কত পড়েছে, সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত অবিরল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দুটি মাত্র জাতির সঙ্গে পৃথিবীর তাবৎ সভ্য মানবসমাজ নিজের নিজের ভাগ্যকে জড়িয়ে নিয়েছিল, একের উত্থান ও পতন অপরের ভাগ্যকেও করেছে নিয়ন্ত্রিত। তাই কোন দেশ বা জাতির ইতিহাস অন্য-নিরপেক্ষভাবে আলোচনা সম্ভব নয়। সমগ্র মানবজাতির ইতিহাস যখন পারস্পরিক স্বার্থের সঙ্গে জড়িত, একের ভাগ্যসূত্র যখন অন্যের সঙ্গে গ্রথিত, তখন সমগ্রভাবে পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনাদ্বারাই দেশ বা জাতিবিশেষের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। অন্যথায় প্রচলিত ইতিহাস যে জাতির বা দেশের আংশিক পরিচয়মাত্র বহন করবে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কাজেই এই সদ্য-কথিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত ইতিহাসই প্রকৃত ইতিহাসপদবাচ্য।

চার

বাংলাদেশ আর বাঙ্গালীজাতির সামনে আজ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে 'কঃ পন্থাঃ'? একটা দেশ আর জাতি যে যুগসঞ্চিত সভ্যতার দৃঢ় বুনিয়াদে আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়েছিল, তার ভিত্তিতে ফাটল দেখা দিয়েছে, মুহুর্মুহু কেঁপে উঠছে সে বুনিয়াদ। বাংলা ও বাঙ্গালীর ইতিহাসও কি জলবুদ্বুদের মতই অবলুপ্ত হয়ে যাবে?—মনীষীদের চিন্তাস্রোত আজ এই পথেই প্রবাহিত হচ্ছে।

কিন্তু কি এর প্রতিকার? কোথায় তার মুক্তি?

এর প্রতিকারের পথ, এর মুক্তির উপায় আমরা খুঁজে পাব পৃথিবীর ইতিহাসে। আর যে ভুল মানুষ করেছে, সেই ভুল সংশোধন করে আজ মানুষ আত্মচেতনা লাভ করবে আর সমগ্র মানবগোষ্ঠীর মঙ্গলের ভিত্তিতে গড়ে তুলবে বিশ্বরাষ্ট্রের বুনিয়াদ।

পাঁচ

প্রাগুক্ত বহুমুখী উদ্দেশ্য-সিদ্ধির কামনায় আমরা আজ বাঙ্গালীর হাতে তুলে দিচ্ছি পৃথিবীর ইতিহাস বা 'বিশ্ব-পরিচয়'। বিশ্বের বহু মনীষীর মানস-কুসুম থেকে তিল তিল মধু আহরণ করেই আমরা তিলোত্তমারূপী বিশ্ব-পরিচয়ের মধু ভাণ্ডার গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছি। তাঁরা সবাই নমস্য—ঋণ বা কৃতজ্ঞতা-স্বীকারের অবকাশ কোথায়! কিন্তু তবু উল্লেখ করতে হয়, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, সার যদুনাথ সরকার, ডঃ ভাণ্ডারকর, ডঃ কালিদাস নাগ, ডঃ হেমচন্দ্র চৌধুরী—এঁদের কথা। ওঁদের আজীবন সাধনার ফল আমরা যথেচ্ছ ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে কৃতার্থ।

দেশের সেবায় আমাদের এই শ্রম যদি বিন্দুমাত্রও স্বীকৃত হয়, তবেই আমরা ভাবব—'ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং সফলং জীবনং মম।'

সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ

বাঙ্গালা ইতিহাস-বিমুখ—বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ চিরকালের। কিন্তু যুদ্ধোত্তর যুগে বাঙ্গালী যে আত্মসচেতন হয়ে উঠেছে, তাতে তার প্রতি আরোপিত অভিযোগ খণ্ডিত হয়েছে—স্পর্ধা নিয়েই আমরা এ কথা ঘোষণা করছি।

যে দেশে 'বিশ্ব-পরিচয়ে'র মত বই-এর সংস্করণ পুনঃ পুনঃ নিঃশেষ হয়ে যায়, সে দেশের অধিবাসীকে আর যাই বলি না কেন, কোনক্রমেই আত্মবিস্মৃত বলতে পারি নে। স্পষ্ট বুঝতে পারছি, স্বাধীনতার নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ দেশবাসীর মনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম ও সভ্যতার ইতিহাস অবগত হবার জন্যে একটা ব্যাকুলতা ও ঐকান্তিক আগ্রহ দেখা দিয়েছে।

নতুন সংস্করণ তৈরি করবার তাগিদ পাচ্ছি প্রতিদিন কত শত পাঠকের কাছ থেকে—কিন্তু তৎসত্ত্বেও যে সহৃদয় পাঠকদের হাতে সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ 'বিশ্ব-পরিচয়' তুলে দিতে দেরি হল তারও কারণ আছে।

পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে দ্রুত পটপরিবর্তন হচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুদূরপ্রসারী প্রভাবে মানচিত্রের রং বারবার বদলাচ্ছে—সাম্প্রতিক কালের কয়েকটি ঘটনাই তার প্রমাণ। এই সংঘাত-মুখর দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীর ইতিহাসের পুনর্লিখন বড় সহজসাধ্য নয়। পরন্তু যে নতুনতর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমরা 'বিশ্ব-পরিচয়' রচনা করেছি, তাতে আমাদের কর্তব্য ও দায়িত্বভার অনেক বেশী দুরূহ হয়ে উঠেছে।

'দেব সাহিত্য কুটীর'-প্রকাশিত এই 'বিশ-পরিচয়ে'র সংকলন বাংলা ভাষায় একটি নতুন ধরনের প্রচেষ্টা। এতে বিশ্ব-ইতিহাসের ঘটনাসমূহ পুঞ্জীভূত করা হয় নি। অসংখ্য চিত্র-সংযোগে পৃথিবীর বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন দেশের মানব-সভ্যতা ও ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনের ধারার প্রতি সহজ অনাড়ম্বর ভাষায় আলোকপাত করা হয়েছে।

দেশে দেশে যুগে যুগে যাবতীয় দৃশ্যমান বিভেদ-বৈষম্যের অন্তরালে, সব কিছু ছাপিয়ে ইতিহাসের স্বকীয় আবর্তনের রেখাঙ্কন ও একটি পরিব্যাপ্ত

ঐক্যের সুর প্রবহমান। অতীত ও বর্তমান ইতিহাসের ঘটনাবলীর যথাযথ বিশ্লেষণের সাহায্যে সেই অনাহত প্রবাহের সূত্রটি পাঠক সাধারণের সামনে তুলে ধরাই এই পুস্তক-রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

এই সংস্করণে গ্রন্থের কিছুটা পরিবর্তন এবং অনেকটা সংযোজন করা হয়েছে। ধারাবাহিক সম্পৃক্তি রক্ষার জন্যে কতকগুলি অনুল্লিখিত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার সন্নিবেশ করা হয়েছে। বিভিন্ন দেশের ইতিহাসকে যথাসম্ভব আধুনিককাল পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়েছে, প্রয়োজনস্থলে ভবিষ্যতের ইঙ্গিতও সংযোজিত হয়েছে।

পরিশেষে নিবেদন—এত বৃহৎ কর্মসম্পাদনে স্খলন পতন-ত্রুটি প্রায় অনিবার্য। তথাপি আমরা গ্রন্থকে সর্বপ্রকার দোষমুক্ত করে তোলবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি—পাঠকসমাজ সাদরে গ্রহণ করলেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে।

যদি কোথাও ত্রুটি থেকে গিয়ে থাকে, সুধী পাঠক তা জানালে আমরা পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে বা তাঁদের নির্দেশমত পরিবর্তন করে দিতে পারব। তাঁদের প্রতিটি নির্দেশ সাদরে গৃহীত হবে।

প্রকাশক

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

চিত্রসূচী

[একবর্ণ]

চিত্র-পরিচয়		পৃষ্ঠা

[ত্রিবর্ণ পূর্ণপৃষ্ঠা]

[একবর্ণ]

শবাধারে মিশরের 'মমী'

ফেরোদের দেশ

মরুভূমি-ঘেরা উত্তর-আফ্রিকার পূর্বপ্রান্তে একটি সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা দেশ আছে; তার মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে নীল নদ। এই দেশটির নাম মিশর।

আফ্রিকার মধ্যদেশে বড় বড় হ্রদ থেকে নীল নদের উৎপত্তি। এই নদ গিয়ে পড়েছে ভূমধ্যসাগরে। শীত ও বসন্তকালে এই নদের জল শান্তভাবে বয়ে চলে, কিন্তু বর্ষায় তার জলধারা দুকূল ছাপিয়ে আশে-পাশের সমস্ত জায়গা ভাসিয়ে দেয়। পাশের জায়গাগুলো এই জল পেয়ে উর্বর হয়ে ওঠে, সেখানে তখন ভালো ভালো ফসল ফলে। এইজন্যে নীল নদকে লোকে বলে 'মিশরের প্রাণ'।

অতি প্রাচীন কাল থেকেই মিশরে নীল নদের দুপাশে লোক এসে বাস করতে আরম্ভ করে। এরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে আলাদা বাস করত। চাষবাস করা ও গরু-ভেড়া চরানো ছিল এদের জীবন ধারণের উপায়। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই এরা বুঝতে পারল যে, এভাবে আলাদা হয়ে থেকে লাভ নেই। নীল নদের জলে বন্যা এসে যখন দুপাশের ঘর-বাড়ি সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তখন তিন-চার গ্রামের লোক একসঙ্গে কাজ করে নতুন ঘর-বাড়ি যত সহজে তৈরি করতে পারে, শুধু একটি মাত্র গ্রামের লোক তা পারে না। তা ছাড়া, এক-এক গ্রামে এক-এক রকম জিনিস তৈরি করে পরে সকলের দরকার-মত সেগুলো বদলাবদলি করে নিলে সবারই সুবিধা হয়।

তারা নৌকা তৈরি করতে শিখেছিল, কাজেই দূর গ্রাম থেকে জিনিস আনতেও কোন অসুবিধা ছিল না। নদীতে যখন জল কম থাকত, তখন খাল কেটে 'শাদূফ' নামক এক রকম সহজ যন্ত্রের সাহায্যে জল তুলে সেই খাল বেয়ে জল নিয়ে ক্ষেতে দিত। মিশরে বর্ষা খুব বিরল। কাজেই প্রায় সময়ই তাদের এইভাবে নদী থেকে জল তুলে ক্ষেতের ফসল বাঁচাতে হত।
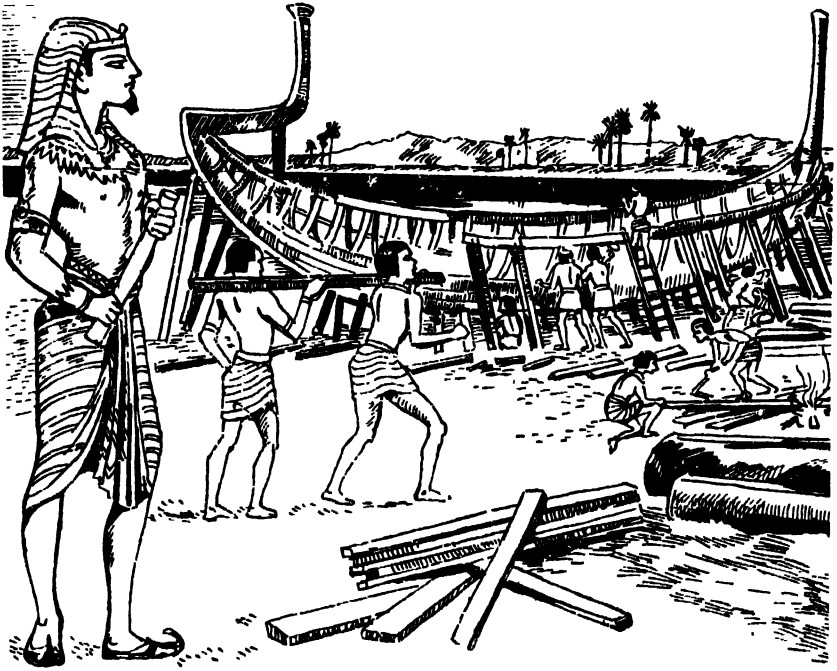
নৌকা তৈরি

পুরাকালে মিশরের রাজাদের উপাধি ছিল 'ফেরো'। প্রজাগণ ফেরোদের দেবতাজ্ঞানে পূজা করত। বিশেষ করে মিশর ছিল 'পিরামিডের দেশ' বলে পরিচিত। বর্তমান মিশর অর্থাৎ ঈজিপ্টের রাজধানী কাইরোর নিকটে গিজে নামক স্থানে পাথরে নির্মিত বিশালকায় পিরামিডগুলি পৃথিবীর অতি আশ্চর্য বস্তু।

অনেকগুলি রাজবংশের মধ্যে প্রথম দিকের রাজবংশদের যুগে এই পিরামিডগুলি তৈরী হয়েছিল। সে আজ প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর আগেকার

কথা। এগুলি ছিল রাজাদের সমাধি-মন্দির। তৃতীয় রাজবংশের প্রথম ফেরো যোসেরের জন্যে প্রথম পিরামিড নির্মাণ করা হয়। বড় তিনটি প্রসিদ্ধ পিরামিড গড়া হয়েছিল চতুর্থ রাজবংশের ফেরোদের সময়ে। এই ফেরোগণের মিশরীয় নাম খুফ্, খাফ্‌রে এবং মেন-কু-রে এবং এঁদের গ্রীক নাম যথাক্রমে—কিওপ্‌স্, সেফ্রেন ও মাইসেরিনাস্।

এই পিরামিড বা কবরগুলো তৈরী হত সবুজ মাঠের শেষে মরুভূমি
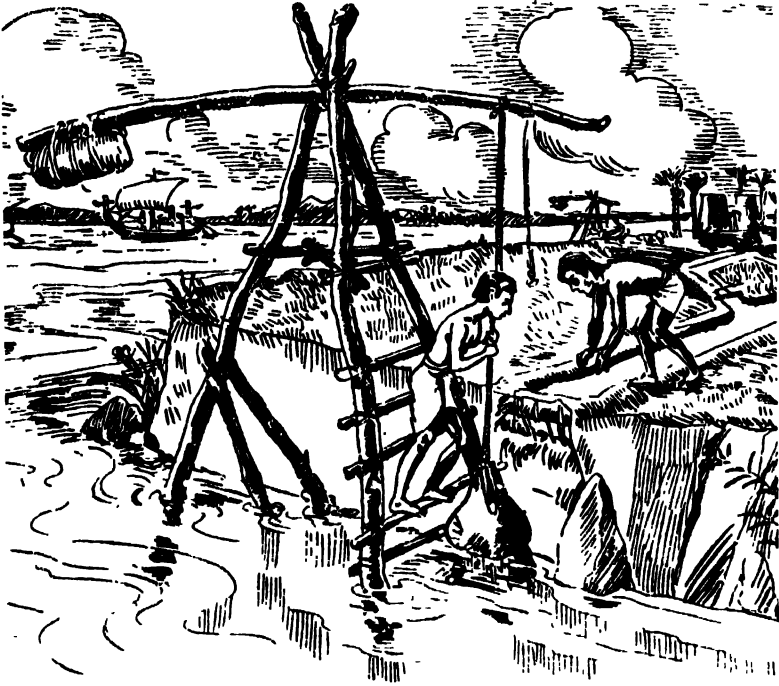
শাদুফ যন্ত্রে নীল নদ হতে জল সেচ

যেখানে আরম্ভ হয়েছে সেখানে। এই মরুভূমির প্রান্তের পাহাড় থেকে তামার ছুরি ও ছেনি দিয়ে পাথর কেটে, সেই পাথর দিয়ে যে সব বাড়ি তৈরি করা হয়েছে, তা দেখে আজও লোকে অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকে। ঐ প্রাচীন যুগে কেমন করে তারা অত শক্ত পাথর সুন্দরভাবে কাটল, ঐ পাথর দিয়ে কেমন করে যে বাড়ির ছাদ তৈরি করল, কেমন করেই বা অত ভারী পাথর তারা অত উঁচুতে তুলল, আজও পযন্ত লোকে তা ভালো করে বুঝতে পারে নি। ঐ শক্ত পাথর কেটে তারা নানা রকম মূর্তি খোদাই করতেও পারত। পাথর দিয়ে যে সব স্তম্ভ তারা তৈরি

করত, সেগুলি এবং বাড়ির ছাদ ও দেওয়ালগুলিকে তারা রং দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে দিতেও জানত।

আগেই বলা হয়েছে যে, পিরামিডগুলি ছিল ফেরোদের কবর। রাজাদের মৃতদেহগুলি যত্ন করে রাখবার জন্যেই মিশরীরা পিরামিড গড়ত। তারা বিশ্বাস করত যে, মৃত্যুর পর ফেরোদের আত্মা ততদিন স্বর্গে বাস করবে যতদিন তাদের দেহ রক্ষা করা যাবে। ফেরোদের দেহ কবরের মধ্যে অতি
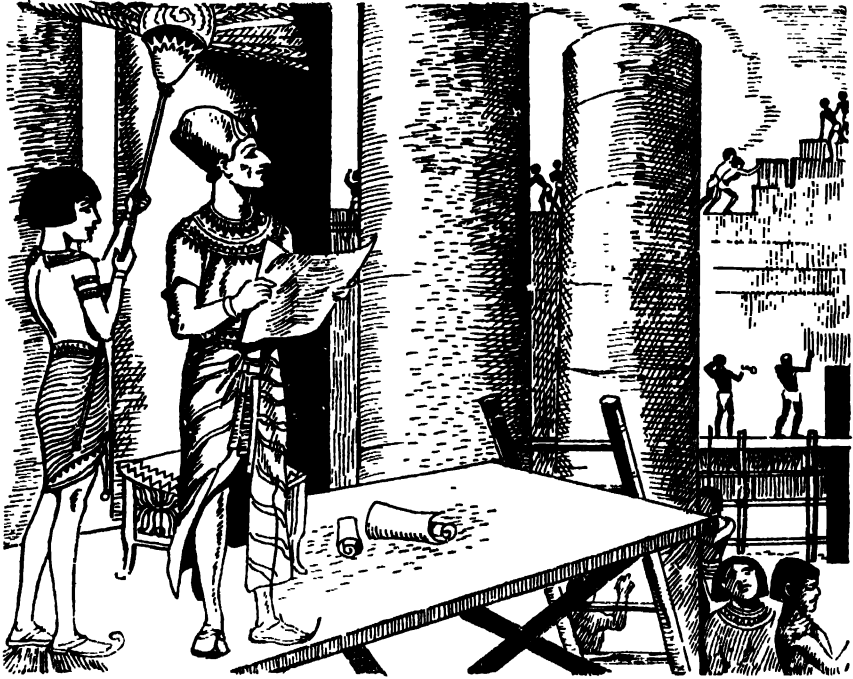
বৃহৎ পিরামিড নির্মাণ

অদ্ভুত কৌশলে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা হত। ক্রমে তারা এমন জিনিস আবিষ্কার করেছিল যা মানুষের মৃতদেহে মাখিয়ে দিয়ে, সেই দেহ সূক্ষ্ম কাপড়ের ফালি দিয়ে জড়িয়ে রাখলে, তা হাজার হাজার বছর ঠিক তেমনই থাকে, পচে যায় না। রাজাদের মৃতদেহে তারা এই সব জিনিস মাখিয়ে তাকে কবর দিত। এই রকম সংরক্ষিত মৃতদেহকে বলে **'মামী'**।

মিশরীরা শুধু যে এই সব কাজই শিখেছিল তা নয়। মনের ভাব ব্যক্ত করবার জন্যে তারা নিজে নিজে লিখতে শিখল—জল আর গঁদের আঠার সঙ্গে রান্নাঘরের ঝুল মিশিয়ে কালি তৈরি করে। তারা 'প্যাপাইরাস রীড'

নামে একরকম নলখাগড়া থেকে একরকম কাগজ তৈরি করল। তাদের লেখা ছিল চিত্রাঙ্কন-রীতিতে। তাদের অনেক লেখা আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এগুলো থেকে একটা উঁচু ধরনের সভ্যতার রূপ পাওয়া যায়।

মামী প্রস্তুত করা হচ্ছে

ইতিহাসের গোড়ার দিকে মিশর—উচ্চ-মিশর এবং নিম্ন-মিশর এই দুই রাজ্যে বিভক্ত ছিল। **মেনেসের** সময়ে এই দুই রাজ্য মিলিত হয়ে গোটা মিশরের সৃষ্টি হয়। তিনি ছিলেন সেই গোটা মিশরের প্রথম ফেরো। তিনি ও তাঁর বংশধরগণ মিশরীয় ইতিহাসের রাজবংশগুলির প্রথম রাজবংশ। মিশরের দীর্ঘ তিন হাজার বৎসরেরও অধিক কালের প্রাচীন ইতিহাসে ত্রিশটি রাজবংশের উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রথম সেটির মামী

সবচেয়ে বড় পিরামিড তৈরী হয় চতুর্থ রাজবংশের প্রথম ফেরো **খুফু**র আমলে। এই বংশেরই খাফ্‌রে নামক এক ফেরো একটা আস্ত পাথরের পাহাড় কেটে, একটা বিরাট অদ্ভুত মূর্তি তৈরি করেন; তার শরীরটা সিংহের কিন্তু মাথাটা মানুষের। এই মূর্তি আজও প্রসিদ্ধ **স্ফিংক্‌স্‌** নামে পৃথিবীর একটা আশ্চর্য বস্তু হয়ে রয়েছে।

প্রথম দিকে কাইরোর নিকটবর্তী **মেমফিস্‌** নগরী ছিল মিশরের রাজধানী। কিন্তু পরবর্তী যুগে শক্তিমান্‌ ফেরোগণ দক্ষিণ-মিশরের **থিবিস** নগরীকে তাঁদের রাজধানী করেন; এর অদূরেই সেই 'রাজাদের কবরের উপত্যকা', যেখানে পরের যুগে নৃপতি **টুট্‌আঙ্খ-আমন** (১৩৫০—১৩৩২ খ্রীঃ-পূর্বাব্দ) সমাধিস্থ হয়েছিলেন। থিবিসের নিকটেই কর্নাকে আমন দেবতার বিরাট মন্দির তৈরী হয়েছিল।

দ্বাদশ রাজবংশের শাসকদের অনেকেই বৃহৎ বৃহৎ মন্দির এবং অন্যান্য সৌধ নির্মাণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে তৃতীয় **আমেন-এম-হেট** প্রাচীন কালের একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাট্‌।

তৃতীয় থোথমেস

দ্বাদশ রাজবংশের পর মিশরে দীর্ঘদিন গৃহবিবাদ ও অরাজকতা চলে। এর পর 'হিক্‌সস' বা 'মেষপালক রাজগণ' নামে আক্রমণকারীরা মিশরে রাজত্ব করেন।

এঁরা এশিয়াবাসী আর্যজাতিসম্ভূত ছিলেন। হিক্‌সসেরা মিশরে অশ্ব ও রথের প্রচলন করেন। অষ্টাদশ রাজবংশের প্রথম ফেরো প্রথম আহ্‌মেশ এই হিক্‌সসদের মিশর থেকে বিতাড়িত করেন।

এই অষ্টাদশ রাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ ফেরো তৃতীয় **থোথমেসকে** বলা হয় 'মিশরের নেপোলিয়ন'। তিনি ছিলেন খ্রীস্ট-পূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীর

বিখ্যাত স্ফিংক্‌স্‌

যোদ্ধা-সম্রাট্‌। তাঁর সময়ে মিশর বিরাট সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। তিনি বার বার পশ্চিম-এশিয়ার রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে অভিযান করেন। আফ্রিকা অতিক্রম করে সিরিয়া, প্যালেস্টাইন (বর্তমান জর্ডন-ইজরেল অঞ্চল) এবং আরও দূরে এশিয়া-মাইনরের প্রান্তদেশ পর্যন্ত ছিল তাঁর বিজিত সাম্রাজ্যের সীমানা।

শুধু স্থলপথে নয়, নৌযুদ্ধেও তৃতীয় থোথমেস বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন। সাইপ্রাস ও ক্রীট দ্বীপের অধিপতিগণ তাঁকে কর প্রদান করতেন। মেসোপোটেমিয়ার (বর্তমান ইরাকের) রাজারা তাঁর বন্ধুত্ব লাভের আশায় তাঁকে মহামূল্য উপঢৌকনসমূহ পাঠাতেন।

তৃতীয় থোথমেসের পর আর একজন শ্রেষ্ঠ ফেরো তৃতীয় **আমেন-হোটেপ**। তিনি একজন শক্তিমান্‌ যোদ্ধা ও শিকারী ছিলেন। তাঁর রাজধানী থিবিস বিলাস-ঐশ্বর্যে পূর্ণ ছিল। তিনি অনেক বড় বড় প্রাসাদ, মন্দির ও প্রস্তরমূর্তি নির্মাণ করেন। এই সময়ের অভিজাতগণ খুব জাঁকজমকপ্রিয় ও সুরুচিসম্পন্ন ছিলেন।

এই রাজবংশের একজন বিখ্যাত স্বাতন্ত্র্যপরায়ণ ফেরোর নাম চতুর্থ
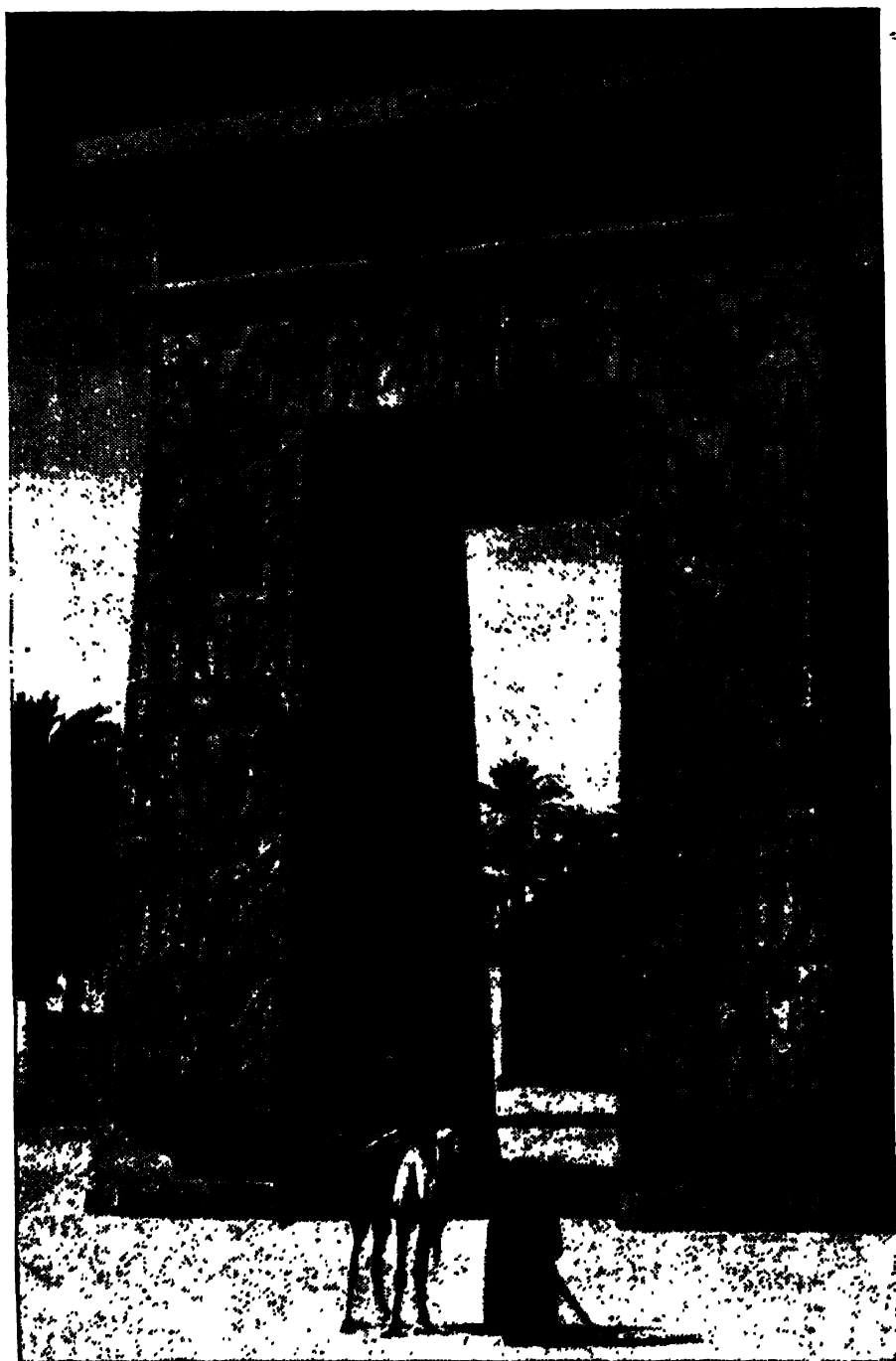
তৃতীয় টলেমির তৈয়ারী বিখ্যাত তোরণ

আমেনহোটেপ। তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা, কবি, স্বপ্নবিলাসী ও ধর্মবিপ্লবী। তিনি মিশরের বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাস না করে ও বিখ্যাত দেবতা আমনকে উপেক্ষা করে, একমাত্র সূর্য-দেবতা আটনের উপাসক হন—নিজের নাম বদলে করেন **আখ-এন-আটন।** রাজধানী থিবিস নগরী হতে আখিটেটন বা বর্তমান টেল্-এল্-আমারনা অঞ্চলে স্থানান্তরিত করেন। এই স্থানে মিশর, ব্যাবিলন, হিটাইট এবং অন্যান্য দেশের রাজন্যদের পরস্পরের মধ্যে লিখিত অনেক চিঠি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই চিঠিগুলি সে যুগের বিভিন্ন রাজ্যের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উপর আলোক-পাত করে।

টলেমি যুগের মিশরীয় ভাস্কর্যের নিদর্শন

(দেঁদারার হাথর মন্দিরের একটি স্তম্ভ)

আখ-এন-আটন যুদ্ধবিগ্রহের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নি বলে পশ্চিম-এশিয়ায় মিশর সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন শুরু হয়। ঊনবিংশ রাজবংশের ফেরোগণ আবার এই সাম্রাজ্যের অনেকখানি উদ্ধার করেন। এই বংশের একজন যোগ্য ফেরো প্রথম **সেটি।** তিনি সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে দুর্ধর্ষ আমোরাইট ও হিটাইটদের বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করেন।

ঊনবিংশ রাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ ফেরো দ্বিতীয় **রামেসিসকে** "মহামতি রামেসিস" বলা হয়। তিনি যেমন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, তেমনি বিখ্যাত সৌধনির্মাতা। তিনি পশ্চিম-এশিয়ার বিদ্রোহী জাতিদের দমন করবার অভিপ্রায়ে বহু অভিযান চালিয়েছিলেন। তিনি তৃতীয় থোথমেসের বিশাল সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের প্রয়াস করেছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হন নি। দ্বিতীয় রামেসিস ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি, অগণিত বিরাট বিরাট সৌধ, মন্দির ও তাঁর নিজের প্রস্তরমূর্তি নির্মাণ করে যশস্বী হন। কর্নাকে তাঁর নির্মিত "প্রশস্ত হল-গৃহ" খুবই বিখ্যাত।

এর পর মিশরের পতনের যুগ শুরু হয়। লিবিয়া, ইথওপিয়া প্রভৃতি নানা

স্থানের ফেরোগণ বিভিন্ন সময়ে মিশরে রাজত্ব করেন। পরে এশিয়া-মাইনরে আসিরিয়া, ব্যাবিলন প্রভৃতি রাজ্য শক্তিশালী হয়ে উঠলে, তাদের আক্রমণে মিশর দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অবশেষে তা পারসিকদের করতলগত হয়।

প্রাচীন মিশরীরা নৌ-বিদ্যা, ব্যবসা-বাণিজ্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও অন্যান্য নানারকম শিল্পে বিশেষ উন্নতি লাভ করে। থিবিস নগরী ছিল জ্ঞানে, গুণে, গরিমায় ও ঐশ্বর্যে খুব অগ্রসর ও উন্নত। মিশরের এক জন প্রাচীন ফেরো **নেকো** সুয়েজ-খালের মত একটা খাল কাটাতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, একটা খাল কেটে তারই সাহায্যে নীল নদের সঙ্গে লোহিত-সাগরকে যুক্ত করা—যাতে আরব এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যের প্রসার করা যায়।

বৈদেশিক আধিপত্য

মিশরের যখন পতন-অবস্থা আরম্ভ হল, তখন দেশের বিভিন্ন দলের কলহ-বিবাদের সুযোগ নিয়ে পশ্চিম-এশিয়ার নানা উদীয়মান জাতি একে একে মিশর আক্রমণ শুরু করল। অবশেষে পারসিকগণ সমস্ত পশ্চিম-এশিয়া অঞ্চলে প্রভুত্ব স্থাপন করলে মিশর তাদের অধীনে চলে গিয়ে পরাধীন দেশে পরিণত হল।

সে আজ প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেকার কথা। পারসিক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কাইরাসের পুত্র সম্রাট্ **কাম্বিসেস** মিশর জয় করে সেখানকার লোকদের উপর অত্যাচার শুরু করে দিলেন। ইরানের (পারস্যের) সর্বপ্রধান সম্রাট্ **দারায়ুস** সিংহাসনে আরোহণ করে মিশরীদের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করতে লাগলেন। তিনি দেশের ব্যবসায়েরও উন্নতি করেন; কিন্তু পারসিকদের শাসনের সময়ে মিশরের বিখ্যাত বন্দর নক্রেটিসের গ্রীকগণ তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সমস্ত সুবিধা হারাল। মিশরী ফেরো নেকো যে খাল কাটা অসম্পূর্ণ রেখেছিলেন, সম্রাট্ দারায়ুস তা সম্পূর্ণ করলেন। ফলে ভূমধ্য-সাগরের জাহাজগুলি তখন নীল নদে প্রবেশ করে ঐ খাল দিয়ে লোহিত-সাগরে যেতে শুরু করল।

পারসিকদের প্রায় দু'শ বছরের রাজত্বকালে, তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মিশরীরা লিবিয়াবাসী এবং ভাড়াটে গ্রীক সৈন্যের সাহায্যে বিদ্রোহ করেছিল। কিন্তু পারসিকরা কঠোর হস্তে সে বিদ্রোহ দমন করে।

এরপর মাসিডোনিয়ার পৃথিবী-বিখ্যাত বীর আলেকজান্দার যখন পারসিকদের

বিরুদ্ধে তাঁর অভিযানে দেশের পর দেশ জয় করছিলেন, তখন মিশরীরা তাঁকে তাদের ত্রাণকর্তারূপে বরণ করল। আলেকজান্দার নিম্ন-মিশরের ভূমধ্যসাগর-উপকূলে আলেকজান্দ্রিয়া নগরী স্থাপন করলেন। কালক্রমে গ্রীক টলেমি শাসক-দের আমলে এই নগরী বাণিজ্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি প্রধান কেন্দ্র হয়েছিল।

আলেকজান্দারের মৃত্যুর পর তাঁর এক-জন সেনাপতি **টলেমি** সোটার মিশরের রাজা হন। এই টলেমি বংশ সেখানে প্রায় তিন শ' বছর শাসন করেছিলেন। এই সময়ে মিশরীদের মধ্যে গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব খুব বেশী বিস্তারলাভ করে। টলেমিদের পূর্ব-ভূমধ্যসাগরে শক্তিশালী নৌবহর ছিল। টলেমি বংশের শেষ শাসক ছিলেন প্রসিদ্ধ সুন্দরী রানী **ক্লিওপেট্রা**। ইনি রোমক সেনাপতি মহাবীর **অ্যাণ্টনিকে** বিয়ে করেছিলেন। অ্যাণ্টনি ও ক্লিওপেট্রার প্রণয়-কাহিনী নিয়ে অনেক পুস্তক রচিত হয়েছে।

রানী ক্লিওপেট্রা

রানী ক্লিওপেট্রার মৃত্যুর পর রোমের প্রথম সম্রাট্ **অগস্টাস** মিশর জয় করে সারা দেশটা অধিকার করেন। পরে মিশর থেকে প্রচুর পরিমাণে শস্যসম্ভার রোমে যেত। সেই কারণে মিশরকে 'রোমের শস্য-গোলা' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল।

প্রাচীন ভারতে মৌর্য-সাম্রাজ্যের প্রবর্তক চন্দ্রগুপ্তের ছেলে বিন্দুসারের রাজ-দরবারে মিশরী গ্রীক নৃপতি টলেমির কাছ থেকে রাজদূতগণ এসেছিলেন।

এই সময়ে এথেন্সের পরিবর্তে **আলেকজান্দ্রিয়া** নগরী হয়েছিল গ্রীক সংস্কৃতির কেন্দ্র। এর বৃহৎ লাইব্রেরী এবং জাদুঘর দূর দেশের ছাত্রদেরও আকৃষ্ট করত। বিখ্যাত গ্রীক গণিতজ্ঞ **ইউক্লিড** ভারত-সম্রাট্ অশোকের যুগে আলেকজান্দ্রিয়া নগরীর অধিবাসী ছিলেন। ঐ নগরীতে ভারতীয় সওদাগরদের একটি উপনিবেশ ছিল বলে জানা গেছে। দক্ষিণ-ভারতের মালাবার-উপকূলেও আলেকজান্দ্রিয়াবাসী ব্যবসায়ীদের বসতি-স্থান ছিল।

টলেমিদের শাসনের সময়ে গ্রীকরা আচারে-ব্যবহারে অনেক মিশরী রীতিনীতি গ্রহণ করেছিল। মিশরী দেবদেবী অসিরিস, আমন, হ্যাথর প্রভৃতি গ্রীক ও পরে রোমান দেবতাদের সঙ্গে সমান আসন লাভ করেন। রোমেরও আগে খ্রীষ্টধর্ম মিশরে প্রবেশ করে; কিন্তু মিশরে বিভিন্ন খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভুত্ব নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ লেগেই ছিল। এইজন্যে মিশরীরা ক্রমে সমস্ত খ্রীষ্টানদের উপরেই বিরক্ত হয়ে যায় এবং খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আরবরা যখন একটা নতুন ধর্ম নিয়ে এল, তখন তারা তাদের অভ্যর্থনা জানাল। এর ফলে মুসলমানদের মিশর-বিজয় সহজ হল।
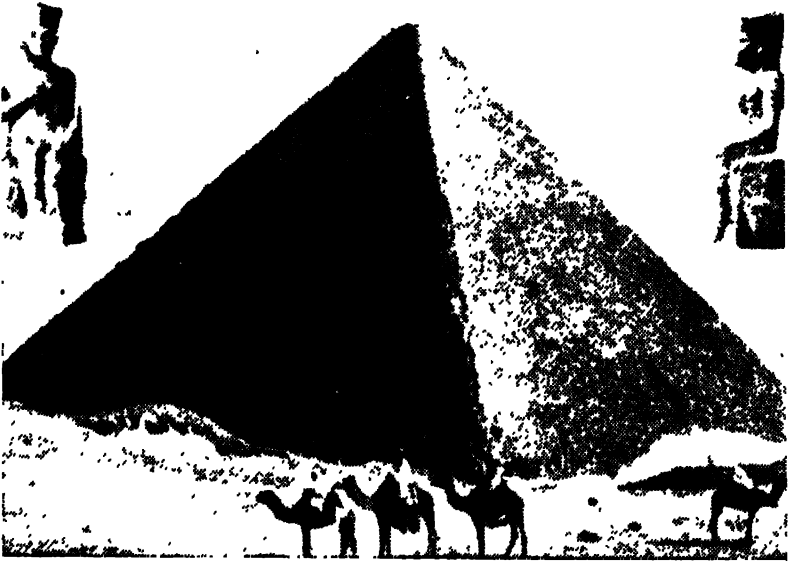
খুফুর সুবৃহৎ পিরামিড

রোমক সাম্রাজ্যের পতনের সময় কনস্টান্টিনোপলের পূর্ব-রোমক সাম্রাজ্যের অধিপতিদের সঙ্গে ইরানের সাসানিড রাজবংশের নৃপতিগণের অনেক যুদ্ধবিগ্রহ হয়। সাসানিডগণ এই যুগে মিশর জয় করে কিছুদিন সেখানে রাজত্ব করেন। পরে আরবে যখন ইসলাম ধর্মের অভ্যুত্থান হল, তখন আরবগণ নতুন ধর্মের প্রেরণায় শীঘ্রই আশপাশের দেশগুলি একটার পর একটা জয় করতে লাগল।

সপ্তম শতাব্দীতে আরব-খলিফা প্রথম ওমরের সময়ে মুসলমানেরা মিশর আক্রমণ করে। ওমর ছিলেন আরবদের রাজা ও ধর্মগুরু। মিশর জয় করে

ওমর নিজে সেখানে গিয়ে থাকেন নি, বিজিত দেশ শাসন করবার জন্যে সেখানে তিনি গভর্নর পাঠিয়ে দিতেন। আরব রাজত্বে মিশরে আরবী ভাষা ও সভ্যতা দ্রুত বিস্তার লাভ করল। দুই শতাব্দী পরে খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে যখন বাগদাদের খলিফাগণ দুর্বল হয়ে পড়লেন, তখন তুর্কী গভর্নররা বেশ কিছুদিন সেখানে স্বাধীনভাবে শাসন চালাতে লাগলেন।

এর তিন শতাব্দী পর বিখ্যাত সেলজুক্ তুর্কী সুলতান **সালাদিন** (১১৩৭-১১৯৩ খ্রীঃ) মিশরের সুলতান হলেন। ইনি খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 'ক্রুসেড' বা ধর্মযুদ্ধের যুগে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সালাদিনের একজন বংশধর ককেশাস পাহাড়-অঞ্চল হতে অনেক শ্বেতকায় তুর্কী-ক্রীতদাস মিশরে এনেছিলেন। এই ক্রীতদাসদের বলা হত **মাম্‌লুক**। এদের সৈন্যদলে ভরতি করা হয়। কিন্তু শীঘ্রই এই মাম্‌লুকরা শক্তিশালী হয়ে বিদ্রোহ করে এবং তাদের নিজেদেরই একজনকে মিশরের সুলতান-পদে বহাল করে।

এইভাবে মিশরে মাম্‌লুকদের শাসনকাল আরম্ভ হয়। তারা আড়াই শ' বছর কর্তৃত্ব করেন। তারপর অর্ধ-স্বাধীনরূপে আরও প্রায় তিন শ' বছর তাঁদের অধিকার চালান। ইতিহাসের এ একটা অদ্ভুত ব্যাপার যে, এভাবে একদল বিদেশী ক্রীতদাস পাঁচ শ' বছরেরও বেশী সময় মিশর দেশের কর্ণধার ছিলেন। মাম্‌লুকরা ককেশাস-অঞ্চল হতে ভাল দেখে প্রায়ই স্বাধীন ক্রীতদাস আমদানি করে তাদের সংখ্যা বাড়াতেন। এই মাম্‌লুকরা মিশরে দীর্ঘদিন অভিজাত এবং শাসক-শ্রেণীরূপে বিরাজ করেছেন।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে মিশর কনস্টান্টিনোপলের তুর্কী **অটোমান** সুলতানদের অধিকারে যায়। মিশর তখন বিশাল অটোমান-সাম্রাজ্যের প্রদেশে পরিণত হয়। সে সময়েও কিন্তু মাম্‌লুকরা সেখানকার শাসক-অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এর পর যখন তুর্কীরা ইওরোপে দুর্বল হয়ে পড়ে, মিশর দেশ তখন নামে মাত্র তুর্কী শাসনের অধীনে হলেও মাম্‌লুকরা যথেচ্ছ কর্তৃত্ব করতে থাকেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে যখন বিখ্যাত ফরাসীবীর নেপোলিয়ন মিশরে এসে এ দেশ জয় করেছিলেন, তখন তিনি এই মাম্‌লুকদের সঙ্গেই যুদ্ধ করেছিলেন। নেপোলিয়ন বেশী দিন মিশরে তাঁর অধিকার বজায় রাখতে পারেন নি। ইংরেজরা তখন ফরাসীদের প্রবল শত্রু। ইংরেজরা আলেকজান্দ্রিয়ায় এসে ফরাসীদের হারিয়ে দেয়। নেপোলিয়ন শীঘ্রই মিশর ছেড়ে যেতে বাধ্য হন।

মহম্মদ আলি

ফরাসীরা মিশর ছেড়ে যাওয়ার পরে তুর্কীরা আবার প্রভুত্ব করতে আরম্ভ করে। ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে **মহম্মদ আলি** নামক একজন আলবেনিয়ার তুর্কীকে, তুরস্কের সুলতান মিশরের শাসনকর্তা অথবা **'খেদিভ'** নিযুক্ত করেন। মহম্মদ আলির প্রথম থেকেই ইচ্ছা ছিল মিশরকে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন করবেন। বিদেশীদের তিনি মোটেই ভাল চোখে দেখতেন না। এর ফলে ইংরেজরা তাঁর উপর মনে মনে খুব অসন্তুষ্টই ছিল। মহম্মদ আলি মিশরী ও মাম্লুকদের উপরেও ভয়ানক অত্যাচার করতেন। তাঁর বিরুদ্ধে একটা মস্ত দল ছিল। ১৮০৭ খ্রীস্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়ায় এক-দল ইংরেজ সৈন্য এসে ঘাঁটি বাঁধল।

মহম্মদ আলি

মহম্মদ আলির বিরোধী লোকেরা ইংরেজদের সাদরে অভ্যর্থনা জানাল। ইংরেজের সহায়তায় তারা মহম্মদ আলিকে তাড়াতে পারবে, এই ছিল তাদের ধারণা। ঠিক এই সময়ে মহম্মদ আলির শত্রু, বিরোধীপক্ষের নেতার মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে দলের লোকেরা দুর্বল হয়ে পড়ল। মহম্মদ আলি এবার প্রবল বিক্রমে তাঁর শত্রুপক্ষ এবং ইংরেজ সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করে দিলেন। কয়েকটি যুদ্ধের পর তাঁর শত্রুপক্ষ একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, ইংরেজরাও খুব দুর্বল হয়ে পড়ল। ইংরেজদের হারিয়ে দিয়ে মহম্মদ আলির সাহস আরও বেড়ে গেল। তিনি গ্রীস আক্রমণ করলেন এবং তাঁদের হাত থেকে ক্রীট দ্বীপটি কেড়ে নিলেন।

মহম্মদ আলির শাসনে মিশরের অনেক উন্নতি হয়েছিল বলে শোনা যায়। তিনি মিশরের উপর তুরস্কের প্রভুত্ব অনেকখানি শিথিল করে দিয়েছিলেন, দেশে তুলার চাষের অনেক উন্নতি করেছিলেন, সুদান জয় করেছিলেন এবং মিশরে ইওরোপীয়, বিশেষ করে ফরাসী জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা আরম্ভ করিয়েছিলেন। আশি বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

ইসমাইল পাশা

মহম্মদ আলির পর খেদিভ **ইসমাইল পাশাও** (১৮৩০-১৮৯৫ খ্রীঃ) মিশরে ইওরোপীয় সভ্যতা আমদানি করেন। ইসমাইলের আমলে মিশরের লোকেরা সাহেবী কায়দায় অভ্যস্ত হয়ে উঠতে আরম্ভ করে।

ইসমাইল একটু বে-হিসাবী লোক ছিলেন। তিনি এত বেশী খরচ করে ফেলতেন যে, কর বসিয়ে তার সব টাকা তোলা যেত না। তাঁকে বাধ্য হয়ে ইওরোপের দেশগুলোর কাছ থেকে টাকা ধার করতে হত, কিন্তু সে টাকাও তিনি সব শোধ দিতে পারতেন না। কাজেই ধার পাওয়াও তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে ওঠে।

ইসমাইলের শাসনকালেই সুয়েজ-খাল খোলা হয়। ফরাসী-সম্রাট্ তৃতীয়

সুয়েজ-খাল

নেপোলিয়নের সময়ে তাঁর উৎসাহে এক ফরাসী কোম্পানি সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী এঞ্জিনিয়ার ফার্দিনান্দ্-দি-লেসেপ্স্ (১৮০৫-১৮৯৪ খ্রীঃ) দ্বারা সুয়েজ-খাল খনন করায়। ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল শুরু হয়ে ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর খাল কাটা শেষ হয়। খালটি ১০৩ মাইল লম্বা এবং কমপক্ষে ১৯৬ ফুট চওড়া।

সুয়েজ-খাল কোম্পানির প্রায় পৌনে দু'লাখ শেয়ার ইসমাইল পাশার হাতে ছিল। সুয়েজ-খালের সাড়ে ছয় লক্ষ শেয়ারের বেশির ভাগ ছিল মিশরীদের এবং ফরাসীদের হাতে। অথচ এই খাল দিয়ে যাতায়াত করার সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল ইংরেজদের। এইজন্যে টাকার অভাবে, ইসমাইল পাশা যে

মুহূর্তে সুয়েজ-খালের শেয়ার বেচে ফেলতে রাজী হলেন, ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ডিজরেলির নির্দেশ অনুসারে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট তৎক্ষণাৎ প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা দিয়ে সেগুলো কিনে নিলেন (২৪শে নভেম্বর, ১৮৭৫ খ্রীঃ)। পরে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট আরও শেয়ার ক্রয় করেন। তাঁদের শেয়ার-সংখ্যা দাঁড়ায় ২,৯৫,০২৬টি।

মিশরে ইংরেজের আগমন

সুয়েজ-খাল কাটানোর পর ইংলণ্ড থেকে কোন জাহাজের ভারতবর্ষে যেতে হলে আর আফ্রিকা ঘুরে যাওয়ার দরকার হত না। ভূমধ্যসাগর এবং সুয়েজ-খাল দিয়ে গেলে অর্ধেক সময়ে সে জাহাজ ভারতবর্ষে পৌঁছে যেত। ইংরেজরা বুঝল যে মিশর যদি তাদের কোন শত্রুর অধীনে থাকে, তাহলে সুয়েজ-খাল দিয়ে ব্রিটিশ জাহাজ ইচ্ছামত চলাচল করতে পারবে না।

মিশর সেই সময় তুর্কী-সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। তুর্কীর সঙ্গে ইংরেজদের তখনও শত্রুতা হয় নি; কিন্তু তাদের ভয় ছিল পাছে তাদের অন্য কোন শত্রু এসে মিশর দখল করে বসে। এই ভয়ে ইংরেজরা মিশরের খেদিভের অধীনে চাকরি নিয়ে দলে দলে সেখানে আসতে আরম্ভ করে দিল। ধীরে ধীরে দল ভারী করে তারা সেখানে এমন একটা অবস্থা করে তুলল যে, মিশরের খেদিভ ইংরেজদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজই করতে সাহস পেতেন না।

আরাবি পাশা

ইংরেজরা ক্রমাগত মিশরীদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে লাগল এবং তাদের নিজেদের দেশের হিসাব-পরীক্ষকদের দ্বারা মিশরীয় সরকারের হিসাবপত্র পরীক্ষা করাতে লাগল। মিশরীরা এতে খুব চটে গেল এবং দেশের যুবকদের দ্বারা একটি জাতীয় দল গড়ে উঠল। এই দলের নেতা **আরাবি পাশা** ইংরেজদের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিদ্রোহের সৃষ্টি করলেন। ইংরেজ তার উন্নত অস্ত্র ও যুদ্ধ-জাহাজের সাহায্যে মিশরীদের এই বিদ্রোহ দমন করল এবং পুরোপুরিভাবে ঐ দেশে নিজেদের আধিপত্য স্থাপিত করল।

এই ভাবে মিশরে ইংরেজ-অধিকারের সূচনা হল। ইংলণ্ডের প্রেরিত রাজপ্রতিনিধি লর্ড ক্রোমার স্বেচ্ছাচারী শাসনকর্তার ন্যায় মিশর শাসন করতে লাগলেন। ক্রোমার দেশে শৃঙ্খলা আনলেন বটে, কিন্তু তিনি মিশরীদের উন্নতির জন্যে তেমন কিছুই করেন নি। বিদেশী মহাজনদিগকে মোটা লভ্যাংশ দেওয়াই তাঁর প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়াল।

ফরাসীরা মিশরে ইংরেজের এই আধিপত্য মোটেই পছন্দ করে নি। কারণ তাদের আর্থিক লাভ কিছুই হয় নি। আন্তর্জাতিক অবস্থার পরিবর্তনে ইংলণ্ড ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্সের সঙ্গে এইরূপ সুবিধাজনক সন্ধি করল যে, ইংরেজ মরোক্কোর উপর ফরাসী-অধিকার মেনে নেবে আর ফ্রান্স তার বিনিময়ে মিশরের উপর ইংরেজের আধিপত্য স্বীকার করবে।

এইভাবেই অনেক বছর কেটে গেল। ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে তুরস্ক যখন ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে তার শত্রু জার্মেনীর সঙ্গে যোগ দিয়ে বসল, ইংলণ্ড তখন মিশরের রক্ষণাবেক্ষণের ভার সরাসরি নিজের হাতে তুলে নিল। বন্দোবস্ত সব আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশ সৈন্য এসে মিশরে বসল এবং মিশর ইংরেজের আশ্রিত রাজ্য বলে গণ্য হল। ইংরেজরা খেদিভকে 'সুলতান' উপাধি দিয়ে সম্মান দেখাল এবং অঙ্গীকার করল যে, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেই তারা তাঁরই হাতে তাঁর রাজ্য ছেড়ে দেবে।

অবশেষে ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে যুদ্ধ যখন শেষ হল তখন মিশরের লোকেরা ভাবল এইবার তাদের দুঃখের দিনের অবসান হবে, আবার তারা নিজেদের দেশের উপর নিজেদের কর্তৃত্বের অধিকার ফিরে পাবে! কিন্তু সে আশা তাদের পূর্ণ হল না। তারা মিশর থেকে ইংরেজ সৈন্যদল সরাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগল, কিন্তু ইংরেজরা সে-বিষয়ে বার বার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও কার্যে কিছুই করল না। যুদ্ধের পর প্যারিসে যখন, কোন্ দেশের অবস্থা কি হবে, তা ঠিক করবার জন্যে শান্তি-বৈঠক বসল, মিশর সেখানে প্রতিনিধি পাঠাবার অধিকার-টুকুও পেল না। ঘরের পাশের আবিসিনিয়া (বর্তমান ইথিওপিয়া) পর্যন্ত প্যারিসের এই শান্তি-বৈঠকে প্রতিনিধি পাঠাল, কিন্তু মিশরকে ইংরেজরা সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখল।

মিশরের চতুর্থ রাজবংশের প্রথম খুফুর প্রস্তর-মূর্তি

বিদ্রোহ

প্যারিসের শান্তি-বৈঠকে প্রতিনিধি পাঠাতে না পেরে মিশরীরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হল। তারা বুঝল ইংরেজরা সহজে তাদের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেবে না। অসন্তুষ্ট মিশরীরা তখন একটা দল গড়ে দেশের স্বাধীনতার জন্যে আন্দোলন আরম্ভ করল। এই দলের নাম দিল তারা **ওয়াফ্‌দ্‌**-দল, তার নেতা হলেন মিশরের গণনেতা **জগলুল পাশা**। জগলুল দেশের স্বাধীনতার দাবি আরম্ভ করবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে এবং ওয়াফ্‌দ্‌-দলের আরও তিনজন নেতাকে ইংরেজরা নির্বাসিত করল (১৯১৯ খ্রীঃ)।

জগলুল্‌ পাশাকে মিশরীরা অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করত। তাই তাঁর নির্বাসনের পর তারা ক্ষেপে উঠে যত রকমে পারে ইংরেজের ক্ষতি করতে আরম্ভ করল। টেলিগ্রাফের তার কেটে, রাজধানী কাইরো শহরের চারিধারের রেল-লাইন এবং রাস্তা নষ্ট করে ইংরেজদের তারা ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। এক জায়গায় আন্দোলনকারীরা কয়েকজন ইংরেজকে হত্যা করে বসল। এই সংবাদ পেয়ে ইংলণ্ডের শাসনকর্তারা চিন্তিত হলেন। একটা মিটমাটের আশায় তাঁরা জগলুল্‌ ও তাঁর তিনজন সঙ্গীকে মুক্তি দিলেন।

ইংলণ্ড থেকে লর্ড মিলনারের নেতৃত্বে একদল রাজনীতিককে মিশরে পাঠানো হল। এই দলই 'মিলনার-কমিশন' নামে পরিচিত। জগলুল্‌ পাশা কিন্তু এই মিলনার-কমিশন বয়কট করবার জন্যে মিশরীদের আহ্বান জানালেন। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজরা আবার তাঁকে নির্বাসিত করল। কিন্তু মিশরীরা তাঁর আহ্বান ভুলল না। মিলনার-কমিশন যখন মিশরে এসে পৌঁছালেন একজন মিশরীও তাঁদের অভ্যর্থনা জানাল না। তারা সম্পূর্ণভাবে কমিশনকে বয়কট করল। হতাশ হয়ে মিলনার-কমিশন দেশে ফিরে গেলেন।

এই ভাবে প্রায় চার বছর তুমুল আন্দোলন চলবার পর ইংরেজ কর্তৃপক্ষ নরম হয়ে তাঁদের মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হলেন। তাঁরা ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করলেন যে, মিশরকে আর ইংলণ্ডের রক্ষণাধীনে রাখা হবে না, মিশরকে স্বাধীন দেশ বলে স্বীকার করা হল। কিন্তু ঐ সঙ্গে তাঁরা এই বলে কয়েকটা শর্তও চাপিয়ে দিলেন যে, মিশরকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে ইংলণ্ডই রক্ষা করবে, এই জন্যে সেখানে কিছু ব্রিটিশ সৈন্য থাকবে এবং সুদানের উপর তাঁদের কর্তৃত্ব বজায় থাকবে। এই তথাকথিত স্বাধীনতা এত শর্তকণ্টকিত ছিল যে বস্তুতঃ মিশরীদের অবস্থার বিন্দুমাত্র পরিবর্তনও হল না।

বর্তমান মিশরের (ঈজিপ্টের) রাজধানী কাইরো নগরীর একটি দৃশ্য

কিন্তু তথাকথিত এই স্বাধীনতা মিশরবাসিগণ মেনে নিল না। এর শাসনপ্রণালী ছিল অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল। রাজা প্রথম **ফুয়াদের** হাতে অপরিমিত ক্ষমতা অর্পণ করা হল। রাজা যথেচ্ছভাবে দেশ শাসন করতে লাগলেন, যখন খুশি তিনি পার্লামেণ্ট ভেঙ্গে দিয়ে দেশের সর্বনিয়ন্তার অধিকার প্রয়োগ করতে লাগলেন। বাস্তবিকপক্ষে এই স্বাধীনতা প্রবর্তনের পর, রাজা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মুখপাত্রস্বরূপ এবং মিশরে ইংরেজ প্রতিনিধির নির্দেশ-অনুসারেই দেশে স্বৈরাচার চালাতে লাগলেন।

জগলুল পাশা

মিশরের এক দরিদ্র ফেল্লা বা কৃষকের ঘরে জগলুলের জন্ম। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বৈদেশিক জাতিদের বাণিজ্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মিশরে কতক লোক কৃষক গোষ্ঠী থেকে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। জগলুল তাদের মধ্যে একজন।

ছোটবেলা থেকেই জগলুল ছিলেন বুদ্ধিমান্ ও সাহসী। তিনি খুব ভাল বক্তৃতা করতে পারতেন। মিশরীদের সুখ-দুঃখ তিনি যে ভাবে অনুভব করতেন এবং যে ভাষায় তা প্রকাশ করতেন, আজ পর্যন্ত কোন লোকই তা পারে নি। এই সব কারণে মিশরীরা তাঁকে দেবতার মত ভক্তি করত এবং তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করত না। মিশরের স্বাধীনতা ইংরেজরা স্বীকার করবার পরে দেশের লোকের ভোটে যখন নতুন পার্লামেণ্ট গঠিত হল, তখন জগলুলের ওয়াফ্দ্-দলের লোকেরাই খুব বেশী সংখ্যায় নির্বাচিত হলেন। পার্লামেণ্টের বেশী আসন এঁরাই দখল করলেন। নতুন গভর্নমেণ্ট যখন গঠিত হল, **জগলুল** হলেন তার প্রধানমন্ত্রী।

ইংরেজরা মিশরের স্বাধীনতা স্বীকার করেছিল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে তারা যে সব শর্ত চাপিয়ে দিয়েছিল, মিশরীরা তা মোটেই পছন্দ করে নি। জগলুল প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তারা এই সব শর্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আরম্ভ করল। আবার আন্দোলন চরমে উঠল; কয়েকজন উচ্চ রাজকর্মচারী নিহত হলেন। ইংরেজরা দোষ দিতে লাগল জগলুলকে। ঠিক এমনি সময়ে মিশরের সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতি সার্ লী স্ট্যাক কাইরো শহরে নিহত হলেন। রাজা প্রথম ফুয়াদ ভয় পেয়ে ইংরেজদের সঙ্গে পুরোপুরি যোগ দিলেন এবং জগলুলকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করলেন।

এইবার চলল দমন-নীতির পালা। ইংরেজ বন্ধুদের পরামর্শে রাজা প্রথম ফুয়াদ দলে দলে লোককে জেলে পাঠাতে লাগলেন। এই ভাবে প্রায় তিন

বছর চলবার পর ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে আবার পার্লামেন্টের সাধারণ নির্বাচন হল। এবারও জগলুলের দলই পার্লামেন্টের অধিকাংশ আসন দখল করলেন। জগলুলের ওয়াফ্‌দ্‌-দলের মধ্যে মিশরের সংখ্যালঘু খ্রীস্টান সম্প্রদায়ভুক্ত কপ্‌ট্‌ও অনেকে ছিল। ইংরেজরা কপ্‌ট্‌দের হাত করে মিশরীদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির জন্যে বার বার চেষ্টা করেছে, কিন্তু বিশেষ কিছু সুবিধা করতে পারে নি।

লর্ড লয়েড তখন মিশরে ইংরেজদের প্রতিনিধি ; রাজা প্রথম ফুয়াদ তাঁরই পরামর্শে চলতেন। লর্ড লয়েড জগলুলকে প্রধান মন্ত্রী করতে কিছুতেই রাজী হলেন না, কাজেই রাজা ফুয়াদও জগলুলকে ডেকে তাঁকে প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করতে বলবার সাহস পেলেন না। এই সব গোলমালের মধ্যে পরের বৎসর ৬৭ বৎসর বয়সে জগলুল পাশার মৃত্যু হল।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধি

জগলুলের মৃত্যুর পরও কিন্তু ইংলণ্ডের সঙ্গে মিশরের গোলযোগ মিটল না। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ মিশরীদের জানালেন যে মিশরের সৈন্যদল মিশরীরাই পরিচালনা করতে পারবে, শুধু যুদ্ধের সময় মিশরে ব্রিটিশ সৈন্যের ঘাঁটি বসাবার সুযোগ ইংলণ্ডকে দিতে হবে। তা ছাড়া, সুদানের উপর মিশর এবং ইংলণ্ড দুজনেরই কর্তৃত্ব থাকবে, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে সুদানের উপর ইংলণ্ডের প্রভুত্বই বজায় থাকবে।

নাহাশ পাশা জগলুলের পর ওয়াফ্‌দ্‌-দলের নেতা হয়েছিলেন। ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দের নির্বাচনেও ওয়াফ্‌দ্‌-দলই পার্লামেন্টের বেশির ভাগ আসন দখল করেছিল এবং নাহাশ পাশা হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। ইংরেজদের এই সন্ধির প্রস্তাবে তিনি রাজী হলেন না। রাজা প্রথম ফুয়াদ ইংরেজদের পরামর্শে ওয়াফ্‌দ্‌ দলকে জব্দ করবার জন্যে পার্লামেণ্ট ভেঙে দিয়ে তাঁরই এক বন্ধু **সিদকী পাশার** হাতে দেশের শাসনভার তুলে দিলেন।

সিদকী পাশাকে শিখণ্ডী রেখে ইংরেজরা ওয়াফ্‌দ্‌দের উপর কঠোর অত্যাচার চালাতে লাগল। তাদের সভা-সমিতি করা নিষিদ্ধ হল, এবং সংবাদপত্রগুলো বন্ধ করে দেওয়া হল। ওয়াফ্‌দ্‌রা যাতে পার্লামেন্টের অধিকাংশ আসন দখল করতে না পারে, সেজন্যে দেশের নির্বাচন-পদ্ধতি পর্যন্ত এমনভাবে বদলে ফেলা হল যাতে শুধু বড়লোকেরাই বেশি করে ভোট দিতে পারেন, কৃষকদের ভোট দেবার ক্ষমতা কমে যায়! কারণ, ওয়াফ্‌দ্‌-দল ছিল দেশের জনসাধারণের প্রিয় দল, গরিবেরা এবং কৃষকেরাই ছিল তার প্রাণ।

ওয়াফ্‌দ্‌-দলকে এইভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে এবং নেতাদের কাইরো শহরে বন্দী করে রেখে রাজা ইংরেজদের পরামর্শ-অনুযায়ী দেশ শাসন করতে লাগলেন।

তারপর ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ইতালী যখন মিশরের ঘরের পাশে আবিসিনিয়া (ইথিওপিয়া) আক্রমণ করে বসল, ইতালীর ভয়ে মিশরীরা তখন ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি করতে রাজী হল। ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে এই সন্ধি হয়। ইংরেজরা মিশর থেকে তাদের সৈন্য সরিয়ে নিতে রাজী হল এবং সুয়েজ খাল রক্ষার জন্যে ইংরেজরা তাদের ইচ্ছামত বন্দোবস্ত করলে মিশরীরা তাতে আপত্তি করবে

প্রথম সেটি

দ্বিতীয় রামেশিস

না বলে জানিয়ে দিল। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী ঠিক হল, ইংরেজরা ২০ বছরের জন্য সুয়েজ-খাল অঞ্চলে দশ হাজার স্থল-সৈন্য ও চার শ' বৈমানিক রাখতে পারবে এবং আলেকজান্দ্রিয়া ও পোর্ট সৈয়দে নৌবন্দর স্থাপন করতে পারবে।

বৈদেশিক ব্যাপারে মিশর ইংলণ্ডের সঙ্গে পরামর্শ করে চলতে সম্মত হল।

এই সন্ধির ফলে মিশরের সঙ্গে ইংলণ্ডের শত্রুতা কতকটা কমে গেল। এই সন্ধির কিছুদিন পরে রাজা প্রথম ফুয়াদের মৃত্যু হয় (২৮শে এপ্রিল, ১৯৩৬ খ্রীঃ) এবং তাঁর ছেলে রাজা প্রথম ফারুক মিশরের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধবার সঙ্গে সঙ্গে (১৯৩৯ খ্রীঃ) ইংরেজ মিশরে নিজের প্রভুত্ব আবার সুপ্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টায় নিযুক্ত হল। না করে তার কোন উপায়ও ছিল না; কারণ, এদিকে সুয়েজ-খাল ছিল তার ভারত-সাম্রাজ্যের সিংহদ্বার,

ওদিকে মিশরের পশ্চিম-সীমান্ত হল লিবিয়ার প্রবেশ-পথ। দুই পথ দিয়েই জার্মান ও ইতালীয় বাহিনী অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করবে নিশ্চয়ই।

বস্তুতঃ, লিবিয়া ও ইথিওপিয়ার যুদ্ধের অনেকটা ঢেউ এসে মিশরকেই ধাক্কা দিয়েছিল বার বার। জার্মান সেনানায়ক রোমেলের সঙ্গে ইংরেজ সেনার যে ভয়াবহ যুদ্ধ হয়েছিল তিন বৎসর ধরে, তার অন্যতম কেন্দ্র ছিল মিশরেরই সন্নিকটে সেলেম-বেনগাজী অঞ্চল।

কাইরোতে রুজভেল্ট, চার্চিল প্রভৃতি রাষ্ট্রনায়কদের একটা কূটনৈতিক কেন্দ্র ছিল। এখানে তাঁরা বারবার পরস্পরে সম্মিলিত হয়েছেন, এবং অন্যান্য বৈদেশিক রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।

ইংরেজ সৈন্যের অন্যতম ঘাঁটি ছিল কাইরো, এবং আলেকজান্দ্রিয়াতে ছিল ইংরেজ নৌ-বাহিনী ও রাজকীয় বিমান বহরের অন্যতম আশ্রয়-স্থল। গ্রীসের নির্বাসিত গভর্নমেন্ট তিন বছর ধরে কাইরোতে অবস্থান করেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর (১৯৪৫ খ্রীঃ) থেকে মিশরবাসিগণ আবার পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে আন্দোলন আরম্ভ করে। পশ্চিম এশিয়ার মুসলমান দেশগুলির ভিতর তারাই রাজনীতিকতায় বেশী সচেতন। মিশরের স্ত্রীলোকেরাও রাজনৈতিক জ্ঞানে খুব অগ্রসর। মিশরীরা দাবি করতে লাগল যে, ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধি তাদের পক্ষে অবমাননাকর, ঐ সন্ধি রহিত করতে হবে। সুয়েজ-খাল অঞ্চলে ইংরেজ সৈন্য থাকতে পারবে না, আর সুদান থেকে ইংরেজ-আধিপত্য সরিয়ে নিয়ে সুদানকে মিশরের সঙ্গে যুক্ত হতে দিতে হবে। যুদ্ধের পরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গরিমা অনেক ম্লান এবং তাদের সামরিক শক্তি শিথিল হয়ে যাওয়ায় তারা এইসব দাবির জোর প্রতিবাদ করতে পারল না। ইংরেজগণ মিশরীদের সঙ্গে কথাবার্তায় পূর্বসন্ধির পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিল, কিন্তু কার্যে কোন আন্তরিকতারই পরিচয় দিল না।

যুদ্ধের পরে রাশিয়ার সঙ্গে ইঙ্গ-আমেরিকার বিরোধবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির প্রতি বেশী মনোযোগ দিল এবং সুয়েজ খালের গুরুত্ব সম্বন্ধে বেশী সজাগ হতে আরম্ভ করল। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর ইরানে যখন রাশিয়ার সৈন্য মোতায়েন ছিল তখন থেকে আমেরিকার নৌবহর পূর্ব-ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হল। ইংলণ্ডও সুয়েজ-খাল অঞ্চলে ক্রমেই সৈন্যসংখ্যা বাড়াতে লাগল। সুদানকে পূর্বের মতই মিশর থেকে আলাদা রাখার জন্যে ইংরেজরা চেষ্টা করতে থাকল।

এই সব কারণে মিশরীদের অসন্তোষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল।

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে আবার ওয়াফ্দ্‌-দল প্রবীণ নেতা নাহাস পাশার অধীনে মিশরের কর্তৃত্ব লাভ করে। নাহাস পাশা প্রধানমন্ত্রী হবার পর হতে বৃদ্ধ বয়সেও মিশরের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে প্রবল উদ্যমে সংগ্রাম শুরু করেন।

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মিশরী পার্লামেণ্ট এককভাবে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ইঙ্গ-মিশরীয় সন্ধি বাতিল করে দেয়। ইংরেজরা এতে ভীষণ চটে গিয়ে বলে যে তাদের সম্মতি ছাড়া এ সন্ধি বাতিল করা বে-আইনী। মিশরীদের মধ্যে বিশেষতঃ কাইরো ও আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ভিতর ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হয়। তারা সুয়েজ-খাল অঞ্চল ও সুদান হতে ইংরেজ আধিপত্য অপসারণের জন্যে বদ্ধপরিকর হয়। পশ্চিম-এশিয়া প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থায় যোগ দেবার জন্যে ইংলণ্ড ও আমেরিকা তাদের আমন্ত্রণ জানালে তারা সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে। গোলমালের সময় ইংরেজ তার সৈন্য ও জাহাজ দ্বারা সুয়েজ অঞ্চল ছেয়ে ফেলে।

জেনারেল নাগিব

মিশরের রাজা প্রথম ফারুক বরাবরই নিজের আধিপত্য বজায় রাখার জন্যে ইংরেজের সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্র করে-ছিলেন। তিনি ইংরেজ-শক্তির সাহায্যে প্রধান-মন্ত্রী নাহাস পাশাকে পদচ্যুত করেন এবং জনজাগরণ ও আন্দোলনকে দৃঢ়হস্তে দমন করতে থাকেন। সুয়েজ-খাল অঞ্চলে জোর করে শান্তি স্থাপন ও ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন সাময়িকভাবে স্তব্ধ হয়ে যায়।

রাজবংশের বিদায়

১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই মিশরীয় ইতিহাসে নাটকীয় ভাবে এক নতুন অধ্যায়ের অবতারণা হয়। জেনারেল মোহাম্মদ নাগিব এক সামরিক 'কুপ' বা

অতর্কিত আক্রমণের সাহায্যে সমস্ত ক্ষমতা নিজে অধিকার করেন। রাজা প্রথম ফারুক অনন্যোপায় হয়ে সিংহাসন ত্যাগ করে দেশ ছেড়ে চলে যান এবং তাঁর শিশুপুত্র দ্বিতীয় ফুয়াদকে ফারুক উপাধি দিয়ে মিশরের রাজা বলে ঘোষণা করা হয়।

১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই জুন মিশর স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র বলে ঘোষিত হয়। নাগিব প্রথম সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি ফারুকের নিজস্ব কর্মচারীদের প্রথমেই গ্রেফতার করেন, ওয়াফ্‌দ্‌-দল ও অপরাপর রাজনৈতিক দলকে ভেঙে দেন এবং ‘পাশা’ ও ‘বে’ উপাধিগুলি তুলে দেন। ক্ষমতা হাতে পেয়ে ভূমি-সংক্রান্ত সংস্কার সাধনেই তিনি অধিকতর মনোযোগী হন। মিশরের গ্রামগুলি ও কৃষকদের কল্যাণকল্পে তিনি বিধান জারি করেন যে, কোন ব্যক্তির দুইশত একরের অধিক জমি থাকবে না। তিনি সুদানের স্বাধীনতাকামী ‘উম্মা’ দলের সঙ্গে একটি আপস-চুক্তিতে আবদ্ধ হন। পরে তিনি মিশরকে এক প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করে নিজে তার রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত হন।

কর্নেল নাসের

জেনারেল নাগিবের বলিষ্ঠ নীতি মিশরকে ঠিক পথেই নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু যে বিপ্লবী দলের সহযোগিতায় জেনারেল নাগিব মিশরের শাসন-ক্ষমতা অধিকার করেন, দুর্ভাগ্যক্রমে কতকগুলি ঘরোয়া ব্যাপারে তাদের সঙ্গে তাঁর মতভেদ ঘটে। ফলে জেনারেল নাগিবকে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে অপসারিত করা হয়। বিপ্লবী দলের অন্যতম সদস্য কর্নেল গামাল আবদেল নাসের ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল মিশরের প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন। পরে জন-সাধারণের ভোটে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন নাসের রাষ্ট্রপতি হন। এদিকে সুদান থেকেও ইংরেজ আধিপত্য দূর হয় এবং সুদান একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন ও আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক আসোয়ান

বাঁধ তৈরি করার জন্যে মিশরকে তাদের প্রতিশ্রুত ঋণ দিতে অস্বীকৃত হয়। অথচ এই বাঁধ নির্মাণের উপর মিশরের উন্নতি বহুলাংশে নির্ভর করে। তখন নাসের সুয়েজ-খাল দখল করেন। স্থির হয়, খালের আয় থেকে বাঁধ তৈরী হবে। পূর্ব শর্ত অনুযায়ী ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দে সুয়েজ-খালের অধিকার আপনাআপনি মিশরের পাবার কথা ছিল। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুন ইংরেজ তার সব সৈন্য (প্রায় আশি হাজার) সুয়েজ এলাকা থেকে সরিয়ে নেয় এবং ঐ বছরের ২৬শে জুলাই নাসের সুয়েজ-খাল দখল করেন। এইভাবে জোর করে খাল দখল করায় ইংরেজ ও ফরাসীরা খাল আক্রমণ করে। শেষ পর্যন্ত তারা যুদ্ধ বন্ধ করে এবং মিশর বিভিন্ন শর্তে রাজী হয়।

সম্মিলিত আরব যুক্তরাষ্ট্র

মিশর নামের বদলে অনেক দিন আগে থেকেই ঈজিপ্ট নাম চলে আসছে। ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি ঈজিপ্টের প্রেসিডেণ্ট নাসের ও সিরিয়ার প্রেসিডেণ্ট কুওয়াটালি এক সম্মিলিত রাষ্ট্র গঠন করেন। ঠিক হয়, উভয় রাষ্ট্রের একই সম্মিলিত সৈন্যদল ও একটি পতাকা থাকবে। এই বৎসরের ৮ই মার্চ ইয়েমেন ঈজিপ্ট ও সিরিয়ার সঙ্গে মিলিত হয়। এই তিন রাষ্ট্রের সম্মিলিত নাম হয় সম্মিলিত আরব যুক্তরাষ্ট্র।

১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই মে ঠিক হয় যে, সম্মিলিত আরব যুক্তরাষ্ট্রের সকলেই 'আরবীয়' নামে পরিচিত হবে।

১৯৬১ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর সিরিয়া সম্মিলিত আরব যুক্তরাষ্ট্র থেকে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে। প্রেসিডেণ্ট নাসের ২৯শে সেপ্টেম্বর তা মেনে নেন।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর প্রেসিডেণ্ট নাসের ইয়েমেনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

ঈজিপ্ট একক রাষ্ট্র হলেও এখনও সম্মিলিত আরব যুক্তরাষ্ট্র নামেই পরিচিত। সম্মিলিত আরব যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইজরেলের সম্পর্ক আদৌ বন্ধুত্বপূর্ণ নয়। মাঝে মাঝে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। একবার ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ বাধে। সেই যুদ্ধে উভয় পক্ষের বহু ক্ষয়ক্ষতির পর দুই দেশের মধ্যে এক চুক্তি হয়। ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে জর্ডন ও সম্মিলিত আরব যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। ইজরেল জয়ী হয় এবং বিরোধী দেশের বহু স্থানের উপর নিজ আধিপত্য বিস্তার করে। ইজরেল এখনও সেই সব অধিকৃত স্থান ত্যাগ করে নি।

গামাল আবদেল নাসের ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ৬ বৎসরের জন্যে সম্মিলিত আরব যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট হয়েছেন। সম্মিলিত আরব যুক্তরাষ্ট্র আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব কোণের একটি দেশ। এর পূর্বে ইজরেল ও লোহিত সাগর, পশ্চিমে লিবিয়া, দক্ষিণে সুদান এবং উত্তরে ভূমধ্যসাগর। সম্মিলিত আরব যুক্তরাষ্ট্রের আয়তন ১০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার (৩,৮৬,১৯৮ বর্গ মাইল)। এই বিস্তৃত স্থানের মধ্যে কর্ষণযোগ্য জমির পরিমাণ মাত্র ৩৫,৫০০ বর্গ কিলোমিটার (১৩,৬৩০ বর্গ মাইল)। নীল নদ, জলাভূমি ও হ্রদসমূহের আয়তন ২৮৫০ বর্গ মাইল। খাল, রাস্তা, খেজুরক্ষেত্র ইত্যাদি ১৯০০ বর্গ মাইল। এর লোকসংখ্যা ৩,০০,৮৩,০০০ (১৯৬৬ খ্রীঃ)। জনসংখ্যা প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৭৩২ জন। এর লোকসংখ্যার শতকরা ৯১.৪৬ জন মুসলমান।

সিরিয়া

সিরিয়া এক প্রাচীন দেশ। এখানকার দামাস্কাস বার হাজার বছরের প্রাচীন শহর। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই অগস্ট সিরিয়া স্বাধীন রাষ্ট্রে, পরিণত হয়। ১লা সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়—সিরিয়া ও বৃহত্তর লেবানন। ১৯২০ থেকে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দুইটি রাষ্ট্রই ফরাসী তত্ত্বাবধানে থাকে।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর সিরিয়া ফ্রান্স কর্তৃক প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র বলে ঘোষিত হয়। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী সৈন্য দেশ ছেড়ে চলে যায়।

সিরিয়া রাষ্ট্রসংঘের সভ্য। রাষ্ট্রটি কম্যুনিস্ট-প্রভাবাধীন। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিরিয়া সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয় এবং সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য লাভ করে। সিরিয়া মধ্য প্রাচ্যের একটি দেশ। এর উত্তরে তুরস্ক, পূর্বে ইরাক, দক্ষিণে জর্ডন ও ইজরেল এবং পশ্চিমে লেবানন ও ভূমধ্যসাগর।

ডাঃ নুরেদ্দিন অল আতাসি সিরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান এবং ডাঃ ইউসিফ জেয়েন প্রধানমন্ত্রী।

সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাস। এর আয়তন ১,৮৫,৬৮০ বর্গ কিলোমিটার (৭১,৭৭২ বর্গ মাইল) এবং লোকসংখ্যা ৫০,৬৭,০০০ (১৯৬২)। সিরিয়ার অধিবাসীদের অধিকাংশই মুসলমান।

চীন

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী লোকের বাসভূমি হচ্ছে চীন। চীনের লোকসংখ্যা প্রায় সত্তর কোটি। জাতি হিসাবে চীনারা হল মঙ্গোলীয়। এদের গায়ের রং পীত, নাক খাঁদা এবং চোখ ছোট। ভারতবর্ষের মত চীনদেশকেও প্রকৃতিদেবী অনেকটা সুরক্ষিত করে রেখেছেন। চীনের পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণ-পশ্চিমে হিমালয় আর পশ্চিম ও উত্তরে পাহাড়-পর্বত এবং মরুভূমি।

চীনের ইতিহাস অতি প্রাচীন; প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে থেকে চীনদেশের ইতিবৃত্ত জানা যায়। চীনে ইয়াংসিকিয়াং এবং হোয়াং হো (পীত নদী) নামে দুটো নদী আছে। এদের মাঝখানের সমতলভূমিতে ছিল চীনাদের আদি বাস। এখান থেকেই তারা ধীরে ধীরে চীনের অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। দেশের লোকসংখ্যা যখন বেড়ে গেল তখন দেশের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে তারা একজন রাজা ঠিক করে নিল। রাজাকে তারা বলত "ঈশ্বরের পুত্র" এবং তাঁকে আন্তরিক সম্মান করত।

জাপানীরাও রাজাকে ঈশ্বরের পুত্র বলে ভক্তি এবং পূজা করেছে। চীনাদের সঙ্গে এ বিষয়ে জাপানীদের তফাত এই যে, চীনারা রাজাকে ভক্তি করেছে, সম্মান জানিয়েছে, কিন্তু কখনো তাঁকে দেবতা বলে পূজা করে নি।

প্রায় হাজার চারেক বছর আগেই চীনবাসীরা নিত্যপ্রয়োজনীয় ছোটখাট জিনিস তৈরি করতে এবং লিখতে পড়তে শিখেছিল। তাদের লেখা ছিল চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতিতে।

প্রাচীন কাল থেকে চীনে অনেক রাজবংশ রাজত্ব করেন। প্রথম দিকে **শিয়া**-বংশ চার শ' বছরের অধিক রাজত্ব করেন। এর পর **শাং** অথবা **জিন্**-বংশ

অধিকার লাভ করেন। এই বংশীয়েরা দীর্ঘযুগ অর্থাৎ প্রায় সাড়ে ছয় শ' বৎসর রাজত্ব চালান। প্রাচীন কালে এই দীর্ঘ রাজত্বের যুগগুলিতে প্রথমে যাঁরা রাজত্ব করতেন তাঁদের রাজা না বলে **প্যাট্রিয়ার্ক** অথবা গোষ্ঠীমুখ্য বলা চলে। আস্তে আস্তে সামন্ত রাজাদের ক্ষমতা খর্ব করে সুনিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় শাসন-যন্ত্রের উদ্ভব হয়। তখন রাজ্যের আয়তন বেড়ে যায় এবং প্রকৃত রাজারা রাজত্ব শুরু করেন। শাং-বংশের পর **চৌ-বংশ** অধিকার লাভ করেন। এঁদের রাজত্বকাল প্রায় নয় শ' বছর। এঁদের সময়েই চীনে প্রথমে সুপ্রতিষ্ঠিত শাসন-ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ দু'জন দার্শনিক, **কনফিউসিয়াস** এবং **লাও-সে** এ-যুগেই চীনে বাস করতেন।

যখন শাং-বংশ ক্ষমতা থেকে অপসারিত হন তখন এঁদেরই একজন বড় রাজকর্মচারী, **কি-সে** পাঁচ হাজার অনুচরসহ কোরিয়া দেশে গিয়ে শাসনের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ঐ দেশের নাম দেন **চোসেন**। এই সময় থেকেই কোরিয়ার ইতিহাস শুরু হয়।

চৌ-বংশের পর চী'ন-বংশের এক রাজা সিংহাসনে বসেন। এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজার নাম **শি-হুয়াংতি**। ইনি একজন শ্রেষ্ঠ, শক্তিশালী রাজা এবং এঁকে বলা হয় চীনের "প্রথম সম্রাট্"। এই বংশের নাম থেকেই এ দেশের নাম হয় চীন।

শি-হুয়াংতির ধারণা ছিল তাঁর আগে যাঁরা রাজত্ব করেছেন তাঁরা কেউ কিছু নন। তাঁদের কীর্তিকলাপ লিখে রাখারও কোন সার্থকতা নেই। সুতরাং তিনি চীনের সমস্ত পুরানো ইতিহাস পুড়িয়ে ফেলবার হুকুম দিলেন। রাজার এই অদ্ভুত হুকুমে অনেক বই পোড়ানো হয়েছিল বটে, কিন্তু দেশের পণ্ডিত লোকেরা ভাল ভাল বইগুলো সব লুকিয়ে ফেলেছিলেন বলেই সেগুলো রক্ষা পেয়েছিল। শুধু ডাক্তারি, কৃষিবিদ্যা এবং জ্যোতিষ-শাস্ত্রের বইগুলো পোড়াতে তিনি বারণ করেছিলেন।

শি-হুয়াংতি চীনের রাজধানী পিকিং শহরের চারদিকে এক **বিরাট প্রাচীর** নির্মাণ আরম্ভ করেন। এই প্রাচীর আজও পৃথিবীর একটি আশ্চর্যের বস্তু হয়ে রয়েছে। চীনের উত্তর দিক্ থেকে হূন প্রভৃতি অসভ্য পার্বত্য জাতির দস্যুরা এসে প্রায়ই লুটপাট করে যেত, তাদের ঠেকাবার জন্যেই শি-হুয়াংতি এই প্রাচীর গঠনে ব্রতী হয়েছিলেন। শুধু পিকিংয়ের চারদিকে নয়, চীনের উত্তর দিকে মঙ্গোলিয়ার সীমান্ত ধরে সমুদ্র পর্যন্ত প্রায় দেড় হাজার মাইল লম্বা এই বিখ্যাত প্রাচীর। প্রাচীরটি ২৫ ফুট উঁচু এবং এত চওড়া যে তার

ওপর দিয়ে ছয় জন অশ্বারোহী একসঙ্গে পাশাপাশি ছুটে যেতে পারে। আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ২১৪ অব্দে প্রাচীরটির নির্মাণকার্য শুরু হয় কিন্তু শেষ হতে

রাজা শি-হুয়াংতির আদেশে চীনের প্রাচীন ইতিহাস পোড়ানো হচ্ছে

কয়েক শতাব্দী লেগেছিল। এই প্রাচীর রাজা শি-হুয়াংতির রাজত্বের সবচেয়ে বড় ও উল্লেখযোগ্য কীর্তি। শি-হুয়াংতি সম্রাট্ অশোকের সমসাময়িক।

কনফিউসিয়াস এবং লাও-সে

চীনদেশে যত মহাপণ্ডিত লোক জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে সব চেয়ে বড় হচ্ছেন **কনফিউসিয়াস** (খ্রীষ্টপূর্ব ৫৫১-৪৭৯ অব্দ) এবং লাও-সে (জন্ম ৬০৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে কনফিউসিয়াসের জন্ম, লাও-সে তাঁর চেয়ে কিছু বড়।

খুব ছোটবেলায় কনফিউসিয়াসের বাবা মারা যান, তাঁর মা তাঁকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেন। বড় হয়ে কনফিউসিয়াস তাঁর নিজের 'লু' প্রদেশে চীনের ছেলেদের লেখা-পড়া শেখাবার জন্যে একটা স্কুল খোলেন। চীনদেশের রাজার খুব বড় লাইব্রেরী ছিল। শি-হুয়াংতি তখনো রাজা হন নি, কাজেই সে লাইব্রেরীর কোন ক্ষতি তখনো হয় নি। তাঁর মনে রাজার লাইব্রেরীতে গিয়ে ইতি-হাসের বই পড়বার ইচ্ছা জাগল।

কনফিউসিয়াস

রাজধানী অভিমুখে তিনি রওনা হলেন। সেখানে পৌঁছে লাইব্রেরীতে গিয়ে তিনি উপস্থিত হলেন এবং ঘুরে ঘুরে লাইব্রেরী দেখতে লাগলেন। এই সব বই কিন্তু এখনকার মত কাগজে ছাপানো ছিল না। বাঁশের ছালের উপর তুলি দিয়ে অক্ষর এঁকে এই সব বই তৈরী হয়েছিল। পড়া শেষ করে কনফিউসিয়াস তাঁর দেশে ফিরে এলেন।

কনফিউসিয়াসের পাণ্ডিত্যের জন্যে তাঁকে লু'র শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। কনফিউসিয়াস চীনাদের আচার-ব্যবহার পালন ব্যাপারে নানারকম নিয়ম-কানুন করে দিলেন। চীনবাসীদের সভ্যতা ও ভদ্রতা শেখাবার উপর তিনি

খুব ঝোঁক দিলেন। ভদ্র ব্যবহার এবং সুসভ্য আদবকায়দা শিখে চীনাদের চরিত্র উন্নত হবে এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। তাঁর প্রধান শিক্ষা এই ছিল যে, "অন্যের কাছ থেকে যে ব্যবহার তুমি পেতে চাও না, অপরের সঙ্গে সে ব্যবহার কখনো কর না।"

কনফিউসিয়াস যে ধর্মমত প্রচার করেন, তা আজও চীনের প্রায় ত্রিশ কোটি লোক মেনে চলে।

লাও-সে

লাও-সেও মহাজ্ঞানী লোক ছিলেন। তিনি যে ধর্মমত প্রচার করেন তা তাও ধর্ম নামে প্রসিদ্ধ। তিনি চীন-বাসীদের শিখিয়েছেন সত্যের ও প্রেমের বাণী। তিনি বলতেন, "যদি কেউ তোমাকে আঘাত করে, তাকেও তুমি ক্ষমা কর, তার সঙ্গেও সদয় ব্যবহার কর।"

তাও ধর্ম অনেকটা বৌদ্ধধর্মের মত। এ ধর্মে পৌত্তলিকতা নেই। ঈশ্বর সম্বন্ধে এ ধর্ম নীরব। অহিংসা, ক্ষমা, দয়া প্রভৃতি এ ধর্মের অঙ্গ। নির্বাণ লাভ তাও ধর্মীয়দের লক্ষ্য। চীনের তাও ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় পাঁচ কোটি।

কনফিউসিয়াস লাও-সে-র চেয়ে বড় রাজনীতিবিদ্ ও বাস্তবপন্থী দার্শনিক ছিলেন। চীনের লোকের জাতীয় চরিত্রের উপর যুগ যুগ ধরে তিনি অবাধ প্রভাব বিস্তার করেছেন।

হান ও তাং-বংশ

শি-হুয়াংতির চীন-বংশ লোপ পাওয়ার পর শুরু হয় **হান**-বংশের রাজত্ব। হান-রাজাদের আমলে চীনে আবার ইতিহাস ও সাহিত্য-চর্চা আরম্ভ হয়। এই বংশের গৌরবের যুগ খ্রীস্টপূর্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দী। এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজা

ছিলেন **উ-তি**। তিনি ছিলেন বিরাট সাম্রাজ্যের অধিনায়ক। পূর্বে কোরিয়া থেকে পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগরের সীমানা পর্যন্ত ছিল তাঁর সাম্রাজ্যের আয়তন। দক্ষিণ অঞ্চলের পাহাড়ে জাতিরাও তাঁকে অধীশ্বর বলে মানত। তখন রোম-সাম্রাজ্য খুব বড় ও ক্ষমতাপন্ন ছিল; কিন্তু চীন ছিল তার চেয়েও বড় ও শক্তিশালী।

সম্রাট্ উ-তির সময়েই বোধ হয় চীন ও রোমের মধ্যে বাণিজ্যের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এই হান-বংশের সময়েই চীনে ভারত থেকে বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব হয়। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতির প্রভাবও চীনে বিস্তার লাভ করে। এই প্রভাব চীন থেকে যায় কোরিয়ায় এবং কোরিয়া থেকে জাপানে। হান-রাজাদের রাজত্বকালেই কাগজ ও ছাপাখানা আবিষ্কৃত হয় এবং পাথরের মূর্তি তৈয়ারী শুরু হয়। হান-রাজারাই সর্বপ্রথম সরকারী চাকরিতে কর্মচারী নিয়োগের জন্যে পরীক্ষা নেওয়া আরম্ভ করেন।
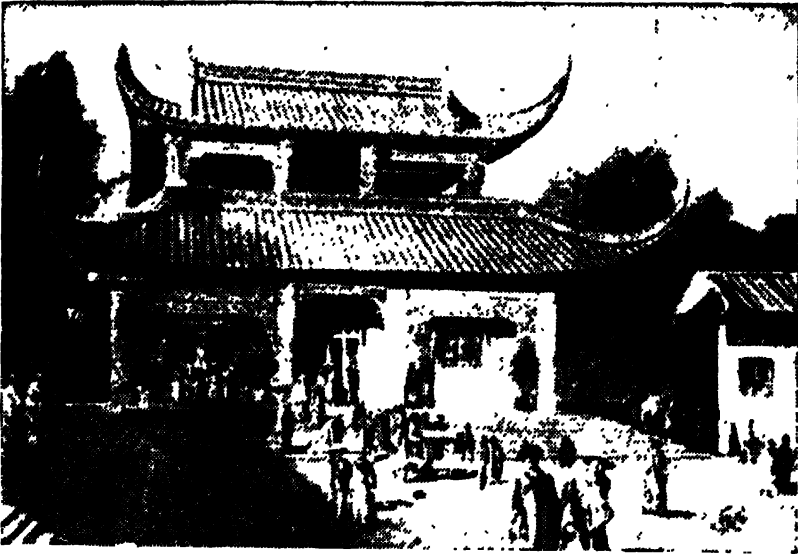
চীনের সাধারণ পাঠাগার (লাইব্রেরী)

হান-বংশের পতনের পর চীনে কয়েক শত বৎসরের জন্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, তারপর শুরু হয় **তাং**-বংশের রাজত্বখ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে। এই সময়ে নানাদিকে উন্নতির চরম বিকাশ হয়। বড় বড় লাইব্রেরী ও সুন্দর চিত্র-শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। এই যুগে ভারত থেকে অনেক বৌদ্ধধর্ম-প্রচারক ও পণ্ডিত চীনে যান এবং চীন থেকেও অনেক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ভারতে আসেন।

বিখ্যাত পরিব্রাজক হিউয়েন-সাং তাং-যুগেরই প্রথম দিকে ভারতে আসেন। নানা দেশ থেকে বিদেশীরা এসে চীনে বসবাস করে। এই সময়ে খ্রীষ্টান এবং ইসলাম ধর্মও চীনে প্রবেশ করে। কথিত আছে, আরবীয়েরা চীনাদের কাছে কাগজ তৈয়ারি-বিদ্যা শিক্ষা লাভ করে ইওরোপকে এই বিদ্যায় শিক্ষিত করে। এই বংশ ৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই যুগকে 'চীনের স্বর্ণযুগ' বললেও অত্যুক্তি হয় না।

তাং-যুগের চীনারা কাগজ প্রস্তুত, গোলা-বারুদ তৈরি এবং যান্ত্রিক বিদ্যা প্রভৃতিতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছিল। এই সময়ে রেশমের কাপড় বোনা ও কবিতা লেখার খুব উন্নতি হয়। লি-পো তাং-যুগের একজন বিখ্যাত কবি। তাই-সুং ছিলেন তাং-বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট্। তাঁর বিরাট সাম্রাজ্যের পরিধি দক্ষিণে আনাম ও পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

এরপর কিছুদিন দেশে বিশৃঙ্খলা চলল। তারপরে **সুং**-বংশ নামে আর একটা বড় রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হল। সুং-বংশের সময়ে চীনের উত্তর প্রান্ত হতে দুর্ধর্ষ বর্বর জাতিরা ঐ দেশে ক্রমাগত আক্রমণ শুরু করে। খিতান জাতিরা আক্রমণ শুরু করলে তাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে, সুংএরা 'কিন্' অথবা 'তাতার'-দের তাঁদের সাহায্য করতে আমন্ত্রণ করেন। কিন্ জাতির লোকেরা এসে খিতানদের তাড়িয়ে দেয় বটে, কিন্তু তারা জোর করে এ দেশে থেকে যায়। তারা উত্তর-চীন অধিকার ক'রে পিকিংকে তাদের রাজধানী করে। সুংএরা বিতাড়িত হয়ে দক্ষিণ দিকে চলে যান।

এরপর মঙ্গোল জাতির লোকেরা এসে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চীন আক্রমণ করে এই দেশের শাসনকর্তা হয়। তবে চীনের সামরিক পরাজয় হলেও নিজের উন্নত সভ্যতা দ্বারা সে মঙ্গোলদের জয় করে।

চেঙ্গিস খাঁর আক্রমণ

চীনের উত্তরে মঙ্গোল জাতির বাস ছিল। এদের মধ্যে দুটো উপজাতি ছিল, তাদের নাম হূন ও তাতার। এরা যেমন অসভ্য ছিল, তেমনি ছিল দুর্ধর্ষ ও হিংস্র। সুযোগ পেলেই এরা চীনদেশে এসে লুটপাট করে চলে যেত। এদের ভয়েই চীনারা তাদের রাজধানী পিকিং শহরের চারদিকে এবং চীনের উত্তর-সীমান্তে বিরাট উঁচু প্রাচীর তুলে দিয়েছিল।

মঙ্গোল জাতির মধ্যে এক দুর্ধর্ষ যোদ্ধা জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁর নাম **চেঙ্গিস খাঁ** (১১৬২-১২২৭ খ্রীষ্টাব্দ)। চেঙ্গিস খাঁ তাঁর অভিযানের পথে কিন্

সাম্রাজ্যের রাজধানী পিকিং আক্রমণ করলেন। চীনারা শহরের সিংহদ্বার বন্ধ করে বসে রইল। মঙ্গোলরা শত চেষ্টা করেও ভিতরে ঢুকতে পারছিল না। এমনি সময় এক বিশ্বাসঘাতক চীনা চেঙ্গিস খাঁকে শহরের একটা গোপন দরজা খুলে দেয়। সদলবলে চেঙ্গিস খাঁ এসে পিকিংএ প্রবেশ করলেন। লুটপাট, নরহত্যা

চেঙ্গিস খাঁর বোখারা জয়

তিনি তো করলেনই, চীনাদের রাজাকেও তিনি পিকিং থেকে তাড়িয়ে দিলেন। এই জয়ের পরে পিকিংএ চুপচাপ বসে থাকতে চেঙ্গিস খাঁর ভাল লাগল না। তিনি বিরাট মঙ্গোল-বাহিনী সঙ্গে নিয়ে তিন হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে গিয়ে হাজির হলেন পারস্যে (ইরানে)। বোখারা ও সামারকাঁদ শহর ধ্বংস

করে তিনি ইসলাম সংস্কৃতির অনেক ক্ষতি করেছিলেন। তিনি উত্তর দিকে অভিযান করে রাশিয়া আক্রমণ করেন এবং কিয়েভের গ্রাণ্ড ডিউককে পরাজিত করেন।

চেঙ্গিস খাঁ বিরাট, সুদূর-বিস্তৃত সাম্রাজ্য গড়েছিলেন। তাঁর সময়ে মঙ্গোলরা পৃথিবীর নানাস্থান জুড়ে বসেছিল। তাঁর রাজধানী মঙ্গোলিয়ার একটি প্রাচীন শহর কারাকোরামে এশিয়া এবং ইওরোপ থেকে বহু শিল্পী, গণিতজ্ঞ এবং বিজ্ঞানী প্রভৃতির সমাবেশ হয়েছিল। যোদ্ধা হিসাবে আলেকজাণ্ডার, জুলিয়াস সীজারও তাঁর কাছে তুচ্ছ হয়ে যান।

চীনের প্রাচীর

চীনের মঙ্গোল-রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন চেঙ্গিস খাঁর বংশধর **কুবলাই খাঁ** (১২১৬-১২৯৪ খ্রীষ্টাব্দ)। তিনি সম্পূর্ণ চীন জয় করেন। কুবলাই খাঁ তাঁর পূর্ব-পুরুষদের মত দুর্ধস যোদ্ধা ছিলেন এবং জাপান ও কোরিয়া জয় করবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি টংকিং, আনাম ও বর্মা তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। তিব্বত আগেই বিজিত হয়েছিল। কুবলাই খাঁর আমলেই ইওরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে চীনের বাণিজ্য অনেক বেশী বিস্তৃত হয়েছিল। কুবলাই খাঁর দরবারেই বিখ্যাত ভেনিসীয় পর্যটক মার্কো পোলো (১২৫৬-১৩২৩ খ্রীষ্টাব্দ) পোপ দশম গ্রেগরীর চিঠি নিয়ে এসেছিলেন।

তাং-যুগে কবিতা লেখার খুব উন্নতি হয়েছিল—তাং-বংশীয় রাজসভায় বিখ্যাত কবি লি-পো তাঁর কবিতা পাঠ করছেন

কুবলাই খাঁর মৃত্যুর কিছু পর চতুর্দশ শতাব্দীতে আবার খাঁটি চীনা **মিং**-বংশের রাজত্ব আরম্ভ হয়। এই বংশ প্রায় তিনশত বৎসর রাজত্ব করেন। এঁদের শাসনকাল রাজ্যের সুব্যবস্থা, শ্রীবৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্যে বিখ্যাত। এঁদের পর সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সিংহাসন অধিকার করেন **মাঞ্চু**-বংশ। মাঞ্চু-বংশই চীনের শেষ রাজবংশ।

সম্রাট্ কুবলাই খাঁর দরবারে মার্কো পোলো

মাঞ্চু-বংশ চীনের উত্তর দিক থেকে আগত অর্ধ-বিদেশী হলেও আস্তে আস্তে চৈনিক রীতি-নীতি ও ভাবধারা গ্রহণ করে চীনবাসীর মতই হয়ে যান। এঁদের মধ্যে কয়েকজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিশারদ ও শক্তিশালী সম্রাটের আবির্ভাব হয়। তাঁদের অধীনে চীন-সাম্রাজ্য খুব প্রসারিত হয় ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

মাঞ্চু-রাজারা কেবল সাম্রাজ্য-বিস্তারেই যশস্বী হন নি। সাহিত্য, শিল্পকলা ও বিবিধ শিক্ষার প্রতি অনুরাগ ও উৎসাহেও তাঁরা মিং-রাজাদের ন্যায় অগ্রণী ছিলেন। এই বংশের সম্রাট্‌দের মধ্যে **কাংহি** ও **চিয়েন লুং** বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

চিয়েন লুংএর সাম্রাজ্য দূর-দিগন্তে বিস্তৃত হয়েছিল। তাঁর রাজত্বের শেষের দিকে ১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দে প্রত্যক্ষভাবে তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়া, তিব্বত ও তুর্কীস্থান। কোরিয়া, আনাম, শ্যাম (থাইল্যাণ্ড) ও বর্মাও তাঁর প্রভুত্বের আওতায় ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মাঞ্চু শাসনে দুর্বলতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

মাঞ্চু-রাজাদের আমলেই চীনে ইওরোপীয়গণ আসতে আরম্ভ করে। রাজারা প্রথমে তাদের কোন বাধা দেন নি; কিন্তু বিদেশীদের, বিশেষ করে খ্রীস্টান যাজক-শ্রেণীর অনাচার ও অপকার্যে রুষ্ট হয়ে সময়ে সময়ে তাঁরা ইওরোপীয় বণিকদের উপর অনেক কঠোর বিধিনিষেধ প্রয়োগ করেন। তা সত্ত্বেও বিদেশী ব্যবসায়ীরা ক্রমাগত এসে চীনের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

চীনে ইওরোপীয়দের আগমন

চীনের মত বিরাট দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের অনেক সুবিধা ছিল; ব্যবসা করে টাকা রোজগারের লোভে ইওরোপের অনেক দেশ থেকে ভারত ও অন্যান্য পূর্বদেশের ন্যায় চীনেও বণিকেরা দলে দলে আসতে লাগল। তাদের সঙ্গে আবার পাদ্রীরাও আসতেন। পোর্তুগিজ, ওলন্দাজ, রাশিয়ান, ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি জাতি ধীরে ধীরে চীনদেশে এসে ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করে দিল; তাদের সুবিধা-অসুবিধা দেখবার জন্যে ঐসব দেশের গভর্নমেণ্টেও চীনে রাজদূত পাঠালেন। মাঞ্চু-রাজাদের নিয়ম ছিল, তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে হলে প্রত্যেককে তাঁদের সামনে 'কৌ-তৌ' করতে হবে।

কৌ-তৌ মানে হচ্ছে হাঁটু গেড়ে বসে ঠকাস করে মাটিতে মাথা ঠোকা। ওলন্দাজ এবং রুশ রাজদূতেরা এই ব্যাপার দেখে ভয়ানক চটে গেলেন, মাটিতে মাথা ঠুকতে তাঁরা রাজী হলেন না। ইংরেজরা দেখলেন যে, মাটিতে দু-একবার মাথা ঠুকে যদি কোটি কোটি টাকা রোজগারের উপায় হয়, তাহলে মন্দ কি? তাঁরা কৌ-তৌ করতে রাজী হলেন এবং চীনদেশে রয়ে গেলেন।

পোর্তুগিজ প্রভৃতি অন্যান্য জাতির লোকেরাও থেকে গেল। ধীরে ধীরে বাণিজ্য বিস্তার করতে করতে ইংরেজরা দক্ষিণ-চীনের একটি খুব ভাল বন্দর ক্যাণ্টনে পোক্ত হয়ে বসল।

১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজদের সঙ্গে চীনাদের একটা বড় যুদ্ধ হয়। ইংরেজ বণিকদের আফিমের ব্যবসা এই যুদ্ধের মূল কারণ ছিল বলে একে **আফিম-যুদ্ধ** বলা হয়। চীনদেশে আফিম চালান দেওয়াই ছিল ইংরেজদের প্রধান ব্যবসা। "ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি" নামে যে ইংরেজ কোম্পানি ভারতবর্ষে বাণিজ্য

আফিম জ্বালানো

করতে আসে, তারা ভারতবর্ষ থেকে চীনে আফিম চালান দিত এবং বিনিময়ে চীন থেকে আনত রুপা। এই ব্যবসায়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এবং অন্যান্য ইংরেজ কোম্পানির কোটি কোটি টাকা লাভ হত। মাঞ্চু-রাজারা দেখলেন যে, আফিম খেয়ে আর চণ্ডু টেনে সমস্ত জাতিটা উচ্ছন্নে যেতে বসেছে। তাঁরা ঠিক করলেন, চীনে আফিম-বিক্রি বন্ধ করতে হবে।

রাজার আদেশে ক্যাণ্টন শহরে একজন সরকারী কর্মচারী অনেকখানি আফিম পাকড়াও করে সেটা পুড়িয়ে দিলেন। ইংরেজরা দেখল, আফিমের ব্যবসা হাতছাড়া হয়ে গেলে তাদের ভয়ানক ক্ষতি হবে। কাজেই তারা ক্যাণ্টনের ঘটনার পর চীনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

দুই বৎসর ধরে এই যুদ্ধ চলল। মাঞ্চু-রাজা পরাজিত হলেন। নানকিনের চুক্তি অনুযায়ী ইংরেজরা চীনের পাঁচটি বন্দরে অবাধে বাণিজ্য করবার অধিকার

পেল। মাঞ্চু-রাজা ইংলণ্ডকে হংকং দ্বীপটি দিতে বাধ্য হলেন। এই হংকং দ্বীপ আজও ইংরেজের অধীনে আছে।

ইংরেজের সঙ্গে এবার এসে যোগ দিল ফ্রান্স, জার্মেনী এবং রাশিয়া। চীনদেশের সমস্ত বহির্বাণিজ্য ধীরে ধীরে এদের হাতে চলে গেল। আমেরিকা তার 'ওপেন ডোর' (Open Door) নীতি ঘোষণা করে শোষণকারী দেশ-গুলির আরও সুবিধা করে দিল। 'ওপেন ডোর' মানে হচ্ছে খোলা দরজা, অর্থাৎ চীনদেশের দরজা খোলাই আছে, যার ইচ্ছা সেখানে গিয়ে অবাধে বাণিজ্য করতে পারে।

চীন-জাপানের যুদ্ধ

ইংরেজের শিল্প ছিল সব চেয়ে বেশী উন্নত, জাহাজও ছিল তার সব চেয়ে বেশী, কাজেই 'ওপেন ডোর' নীতির ফলে তার ও আমেরিকার লাভই বেশী হল।

উনবিংশ শতাব্দীতে মাঞ্চু-রাজাদের দুর্বল শাসনের সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন ইওরোপীয় শক্তি চীনদেশে উদ্ধতভাবে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করল। চীনে এ সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল এবং এই প্রকাণ্ড দেশের নানাস্থানে বিশৃঙ্খলা। এই সময়ে **তেইপিং বিদ্রোহ** দেখা দেয়। মাঞ্চু-রাজবংশের উচ্ছেদকল্পে ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে বিদ্রোহের শুরু হয়ে ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে শেষ হয়। কর্নেল চার্ল্স্ গর্ডনের চেষ্টায় বিদ্রোহ প্রশমিত হয়। দীর্ঘদিনব্যাপী ধ্বংসকারী 'তেইপিং বিদ্রোহে' দেশের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়। তার সুযোগ নিয়ে প্রথমে ইওরোপীয় শক্তিগুলি ও পরে

তাদের সঙ্গে জাপান, চীনের কাছ থেকে একটার পর একটা সুবিধা ও ভূ-খণ্ড অন্যায়রূপে আদায় করতে লাগল। এই সব বিদেশী শক্তিগুলির মধ্যে পরস্পর স্বার্থ-সংঘাতের ফলে চীনের স্বাধীনতা কোনরকমে বজায় রইল বটে, কিন্তু আর্থিক ব্যাপারে—ব্যবসায়, বাণিজ্যে—পাশ্চাত্য দেশগুলি চীনকে একেবারে নিঃস্ব করে ফেলল।

চারদিকে চীনের তখন ভাঙন ধরেছে। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তি শিথিল। স্বার্থান্বেষী লোকেরা যার যার সুবিধা আহরণে মত্ত। দেশের উত্তর অঞ্চলে কতকগুলি "তুচুন" বা সামরিক সর্দারের আবির্ভাব হয়েছিল। এঁরা বিদেশীদের অর্থ-সাহায্যে পুষ্ট হয়ে দেশে নানারূপ অনাচার ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে লাগলেন। ফলে, চীনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বনিয়াদ ক্রমেই ধ্বসে পড়তে লাগল। দু একজন বিচক্ষণ লোক যথা, **লি হুং-চ্যাং** এবং মহারানী-মাতা **জু-সি** নানারূপ সংস্কারের দ্বারা দেশকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু চীনদেশের বিরাটত্ব, তার বিপুল লোকসংখ্যা এবং বিদেশী শক্তিদের ক্রমান্বয়ে অবৈধ হস্তক্ষেপের জন্যে চীনের নেতাদের পক্ষে কোনরকম কাযকারী সংস্কার করা সম্ভব হল না।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি ক্রমেই নানা অজুহাতে ও অস্ত্রের জোরে চীনের নানাস্থানে, বিশেষ করে সমুদ্রের উপকূলবর্তী বন্দরগুলিতে জুড়ে বসল। তাদের শোষণে চীন ক্রমেই হতবল ও হৃত-সর্বস্ব হতে লাগল।

জাপান এই সময়ে উদীয়মান শক্তি। জাপানীদের মধ্যে বরাবরই একটা সামরিক ঐতিহ্য ছিল। তারা দেখল, বহুদূর থেকে বিদেশীরা এসে চীনের টাকা-পয়সা লুঠ করছে অথচ ঘরের দুয়ারে থেকে জাপান কিছু করতে পারছে না! তাই ইওরোপীয় জাতিদের মত তারাও দুবল চীনদেশে হস্তক্ষেপ করা শুরু করল। কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়াকে উপলক্ষ করে, ১৮৯৪ ও ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে **চীন-জাপান যুদ্ধের** ফলে জাপান ফরমোজা ও অন্যান্য কয়েকটি স্থান জয় করল। অবশ্য ইওরোপীয় শক্তিসমূহের বাধাদানে জাপান আশানুরূপ সুযোগ লাভ করতে পারল না।

চীন-জাপান যুদ্ধের পর ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া প্রভৃতি শক্তি আফ্রিকার মত বিরাট চীনদেশকেও ভাগ-বাঁটরা করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হল। রাশিয়া গ্রাস করল উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দেশগুলি, ইংরেজ প্রধানতঃ দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে তার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করল এবং ফরাসী ক্রমাগত দক্ষিণ-চীনে কায়েমী হয়ে বসতে লাগল।

বিদেশী শক্তিদের অনাচারের জন্যে চীনে এই সময়ে বিদেশীদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী একটি জাতীয় বিদ্রোহের অভ্যুত্থান হয়। ইহাকে বলে **"বক্সার"** বা মুষ্টিযোদ্ধাদের বিদ্রোহ। ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে এই বিদ্রোহের আরম্ভ। বিদ্রোহ

বক্সার বিদ্রোহ

বিশেষ করে বিদেশী মিশনারীদের বিরুদ্ধে চালিত হয়। শেষে ইওরোপীয় শক্তিসমূহের সমবেত চেস্টায় ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে বিদ্রোহের অবসান হয়।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব

বিভিন্ন যুদ্ধে বিদেশীর কাছে মাঞ্চু-রাজা হেরে যাওয়ার পর চীনাদের বিশ্বাসও রাজার উপর থেকে টলে গেল। বিদেশীরা এসে চীনের সমস্ত সম্পদ নিয়ে চলে যাচ্ছে, দেশের লোক ক্রমেই গরিব হয়ে পড়ছে, অথচ রাজা এতে বাধা দিতে পারছেন না। এই সব দেখে দেশের লোকের মন প্রতিকারের জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠতে লাগল। ১৯০৪-১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের বিরাট জয়ও চীনের তরুণদের মনে উৎসাহ জাগাল।

ক্যান্টন শহরে কয়েকজন লোক মিলে একটা বিপ্লবী দল গড়ে তুললেন। দেশের লোকদের এঁরা বোঝাতে লাগলেন যে, মাঞ্চু-রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করে দেশের প্রজাদের গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া চীনের উন্নতির আর কোন উপায় নেই। এই বিপ্লবী দলের নাম ছিল **'কুয়োমিণ্টাং'** অথবা গণজাতীয় দল, আর এঁদের নেতা ছিলেন ডাঃ **সান ইয়াৎ-সেন**। এই দল ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের ১০ই অক্টোবর জোর বিপ্লবী আন্দোলন ও সংগ্রাম আরম্ভ করেন। তাঁরা ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের ১লা

জানুয়ারি মাঞ্চু-রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে চীনদেশে প্রজাতন্ত্র-গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করেন। ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন তার প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। **নানকিং** শহর হল প্রজাতন্ত্রের রাজধানী।

সান ইয়াৎ-সেন

দক্ষিণ-চীনের এক দরিদ্র পরিবারে ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে সান ইয়াৎ-সেন জন্মগ্রহণ করেন। হংকং-এর এক ডাক্তারি স্কুল থেকে ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে তিনি ডাক্তারি পাস করেন। দলের জন্যে টাকা সংগ্রহ করতে তাঁকে ইওরোপে যেতে হয়েছিল। চীনারা তাঁকে এত শ্রদ্ধা করত যে, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের চীনা ব্যবসায়ীরা তাকে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে সাহায্য করে। মাঞ্চু-রাজ তাকে গ্রেফতার করবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেন। ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে তাঁরই গঠিত কুয়োমিণ্টাং-দল যখন চীনে প্রজাদের গভর্নমেণ্ট গঠন করল, সান ইয়াৎ-সেন তখন লণ্ডনে। এই খবর পেয়ে তিনি তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে আসেন।

সান ইয়াৎ-সেন

চীনের লোকদের অবস্থার উন্নতির জন্যে সান ইয়াৎ-সেন আজীবন চেষ্টা করেছেন। চীনদেশের স্থায়ী উন্নতি কিভাবে হতে পারে, সে সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করে তিনি তিনটি উপায় নির্দেশ করেন। উপায় তিনটি এই :—

প্রথম, চীন থেকে বিদেশীদের সমস্ত প্রভুত্ব দূর করে চীনাদের হাতে দেশের সব রকম কর্তৃত্ব নিয়ে আসতে হবে। বাণিজ্য করবার নাম করে বিদেশীরা চীনে এসে চীনাদের উপর যে কর্তৃত্ব করে, তা বন্ধ করতে হবে। দ্বিতীয়, দেশের লোকদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা দেশ শাসন করবেন, চীনে রাজা থাকবে না। তৃতীয়, দেশের জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে হবে।

ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন তাঁর এই সব নীতি কাজে খাটানোর জন্যে চেষ্টা আরম্ভ করলেন, কিন্তু তাঁকে পদে পদে বিপুল বাধার সম্মুখীন হতে হল। কেবল সোভিয়েট রাশিয়া এ বিষয়ে তাঁকে খুব সাহায্য করে। কিন্তু তাঁর কাজ শেষ হওয়ার আগেই ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন মারা যান।

চিয়াং কাই-শেক

ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের পর তাঁর শিষ্য ও সহচর **চিয়াং কাই-শেকের** হাতে কুয়োমিণ্টাং-দলের নেতৃত্বভার আসে। চীনের এক ছোট্ট গ্রামে এক সামান্য ব্যবসায়ীর ঘরে ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে চিয়াং-এর জন্ম। উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন তিনি জাপানে। সান ইয়াৎ সেনের মত চিয়াংও খ্রীস্টান। ছাত্রাবস্থায় সামরিক শিক্ষালাভের দিকেই তার ঝোঁক ছিল সব চেয়ে বেশী। চিয়াং-এর প্রধান গুণ এই যে, তিনি কোন কাজে একবার হাত দিলে সেটা শেষ না করা পর্যন্ত কিছুতেই ছাড়েন না।

উত্তর-চীন এবং দক্ষিণ-চীনের মধ্যে বরাবরই একটা ঝগড়া আছে। সান ইয়াৎ-সেন, চিয়াং কাই-শেক এঁরা সবাই দক্ষিণ-চীনের লোক। উত্তর-চীনের একজন প্রধান নেতার নাম ছিল **উয়ান শি-কাই**। উত্তর ও দক্ষিণ-চীনের বিরোধ মেটাবার জন্যে ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন নিজে রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ করে উয়ান শি-কাইকে ঐ আসনে বসিয়েছিলেন (১৯১২ খ্রীঃ)। উয়ান শি কাই কিন্তু ডাঃ সানের এই ভদ্রতার সম্মান রাখেন নি : কিছুদিনের মধ্যেই তিনি নিজেকে সম্রাট্ বলে জাহির করে উলটে বিপ্লবী দলেরই পিছনে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য উয়ান শি-কাইয়েরই হার হল—এবং শীঘ্রই তিনি মারা যান।

জাপান এদিকে ক্রমেই তার শক্তি বাড়িয়ে যাচ্ছিল এবং চীনের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধবার পর জাপান একরূপ বিনা কারণেই জার্মেনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ও চীনস্থিত জার্মেনীর অধিকৃত সাণ্টুং প্রদেশের কিউচউ কেড়ে নেয়।

এই সময় থেকে জাপান ক্রমাগতই সাণ্টুং ও মাঞ্চুরিয়ায় জোর করে প্রবেশ করতে থাকে। চীনবাসী প্রবল প্রতিবাদ করে, কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যে বিভেদ ও পাশ্চাত্য শক্তিদের কাছ থেকে সাহায্যের অভাবে তারা কিছুই করতে পারে না। ফলে, জাপান ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে অসহায় চীনের নিকট তার কুখ্যাত **"একুশ দফা দাবি"** উপস্থিত করল। চীন বিশ্বযুদ্ধে মিত্র-শক্তিদের পক্ষে

যোগদান করা সত্ত্বেও, যুদ্ধের অবসানে, প্যারিস শান্তি সম্মিলনে পাশ্চাত্য শক্তিদের কাছে কোন সাহায্য পেল না।

অপরাপর রাষ্ট্রের কাছ থেকে কোন সাহায্য না পেলেও, বলশেভিক বিপ্লবের পর থেকে, ডাঃ সান তাঁর দক্ষিণ-চীনের ক্যান্টন সরকারের কাছে সোভিয়েট রাশিয়ার তরফ হতে প্রভূত উৎসাহ পেয়েছিলেন। এই সময় থেকে চীন ছাত্র ও শিক্ষিত সমাজের মধ্যে কম্যুনিস্ট মতবাদ গোপনে ও দ্রুত বিস্তার লাভ করতে লাগল। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে একটি কম্যুনিস্ট-দল গঠিত হল।

চিয়াং কাই-শেক নেতৃত্বভার গ্রহণ করে তলোয়ারের জোরে, উত্তর-দক্ষিণ

চিয়াং কাই-শেক

চীনের বিবাদ ঘুচিয়ে, সমগ্র চীনে ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে লাগলেন। এই চেষ্টা তাঁর কতকটা সফলও হয়েছিল, কিন্তু তা স্থায়ী হয় নি। এই জন্যে তিনি নিজেই অনেকটা দায়ী—কারণ তিনি কুয়োমিণ্টাং-দলের একতা বা দেশের কৃষক-মজদুরদের স্বার্থের চেয়েও নিজের কর্তৃত্ব ও বড়লোকদের সুবিধাই বেশী দেখতে আরম্ভ ক:রছিলেন। তিনি বামপন্থী ও কম্যুনিস্টদের দমন করবার জন্যে

ব্যাপকভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন। এমন কি তিনি সাংহাইয়ের বিদেশী বণিকদের সঙ্গেও গোপনে যোগাযোগ আরম্ভ করলেন।

চিয়াং-এর এই ব্যবহারে কুয়োমিন্টাং-দলের সংহতি ভেঙ্গে গেল; দেশে আবার অরাজকতা দেখা দিল। এই সব গোলমালের সুযোগ নিয়ে জাপান চীন আক্রমণ করে উত্তর-চীনের মাঞ্চুরিয়া এবং আরও অনেক অংশ দখল করে নিল।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুলাই থেকে জাপান নিজের শক্তিমাদকতায় চীনের নানাস্থানে আক্রমণ শুরু করে ও চীনাবাসীর উপর অমানুষিক অত্যাচার চালাতে থাকে। আধুনিক শস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ করবার শক্তি অবশ্য চীনের ছিল না। কাজেই ক্রমশঃ তাকে পরাজয়ের গ্লানির ভিতর গভীর-ভাবে ডুবে যেতে হল। ঐ বৎসরের ১৮ই সেপ্টেম্বর মাঞ্চুরিয়াতে জাপ-নিয়ন্ত্রিত **মাঞ্চুকুয়ো** গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হল। জাপানের ক্রমাগত আক্রমণ ও অনাচারে অতিষ্ঠ হয়ে চিয়াং কাই-শেক দেশের অন্যান্য দলের সঙ্গে সমবেত হয়ে, জাপানের অগ্রাভিযানে প্রবলভাবে বাধা দিলেন, কিন্তু তিনি জাপ-সৈন্যের দক্ষিণমুখী গতি কিছুতেই রোধ করতে পারলেন না। জাপানের আক্রমণ-পর্বে চীনের তরুণ-তরুণী ও জনসাধারণ যে সাহসিকতা ও বীরত্ব দেখিয়েছে, ইতিহাসে তা এক পরম বিস্ময়ের বস্তু। তারা নির্ভীকভাবে সংগ্রাম চালিয়ে গেছে, কখনও দমে নি, কখনও ক্লান্তি মানে নি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান অক্ষশক্তির সঙ্গে মিতালি করল। কাজেই চীনকে আসতে হল মিত্রশক্তির পক্ষে। তা ছাড়া, ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চীনের অর্থনৈতিক সম্পর্ক আগে থেকেই ছিল অচ্ছেদ্য। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে হলে চীনের সহযোগিতার মূল্য খুবই বেশী। এটা বুঝতে পেরে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি চীনকে মর্যাদাও দিতে লাগল খুব। চীনের বন্দরগুলিতে তখনও বিদেশীদের যে অতি-রাষ্ট্রিক ক্ষমতা বজায় ছিল, ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তারা তা বর্জন করায় এই সময় থেকে চীন সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন হল।

মার্কিন সেনাপতি স্টালওয়েলের উপর চীনা সৈন্যদলকে শিক্ষাদান ও পরি-চালনা করবার ভার অর্পণ করে তাঁকে চীনে নিয়ে এলেন চিয়াং কাই-শেক। ব্রহ্ম-রণাঙ্গনে চীনা সৈন্য ইংরেজের স্বপক্ষে যুদ্ধ করতে লাগল। মিত্রশক্তির ভিতর চীনকে পঞ্চ-প্রধানের অন্যতম বলে গণ্য করা হল এই সময়ে।

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপান বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করল মিত্রশক্তির কাছে। নানকিংয়েও চীনা সৈন্যের কাছে আত্মসমর্পণ করল চীনস্থিত দশ লক্ষ জাপসেনা। জাপানের সঙ্গে চীনের সাত বৎসরব্যাপী যুদ্ধ এইভাবে ৫ই অগস্ট শেষ হল।

চীন

নয়া চীন

বিশ্বযুদ্ধের পরে চীনে কম্যুনিস্ট-দলের প্রভাব ক্রমশঃ বেড়ে চলল। চিয়াং কাই-শেকের কুয়োমিণ্টাং দল ও কম্যুনিস্ট-দলের ভিতর পূর্ব থেকেই ঘোরতর মনোবিবাদ ছিল। এখন সেই বিবাদ প্রবল হয়ে উঠল। কম্যুনিস্ট-নেতা **মাও সে-তুং**-কে আমন্ত্রণ করে এনে চিয়াং কাই-শেক একটা নিষ্পত্তির চেষ্টা করলেন। কিন্তু তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। তখন কম্যুনিস্টগণ অস্ত্রমুখে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় যত্নবান্ হল। বলা বাহুল্য, তাদের পিছনে সোভিয়েটের আনুকূল্য ছিল।

মাও সে-তুং

মিত্রশক্তি চীনের গৃহ-বিবাদে হস্তক্ষেপ করতে রাজী হল না। দেশের জনসাধারণও দলে দলে কম্যুনিস্টদের সঙ্গে যোগদান করল। চিয়াং কাই-শেক পদে পদে পরাজিত হতে লাগলেন। প্রদেশের পর প্রদেশ কম্যুনিস্টদের বশীভূত হল। পিকিং, নানকিং, সাংহাই—এইসব বিখ্যাত মহানগরী একে একে অধিকার করল কম্যুনিস্টরা। চিয়াং চীনের রাষ্ট্রপতির পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন। মূল চীনা ভূখণ্ড ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দে কম্যুনিস্টদের সম্পূর্ণ অধিকারে চলে গেল। চিয়াং কাই-শেকের জাতীয় সরকার ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর মূল চীনা ভূখণ্ড থেকে ১১০ মাইল দূরে তাইওয়ানের (ফরমোজা) তাইপে নগরীতে স্থানান্তরিত হল।

চীন লোক-সাধারণতন্ত্র

নতুন চীন বহুদিনের লাঞ্ছনা ও দুর্গতির পর নব-মূর্তিতে জেগে উঠল। সমস্ত দেশে এখন একটা নবচেতনা, জীবনের স্পন্দন ও উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর **চীন লোক-সাধারণতন্ত্র** প্রতিষ্ঠিত হয়।

মাও সে-তুং হন এর রাষ্ট্রপতি। ১লা অক্টোবর চৌ এন-লাই হন প্রধানমন্ত্রী এবং সেনাপতি চু তে হন প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ।

১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারি চীন লোক-সাধারণতন্ত্র সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে ৩০ বৎসরের এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। সেই থেকে সোভিয়েট রাশিয়া নানাভাবে চীনকে সাহায্য করে আসছে। চীনও সোভিয়েট রাশিয়ার কার্যে নৈতিক সমর্থন জানিয়ে আসছে। ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারি সোভিয়েট রাশিয়া চীনকে অধিকতর অর্থ, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সাহায্য দানের শর্তে এক চুক্তি-পত্রে স্বাক্ষর করে।

বর্তমানে চীনে কম্যুনিস্ট-দল প্রভাবশালী হলেও অনেক গণতান্ত্রিক দল সরকারের সঙ্গে যুক্ত আছে। এখানকার কম্যুনিস্ট ব্যবস্থা রাশিয়ার অবিকল অনুকরণ নয়। চীনের অতীত রীতি-নীতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে এর গভীর যোগাযোগ আছে। বর্তমান সরকার চীনের ভূমি-বিন্যাস, সামাজিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক সমতা, সর্বসাধারণের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতা সমস্ত দিকেই বিপ্লবাত্মক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। বহু যুগের বিশৃঙ্খলা ও ভেদাভেদের পর অবশেষে এখন দেশে একটি শক্তিশালী, সংহত কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

চৌ এন-লাই

নতুন চীনের সেনাদল অসংখ্য (নিয়মিত সৈন্য-সংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ) ও তারা আধুনিক উন্নত রণবিদ্যায় সুদক্ষ।

ভারত, ইংলণ্ড প্রভৃতি পৃথিবীর কুড়িটি দেশ চীন লোক-সাধারণতন্ত্রকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবল প্রতিরোধে সাম্যবাদী চীন আজও রাষ্ট্রসংঘে তার আসন লাভ করতে পারে নি। তাইপের জাতীয় সরকার এখনও রাষ্ট্রসংঘে চীনের প্রতিনিধিত্ব করছে।

চৌ এন-লাই বর্তমানে চীন লোক-সাধারণতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী। লিউ শাও-চি ১৯৫৯, ২৭শে এপ্রিল মাও সে-তুং-এর স্থানে চীনের রাষ্ট্রপতি হন। তিনি পুনরায় ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি হন। তাঁর বর্তমান অবস্থা একরূপ অজ্ঞাত।

চীনে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। তার পরেই কনফিউসিয়ান ও তাও ধর্মাবলম্বীর স্থান। মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটি ও খ্রীষ্টানদের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ লক্ষ।

অন্তর্মঙ্গোলিয়া, সিনকিয়াং, মাঞ্চুরিয়া, কোয়াণ্টুং, তিব্বত প্রভৃতি চীনের শাসন এলাকার অন্তর্ভুক্ত।

চীন ও তিব্বত

তিব্বত বরাবরই স্বাধীন দেশ ছিল। তিব্বতবাসী দালাই লামা ও পাঞ্চেন লামার অধীনে বাস করত। ব্রিটিশ আমলে ভারত বহু ব্যাপারে তিব্বতের উপর কর্তৃত্ব করত। ভারত স্বাধীন হবার পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল তিব্বতকে একরূপ চীনের হাতে তুলে দেন বলা চলে।

১৯৫১, ২৩শে মে তারিখে তিব্বত কম্যুনিস্ট চীনের আধিপত্য মেনে নেয়। পরে ১৯৫৩, ২০শে ডিসেম্বর তিব্বতে দালাই লামা ও পাঞ্চেন লামার শাসন-ব্যবস্থা অস্বীকার করা হয়। তিব্বত স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল বলে স্বীকৃত না হওয়ায় ১৯৫৯, ১৩ই মার্চ তিব্বতে বিপ্লব শুরু হয়। দালাই লামা অনুচরগণসহ গোপনে দেশ ছেড়ে ভারতে আসেন। চীন তিব্বতের ওপর নির্মম অত্যাচার চালাতে থাকে। ফলে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তিব্বতে পুনরায় বিপ্লব দেখা দেয়। এখনও বিপ্লবের শেষ হয় নি। পাঞ্চেন লামা কতকটা বন্দী অবস্থায় তিব্বতে আছেন। চীনা সৈন্যেরা নিষ্ঠুর হস্তে তিব্বতবাসীদের রক্তে সারা তিব্বত রাঙা করে তুলছে।

ভারত ও চীন

বর্তমানে চীন লোক-সাধারণতন্ত্র ক্ষমতার গর্বে স্ফীত হয়ে সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব গ্রহণ করেছে। ভারতের উত্তর সীমান্তের সহস্র সহস্র মাইল এলাকা চীন জোর করে দখল করেছে। লাডাক থেকে আরম্ভ করে আসাম সীমান্তের অনেক জায়গায় চীন রাস্তা পর্যন্ত নির্মাণ করেছে।

চীনের সৈন্যদের হাতে কয়েকজন ভারতীয় সৈন্য নিহতও হয়েছে। চীনের এই আকস্মিক পররাজ্য আক্রমণে ভারতের জনসাধারণ রীতিমত অসন্তুষ্ট। চীন ভারতের আরো সহস্র সহস্র মাইল অধিকার করবার সংকল্প জানিয়েছে।

সীমান্ত-বিরোধ আপসে মেটাবার জন্যে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই ভারতে আসেন। নয়া দিল্লীতে জহরলালের সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়। কিন্তু কোন মীমাংসা হয় না।

চীনের আয়তন ৯৫৯৭,০০০ বর্গ কিলোমিটার (৩৭,০৪, ৪০০ বর্গমাইল)। এর লোকসংখ্যা (তাইওয়ান বাদে) ৭৮,৬৪,০০,০০০। চীনের রাজধানী পিপিং (পিকিং)।

চীন সাধারণতন্ত্র

মূল চীন ভূখণ্ড কম্যুনিস্ট-কবলিত হবার পর চিয়াং কাই-শেক তাইওয়ানে (ফরমোজায়) চলে যান। তাঁর চীনের জাতীয় সরকার সেখানে স্থানান্তরিত হয়।

তাইওয়ান কয়েকটি ছোট বড় দ্বীপের সমষ্টি। এক সময়ে চীন জাপানকে তাইওয়ান দিয়ে দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর চিয়াং কাই-শেক তাইওয়ানের দখল নেন। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চ চিয়াং কাই-শেক তাইওয়ানে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় সরকারের প্রেসিডেণ্ট হন এবং চীন সাধারণতন্ত্র গঠিত হয়। চিয়াং কাই-শেক তাইওয়ানের কুওমিনটাং-এর (জাতীয় দলের) নেতা।

চিয়াং কাই-শেক চীন সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট। ডাঃ ইয়েন চিয়া-কান এর প্রধানমন্ত্রী ও ভাইস-প্রেসিডেণ্ট। চীন সাধারণতন্ত্র কম্যুনিস্ট চীন ও সোভিয়েট রাশিয়ার ঘোরতর বিরোধী।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য করে তাইওয়ানকে চীন লোক-সাধারণতন্ত্রের হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবহর তাইওয়ানের নিকটবর্তী সমুদ্রে টহল দিয়ে থাকে।

১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মার্চ চীন সাধারণতন্ত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এক চুক্তি-শর্তে আবদ্ধ হয়। তাতে ঠিক হয়, চীন লোক-সাধারণতন্ত্র তাইওয়ানকে আক্রমণ করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে তাকে রক্ষা করবে।

তাইওয়ানের আয়তন ৩৫,৯৬১ বর্গ কিলোমিটার (১৩,৮৮৫ বর্গ মাইল)। এর লোকসংখ্যা ১,২৯,৯৩,০০০ (১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর)। তন্মধ্যে ৬৭ লক্ষ পুরুষ, ৬৩ লক্ষ নারী। এর রাজধানী তাইপে (লোকসংখ্যা ৯,৬৩,৬৪০)।

কোরিয়া

কোরিয়া একটি প্রাচীন দেশ। ৫৭ খ্রীস্টপূর্বাব্দ থেকে এর নিয়মিত ইতিহাস পাওয়া যায়। ৬৬৮ খ্রীস্টাব্দে সিলা রাজবংশের অধীনে কোরিয়া একটি অখণ্ড রাষ্ট্রে পরিণত হয়। তার পরের ইতিহাসে দেখা যায়, বিভিন্ন সময়ে কোরিয়া চীন সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। চীন-জাপান যুদ্ধের পর ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে কোরিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়।

কোরিয়া ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে জার্মেনী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেন এবং ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে ইতালি ও রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ১৯০৪-১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে রাশিয়া-জাপান যুদ্ধের পর কোরিয়া জাপানের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়। ১৯১০ খ্রীস্টাব্দের ২২শে আগস্ট জাপান কোরিয়ার নাম দেয় চোসেন এবং পুরাপুরি কোরিয়া দখল করে নেয়। এর ফলে ১৩৯২ খ্রীষ্টাব্দে কোরিয়ায় যে ঈ রাজবংশের সূচনা হয় তার অবসান ঘটে।

১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের কায়রো সম্মেলনে রুজভেল্ট, চার্চিল ও চিয়াং কাই-শেক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে কোরিয়াকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে। ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে জাপান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পরাজিত হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার সৈন্যদল কোরিয়ায় প্রবেশ করে এবং জাপানী সৈন্যদলকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে। সামরিক সুবিধার জন্য সেই সময় কোরিয়াকে ৩৮° অক্ষরেখা বরাবর দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়।

রাশিয়ার সৈন্যদল ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের ১০ই আগস্ট এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যদল ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর কোরিয়ায় প্রবেশ করে। রাশিয়া ৪৮,৪৬৮ বর্গ মাইল (লোকসংখ্যা ৯০,০০,০০০) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৩৬,৭৬০ বর্গ মাইল (লোকসংখ্যা ২,১০,০০,০০০) স্থান অধিকার করে। কোরিয়াবাসীরা উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া হিসাবে পৃথক্ থাকা পছন্দ না করে বারবার সংযুক্ত হবার জন্যে আন্দোলন চালায়। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ার জন্য উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া এক হতে পারে না। রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে কোরিয়ায় এক সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা হয় কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া রাষ্ট্রসংঘের প্রতিনিধিদলকে উত্তর কোরিয়ায় প্রবেশ করতে দেয় না।

দক্ষিণ কোরিয়া

দক্ষিণ কোরিয়া ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কোরিয়া সাধারণতন্ত্র আখ্যালাভ করে। সিউল হয় এখানকার রাজধানী। ২০শে জুলাই ডাঃ সীংম্যান রী রাষ্ট্রপতি হন। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুনের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়া থেকে সব সৈন্য সরিয়ে নেয়।

ডাঃ সীংম্যান রী ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মে তৃতীয়বার রাষ্ট্রপতি হন। পরে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ চতুর্থবার রাষ্ট্রপতি হন। তখন তাঁর বয়স ৮৫। কলেজের ছাত্রদের এক প্রবল আন্দোলনে ২৬শে এপ্রিল সীংম্যান রী রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ করেন। তিনি ৩০শে মে হনলুলুতে চলে যান।

পোসুন ইউন ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই আগস্ট রাষ্ট্রপতি হন; ১৯শে আগস্ট প্রধানমন্ত্রী হন ডাঃ মীয়ান চ্যাং। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মে এক সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে ডাঃ মীয়ান চ্যাং-এর সরকারের পতন হয়। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর জেনারেল চাং হী পার্ক রাষ্ট্রপতি হন। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী আই কে চাং।

দক্ষিণ কোরিয়ার আয়তন ৯৮,৪৩১ বর্গ কিলোমিটার (৩৮,৪৫২ বর্গ মাইল) এবং লোকসংখ্যা ২,৯২,০৭,৮৫৬ (১৯৬৬ খ্রীঃ)।

কোরিয়ায় খ্রীষ্টীয়, কনফিউসিয়ান ও বৌদ্ধ প্রভৃতির সংখ্যাই অধিক।

উত্তর কোরিয়া

উত্তর কোরিয়া ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে কোরিয়া গণরাষ্ট্র নামে খ্যাত হয়। এখানকার রাজধানীর নাম পাইঅংয়ং। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রসংঘের বহু সদস্য রাষ্ট্র কোরিয়া রাষ্ট্রসংঘকে মেনে নেয় না। এই বৎসরের শেষের দিকে রাশিয়া এখান থেকে সব সৈন্য সরিয়ে নেয়। সেস্থলে দেশে শ্রমিক ও কৃষক নিয়ে গঠিত এক সুসংবদ্ধ সৈন্যদল গড়ে ওঠে।

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জুন উত্তর কোরিয়ার সৈন্যদল দক্ষিণ কোরিয়াকে আক্রমণ করে। রাষ্ট্রসংঘের নির্দেশে জেনারেল ম্যাকআর্থার দক্ষিণ কোরিয়ার সাহায্যার্থে অগ্রসর হন। ২৬শে নভেম্বর কম্যুনিষ্ট চীন দুই লক্ষ সৈন্য উত্তর কোরিয়ার সাহায্যার্থে প্রেরণ করে। পরে সেই সংখ্যা বেড়ে দশ লক্ষে দাঁড়ায়।

কোরিয়ার যুদ্ধ ক্রমশঃ জটিল আকার ধারণ করে। শেষে ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে জুলাই পানমুনজমে এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

রাশিয়া ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দের ৬ই জুলাই এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে উত্তর কোরিয়াকে দশ বৎসরের জন্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। চীনও ১১ই জুলাই এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে উত্তর কোরিয়াকে সাহায্য করবে বলে জানায়।

কোরিয়া সমস্যার সমাধান-কল্পে ভারত বরাবরই প্রশংসনীয় ভাবে চেষ্টা করে এসেছে। ভারতের প্রেরিত সেনাপতি ও সৈন্যেরা দুর্জয় সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে।

মার্শাল কিম ইল-সুঙ্গ উত্তর কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী এবং চই ইয়ং কুন রাষ্ট্রপতি।

উত্তর কোরিয়ার আয়তন ১,২২,৩৭০ বর্গ কিলোমিটার (৪৭,২২৫ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ১,২৫,০০,০০০ (১৯৬৬ খ্রীঃ)।

ভারতবর্ষ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ দিকে কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত একটি বৃহৎ উপদ্বীপ। এই দেশ প্রাকৃতিক আবেস্টনী দ্বারা সুরক্ষিত—উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা আর তিন দিকে সমুদ্র। ভারতের ইতিহাসে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ভাব দেখা যায়।

ভারতবর্ষের ইতিহাস বহু পুরাতন। কত পুরাতন, ঐতিহাসিকগণ এখনও পর্যন্ত ঠিক করে বলতে পারেন না। পূর্বে লোকের ধারণা ছিল যে, আর্যজাতির ভারতে আগমনের ফলে ভারতবর্ষে সভ্যতার সূত্রপাত হয়েছিল; কিন্তু কয়েক বছর আগে, প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু-সভ্যতার আবিষ্কারের ফলে এখন প্রমাণিত হয়েছে যে, সাড়ে পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও সিন্ধুনদের উপত্যকায় এক সুসভ্য জাতি বাস করত। এই সময়কার ইতিহাস ভারতীয় সভ্যতায় প্রস্তরযুগের পর তাম্রযুগের ইতিহাস। প্রস্তরযুগে এদেশের অধিবাসী ছিল অনার্যগণ।

তাম্রযুগের সভ্যতার অনেক নিদর্শন সিন্ধুদেশের অন্তর্গত **মহেঞ্জোদড়ো** এবং পঞ্জাবের অন্তর্গত **হরপ্পা** নামক স্থানে মাটির নীচে পাওয়া গিয়েছে [দুইটি স্থানই বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত]। এই সিন্ধু-সভ্যতা লৌহযুগের এবং বৈদিক যুগেরও আগেকার। এই প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে মিশর, পশ্চিম-এশিয়া

এবং চীনের আদি সভ্যতার তুলনা করা চলে। এই সভ্যতার সঙ্গে বোধ হয় পশ্চিম-এশিয়ার সুমেরীয় সভ্যতার নিকট সম্পর্ক ছিল। এই যুগে ভারতে

মহেঞ্জোদড়োয় প্রাপ্ত নানাপ্রকার সীলমোহর

শিল্পকলা, নগর-নির্মাণ, পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা প্রভৃতি নানা বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি ও শ্রেষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়। তখনকার অনেক লেখা পাওয়া গিয়েছে,

মহেঞ্জোদড়োয় প্রাপ্ত নানাপ্রকার মৃৎপাত্র

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মহেঞ্জোদড়োতে আবিষ্কৃত সীলমোহরে উৎকীর্ণ লিপির পাঠোদ্ধার করা আজ পর্যন্ত সম্ভব হয় নি।

আর্য-সভ্যতার পূর্বে দ্রাবিড়জাতিও ভারতে উঁচু ধরনের সভ্যতা বিস্তার করেছিল। এরা খুব সম্ভব বাইরে থেকে এদেশে এসেছিল।

আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে আর্যজাতি বোধ হয় মধ্য-এশিয়া থেকে এসে ভারতবর্ষের পঞ্জাব প্রদেশ জয় করে সেখানে বসবাস আরম্ভ করে। পঞ্জাব থেকে তারা ভারতের অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ে।

আর্যেরা খুব ভাল লেখাপড়া জানত। তাদের সব চেয়ে পুরানো এবং সব চেয়ে বিখ্যাত ধর্মগ্রন্থের নাম **বেদ।** পৃথিবীর সব চেয়ে পুরাতন গ্রন্থ এই বেদ। বেদ আবার চার ভাগে বিভক্ত ঃ—ঋক্‌, সাম, যজুঃ এবং অথর্ব। আর্য
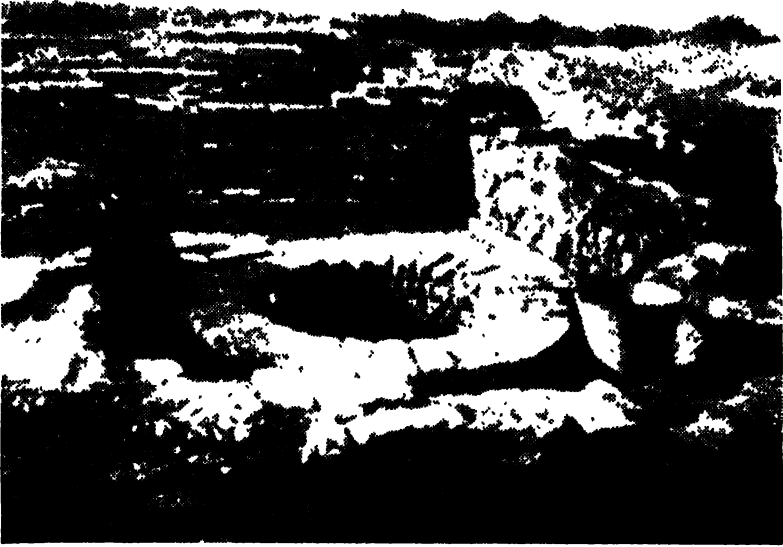
মহেঞ্জোদড়োয় প্রাপ্ত একটি কূপ

ঋষিরা ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, সূর্য প্রভৃতি দেবতার স্তব করতেন এবং তার জন্যে চমৎকার সব স্তোত্র রচনা করতেন। তাঁরা যজ্ঞের জন্যেও মন্ত্র রচনা করতেন। এই সব স্তব, স্তোত্র এবং মন্ত্র হল বেদের প্রধান উপাদান। বেদ ছাড়াও আর্য মনীষীরা বেদাঙ্গ, সংহিতা, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ প্রভৃতি আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। সংগীত-কলা, স্থপতি-বিদ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধেও তাঁদের অনেক ভাল ভাল লেখা আছে।

আর্যেরা হচ্ছে ভারতের বর্তমান অধিবাসীদের—বিশেষ করে হিন্দুদের পূর্ব-পুরুষ। হিন্দুদের মধ্যে আর্যযুগে **জাতিভেদ-প্রথা** হয়ত আরম্ভ হয়, কিন্তু পরে রামায়ণ-মহাভারতের মহাকাব্য যুগে তার বহুল প্রচলন হয়।

এইরূপে ভারতে চারিটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর উদ্ভব হয়; যথা:—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ব্রাহ্মণেরা পূজা-অর্চনা এবং ধর্ম-সাহিত্য অধ্যয়ন করত। ক্ষত্রিয়েরা দেশরক্ষা ও যুদ্ধ করত। বৈশ্যেরা করত ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কৃষিকার্য, আর শূদ্রদের কাজ ছিল এদের ভৃত্য হয়ে থেকে সেবা করা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য,

মহেঞ্জোদড়ো নগরীর একটি রাস্তা
(এর দুই পাশে আবৃত পয়ঃপ্রণালী অবস্থিত)

শূদ্র—এই চারি জাতির পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি আদান-প্রদান ক্রমে লুপ্ত হয়ে যায়। এই ব্যবস্থা অনেকাংশে আজও প্রচলিত রয়েছে।

আর্য-সভ্যতার ধারা মূলতঃ পরবর্তী ভারতীয় ইতিহাসকে প্রভাবিত করে। মিশর, বাবিলন, গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশের পুরাতন সভ্যতা এখন অনেক ক্ষেত্রেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু ভারতীয় বৈদিক আর্য-সভ্যতা নানাযুগের পরিবর্তন সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত অনেকটা অব্যাহতরূপেই চলে এসেছে।

রামায়ণ ও মহাভারত দুইখানি মহাকাব্যে বৈদিক আর্যযুগের শেষের দিকের পূর্ণতর সভ্যতার সামাজিক ও রাজনৈতিক চিত্র পাওয়া যায়।

গৌতম বুদ্ধ

উত্তর-পূর্ব ভারতে নেপালের তরাই অঞ্চলে কপিলাবস্তু নামে এক নগরে শুদ্ধোদন নামে শাক্যবংশের এক রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন। গৌতম নামে তাঁর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের অল্প পরেই গৌতমের মায়ের মৃত্যু হয়।

ছোটবেলা থেকেই গৌতম চিন্তাশীল এবং সাংসারিক বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। তাঁকে সাংসারিক বিষয়ে আকৃষ্ট করবার জন্যে, রাজা শুদ্ধোদন গোপা নাম্নী এক পরমাসুন্দরী বালিকার সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিলেন। কিন্তু পথে বেরোলেই গৌতমের চোখে পড়ত পীড়িত, বার্ধক্যগ্রস্ত লোক; তাদের দুঃখ দেখে তিনি বিচলিত হতেন। মৃতদেহ দেখেও তাঁর খুব দুঃখ হত। কেমন করে রোগ, বার্ধক্য ও মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, তিনি সব সময় শুধু সেই সব কথা চিন্তা করতেন। অবশেষে এক সন্ন্যাসীর শান্ত মুখশ্রী দেখে তিনি অনেকটা স্বস্তি পেলেন এবং কোন্ পথে অগ্রসর হলে মানুষের মুক্তির সন্ধান পাওয়া যাবে, তার কতকটা আভাস পেলেন।

গৌতম বুদ্ধ

এই সময়ে উনত্রিশ বছর বয়সে তাঁর একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করল। তিনি দেখলেন, সংসারে মায়ার বাঁধন ক্রমেই বেড়ে চলেছে। তাই তিনি হঠাৎ একদিন রাত্রে সন্ন্যাসী হবার সংকল্প নিয়ে সংসার ত্যাগ করে চলে গেলেন।

ছয় বৎসর তিনি নানাস্থানে ভ্রমণ, কঠোর তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন করে কোথাও শান্তি পেলেন না। অবশেষে গয়ায় এক গাছের নীচে বসে তিনি নির্জনে সাধনা আরম্ভ করলেন। দিনরাত তিনি শুধু ধ্যান করতেন, কেমন করে, কোন্ পথে অগ্রসর হলে মানুষের রোগ, শোক, জরার কষ্ট আর থাকবে না। দীর্ঘকাল

গভীর ধ্যানের পর তিনি প্রকৃত জ্ঞান ও শান্তিলাভের উপায় আবিষ্কার করলেন। সেই থেকে তাঁর নাম হল বুদ্ধ, অর্থাৎ জ্ঞানী।

তখন তিনি বেরিয়ে পড়লেন তাঁর ধর্ম প্রচার করতে। দেশের লোককে তিনি শেখালেন যে, মানুষ নিজের কর্মের দ্বারা নিজের ভাগ্য গড়ে তোলে। এ জন্মে যদি কেউ ভাল কাজ করে, তাহলে পরজন্মে সে উন্নততর জীবন লাভ করতে পারে। এইভাবে ক্রমাগত ভাল কাজ করলে এবং সৎপথে জীবনযাপন করলে মানুষ অবশেষে মুক্তি বা নির্বাণ লাভ করবে। নির্বাণ লাভের পর মানুষের আর জন্ম হবে না; সুতরাং পৃথিবীর রোগ, শোক, জরার কষ্টও তাকে আর ভোগ করতে হবে না। সত্যকথা বলা, জীবে দয়া, আত্মসংযম এবং কায়মনোবাক্যে পবিত্রতা রক্ষা, এই সব নীতি মেনে চলা নির্বাণলাভের পক্ষে প্রয়োজন বলে বুদ্ধদেব মনে করতেন। অহিংসা পরম ধর্ম বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। বুদ্ধের প্রচারিত এই ধর্মের নাম হয় **বৌদ্ধধর্ম**। ৪৫ বৎসর বৌদ্ধধর্ম প্রচারের পর ৮০ বছর বয়সে বুদ্ধের মৃত্যু হয়।

বুদ্ধ যখন ধর্মপ্রচার করেন তখন পূর্ব-ভারতে **মহাবীর** নামে আর একজন প্রসিদ্ধ ধর্ম-প্রবর্তকের আবির্ভাব হয়। মহাবীর যে ধর্মের প্রবর্তন করেন তার নাম **জৈনধর্ম**। বুদ্ধ ও মহাবীর দু'জনেই ক্ষত্রিয় ছিলেন।

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধদেব যখন ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করছিলেন, সেই সময়ে উত্তর-ভারত ছিল ছোট ছোট অনেকগুলো রাজ্যে বিভক্ত। তখনও সেখানে কোন বড় সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে নি। ক্রমে চারিটি রাজ্য প্রাধান্য লাভ করে। এদের নাম কোশল, মগধ, বৎস এবং অবন্তি। আস্তে আস্তে মগধরাজ্য নৃপতি বিম্বিসার ও তাঁর পুত্র বিজয়ী অজাতশত্রুর সময়ে বিস্তারলাভ শুরু করে ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হতে থাকে।

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে **মহাপদ্ম নন্দ** নামে মগধের একজন অসাধারণ বীর সম্রাট্ উত্তর-ভারতের ছোট ছোট রাজ্যগুলি জয় করে এক বৃহৎ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন ও কেন্দ্রীয় শাসন সুদৃঢ়

করেন। তাঁর বিপুল সৈন্যবাহিনী ছিল। মহাপদ্ম নন্দের ছেলেদের রাজত্ব-কালে মাসিডোনিয়ার বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী বীর **আলেকজাণ্ডার** ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন (খ্রীস্টপূর্ব ৩২৭)। এর বহুপূর্বে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইরানের সম্রাট্ দারাউস পঞ্জাব আক্রমণ করে জয় করেছিলেন। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের সময় পঞ্জাবে পারসিক শক্তি শিথিল হয়ে গিয়েছিল এবং তা একতাবিহীন খণ্ড খণ্ড রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়েছিল। আলেকজাণ্ডার দুর্বার গতিতে বিশাল পারসিক সাম্রাজ্য জয় করে ভারতে প্রবেশ করেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের অনেক দুর্বলচিত্ত রাজা তাঁর নিকট বশ্যতা স্বীকার করলেন। তিনি ক্রমে সিন্ধুদেশ ও পঞ্জাব জয় করেছিলেন। তবে তার

আলেকজাণ্ডার

চেয়ে বেশীদূর আর অগ্রসর হতে পারেন নি। এই সময় ভারতীয় রাজা **পুরুর** বীরত্বে তিনি মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের অভিমত —আলেকজাণ্ডার পুরুর নিকট পরাজিত হন। মাত্র দুই বৎসর ভারতবর্ষে থেকেই তিনি ফিরে চলে যান। দেশে ফেরবার পথে বাবিলন শহরে আলেক-জাণ্ডারের মৃত্যু হয়।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুসংবাদ ভারতবর্ষে পৌঁছাবার পরই মহাপদ্ম নন্দের বংশধরকে বিতাড়িত করে ক্ষত্রিয় মৌর্যবংশের বীর **চন্দ্রগুপ্ত** মগধের সিংহাসনে বসেন। গ্রীকদের হটিয়ে দিয়ে তিনি পঞ্জাব অধিকার করেন। **সেলুকস** নামে আলেকজাণ্ডারের এক সেনাপতি ছিলেন। তিনি এই সময়ে সিরিয়ার অধিপতি ছিলেন। তিনি পঞ্জাব পুনরধিকার করবার জন্যে চেষ্টা করেন। চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে তাঁর প্রবল যুদ্ধ হয়। সেলুকস এই যুদ্ধে পরাজিত হন এবং কাবুল, কান্দাহার ও হিরাট এই তিনটি অঞ্চল চন্দ্রগুপ্তকে দিয়ে তাঁর সঙ্গে সন্ধি করেন।

চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য এর পর ইরানের সীমান্ত হতে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তিনি পশ্চিমে গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের অনেক প্রদেশও জয় করেছিলেন। তাঁর দরবারে সেলুকস-প্রেরিত গ্রীক রাজদূত **মেগাস্থিনিস্** অনেকদিন অবস্থান করে চন্দ্রগুপ্তের শাসনব্যবস্থা ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে 'ইণ্ডিকা' নামে একখানি মনোরম বিবরণ লিখেছিলেন।

চাণক্য নামে চন্দ্রগুপ্তের একজন বিচক্ষণ কূটনৈতিক মন্ত্রী ছিলেন। চাণক্য ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্। এঁর পরামর্শে চন্দ্রগুপ্ত রাজ্যশাসনে যথেষ্ট নিপুণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। চাণক্যের আর এক নাম কৌটিল্য। কৌটিল্যের বিখ্যাত **অর্থশাস্ত্র** পুস্তক হতে আমরা মৌর্য শাসনক্ষমতার পরিচয় পাই। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যে শৃঙ্খলা ও আধুনিক ধরনের নানারূপ উন্নত শাসন-প্রণালীর ব্যবস্থা ছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্র নগরী যেমন সুরক্ষিত ছিল, তেমনি প্রাসাদ-ঐশ্বর্যে মণ্ডিত এবং কর্মব্যস্ততায় মুখরিত ছিল।

মহামতি অশোক

চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র **অশোক** কেবল ভারতের নয়—সমগ্র পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রাজাদের অন্যতম। সিংহাসনে আরোহণ করবার কিছুদিন পরে তিনি কলিঙ্গ দেশ জয় করেন। বর্তমান উড়িষ্যার প্রাচীন নাম কলিঙ্গ। এই যুদ্ধে ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড দেখে অশোকের মন বেদনায় ও বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে, এবং সেই সময় থেকেই তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, অহিংসা পরম ধর্ম, এই সত্যের প্রচার আরম্ভ করেন। **উপগুপ্ত** নামক একজন সন্ন্যাসী অশোককে বৌদ্ধ-ধর্মে দীক্ষা দেন। জীবনের অবশিষ্টকাল অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ

করেন। এশিয়া, আফ্রিকা ও ইওরোপের বহু দেশে অশোকের নিজস্ব অনেক প্রচারক ভিক্ষু, ভিক্ষুনীরা গিয়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। ফলে, পৃথিবীর অনেক দেশে এখনও বৌদ্ধধর্ম বিরাজমান।

রাজ্যশাসনেও অশোক আদর্শ প্রণালীর অবতারণা করেন। তাঁর রাজত্বে দেশের সব লোক সুখে শান্তিতে সচ্ছলভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করত। অসংখ্য প্রস্তরগাত্রে ও স্তম্ভগাত্রে বৌদ্ধধর্মের সুন্দর নীতিগুলি এবং তাঁর অপূর্ব উপদেশাবলী ক্ষোদিত করে তিনি দেশের লোকের নৈতিক উন্নতির জন্যে অক্লান্ত চেষ্টা করেন। পররাষ্ট্র-নীতিতে অশোক ধর্ম-বিজয়ের মহান্ আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সময় শিল্পকলার খুব উন্নতি হয়। তাঁর শিল্প-নিদর্শনের মধ্যে **সারনাথ স্তম্ভ-শীর্ষে সিংহমূর্তি** বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। ৪১ বছর রাজত্বের পর অশোকের মৃত্যু হয়। অশোকের মৃত্যুর পর উত্তর-ভারত আবার ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

অশোক-স্তম্ভ

খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের ইতিহাসে রাজনৈতিক ঐক্য বিশেষ ছিল না। কেন্দ্রগত প্রভুত্বের অভাবে দেশের নানাস্থানে ছোট ছোট দেশীয় রাষ্ট্রশক্তির অভ্যুত্থান হয়। এই সময়ে ভারতে বহু বিদেশী শক্তিরও আক্রমণ ঘটে। মৌর্যবংশের পতন হলে ক্ষীণায়তন মগধ রাজ্য পর পর শুঙ্গ ও কাণ্ব বংশের শাসনাধীন হয়। শুঙ্গবংশের স্থাপয়িতা **পুষ্যমিত্র** শক্তিশালী যোদ্ধা ছিলেন। তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারত হতে গ্রীক আক্রমণ প্রতিরোধ করেছিলেন।

এই যুগের সাতবাহন বা অন্ধ্রবংশীয় রাজগণ দক্ষিণ-ভারতের ইতিহাসে এক শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করেছেন। সাতবাহনবংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট্ **গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি** শক, যবন (বা গ্রীক), পহ্লব (বা পার্থিয়ান) প্রভৃতি বৈদেশিক জাতিকে পরাভূত করে বিশেষ গৌরব অর্জন করেছিলেন।

খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে বাহ্লীকদেশীয় গ্রীকগণ পঞ্জাবে রাজ্যস্থাপন

করে। উত্তর-পশ্চিম ভারতের গ্রীক রাজগণের মধ্যে ডেমেট্রিয়স ও **মিনান্দারের** নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই যুগে বহু বিদেশী দুর্ধর্ষ জাতি একের পর এক উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথ দিয়ে ভারত আক্রমণ করে ও এদেশের বিভিন্ন স্থানে রাজ্যস্থাপন করে। গ্রীকদের পরে আসে শকজাতি, তারপরে পহ্লব এবং তারপর **কুষাণ**।

কুষাণ সম্রাট্গণের মধ্যে **কণিষ্ক** সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি বাহুবলে রাজ্যবিস্তার করে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়েছিলেন। পেশোয়ার বা পুরুষপুর নগরে তাঁর রাজধানী ছিল। তিনি বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি পুরুষপুরে বুদ্ধের দেহাবশেষের উপর এক বিশাল চৈত্য নির্মাণ করেছিলেন। প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজগণের ন্যায় কণিষ্কও সাহিত্য ও শিল্পের অনুরাগী ছিলেন এবং অপরের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন।

কণিষ্কের ভগ্ন প্রস্তরমূর্তি
(অধুনা এই মূর্তি মথুরার মিউজিয়মে রক্ষিত আছে)

কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের পর খ্রীষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে মগধের গুপ্তবংশীয় বিখ্যাত সম্রাট্গণ ভারতবর্ষে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে **গুপ্তবংশের** উন্নতির সূচনা হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর যশস্বী পুত্র সমুদ্রগুপ্ত গুপ্ত-রাজ্যের অধিপতি হলেন।

সমুদ্রগুপ্ত

সমুদ্রগুপ্ত প্রাচীন ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন। যোদ্ধা হিসাবে তাঁকে 'ভারতীয় নেপোলিয়ন' বলা হয়। দাক্ষিণাত্যের বহু দেশ তিনি জয় করেন, কিন্তু প্রত্যেক দেশের পরাজিত রাজা তাঁর বশ্যতা স্বীকার

করা মাত্র তিনি তাঁদের রাজ্য ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। উত্তরে হিমালয়, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ, দক্ষিণে নর্মদা নদী এবং পশ্চিমে যমুনা নদী পর্যন্ত সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তিনি একাধারে শিল্পী, বীণাবাদক, যোদ্ধা ও শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন।

অজন্তা গুহার ভিতরের একটি দৃশ্য

সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র **দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত** সিংহাসনে আ হন। বীরত্বে তিনিও প্রায় সমুদ্রগুপ্তেরই সমকক্ষ ছিলেন; তা ছাড়া তাঁর অন্যান্য সদ্‌গুণও ছিল অশেষ। এই কারণে দেশের লোক তাঁকে **বিক্রমাদিত্য**

উপাধি প্রদান করে। ঐতিহাসিকগণের মতে এই চন্দ্রগুপ্তই কিংবদন্তীর বিখ্যাত পুণ্যশ্লোক বিক্রমাদিত্য রাজা। সম্ভবতঃ তাঁরই ছত্র-ছায়ায় অতুলনীয় **নবরত্ন** পণ্ডিত-সভার সমাবেশ ঘটে। কালিদাস-আদি মহাকবি ও বরাহমিহির প্রভৃতি পণ্ডিতের অনেকে তাঁরই সভা অলংকৃত করে বিরাজ করতেন। পশ্চিম-ভারতের শক-দলের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে তিনি শকদের হারিয়ে দিয়ে পশ্চিম-ভারত গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁর রাজত্বকালে চীনদেশীয় পরিব্রাজক **ফা-হিয়েন** ভারত পরিভ্রমণ করেছিলেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পরে কুমারগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্তও পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন,
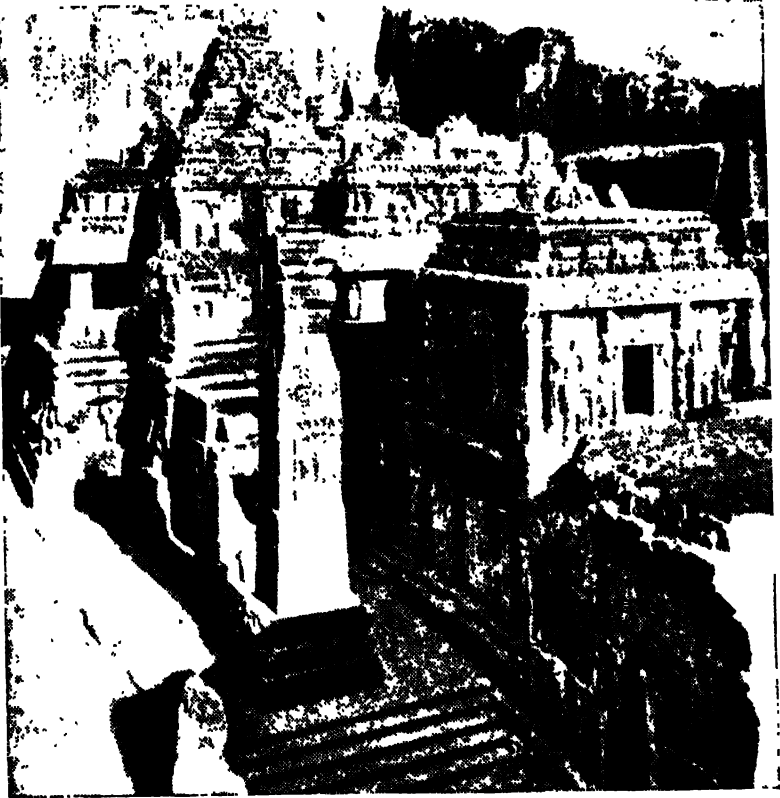
ইলোরা—কৈলাস মন্দির

কিন্তু তাঁদের বংশধরেরা ক্রমেই ক্ষীণবল হয়ে বিদেশী হূন-আক্রমণ প্রতিরোধ করবার শক্তি হারিয়ে ফেললেন। কালক্রমে অন্তর্বিরোধ ও হূন-আক্রমণের ফলেই গুপ্ত-সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ল।

গুপ্তযুগে ভারতবর্ষের উন্নতি হয়েছিল সর্বতোমুখী। শিল্প, কলা, বাণিজ্য,

সাহিত্য, সর্ববিষয়েই ভারতবাসী প্রতিভার পরিচয় দিতে পেরেছিল এই যুগে। এই যুগকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের স্বর্ণযুগ বলে আখ্যা দেওয়া হয়। গুপ্তযুগে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। এই সময় পুরাণ, স্মৃতিশাস্ত্র ও রামায়ণ-মহাভারত পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে বর্তমান রূপ গ্রহণ করে।

গুপ্ত-সম্রাট্‌গণ ভারতীয় শিল্পে এক গৌরবময় যুগের প্রবর্তন করেছিলেন। অজন্তার গুহাগুলি স্থাপত্য ও চিত্রকলার অপূর্ব নিদর্শন। এ সবের অনেকগুলি ভাল ভাল চিত্র গুপ্তযুগে অঙ্কিত হয়েছিল। ব্রহ্মদেশ, শ্যাম (থাইল্যাণ্ড), কাম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশের শিল্পিগণ গুপ্ত-শিল্পরীতির অনুকরণ করেছিল। গুপ্ত-সভ্যতার যুগে ভারতের সঙ্গে রোমান সাম্রাজ্যের এবং চীনদেশের ভাবের আদান-প্রদান ঘটে।

গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পতনের পর সপ্তম শতাব্দীতে পঞ্জাবের পূর্বপ্রান্তে থানেশ্বরের রাজা **হর্ষবর্ধন** প্রবল-পরাক্রান্ত হয়ে ওঠেন। তাঁরই রাজত্বকালে চীনা পরিব্রাজক **হিউয়েন সাং** ভারত পরিভ্রমণে আগমন করেন। উত্তর-ভারতে হর্ষবর্ধন এক বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। তিনি থানেশ্বর হতে **কনৌজে** রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এই সময় থেকেই কনৌজ উত্তর-ভারতের প্রধান নগররূপে পরিগণিত হতে থাকে। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই পাটলিপুত্রের গৌরব ম্লান হয়ে গিয়েছিল। হর্ষের রাজত্বকালে পশ্চিমবঙ্গে **গৌড়ের** রাজা **শশাঙ্ক** তাঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। হর্ষবর্ধন জনহিতকর কার্যাবলী, দানশীলতা ও বিদ্যোৎসাহিতার জন্যে অমরত্ব লাভ করেছেন। তিনি বিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে অকাতরে দান করতেন। প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী পণ্ডিত **শীলভদ্র** এই সময় নালন্দার অধ্যক্ষ ছিলেন এবং হিউয়েন সাং তাঁরই শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

হর্ষবর্ধনের পর হিন্দুযুগ

হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য বিনষ্ট হয়ে যায়। এর পরে অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধে **যশোবর্মন** নামক এক পরাক্রান্ত নৃপতি কনৌজে রাজত্ব করেন। কাশ্মীরের অভ্যুদয় হয় **ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়ের** আমলে। তিনি দিগ্বিজয়ী ছিলেন। **'রাজ-তরঙ্গিণী'** নামক কহ্লন-রচিত ঐতিহাসিক কাব্যে তাঁর দিগ্বিজয়ের বিস্তৃত বিবরণ আছে। তিনি কনৌজরাজ যশোবর্মনকে পরাজিত করেন এবং তিব্বতে ও মধ্য-এশিয়ায় অভিযান প্রেরণ করেন।

অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগ হতে দশম শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত কনৌজের আধিপত্য নিয়ে উত্তর-ভারতে তুমুল সংঘর্ষ চলেছিল। তিনটি প্রবল রাজবংশ এই সংঘর্ষে অংশ গ্রহণ করেছিলেন—পালবংশ, গুর্জর-প্রতিহারবংশ এবং রাষ্ট্রকূটবংশ। **গুর্জর-প্রতিহারবংশীয়** রাজগণ সূর্যবংশীয় রাজপুতরূপে পরিচিত ছিলেন। তাঁরা খুব সম্ভব গুর্জর নামক বৈদেশিক জাতির বংশধর। গুর্জর জাতি হূন জাতির সঙ্গে মধ্য-এশিয়া হতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল। **মহেন্দ্রপাল** গুর্জর-প্রতিহারবংশের সর্বাপেক্ষা প্রতাপান্বিত নরপতি। এই প্রতিহারবংশই হিন্দুযুগের শেষ সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল। আরব লেখকগণ প্রতিহার-রাজদের সুশাসনের প্রশংসা করেছেন। তাঁদের প্রতাপেই সিন্ধুদেশের আরবগণ ভারতের অভ্যন্তরে রাজ্য-বিস্তার করতে পারে নি।

পালবংশের দীর্ঘ রাজত্বকাল বাংলাদেশের ইতিহাসের এক পরম গৌরবময় যুগ। ধর্মপাল এবং তাঁর পুত্র দেবপাল পালবংশের দুইজন শ্রেষ্ঠ সম্রাট্। **ধর্মপাল** সমগ্র উত্তর-ভারতে পালবংশের গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বাহুবলে কনৌজ অধিকার করেছিলেন। **দেবপাল** নবম শতাব্দীতে রাজত্ব করেন। তিনি অসামান্য কীর্তির অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি আসাম ও কলিঙ্গ (উড়িষ্যা) জয় করেছিলেন এবং হূন, গুর্জর, কম্বোজ, দ্রাবিড় প্রভৃতি জাতির সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছিলেন। পালরাজগণ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এবং বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁদের সময়ে ধর্মপাল, **দীপঙ্কর** প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বাঙ্গালী পণ্ডিতগণ তিব্বতে ও সুদূর সুমাত্রা দ্বীপে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। পালযুগে ভাস্কর্যশিল্প ও স্থাপত্য-বিদ্যার বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। **ধীমান** ও **বীতপাল** এই যুগের দুইজন বিখ্যাত শিল্পী।

দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পালবংশ হীনবল হয়ে পড়লে বাংলায় **সেনবংশ** প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজাদের মধ্যে বিজয় সেন, বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেনের নাম উল্লেখযোগ্য। **বল্লাল সেন** উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে কৌলীন্যপ্রথার প্রবর্তন করেছিলেন। লক্ষ্মণ সেন সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। 'গীতগোবিন্দ'-রচয়িতা কবি জয়দেব তাঁর সভা অলংকৃত করে-ছিলেন। লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের শেষভাগে মুসলমানগণ বাংলার কতক অংশ জয় করে।

গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর-ভারতের ন্যায় দক্ষিণ-ভারতেও স্বাধীন রাজ্যসমূহের উদ্ভব হতে থাকে। দাক্ষিণাত্যের রাজবংশগুলির মধ্যে **বাতাপির চালুক্যবংশ, কাঞ্চীর পল্লববংশ, মান্যখেটের রাষ্ট্রকূটবংশ** এবং **তাঞ্জোরের**

চোলবংশ প্রধান। এইসব রাজবংশের বিখ্যাত রাজগণ হচ্ছেন চালুক্যবংশের দ্বিতীয় পুলকেশী, পল্লববংশের নরসিংহবর্মন, রাষ্ট্রকূটবংশের তৃতীয় গোবিন্দ এবং চোলবংশের রাজরাজ ও প্রথম **রাজেন্দ্র চোল**।

হিউয়েন সাং চালুক্যরাজ **দ্বিতীয় পুলকেশীর** শক্তি ও ঐশ্বর্য দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। পল্লবরাজ নরসিংহবর্মনের সময়ে শিল্পের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম কৃষ্ণের রাজত্বকালে ইলোরার কৈলাসনাথের মন্দির নির্মিত হয়েছিল। চোলরাজগণের পরাক্রান্ত নৌ-বাহিনী ছিল। এর সাহায্যে তাঁরা দশম ও একাদশ শতাব্দীতে সমুদ্রপথে ভারতের বাইরেও অধিকার বিস্তার করেছিলেন।

মুসলমান যুগ

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর অল্পকালের মধ্যে এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইওরোপের নানাস্থানে আরব-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল। এই সময় আরবগণ ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধু ও মুলতান অধিকার করে ভারতে মুসলমান-রাজত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে। প্রতিহার-প্রমুখ রাজপুত বংশগুলির শৌর্যের জন্যে মুসলমানেরা বহুকাল পর্যন্ত ভারতের অভ্যন্তরে আর অধিকার বিস্তার করতে পারে নি।

মহম্মদ ঘোরী

দশম শতাব্দীর শেষদিক হতে প্রতিহার-শক্তি হীনবল হয়ে পড়লে আফগানিস্থানের অন্তর্গত **গজনী** রাজ্যের সম্রাট্ **সুলতান মামুদ** বার বার ভারত আক্রমণ করেন এবং এদেশ থেকে প্রভূত ধন-ঐশ্বর্য লুণ্ঠন করে নিয়ে যান। মামুদ পরস্বলুণ্ঠনকারী, নির্মম প্রকৃতির শাসক ছিলেন।

তারপর দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে গজনীর সন্নিহিত **ঘোর** রাজ্যের তুর্কী প্রধান সেনাপতি **মহম্মদ ঘোরী** ভারতবর্ষ আক্রমণ করে এদেশে স্থায়ী মুসলমান-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি

দিল্লী ও আজমীরের অধিপতি **পৃথ্বীরাজ** ও কনৌজের রাজা জয়চন্দ্রের মধ্যে শত্রুতার সুযোগ নিয়ে দুইবার **তরাইন** নামক স্থানে যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করে পৃথ্বীরাজকে পরাজিত ও নিহত করেন। এর কয়েক বৎসরের মধ্যেই সিন্ধুদেশ হতে বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল তুর্কীগণের অধীন হল।

কুতুবউদ্দীন

মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর পর তাঁর সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত ক্রীতদাস **কুতুবউদ্দীন** ১২০৬ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীতে প্রথম মুসলমান সম্রাট্ হয়ে বসেন। কুতুবউদ্দীন যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন, তার নাম **দাসবংশ**।

ধীরে ধীরে ভারতবর্ষে মুসলমান-রাজত্ব কায়েম হল ও একাদিক্রমে প্রায় সাতশ' বছর ধরে তারা রাজত্ব করল। প্রথম তিনশ' বছরের মুসলমান শাসনকালকে বলে **তুর্কী-আফগান যুগ**। দাসবংশের **রজিয়া** নামে একজন মহিলা কিছুকাল রাজত্ব করেছিলেন।

রজিয়া

দাসবংশের পরে **খিলজীবংশ**। এই বংশের দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ **আলাউদ্দীন খিলজী** তুর্কী-আফগান যুগের সর্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী সুলতান। তিনি নিষ্ঠুর, অত্যাচারী ও পরধর্মবিদ্বেষী ছিলেন।

খিলজীবংশের পর তুঘলকবংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান **মহম্মদ তুঘলক** অনেক গুণের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তাঁর নিষ্ঠুরতা ও কতকগুলি গুরুতর কাজে অবিবেচনা ও নির্বুদ্ধিতার ফলে তুর্কী-সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ল। শীঘ্রই ভারতে অনেক স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি হল। তাদের মধ্যে বাংলাদেশ, দাক্ষিণাত্যে **বাহমনী** রাজ্য এবং সুদূর দক্ষিণ-ভারতে **বিজয়নগর** রাজ্য বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেছিল।

স্বাধীন বাংলারাজ্যের সুলতানদের মধ্যে **হোসেন শাহ** খুব বিখ্যাত। তাঁর রাজত্বকালে **শ্রীচৈতন্যদেব** আবির্ভূত হয়েছিলেন। হোসেন শাহের পুত্র **নসরৎ শাহ** বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন।

বিজয়নগরে এক সমৃদ্ধিশালী ও পরাক্রান্ত হিন্দু-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এই রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতির নাম **কৃষ্ণদেব রায়।**

তুর্কী-আফগানদের পর আসে মোগল যুগ। এই সময়ের শ্রেষ্ঠ সম্রাট্‌দের নাম বাবর, আকবর, শাহজাহান ও ঔরঙ্গজীব। শেরশাহও এই সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট্। তিনি ছিলেন পাঠান। মোগল সম্রাট্‌গণ ছলে বলে কৌশলে ভারতের বিভিন্ন হিন্দুরাজ্য একের পর এক অধিকার করেন। এই আমলে দেশে শিল্পের প্রভূত উন্নতি হয়।

বাবর

তুর্কী-আফগান যুগের শেষ অধিপতি ইব্রাহিম লোদিকে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম পাণিপথের যুদ্ধে পরাজিত করে মোগল-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা **বাবর** দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করবার পর, চিতোরের মহারানা সংগ্রাম সিংহের অধীনে, রাজপুতেরা তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ান,—কিন্তু যুদ্ধে রাজপুতদের পরাজয় ঘটে। রাজপুতদের পরাজয়ের ফলে বাবরের সাম্রাজ্য উত্তরে হিমালয়, পশ্চিমে কাবুল, দক্ষিণে গোয়ালিয়র ও পূর্বে বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। মাত্র চার বৎসর রাজত্ব করবার পর বাবরের মৃত্যু হয়। বাবর ছিলেন সাহসী ও নির্ভীক যোদ্ধা। তাঁর "আত্মজীবনী" থেকে বোঝা যায় যে, তিনি কবিতা ও গদ্য দুই-ই ভাল লিখতে পারতেন। তাঁর চরিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল দৃঢ় মনোবল। আজীবন মদ্যপানে অভ্যস্ত বাবর একদিন যুদ্ধক্ষেত্রে মুহূর্তের সংকল্পে বাকী জীবনের জন্যে মদ্যপান পরিত্যাগ করেছিলেন।

বাবর

হুমায়ুন ও শেরশাহ

বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে **হুমায়ুন** দিল্লীর সম্রাট্ হন। সিংহাসনে আরোহণ করবার পরেই হুমায়ুনকে নানা বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। বিহারের শাসনভার ছিল **শেরখাঁ** নামক একজন আফগান বীরের হাতে। শেরখাঁর সঙ্গে হুমায়ুনের অনেকবার যুদ্ধ হয়। শেরখাঁ জয়লাভ করেন। হুমায়ুন রাজ্যহারা হয়ে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে থাকেন।

হুমায়ুন

শেরখাঁ এইবার **"শেরশাহ"** উপাধি নিয়ে রাজত্ব আরম্ভ করলেন। তিনি নিজের প্রতিভা ও দুঃসাহসিকতার জোরে অতি সাধারণ অবস্থা হতে দিল্লীর সম্রাট্পদে আসীন হয়েছিলেন। শুধু যোদ্ধা নয়, শাসকরূপেও তিনি ভারত-ইতিহাসে অবিস্মরণীয় খ্যাতি অর্জন করেছেন। শেরশাহ তাঁর বিস্তৃত সাম্রাজ্যের শৃঙ্খলা বিধান করেন। মুসলমান রাজাদের মধ্যে শেরশাহই সর্বপ্রথম বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভারতবর্ষ হিন্দুর দেশ। হিন্দুদের সঙ্গে মিলে মিশে বাস না করলে মুসলমানদের উন্নতি অসম্ভব। তাই তিনি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে প্রজাদের উপর যথাসাধ্য ন্যায়বিচার করতেন।

শেরশাহ

শেরশাহ প্রজাদের জমির সীমা এবং খাজনার হার নির্দিষ্ট করে দেন; প্রজাদের যাতায়াতের সুবিধার জন্যে বাংলাদেশ হতে পঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত বিরাট **গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড** নির্মাণ তিনিই আরম্ভ করেন; মাত্র পাঁচ বৎসর রাজত্বের পর শেরশাহের মৃত্যু হয়।

শেরশাহের মৃত্যুর পর হুমায়ুন তাঁর সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন। হুমায়ুন বেশীদিন রাজত্ব করতে পারেন নি। তাঁর লাইব্রেরীর সিঁড়ি থেকে পা পিছলে পড়ে গিয়ে তিনি মারা যান। হুমায়ুন যখন রাজ্যহারা হয়ে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, সেই সময় সিন্ধুদেশের অন্তর্গত অমরকোট নামক স্থানে তাঁর বিখ্যাত পুত্র আকবরের জন্ম হয় (১৫৪২ খ্রীঃ)।

সম্রাট আকবর

অতি অল্পবয়সে আকবর যখন সিংহাসনে বসলেন তখন মোগল-শক্তি অত্যন্ত দুর্বল, দেশের চারদিকে বিশৃঙ্খলা, বিদ্রোহ এবং রাজশক্তি অসুবিধা ও বিপদ দ্বারা বেষ্টিত। আকবর নির্ভীক, অচঞ্চলভাবে সমস্ত অসুবিধার সম্মুখীন হলেন।

আকবর

আকবর কঠোরহস্তে সমস্ত বিশৃঙ্খলা দমন করেই রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করেন। গুজরাট, বাংলাদেশ, কাশ্মীর, কাবুল প্রভৃতি জয় করবার পর তিনি দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করেন। ক্রমে তিনি উত্তরে হিমালয়, পশ্চিমে কান্দাহার, দক্ষিণে বেরার এবং পূর্বে বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকারী হন।

সম্রাট্ আকবরের অনেক গুণ ছিল। রাজ্যশাসনে তিনি বহু সুব্যবস্থা অবলম্বন করেন। সুশাসনের জন্যে তিনি তাঁর সাম্রাজ্যকে ১৫টি সুবা অথবা প্রদেশে বিভক্ত করেন। প্রদেশগুলি আবার নানা নিম্নস্তরে ভাগ করেন। সকল স্তরে বিভিন্ন বিভাগের কার্যনির্বাহের জন্যে অগণিত সুদক্ষ কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। আকবর নিজে নিরলসভাবে সমস্ত বিভাগের তত্ত্বাবধান করতেন।

রাজা **তোডরমল** নামে তাঁর একজন বিচক্ষণ রাজস্ব-সচিব ছিলেন। তিনি শেরশাহের নীতির অনুসরণে প্রজাদের খাজনার হার নির্দিষ্ট করবার জন্যে সমস্ত জমি জরিপ করিয়েছিলেন।

আকবর সৈন্যবিভাগে উন্নত সংস্কারসমূহ প্রবর্তন করেছিলেন। **আবুল ফজল** নামক বিখ্যাত পণ্ডিত ও সাহিত্যিক আকবরের সভাসদ্ ছিলেন।

আকবরের রাজত্বের উন্নতির মূলে ছিল হিন্দুদের দান। তিনি নানা কৌশলে হিন্দুদের সহায়তা অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর প্রধান সেনাপতি ছিলেন রাজা **মানসিংহ** নামক একজন হিন্দু। আকবরের রাজত্বকালেই বিখ্যাত হিন্দি কবি **তুলসীদাস** তাঁর হিন্দি রামায়ণ রচনা করেন। হিন্দুদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার জন্যে, আকবর পরাক্রান্ত রাজপুতদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। মুসলমান রাজত্বে হিন্দুদের **জিজিয়া** নামক একটা কর দিতে হত, আকবর সেটা তুলে দেন।
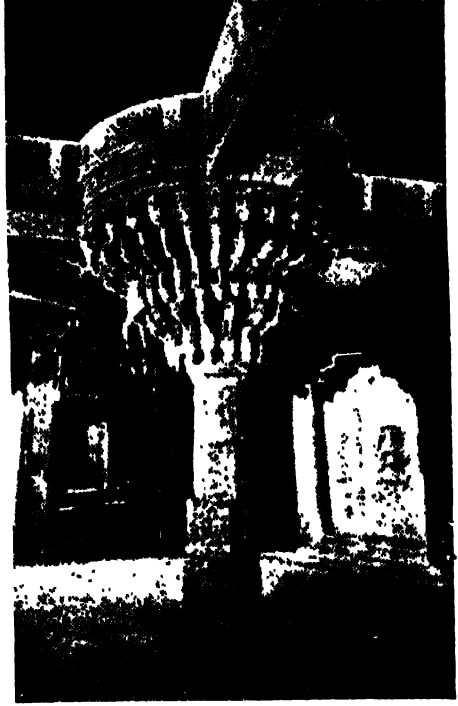
ফতেপুর সিক্রি—দেওয়ান-ই-খাস্

রানা প্রতাপসিংহ

আকবর অন্যান্য মুসলমান সম্রাটের মতই স্বাধীনতাপ্রিয় হিন্দু রাজাদের বিরুদ্ধে সারাজীবন সর্বপ্রকারে বলপ্রয়োগ করে গেছেন। তাঁর রাজত্বকালে **বারভুঞা** নামক বাংলার জমিদারগণ প্রবলভাবে মোগলবিদ্রোহী হয়েছিলেন— তবে আকবর তাঁর রাজ্যবিস্তারে সব চেয়ে বেশী বাধা পেয়েছিলেন মেবারের রানা প্রতাপসিংহের কাছে। রাজপুতনার (বর্তমান রাজস্থানের) অধিকাংশ রাজপুত রাজা আকবরের অধীনতা স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু ভারত-গৌরব প্রাতঃস্মরণীয় **রানা প্রতাপসিংহ** কিছুতেই তাঁর কাছে মাথা নত করেন নি। **হলদিঘাটের** গিরিসংকটে আকবরের সেনাপতি রাজপুতকুলকলঙ্ক

মানসিংহের পরিচালিত অগণিত মোগলবাহিনীর সঙ্গে রানা প্রতাপের ভীষণ যুদ্ধ হয়।

যুদ্ধকালে একবার রানা প্রতাপের জীবন-সংশয়ও হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তাঁরই একজন প্রভুভক্ত সর্দার—ঝালাপতি মান্না, শত্রুদের কাছে নিজেকে রানা প্রতাপ প্রতিপন্ন করে, উদ্যত আঘাত স্বেচ্ছায় নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করেন। এইভাবে সেদিন প্রভুভক্ত অনুচরের মহান্ আত্মত্যাগে প্রতাপের জীবন রক্ষা হয়েছিল। জীবন-রক্ষা হলেও যুদ্ধে বিশাল মোগল-বাহিনীর কাছে তিনি পরাজিত হন, কিন্তু আকবরের বশ্যতা স্বীকার না করে তিনি পর্বতের দুর্গম স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এইখান থেকেই মাঝে মাঝে সৈন্য সংগ্রহ করে মোগল সৈন্যকে আক্রমণ করে তিনি লুপ্ত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্যে যুদ্ধ চালিয়েছিলেন। শত দুঃখ শত দারিদ্র্যের মধ্যেও তিনি এই স্বাধীনতা-সংগ্রাম থেকে বিরত হন নি।
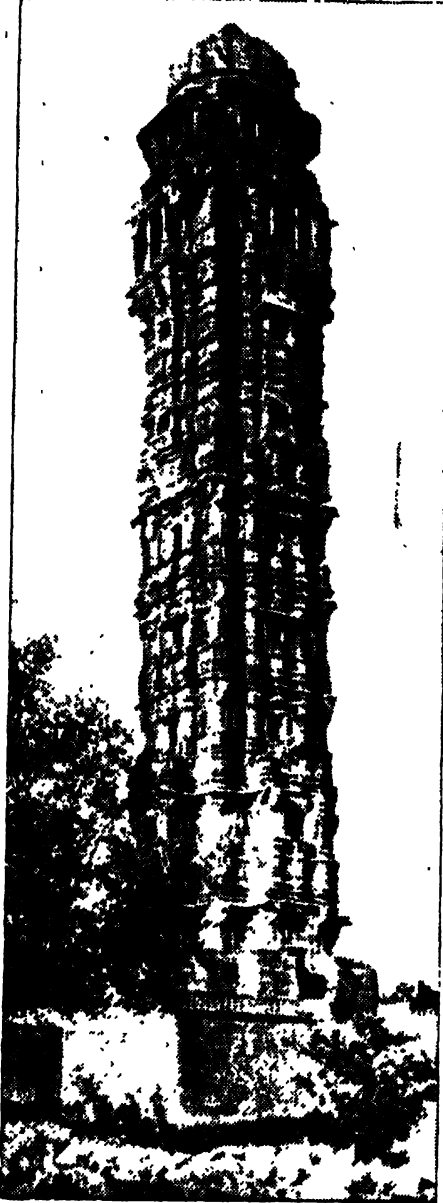
চিতোরের বিজয়-স্তম্ভ

রানা প্রতাপের অপূর্ব সাহস, অসাধারণ কষ্টসহিষ্ণুতা এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা, আজ দেশের প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি মেবার রাজ্যের অধিকাংশ স্থানই পুনরুদ্ধার করেছিলেন, কিন্তু রাজধানী চিতোর উদ্ধার করতে পারেন নি। রানা

প্রতাপ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, চিতোর উদ্ধার না-করা পর্যন্ত তিনি তৃণ-শয্যায় শয়ন করবেন এবং বৃক্ষ-পত্রে ভোজন করবেন। রানা প্রতাপ এই প্রতিজ্ঞা মৃত্যুকাল পর্যন্ত পালন করেছিলেন। আকবর রানা প্রতাপের সঙ্গে সন্ধির জন্যে প্রস্তাব করেছিলেন; কিন্তু প্রতাপ বিদেশী সাম্রাজ্য প্রসার প্রয়াসীর এই ঘৃণিত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। রানা প্রতাপের কাহিনী ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল ও গৌরবময় অধ্যায়।

রানা প্রতাপ

জাহাঙ্গীর

আকবরের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে **জাহাঙ্গীর** দিল্লীর সম্রাট্ হয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। জাহাঙ্গীর **মেহেরউন্নিসা** নাম্নী এক পরমা সুন্দরী বুদ্ধিমতী নারীকে বিবাহ করেন। বিয়ের পরে তাঁর নাম হয় **নূরজাহান**। জাহাঙ্গীর রাজ্যশাসন-ব্যাপারে অনেক সময় নূরজাহানের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। জাহাঙ্গীর খুব ভাল কবিতা লিখতে ও ছবি আঁকতে পারতেন।

জাহাঙ্গীরের সময় মোগল-শিখ সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। সার টমাস রো নামক একজন ইংরেজ দূত জাহাঙ্গীরের দরবারে এসে কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন।

শাহজাহান

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে **শাহজাহান** দিল্লীর সিংহাসন অধিকার

শাহজাহান

করলেন। শাহজাহান ৩০ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর সময়ে মোগল-সাম্রাজ্যের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল।

শাহজাহান খুব আড়ম্বরপ্রিয় এবং শিল্পানুরাগী সম্রাট্ ছিলেন। তাঁর রাজত্বে দেশে শিল্পকলার অনেক উন্নতি হয়। তাঁর ঐশ্বর্য অতুলনীয় ছিল। টাভার্নিয়ে ও বার্নিয়ে নামক ফরাসী পর্যটকদ্বয় তাঁর নির্মিত অট্টালিকাসমূহ এবং তাঁর দরবারের জাঁকজমক দেখে আশ্চর্য হয়েছিলেন। তাজমহল, ময়ূর-সিংহাসন, মতি-মসজিদ প্রভৃতি তাঁরই অমর কীর্তি।

শাহজাহান বেগম **মমতাজকে** অত্যন্ত ভালবাসতেন। মমতাজ বেগমের মৃত্যুর পর তিনি তাঁর সমাধির উপর এক অপূর্ব সমাধি-গৃহ নির্মাণ করেন। এই সমাধি-ভবনেরই নাম **তাজমহল**।

তাজমহল

তাজমহল নির্মাণে হিন্দু স্থাপত্য পদ্ধতির সঙ্গে পারসিক পদ্ধতির অপূর্ব সম্মিলন ঘটেছিল।

শাহজাহানের শেষ জীবন খুব দুঃখের। নিজের পুত্র ঔরঙ্গজীবের হাতে বন্দী হয়ে তাঁকে শেষ দিনগুলো চরম দুর্দশার মধ্যে কাটাতে হয়।

ঔরঙ্গজীব

শাহজাহানের চার পুত্র ছিলঃ **দারা, সুজা, ঔরঙ্গজীব** এবং **মোরাদ**। এঁদের মধ্যে ঔরঙ্গজীব ছিলেন সব চেয়ে বুদ্ধিমান ও কৌশলী। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বঞ্চিত করে সিংহাসন দখল করেন। দারা এবং মোরাদকে তিনি হত্যা করেন। সুজা আরাকানে পলায়ন করেন এবং সেখানেই মারা যান।

ঔরঙ্গজীব প্রায় ৫০ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বকালের প্রথম ভাগে প্রধান ঘটনা রাজপুতানায় বিদ্রোহ এবং দাক্ষিণাত্যে হিন্দুগৌরব ছত্রপতি শিবাজীর সঙ্গে যুদ্ধ; দ্বিতীয় ভাগে প্রধান ঘটনা দাক্ষিণাত্যে শিবাজীর বংশধরগণের সঙ্গে যুদ্ধ আর মুসলমান রাজ্য বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা-বিজয়। ঔরঙ্গজীবের রাজত্বে ভারতবর্ষে মুসলমান-সাম্রাজ্য সব চেয়ে বেশী বিস্তৃত হয়; আবার তাঁর সময়ই মোগল-সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়েছিল।

ঔরঙ্গজীব

ঔরঙ্গজীব অত্যন্ত সংকীর্ণচিত্ত, অনুদার এবং পরধর্মদ্বেষী ছিলেন। হিন্দুর উপর তিনি অবর্ণনীয় অনাচার করেছেন। তাঁর আদেশে শত শত হিন্দু মন্দির ভেঙ্গে ফেলে তার উপর মসজিদ নির্মাণ করা হয়। কাশীর বিখ্যাত বিশ্বনাথের মন্দির, মথুরার বিখ্যাত কেশবদেবের মন্দির তিনি ধ্বংস করেছিলেন। হিন্দুদের উপর তিনি আবার **জিজিয়া কর** বসান। ঔরঙ্গজীব পৃথিবীর কোন লোককে বিশ্বাস করতেন না।

ঔরঙ্গজীব অত্যন্ত সাদাসিধা জীবন যাপন করতেন এবং জীবনে কখনও মদ্য স্পর্শ করেন নি। কিন্তু সবাইকে তিনি অবিশ্বাস করতেন বলে কারও কাছ থেকে আন্তরিক সাহায্য পেতেন না। তাঁর ব্যবহার খারাপ ছিল, তাই দেশের নানাদিকে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। রাজপুত জাতি ও শিখ-সম্প্রদায় বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহ তিনি কতকটা দমন করেন বটে, কিন্তু মারাঠাবীর শিবাজীকে তিনি বশীভূত করতে পারেন নি। আকবর ছলে বলে কৌশলে মোগল-সাম্রাজ্য গঠন করেন, আর ঔরঙ্গজীব তা একরূপ ভেঙ্গে চুরমার করেন।

শিবাজী
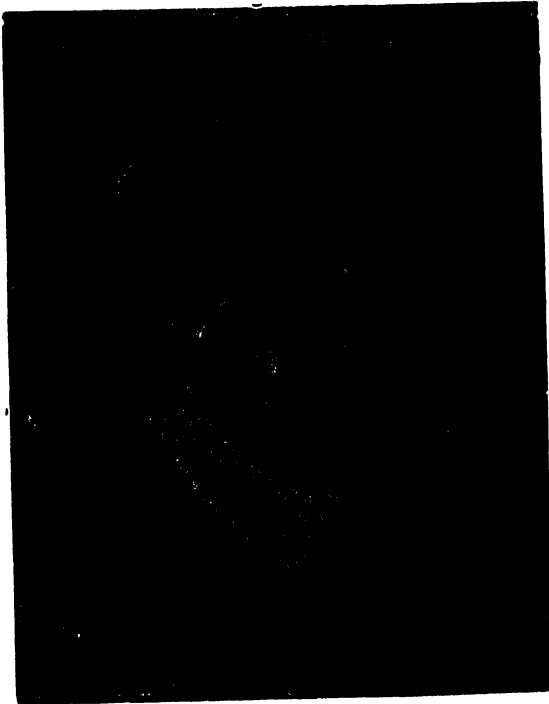
মারাঠা-শক্তির স্রষ্টা **শিবাজী** সুযোগ পেলেই ঔরঙ্গজীবের বিপুল সাম্রাজ্য আক্রমণ করে তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতেন। শিবাজীকে দমন করবার জন্যে ঔরঙ্গজীব তাঁর বিখ্যাত সেনাপতিদের দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করেন। তবু শিবাজীকে সম্পূর্ণ পরাজিত করা সম্ভব হয় না। ঔরঙ্গজীব তখন তাঁকে অভয় দিয়ে দিল্লীর দরবারে আমন্ত্রণ করেন। দরবারে উপস্থিত হওয়ার পর কিন্তু শিবাজীকে যথেষ্ট সম্মান দেখানো হয় না, উপরন্তু তাঁকে রাজপ্রাসাদে বন্দী করে রাখা হয়। শিবাজী কৌশলে, ফলের ঝুড়ির ভিতর লুকিয়ে, দিল্লী থেকে পলায়ন করেন। তারপর তিনি আরও পরাক্রমের সঙ্গে ঔরঙ্গজীবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। এবার ঔরঙ্গজীব তাঁকে আর কোনভাবেই কায়দা করতে পারলেন না।

শিবাজী

শিবাজী দাক্ষিণাত্যের বহু স্থান জয় করে স্বাধীন হিন্দু-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রায়গড়ে তাঁর রাজ্যাভিষেক হল; তিনি 'ছত্রপতি' ও 'গোব্রাহ্মণ প্রতিপালক' উপাধি গ্রহণ করলেন।

শিবাজী ছেলেবেলা থেকেই ভারতবর্ষে হিন্দু-রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন। তাঁরই উৎসাহে মারাঠা জাতি নবজীবন লাভ করে। তিনি মারাঠাদের এমন-ভাবে সংঘবদ্ধ করেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর একশো বছর পরেও, মারাঠারা ভারতের একটি বিরাট শক্তিরূপে পরিগণিত হয়।

হিন্দুযুগে বিষ্ণুমূর্তি

শিবাজী যে সাহস, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, কষ্টসহিষ্ণুতা ও সমর-কৌশল দেখিয়ে গিয়েছেন, তার তুলনা পাওয়া কঠিন। তাঁর উদারতাও অসাধারণ ছিল। ঔরঙ্গজীব সুযোগ পেলেই হিন্দুর মন্দির চূর্ণ করেছেন, কিন্তু শিবাজী কখনও মুসলমানের মসজিদ অপবিত্র করেন নি। নিজের ধর্মকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন, কিন্তু অপরের ধর্মকে তিনি কখনও ঘৃণা করেন নি।

শিবাজী বাহুবলে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হন নি, উন্নত শাসন-পদ্ধতি প্রবর্তন করে নবস্থাপিত রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করেছিলেন। প্রজার মঙ্গলসাধনই শিবাজীর রাজ্যশাসনের মূল লক্ষ্য ছিল। তিনি সমরবিভাগে সৈন্যদলের মধ্যে সর্ব-প্রকার শৃঙ্খলার প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর বৃহৎ নৌ-বহর ছিল।

শিবাজীর মাতৃভক্তি, হিন্দুধর্মে ঐকান্তিক শ্রদ্ধা, সাহস, বীরত্ব, উপস্থিত বুদ্ধি, নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা, নিয়মানুবর্তিতা, কষ্টসহিষ্ণুতা সবই অসাধারণ ছিল। তিনি একজন প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষরূপে হিন্দুর ঘরে ঘরে পূজা পেয়ে আসছেন।

মোগল-সাম্রাজ্যের পতন

ঔরঙ্গজীব পৃথিবীর কোন লোককে বিশ্বাস করতেন না বলে একা তাঁকে রাজ্যের সব দিকে নজর রাখতে হত। তাঁর অবর্তমানে যে এই বিশাল সাম্রাজ্য সুশৃঙ্খল ভাবে চালাতে পারে এমন কোন দ্বিতীয় লোক তিনি তৈরি করে যান নি। তাই তাঁর মৃত্যুর পর এত বড় সাম্রাজ্য সামলাবার উপযুক্ত লোক একজনও রইল না। অল্পদিনের মধ্যেই ঔরঙ্গজীবের বিশাল সাম্রাজ্য ধ্বংসের পথে অগ্রসর হল, চারদিকে বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহ দেখা দিল।
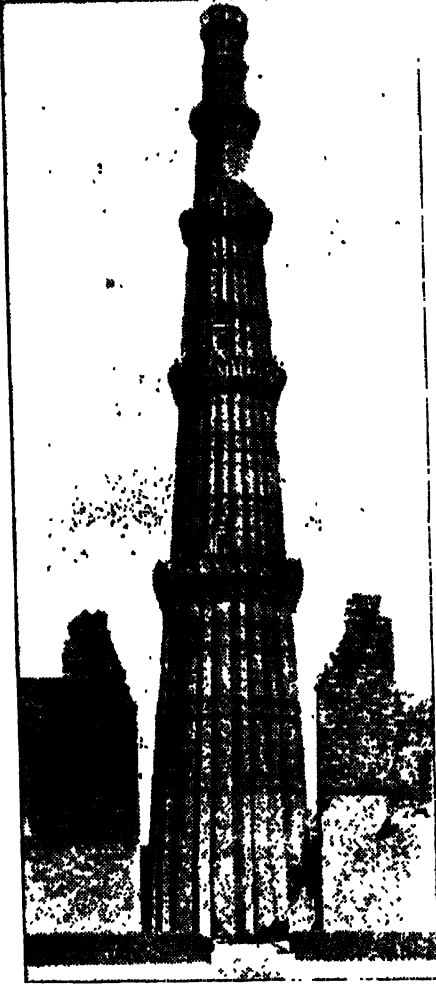
কুতুব মিনার

এই রকম বিশৃঙ্খল অবস্থা আরম্ভ হওয়ার পর, **আহম্মদ শাহ দুরানী** নামক একজন আফগান সেনাপতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তার পূর্বে পারস্যের (বর্তমান ইরানের) অধিপতি পরাক্রমশালী **নাদির শাহ** ভারত আক্রমণ করে অমানুষিক ভাবে দিল্লী নগরী লুণ্ঠন করেন। তাঁর নৃশংস অত্যাচারে দিল্লীর প্রতিটি রাজপথ রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল। এই আক্রমণেই মোগল-সাম্রাজ্যের দুর্বলতা স্পষ্টভাবে প্রকট হল। নাদির শাহের পর তাঁর সেনাপতি আহম্মদ শাহ দুরানী যখন ভারত আক্রমণ করলেন মারাঠারা তখন এদেশের শ্রেষ্ঠ শক্তি। পাণিপথের রণক্ষেত্রে মারাঠারা দুরানীর সম্মুখীন হল এবং তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে ভীষণভাবে পরাজিত হল।

মুসলমানদের সুদীর্ঘ শাসনকালে মুসলমানদের দ্বারা ভারতের উন্নতির কোনও উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টার কথা ইতিহাসে লেখা নেই। মন্দির ধ্বংস, হিন্দু পীড়ন, হিন্দু নারীকে ছলে বলে অন্তঃপুরবাসিনী করা, পাঠাগার দাহ,

লুণ্ঠন প্রভৃতির জন্য বিব্রত হয়ে হিন্দুরা আশা করেছিল, দেশে হিন্দুরাজত্বের প্রতিষ্ঠা হবে। কিন্তু ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে এই পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে ভারতে হিন্দু-রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশা শেষ হয়ে গেল। মোগল-সাম্রাজ্য আগেই ভেঙ্গে গিয়েছিল। এবার ভারতের ভাগ্যাকাশে উদিত হল **ইংরেজ**। তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধের চার বৎসর আগে ইংরেজরা বাংলাদেশে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করে ভারতবর্ষে রাজ্যবিস্তারের গোড়াপত্তন করে রেখেছিল।

১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে **ভাস্কো-দা-গামা** নামক জনৈক পোর্তুগিজ নাবিকের ভারতবর্ষে আগমন করার পর থেকে এদেশে বিভিন্ন ইওরোপীয় জাতিসমূহের বাণিজ্য বিস্তার আরম্ভ হয়। প্রথমে পোর্তুগিজ তারপরে যথাক্রমে ইংরেজ, ওলন্দাজ, দিনেমার ও ফরাসীগণ ভারতে এসে বাণিজ্য করার অভিপ্রায়ে নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়ে। আগমনকারী ইওরোপীয় জাতিদের মধ্যে ইংরেজ ও ফরাসী বাণিজ্য কোম্পানিদ্বয় ধীরে ধীরে প্রধান হয়ে ওঠে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ভারতে ইংরেজ ও ফরাসী কোম্পানির মধ্যে বাণিজ্যের জন্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হল; শীঘ্রই এই সংঘর্ষ এদেশে সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্যে পরস্পর দ্বন্দ্বে পরিণত হল। কূটনীতি-বিচক্ষণ ফরাসী নায়ক **ডুপ্লে** প্রথম ভারতে ফরাসী-সাম্রাজ্য স্থাপনের সংকল্প করেছিলেন এবং দাক্ষিণাত্যে তিনি এ উদ্দেশ্যে কতকটা সফলও হয়েছিলেন। কিন্তু নানাকারণে, বিশেষতঃ **ক্লাইভ** নামক একজন ইংরেজ সেনাপতির আবির্ভাবে ডুপ্লের স্বপ্ন ব্যর্থ হল। ক্রমে ভারতে ইংরেজের রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হল।

ইংরেজের অভ্যুদয়

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই দিন ইংরেজরা **পলাশীর যুদ্ধে** নবাব **সিরাজউদ্দৌলাকে** পরাজিত করে বাংলাদেশে নিজেদের প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় করে। ইংরেজরা এদেশে এসেছিল বাণিজ্য করতে, কিন্তু নানাকারণে অল্পদিনের মধ্যেই তাদের সঙ্গে সিরাজের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হল।

সিরাজের মতের বিরুদ্ধে ইংরেজরা কলকাতায় দুর্গ-নির্মাণ, বাণিজ্যসংক্রান্ত সুবিধাগুলির অপব্যবহার প্রভৃতি করায় নবাব অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে কলকাতা আক্রমণ করে নিজের হস্তগত করেন। ক্ষমতাদৃপ্ত ইংরেজ সেনানায়ক ক্লাইভের কাছে নবাবের স্বাধীন ব্যবহার অসহ্য হয়ে ওঠে। তিনি সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজেদের পছন্দমত একজন নবাবকে বাংলার

সিংহাসনে বসাবার জন্যে জোর চেষ্টা আরম্ভ করলেন। সিরাজের সেনাপতি **মীরজাফরকে** তিনি হাত করলেন। সিরাজের কয়েকজন মন্ত্রীও এই ষড়যন্ত্রের ভিতর ছিলেন।

সিরাজউদ্দৌলা

ক্লাইভ সুযোগ বুঝে ভাগীরথী-তীরে, পলাশীর প্রাঙ্গণে সৈন্য সমবেত করলেন। সিরাজও তাঁর সৈন্য নিয়ে এলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিরাজের সেনাপতি একপাশে সরে দাঁড়ালেন। অতর্কিতে তাঁর এই বিশ্বাসঘাতকতায় সিরাজ বুঝলেন জয়ের আশা নেই। তবুও তিনি এবং তাঁর **মোহনলাল** নামক একজন বীর সেনাপতি প্রাণপণে যুদ্ধ করলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সিরাজ পলায়ন করতে বাধ্য হলেন। ফলে ক্লাইভ এই যুদ্ধে সহজেই জয়লাভ করলেন। কতকটা মীরজাফরের সহায়তায়ই ক্লাইভের জয়লাভ সম্ভব হয় এবং ইংরেজরা বাংলাদেশে প্রভুত্ব লাভ করতে সমর্থ হয়। সিরাজ পরে ধরা পড়েন ও নিহত হন। মীরজাফর বাংলার নবাব হন, কিন্তু তাঁকে ইংরেজদের হাতের পুতুল হয়ে থাকতে হয়। ক্লাইভ নিজেই নবাবের নামে বাংলাদেশ শাসন করতে আরম্ভ করলেন।
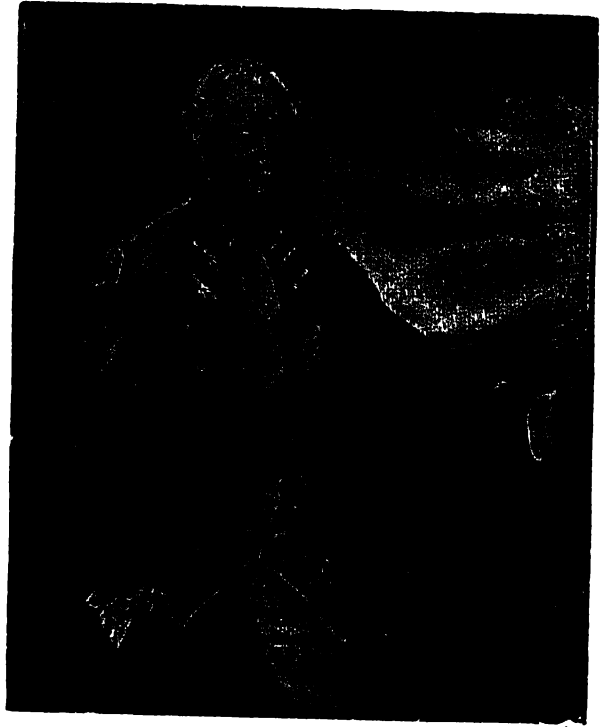
ক্লাইভ

পলাশীর যুদ্ধের ফলে বাংলার সম্পদ ইংরেজদের হস্তগত হওয়ায় তারা দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করতে সমর্থ হল। ভারতে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা পলাশীর যুদ্ধের পরোক্ষ ফল।

মীরজাফরের পরবর্তী নবাব মীরকাসিমের বিরুদ্ধে ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে **বক্সারের যুদ্ধে** জয়লাভ করে ইংরেজশক্তি পূর্ব ও উত্তর-ভারতে কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করল। এরপর বাংলার নবাবের যতটুকু ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছিল তা-ও লোপ পেল।

ওয়ারেন হেস্টিংস

ক্লাইভের কিছু পরে **ওয়ারেন হেস্টিংস** বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। প্রথমে তাঁর উপাধি ছিল 'গভর্নর'; ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ হতে রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুসারে তিনি 'গভর্নর-জেনারেল' বা বড়লাট আখ্যা লাভ করেন।

ওয়ারেন হেস্টিংস

ক্লাইভ ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্বের গোড়াপত্তন করেন। **ওয়ারেন হেস্টিংস** শাসনপদ্ধতি সংস্কার করবার এবং সরকারী কোষাগারের অর্থাভাব দূর করবার চেস্টা করেন; কিন্তু এইসব ব্যাপারে হেস্টিংস সব সময়ে সদুপায় অবলম্বন করেন নি।
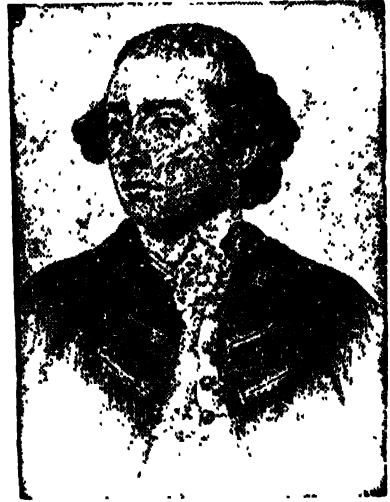
বারাণসীর রাজা চৈৎসিংহ এবং অযোধ্যার বেগমদের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে এবং বলপূর্বক তিনি বহু অর্থ আদায় করেন। তা ছাড়া তিনি নিজে চল্লিশ লক্ষ টাকা ঘুষ নিয়েছেন বলেও অভিযোগ ওঠে। মহারাজা নন্দকুমার (১৭০৪-১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ) এই ঘুষের অভিযোগ আনেন এবং প্রমাণ-স্বরূপ, শাসনপরিষদের কাছে লিখিত দলিলপত্র দাখিল করেন। হেস্টিংস কিছুতেই নন্দকুমারের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারলেন না। অবশেষে তিনি মোহনপ্রসাদ নামে এক ব্যক্তিকে দিয়ে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে এক দলিল জাল করার মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করান। সুপ্রিম কোর্টে নন্দকুমারের বিচার হয়। সার ইলাইজা ইম্পে ছিলেন তখন বিচারপতি। বিচারে অন্যায়ভাবে **নন্দকুমারের ফাঁসি** হয়।
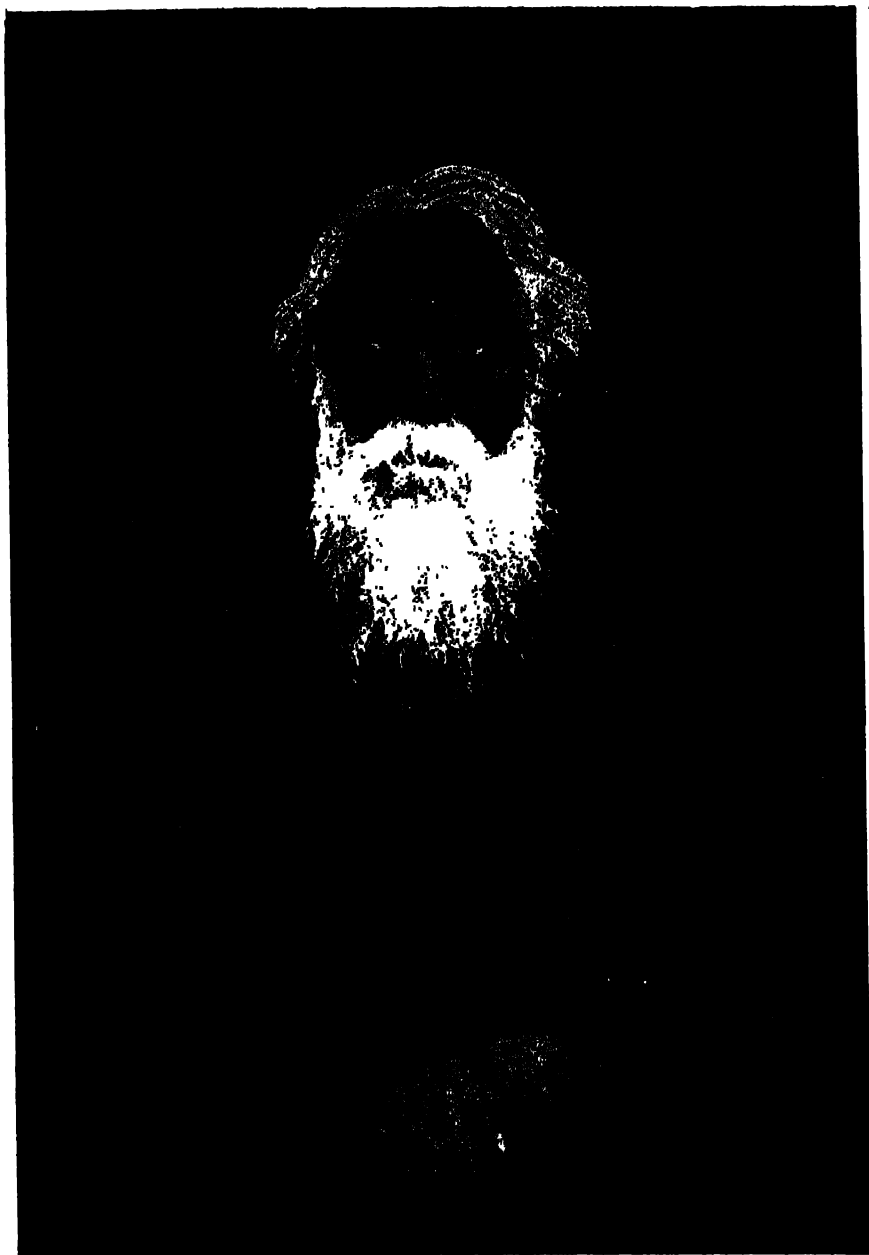
ভারতীয় সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জাতীয়তার এক বিস্ময়কর নবযুগের প্রবর্তন করেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই প্রাণদণ্ডের মূলে হেস্টিংস ছিলেন বলেই ঐতিহাসিকদের অভিমত। হেস্টিংসের কার্যকলাপে **বাগ্মী বার্ক** প্রমুখ রাজনীতিজ্ঞরা বিলাতে প্রবল আন্দোলন করেন। তিনি পদত্যাগ করে দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হন।

হেস্টিংসের ব্যবস্থায় ইংরেজ কোম্পানি ভারতে সাক্ষাৎভাবে দেশশাসনের ভার গ্রহণ করে। ভারতে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য-সংস্থাপকগণের মধ্যে হেস্টিংস শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী। আভ্যন্তরীণ শাসনকার্যে ও পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনায় তাঁর অসামান্য দক্ষতা ছিল; তবে তাঁর অনুষ্ঠিত কতকগুলি কাজ নিন্দনীয় এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ওয়েলেসলি

ওয়ারেন হেস্টিংসের পর শাসনকর্তাদের মধ্যে **লর্ড কর্নওয়ালিসের** শাসনকাল ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত **চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত** প্রবর্তনের জন্যে প্রসিদ্ধ। এই বন্দোবস্তের ফলে বাংলাদেশে একটি প্রভাবশালী জমিদারশ্রেণী এবং সমৃদ্ধ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়েছিল।

কর্নওয়ালিস

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য বিস্তারে সব চেয়ে বেশী মন দেন **লর্ড ওয়েলেসলি**। তিনি তখনকার মহীশূর, অযোধ্যা, গোয়ালিয়র প্রভৃতি রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাদের ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেন। তাঞ্জোর, কর্নাট, সুরাট প্রভৃতি তিনি খাস ব্রিটিশ এলাকাভুক্ত করে নেন। হায়দরাবাদের **নিজাম** বিনা যুদ্ধেই বশ্যতা স্বীকার করেন। মহীশূরের **টিপু সুলতানকে** এবং মারাঠা রাজ্যগুলোকে পরাজিত করতেই ওয়েলেসলিকে সব চেয়ে বেশী বেগ পেতে হয়েছিল। এই সব রাজ্যজয় সম্ভব হয়েছিল তাদের নিজেদের মধ্যে একতার অভাবে। একের বিপদে অপরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকত, প্রতিবেশী রাজ্যকে কোন সাহায্য করত না। তারপরেই আসত তার নিজের পালা। ওয়েলেসলির সঙ্গে মারাঠাদের সব চেয়ে বড় যে যুদ্ধ হয়েছিল, তার নাম **আসাই'র যুদ্ধ,**—তাতে হোলকার ছিলেন নিরপেক্ষ; কিন্তু তিনিও শেষ পর্যন্ত রেহাই পেলেন না। ব্রিটিশ সৈন্যের হাতে পরাজিত হয়ে তাঁকে পলায়ন করতে হল।

ওয়েলেসলি যে সব রাজ্যকে সম্পূর্ণ গ্রাস করেন নি, তাদের সঙ্গে তিনি সন্ধি করেন। এই সন্ধিকে বলা হয় **"অধীনতামূলক মিত্রতা"**। এই অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি যে রাজ্য গ্রহণ করত, তাকে নিজের রাজ্যে, নিজের খরচে একদল ব্রিটিশ সৈন্য রাখতে হত, ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের বিনা অনুমতিতে বাইরের কোন দেশের সঙ্গে তারা সন্ধি করতে পারত না। এই নীতির আশ্রিত নৃপতিদের নানাপ্রকারে নিজেদের স্বাধীনতা খর্ব করতে হয়েছিল। ইংলণ্ডে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষ ভারতবর্ষে রাজ্যবিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন না, সে কারণে নির্দিষ্ট সময় শেষ হওয়ার আগেই ওয়েলেসলিকে বড়লাটের পদ থেকে অপসারিত করা হয়।

ওয়েলেসলি

ইওরোপে ফরাসী-বিপ্লবীদের ও নেপোলিয়নের আধিপত্যের সময় ওয়েলেসলি ভারতে ফরাসী-প্রভাব বিনষ্ট করেছিলেন। তিনি ইংরেজ কোম্পানিকে ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করেছিলেন এবং ব্রিটিশ প্রভুত্ব সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

লর্ড হেস্টিংস নামক একজন বড়লাট লর্ড ওয়েলেসলির অসমাপ্ত কার্য সম্পূর্ণ করেছিলেন। তিনি মারাঠা-নায়কদের শক্তি সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে দেন। হেস্টিংসের কিছু পরে **লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক** বড়লাট হন। তাঁর শাসনকাল নানাবিধ সমাজ-সংস্কারের জন্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তাঁর সময়ে ভারতে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রচলন হয়। এ-বিষয়ে তাঁর প্রধান সমর্থক ছিলেন খ্যাতনামা **মেকলে** এবং রাজা **রামমোহন রায়**।

রাজা রামমোহন রায়

প্রথম লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসনকালে **প্রথম শিখ-যুদ্ধ** হয়েছিল। মারাঠা-সাম্রাজ্যের প্রথম দিকের পেশোয়াদের ন্যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পঞ্জাবে মহারাজা রণজিৎ সিংহ অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। তিনি বিভিন্ন শিখ-রাজ্য সম্মিলিত করে বিস্তৃত পরাক্রান্ত রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। রণজিৎ

সিংহের মৃত্যুর পর শিখ-রাজ্যে দারুণ গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হল। হার্ডিঞ্জের সময় শিখদের সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে শিখরা হেরে যাওয়ায় পঞ্জাব প্রকৃতপক্ষে কোম্পানির আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হল।

সিপাহী-বিদ্রোহ

ওয়েলেসলির স্থায় সাম্রাজ্যবাদী আর একজন বড়লাট লর্ড ডালহৌসী আক্রমণাত্মক যুদ্ধ, কুখ্যাত **স্বত্বলোপ নীতির** প্রয়োগ এবং আরও অন্য উপায়ে কোম্পানির রাজ্য চারিদিকে বিস্তৃত করেছিলেন। এজন্যে এবং অন্যান্য কতকগুলি কারণে দেশের সর্বত্র একটা ঘোর অশান্তির ভাব বিরাজিত ছিল। এই সময়ে ইংরেজরা সৈন্যদলে এনফিল্ড-রাইফেল নামক উন্নত ধরনের বন্দুকের ব্যবহার আরম্ভ করে। এই রাইফেলে টোটা ভরবার সময় সেটা দাঁত দিয়ে কেটে নিতে হত। সৈন্যদের মধ্যে গুজব রটে গেল যে, হিন্দু ও মুসলমানের জাত নষ্ট করবার জন্যে, খ্রীষ্টান সাহেবেরা এই টোটায় গরু ও শূকরের চর্বি মিশিয়ে দিয়েছে।

গুজব রটবার সঙ্গে সঙ্গে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ বারাকপুরের সৈন্যেরা বিদ্রোহী হয়ে তাদের সেনাপতিকে হত্যা করল। মীরাট এবং লক্ষ্ণৌতেও বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল। সেখানকার বিদ্রোহী সৈন্যেরা শহরের ইওরোপীয়দের হত্যা করে দিল্লীতে উপস্থিত হল। আরও কয়েক দল বিদ্রোহী দিল্লীতে আসবার পর, তারা শেষ মোগল বাদশাহ **বাহাদুর শাহকে** (দ্বিতীয়) ভারতের সম্রাট্ বলে ঘোষণা করে দিল। দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, বেরিলী ও ঝাঁসী বিদ্রোহীদের প্রধান প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠল। এই সব স্থানেই অনেক ইওরোপীয় নরনারীকে বিদ্রোহীরা হত্যা করে।

টিপু সুলতান

বিদ্রোহের প্রথম দিকে ইংরেজরা সুবিধা করতে পারে নি; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তারাও সৈন্য সংগ্রহ করে বিদ্রোহ দমনে মন দিল। এই সময় বিদ্রোহী নায়কদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বীরত্বের পরিচয় দেন

ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ। লর্ড ডালহৌসী বলপূর্বক ঝাঁসীর রাজার মৃত্যুর পর, ঐ রাজ্য ইংরেজের খাস অধিকারভুক্ত করে নিয়েছিলেন। এতে ঝাঁসীর বিধবা রানী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং স্বামীর রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্যে তিনি বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেন। তাঁর বয়স তখন মাত্র কুড়ি বৎসর।

ঝাঁসীতে বিদ্রোহ দমন করবার জন্যে ইংরেজরা যখন আসে, রানী লক্ষ্মীবাঈ তখন পুরুষের বেশে, উন্মুক্ত তরবারি হস্তে যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জন দেন। বিদ্রোহের অপর দুই নেতা ছিলেন নানা সাহেব ও তাঁতিয়া তোপি। নানা সাহেব পলায়ন করেছিলেন। তাঁতিয়া তোপি ঝাঁসীর বিদ্রোহে ধরা পড়েন, তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়। বাদশাহ বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হল। সিপাহী-বিদ্রোহে শিখেরা ইংরেজকে সাহায্য করেছিল।

সিপাহী-বিদ্রোহের ফলে ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বের অবসান হল। ইংলণ্ডের রানী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করলেন। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের বনিয়াদ এতদিনে সুদৃঢ় হল।

বঙ্গভঙ্গ

সিপাহী-বিদ্রোহের পর লর্ড কার্জনের আমল পর্যন্ত, দেশে আর বিশেষ কোন গোলযোগ হয় নি। ভারতবর্ষের উপর ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের কর্তৃত্ব ক্রমেই দৃঢ়বদ্ধ হতে থাকে। ইংলণ্ডের খ্যাতনামা সাম্রাজ্যবাদী প্রধানমন্ত্রী ডিজরেলির নির্দেশে ভারতের বড়লাট লর্ড লিটন ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে এক বিরাট দরবার করে রানী ভিক্টোরিয়ার "ভারত-সম্রাজ্ঞী" উপাধি ঘোষণা করেন। লর্ড লিটনের পরবর্তী বড়লাট লর্ড রিপন ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন; তাই তাঁর শাসনকাল সংস্কারের যুগরূপে স্মরণীয় হয়ে আছে।

লর্ড কার্জন ১৮৯৯-১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এদেশে বড়লাট ছিলেন। শাসন-কার্যে, রাজনৈতিক জ্ঞানে ও বিদ্যাবত্তায় তিনি অসামান্য পারদর্শী ছিলেন। আফগানিস্তান, ইরান এবং তিব্বতে রাশিয়ার প্রভাববৃদ্ধি রোধ করবার উদ্দেশ্যে তিনি নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু কার্জন তাঁর একটা কার্যের জন্যে ভারতবাসীর অপ্রিয়ভাজন হয়েছিলেন।

কার্জন শাসনের সুবিধার জন্যে বাংলাদেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন (১৯০৫ খ্রীঃ)। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা তখন এক প্রদেশ ছিল। কার্জন পশ্চিম

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা সম্মিলিত করে একটি প্রদেশে পরিণত করলেন,—এর নাম হল বাংলাদেশ ; আর পূর্ব ও উত্তর বাংলা আসামের সঙ্গে যুক্ত করে পূর্ব বাংলা ও আসাম নামক নতুন প্রদেশ গঠিত হল। এই ব্যবস্থায় বাঙ্গালীরা ঘোর আপত্তি করে। দেশময় তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হয়। **বারীন্দ্র ঘোষ** প্রভৃতির নেতৃত্বে দেশে বৈপ্লবিক আন্দোলন শুরু হয়। দেশের অনেক জায়গায় বহু গুপ্ত সমিতি গড়ে ওঠে এবং অনেক রাজ-কর্মচারী নিহত হন। বাংলাদেশের সব লোক তখন ব্রিটিশ পণ্য বর্জন করে ব্রিটিশের অর্থনৈতিক বনিয়াদের মূলে তীব্র কুঠারাঘাত করে।

ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন—ত্রিমূর্তি

১৯০৪-১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের রুশ-জাপান যুদ্ধে ক্ষুদ্র দেশ জাপানের গৌরব-জনক জয়লাভে এশিয়ার অনেক লোক, বিশেষ করে বাংলাদেশের বিপ্লবীরা তাঁদের কাজে খুব উৎসাহ বোধ করেন। ক্রমে বাংলাদেশের বৈপ্লবিক আন্দোলন পঞ্জাব, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি ভারতের অন্যান্য স্থানেও ছড়িয়ে পড়ে। এই আন্দোলনই আজও **স্বদেশী-আন্দোলন** নামে বিখ্যাত হয়ে

রয়েছে। এই সময়ে ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে, দেশে কাপড় প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য তৈরির জন্যে অনেক কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। নতুন নতুন ব্যাঙ্ক গড়ে ওঠে। 'বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল' এবং 'বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক' এই সময় প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশের এই স্বদেশী-আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে **সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ,** ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, কালী-

হিন্দুযুগে মাদুরার একটি মন্দির

প্রসন্ন কাব্য-বিশারদ, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তীব্র আন্দোলনের পর ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ-বিভাগ রহিত হয়। এই সময় ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হয়।

স্বদেশী-আন্দোলনের ফলে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের শাসন-পদ্ধতির খানিকটা সংস্কার সাধিত হল। ভারতের ব্যবস্থা-পরিষদগুলোতে বে-সরকারী সদস্যের সংখ্যা কিছু বাড়ল এবং বড়লাটের শাসন-পরিষদে ভারতীয় সদস্য

নিযুক্ত করবার ব্যবস্থা হল। এই শাসন-সংস্কার **মর্লি-মিণ্টো সংস্কার** নামে পরিচিত। **মর্লি** ছিলেন ভারত-সচিব এবং **মিণ্টো** ছিলেন তখনকার বড়লাট। এই সংস্কারে ভারতকে বিশেষ কিছু রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হয় নি বলে প্রগতিশীল রাজনৈতিকগণ এতে মোটেই সন্তুষ্ট হলেন না। এই সংস্কারের একটা বড় দোষ এই যে, এতেই প্রথম সাম্প্রদায়িক নির্বাচন-প্রথা প্রবর্তিত হল। হিন্দুদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা দেখে তাদের বিরুদ্ধে অনগ্রসর মুসলমান সম্প্রদায়কে সংঘবদ্ধ করবার জন্যেই এই প্রথার প্রবর্তন করা হয়।

বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে বিনষ্ট করার অভিপ্রায়ে ইংরেজ গবর্নমেণ্ট অতিশয় উৎপীড়ন ও দমন-নীতি অবলম্বন করেছিল। বিপ্লবী যুবকগণ তাতে একটুও বিচলিত হন নি, নির্ভয়ে দেশের জন্যে তাঁরা চরম নির্যাতন বরণ করে নিয়েছিলেন। এই সময়ে **কানাইলাল, ক্ষুদিরাম** প্রভৃতি নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক তরুণ বিপ্লবীরা হাসিমুখে ফাঁসিকাঠে নিজেদের জীবন বলি দিয়েছিলেন। স্বদেশী-আন্দোলনের প্রবলতার সময় ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের মধ্যে নরমপন্থী ও চরমপন্থী দুই দলের সৃষ্টি হয়েছিল।

মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার

বঙ্গভঙ্গ রহিত হবার পর, স্বদেশী-আন্দোলন থেমে গেল বটে, কিন্তু দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন চলতে লাগল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতের মধ্যে নানাকারণে আন্দোলন তীব্রভাবে চলতে পারে নি; অবশ্য বিপ্লবীরা কঠোর দমন-নীতি সত্ত্বেও ঘরে-বাইরে বিপুল বাধার বিরুদ্ধে তাঁদের কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে লাগলেন। জার্মেনীতে ভারতীয় বিপ্লবীরা ষড়যন্ত্র-দল গড়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। যুদ্ধকালে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতবাসীকে অনেকবার স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু কার্যকালে যে অধিকার ভারতকে দেওয়া হল তাতে কংগ্রেসের প্রগতিশীল নেতারা কেউই সন্তুষ্ট হলেন না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে ভারতবর্ষের শাসন-পদ্ধতির আরও কিছু পরিবর্তন সাধিত হল। এই শাসন-সংস্কার, **মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার** নামে পরিচিত। **মণ্টেগু** ছিলেন ভারত-সচিব, আর **চেমসফোর্ড** ছিলেন তখনকার বড়লাট। এই শাসন-সংস্কারের ফলে, ভারতবর্ষের প্রদেশগুলোর ব্যবস্থা-পরিষদ-

সাহস, বীরত্ব ও স্বাদেশিকতার দ্বারা সাম্রাজ্যবাদীদের ত্রাসিত করে ভারতের স্বাধীনতার পথ সুগম করে দিয়েছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু
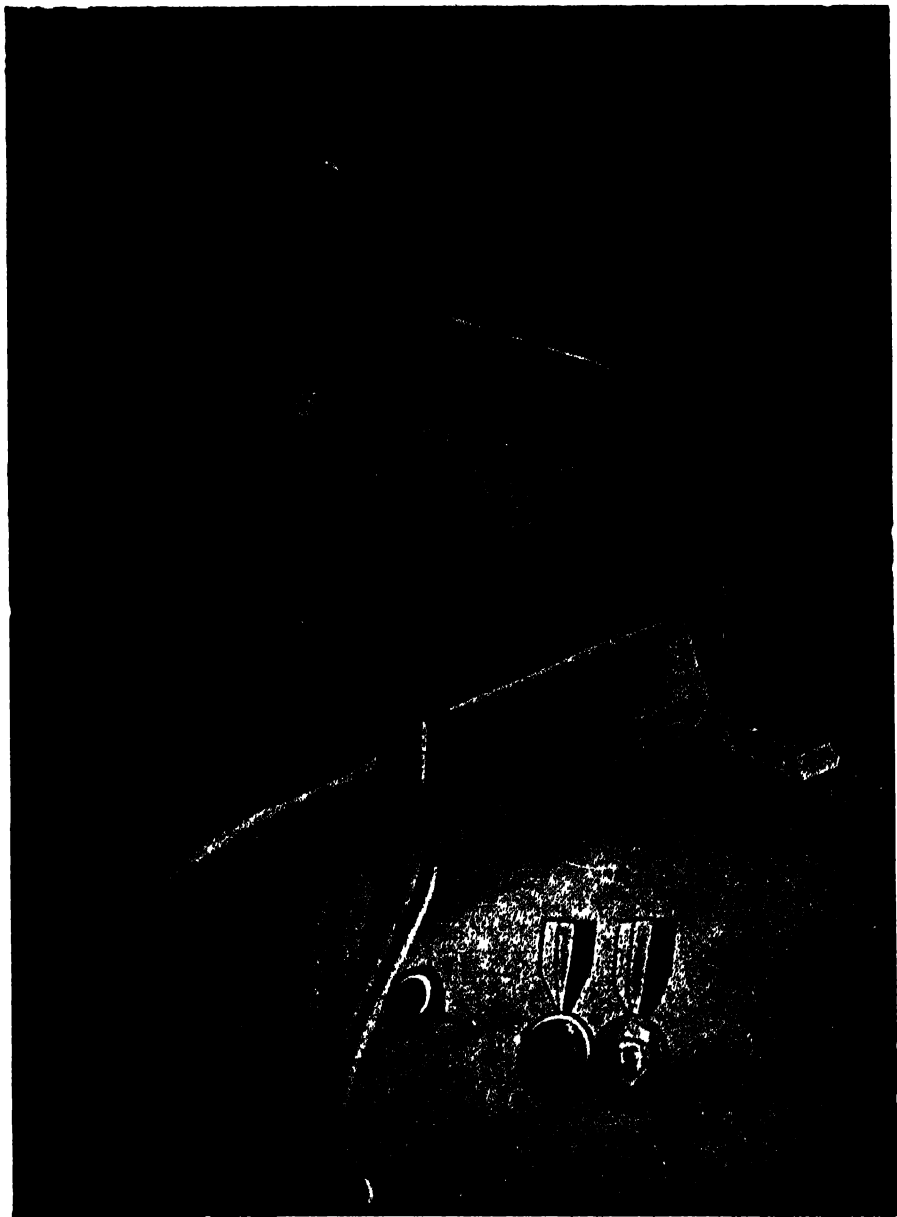
সমূহে, বে-সরকারী সদস্যেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন প্রভৃতি কয়েকটি বিভাগের ভার মন্ত্রীদের হাতে দেওয়া হয়, কিন্তু পুলিস, অর্থ, বিচার প্রভৃতি প্রধান বিভাগগুলো গভর্নরের হাতেই রাখা হয়। গভর্নরের একটি শাসন-পরিষদ গড়ে দেওয়া হয়; এই শাসন-পরিষদের সদস্যদের সাহায্যে, তিনি ঐ সব বিভাগের কাজ চালাতেন।

গভর্নরের নিজের হাতের বিভাগগুলিকে বলা হত 'সংরক্ষিত বিভাগ' আর মন্ত্রীদের হাতের গুলোকে বলা হত 'হস্তান্তরিত বিভাগ'। অর্থ-বিভাগের উপরে মন্ত্রীদের কোন হাতই ছিল না; এই কারণে তাঁরা টাকার অভাবে নিজেদের বিভাগের কোন উন্নতি করতে পারতেন না। কংগ্রেস এই শাসন-সংস্কার গ্রহণ করতে মোটেই রাজী হল না; রাজনৈতিক আন্দোলন সমানেই চলতে লাগল।

কংগ্রেস

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা বুঝতে হলে কংগ্রেসের কথা জানা দরকার। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কলকাতায়, কলেজ স্ট্রীটের একটি বাড়িতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন মিলে 'ভারত-সভা' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। এই সমিতির লোকেরা ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে বক্তৃতা করে বেড়াতেন। ভারতবর্ষে সংঘবদ্ধভাবে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের এইটিই প্রথম প্রচেষ্টা। এই ভারত-সভাই কালে রূপান্তরিত হয়ে বর্তমান কংগ্রেসে পরিণত হয়।

শ্রীঅরবিন্দ

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে, বোম্বাই শহরে, কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। তারপর থেকে প্রতি বৎসর কংগ্রেসের অধিবেশন হয়ে আসছে। প্রথম কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন একজন বাঙ্গালী, তাঁর নাম উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমে কংগ্রেসের নীতি ছিল ভারতবর্ষের শাসন-পদ্ধতি সংস্কার করবার জন্যে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে অনুরোধ জানিয়ে আবেদন পাঠানো। প্রথমদিকের কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, লর্ড সিংহ, আনন্দমোহন

বসু, গোপালকৃষ্ণ গোখলে ও লোকমান্য **তিলকের** নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে কুখ্যাত রাওলাত আইন ও জালিয়ানওয়ালাবাগের অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের পর, ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে **মহাত্মা গান্ধী** সর্বপ্রথম ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কাছ থেকে শাসন-সংস্কার আদায় করবার জন্যে, ব্যাপক সংগ্রাম আরম্ভ করেন। এই বৎসর কলকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন হয় এবং তাতে অসহযোগের প্রস্তাব পাস হয়। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে এই **অসহযোগ-আন্দোলন** আরম্ভ হয়। এই আন্দোলনের অর্থ, গভর্নমেন্টের সঙ্গে সব রকমে অসহযোগ, অর্থাৎ আইন-আদালত, সরকারী স্কুল-কলেজ প্রভৃতি বর্জন করা। দেশব্যাপী সভা-সমিতির অনুষ্ঠান করে এই আন্দোলন আরম্ভ হল।

মহাত্মা গান্ধী

বাংলাদেশের বিখ্যাত ব্যারিস্টার **চিত্তরঞ্জন দাশ** এবং **যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত** আইন-ব্যবসায় ত্যাগ করে এই আন্দোলনে যোগ দেন। আই-সি-এস পাস করেও চাকরি না নিয়ে **সুভাষচন্দ্র বসুও** এসে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। বিলাতী পণ্য ও মদের দোকানে পিকেটিং করে দলে দলে লোক জেলে গেল। বাংলাদেশে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন চিত্তরঞ্জন দাশ। জনসাধারণ তাঁকে **"দেশবন্ধু"** উপাধিতে ভূষিত করে। দেশবন্ধুর পত্নী শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী এবং ভগিনী শ্রীমতী ঊর্মিলা দেবীও এই আন্দোলনে পুলিস-কর্তৃক গ্রেফতার হয়েছিলেন। কিছুদিন খুব জোরের সঙ্গে চলবার পরে এই আন্দোলন থেমে গেল। স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যান্য দিকের মতো অসহযোগ-আন্দোলন সবচেয়ে বেশী তীব্র হয়েছিল বাংলাদেশে।

অসহযোগ আন্দোলন থামল বটে, কিন্তু কংগ্রেস প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ ত্যাগ করল না। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কাছে ভারতবর্ষের **পূর্ণ স্বাধীনতা** দাবি করল। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্লবীরা চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করলেন। ঐ বৎসরই দেশে আবার ব্যাপক আন্দোলন আরম্ভ হল। এবার শুরু হল

দেশের সর্বত্র **লবণ-আইন অমান্য**। মহাত্মা গান্ধী এবারও আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। বারদৌলি-তালুকে সর্দার **বল্লভভাই প্যাটেলের** নেতৃত্বে প্রজারা সরকারকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করল। এই আন্দোলন এমন তীব্র আকার ধারণ করল যে, ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে বড়লাট **লর্ড আরউইন** মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হলেন।

লণ্ডনে তখন ভারতবর্ষের শাসন-পদ্ধতি সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্যে এক **গোলটেবিল বৈঠক** চলছিল। মহাত্মা গান্ধী লর্ড আরউইনের সঙ্গে সন্ধির পর লণ্ডনে গিয়ে সেই বৈঠকে যোগ দিলেন। বৈঠকের আলোচনা থেকে তিনি বুঝতে পারলেন যে, এর ফলে ভারতবর্ষের কোন লাভ হবে না। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতবর্ষকে কিছুতেই স্বাধীনতা দেবে না। তাই তিনি দেশে ফেরবার সঙ্গে সঙ্গে আবার আন্দোলন আরম্ভ হল।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

লর্ড আরউইনের কার্যকাল শেষ হয়ে যাওয়ায় তিনি দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। তাঁর জায়গায় এসেছিলেন **লর্ড উইলিংডন**। তিনি আন্দোলন বন্ধ করবার জন্যে, কঠোর হস্তে দমন-নীতি প্রয়োগ করলেন। প্রায় দুই বৎসর তুমুল আন্দোলন চলবার পর দেশ আবার শান্ত হল।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত-শাসন আইন

ইতিমধ্যে গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনার ফলে, ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে নতুন ভারত-শাসন আইন রচিত হল এবং পার্লামেণ্টে পাসও হয়ে গেল। এই আইনে ভারতবর্ষকে এগারোটি প্রদেশের এবং দেশীয় রাজ্যের এক যুক্ত-রাষ্ট্রে পরিণত করার ব্যবস্থা হল। ঠিক হল যে, প্রদেশগুলিতে একটি করে ব্যবস্থা-পরিষদ থাকবে এবং প্রত্যেক গভর্নরের একটি করে মন্ত্রিসভা থাকবে। এই মন্ত্রীরা তাঁদের সমস্ত কাজের জন্য ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন। ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যেরা জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হবেন।

কিন্তু এই নির্বাচন সম্পর্কে এই ব্যবস্থা করা হল যে, মুসলমানের ভোটে মুসলমান, শিখের ভোটে শিখ, ইওরোপীয়ানের ভোটে ইওরোপীয়ান, খ্রীস্টানের ভোটে খ্রীস্টান, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের ভোটে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, এবং অবশিষ্ট সকলের ভোটে হিন্দু প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন। তা ছাড়া, ব্যবস্থা-পরিষদগুলোতে মুসলমানদের প্রাপ্যের অতিরিক্ত কিছু বেশী আসন দেওয়া হল। অতএব এই শাসনতন্ত্র রচিত হল **সাম্প্রদায়িক** ভিত্তিতে। কেন্দ্রীয় শাসনের যে বন্দোবস্ত এই আইনে করা হয়েছিল, কংগ্রেসের আপত্তিতে তা কার্যকরী করা হয় নি।

কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব-গ্রহণ

এই নতুন আইন অনুসারে প্রথম নির্বাচনেই কংগ্রেস বোম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ (বর্তমান উত্তরপ্রদেশ), বিহার ও উড়িষ্যার ব্যবস্থা-পরিষদের অধিকাংশ আসন দখল করে। তারপর কংগ্রেস এই ছয়টি প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করে। সীমান্তপ্রদেশ এবং আসামেও কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এই কয়টি প্রদেশে কংগ্রেসের উদ্যোগে জনসাধারণের সুবিধাজনক অনেক ভাল ভাল আইন পাস হয়। জমিদার ও মহাজনের অত্যাচার থেকে প্রজারা অনেকাংশে অব্যাহতি পায়। পুলিসের উপদ্রবও অনেক কমে যায়। লোকে যাতে সুবিচার পায়, কংগ্রেসী মন্ত্রীরা সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন।

বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমান সদস্য, ইওরোপীয়দের সহায়তায় মন্ত্রিসভা গঠন করেন। মৌলবী ফজলুল হক তার মুখ্যমন্ত্রী হন।

১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ** শুরু হওয়ায় কংগ্রেস স্থির করে যে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যুদ্ধের পর ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবে, এই কথা ঘোষণা না করলে তারা যুদ্ধে সাহায্য করবে না। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট এরকম কোন ঘোষণা করতে রাজী হল না। ফলে আটটি প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করল। একমাত্র আসামে মুসলিম-লীগ সদস্য সার মহম্মদ সাদুল্লা কংগ্রেসকে বাদ দিয়েই মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারলেন। অবশিষ্ট সাতটি প্রদেশে গভর্নরেরা দেশের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করলেন।

এরপর আবার মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ‘সত্যাগ্রহ’ শুরু হল। অন্যান্য লোকের সঙ্গে প্রাক্তন কংগ্রেসী মন্ত্রীরাও জেলে আবদ্ধ হলেন।

বাংলাদেশ

সিপাহী-বিদ্রোহের সূত্রপাত হয় বাংলাদেশে। বৈপ্লবিক আন্দোলনের আরম্ভও এই বাংলায়। কংগ্রেসের অধিবেশনগুলির মধ্যে অধিকাংশেরই সভাপতির আসন গ্রহণ করেছেন বাঙ্গালী।

জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ধর্মচর্চাতেও বাংলাদেশ অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে অনেক অগ্রসর। চৈতন্যদেব বৈষ্ণব ধর্ম এবং রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্ম ধর্ম প্রবর্তন করেন। চৈতন্যদেব মহাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর প্রবর্তিত প্রেমের ধর্ম আজও বাঙ্গালীর চিত্তকে ভক্তি-রসে আপ্লুত করে। রাজা রামমোহন রায় বাঙ্গালীকে সংঘবদ্ধ করে তাকে শক্তিমান জাতিতে গড়ে তোলবার জন্যে একশ' বছরেরও বেশী আগে চেষ্টা করে গিয়েছেন।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

পাশ্চাত্য সভ্যতা ভারতে এসে পৌঁছলে বাঙ্গালীই প্রথম তার বৈশিষ্ট্যগুলি উপলব্ধি করে তখনকার দেশের সামাজিক ও অন্যান্য ত্রুটিসমূহ সংস্কারে অগ্রণী হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর নতুন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ভারতবর্ষে বাঙ্গালীর মনকেই প্রথম আন্দোলিত করে। বর্তমান যুগে ভারতবাসীর নবজাগরণের পথ-প্রদর্শক বাঙ্গালী।

বাংলার কবি অসামান্য প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বলে সর্বত্র সম্মান পেয়েছেন। সাধকশ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণ পরমহংস, দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু [ইনিই প্রকৃত বেতার-যন্ত্রের উদ্ভাবক] ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শিক্ষাব্রতী সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, যুগনেতা বিবেকানন্দ, সংস্কারক কেশবচন্দ্র সেন, বাগ্মীশ্রেষ্ঠ বিপিনচন্দ্র পাল, দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঐতিহাসিক রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুনাথ সরকার এবং রমেশচন্দ্র মজুমদার, কবি চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, চিকিৎসক বিধানচন্দ্র রায় ও
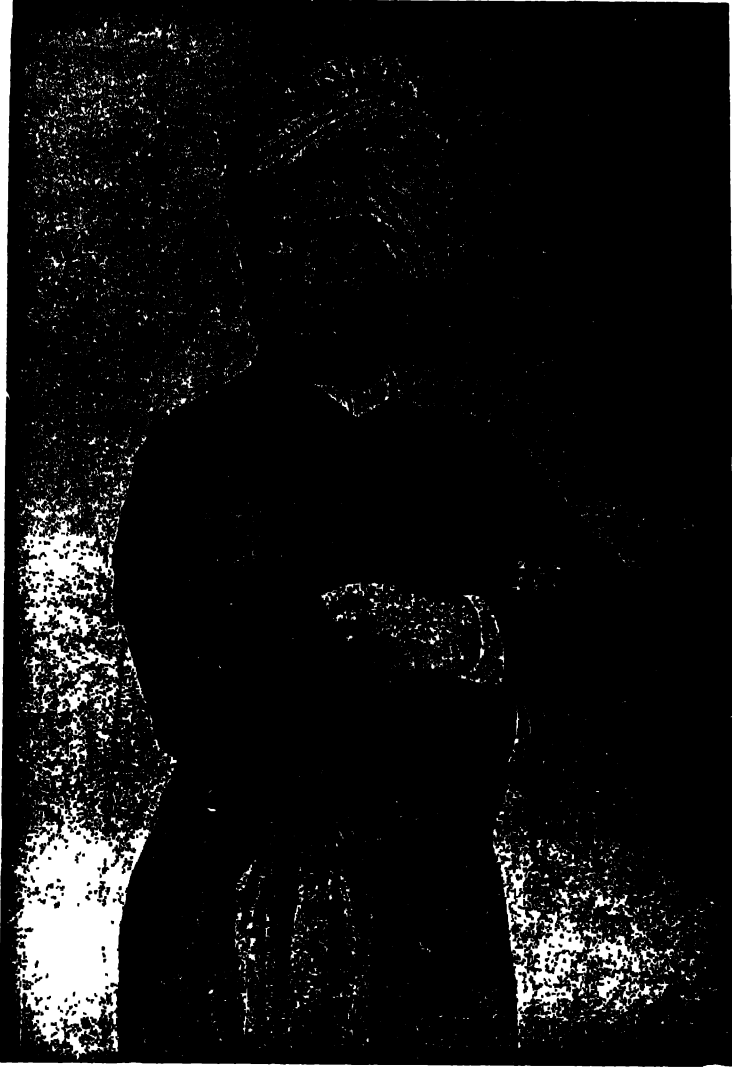
যুগনেতা বিবেকানন্দ

নীলরতন সরকার, আইনজীবী লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ও রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতির সমকক্ষ লোক ভারতবর্ষে কেন, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও বিরল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বাধ্যতামূলকভাবে জড়িত হওয়ার বিরুদ্ধে ঘোরতর প্রতিবাদ করে মহাত্মা গান্ধীপ্রমুখ কংগ্রেস-নেতারা কারাগারে আবদ্ধ হওয়ার পর, ইংরেজের রণোদ্যম প্রবলভাবে চলতে লাগল ভারতবর্ষে। ইংরেজের আজ্ঞাবহ তখনকার দেশীয় রাজন্যবর্গ চিরদিনই ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের উপর বিরূপ ছিলেন। তাঁরা প্রাণপণে ইংরেজ সরকারের সাহায্য করতে লাগলেন। ভারতীয় বাহিনীর সৈন্যগণ এশিয়া, ইওরোপ ও আফ্রিকায় সমভাবে প্রেরিত হতে লাগল ইংরেজের পক্ষে লড়বার জন্যে। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ অভিযাত্রী বাহিনী যখন ডানকার্ক থেকে পলায়ন করতে বাধ্য হয়, তখন তাদের ভিতর ভারতীয় বাহিনীর কোন কোন দল উপস্থিত ছিল। ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে ইরিত্রিয়া ও আবিসিনিয়া (বর্তমান ইথিওপিয়া) রণাঙ্গনে ভারতীয় বাহিনীকে প্রেরণ করা হয়েছিল। জেনারেল ওয়েভেল তাদের মরুভূমির যুদ্ধে শিক্ষিত করে তুলেছিলেন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

এ-ছাড়া, সমর-সম্ভার উৎপাদনে ভারতের প্রত্যেকটি কারখানাকে নিযুক্ত করেছিল ইংরেজ সরকার। ভারতীয় নৌ-বাহিনী এর আগে খুবই দুর্বল ছিল। এই যুদ্ধের প্রয়োজনেই তাকে কিছু পরিমাণে শক্তিশালী করে তোলে গভর্নমেণ্ট। আর-আই-এন্ বা রাজকীয় ভারতীয় নৌশক্তি এই সময়ে লোহিত সমুদ্র ও আরব-সমুদ্রকে শত্রুর ইউ-বোট নামে ডুবো জাহাজের আক্রমণ থেকে মুক্ত রাখতে পেরেছিল, এটা তাদের কম কৃতিত্বের কথা নয়।

ভারতবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যখন ভারতের ধনবল ও জনবল ইংরেজের যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সাহায্যে নিয়োজিত হচ্ছিল তখন কিন্তু ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান সুভাষচন্দ্র বসু, ইংরেজের ভারত-সাম্রাজ্য ধ্বংস করবার জন্যে জার্মেনী ও

গান্ধীজী ও কস্তুরীবাঈ

জাপানে, এক ইংরেজ-বিরোধী ভারতীয় সৈন্যদল গড়ে তুলছিলেন। গান্ধীজি ও পণ্ডিত জওহরলালকে বন্দী করে ইংরেজ মনে করেছিল যে, ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধকে অঙ্কুরেই দলিত করা গিয়েছে! কিন্তু সুভাষচন্দ্রকে অবলম্বন করে ভারতের মুক্তি-প্রয়াস যে অচিরেই এশিয়ার পূর্বাঞ্চলে বিরাট ঝঞ্ঝার সৃষ্টি করবে, তা তারা জানত না।

মহাত্মা গান্ধীপ্রমুখ কংগ্রেস-নেতৃবর্গকে কারারুদ্ধ করার ফলে, ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে সারা ভারতব্যাপী তুমুল বিক্ষোভ উপস্থিত হয়; ভারতের ইতিহাসে এই বিক্ষোভকে **"অগস্ট-বিপ্লব"** নামে অভিহিত করা হয়েছে। অতি নির্মম ভাবে ইংরেজ সরকার জনগণের এই অভ্যুত্থানকে দমন করে। তারপর এল ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের করাল **দুর্ভিক্ষ**। বাংলা-দেশে তখন খাজা নাজিমুদ্দীনের মন্ত্রিত্ব প্রতিষ্ঠিত। দেশের লোকের খাদ্য-সংস্থানের দিকে তিলমাত্র দৃষ্টি না দিয়ে, মন্ত্রীরা নিজেদের স্বার্থরক্ষার দিকেই একান্ত মনোযোগী হয়ে বসে রইলেন। ফলে বাংলায় মানুষ মরতে লাগল হাজারে হাজারে। পল্লী থেকে লোক ছুটে আসতে লাগল শহরে খাদ্যের অন্বেষণে। সেখানেই বা খাদ্য কোথায়? রাস্তায় পড়ে মানুষ মরতে লাগল।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু

এদিকে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী না খেয়ে মরল, ওদিকে লক্ষ লক্ষ মার্কিন সেনা বাংলায় এসে ঘাঁটি গাড়তে লাগল—জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্যে। ভারতের পূর্ব-সীমান্তে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পরিচালিত ভারতীয় জাতীয় বাহিনী বা **আই-এন-এ** বা **আজাদ হিন্দ্ ফৌজ** যে আক্রমণ চালিয়েছিল, তাকে ইংরেজ সরকারের প্রচার-বিভাগ, ঐ সময়ে জাপ-আক্রমণ নামেই অভিহিত করেছিল। ভারতবাসী কেউ জানতেই পারে নি যে, কোহিমা ও ইম্ফলে যারা আক্রমণ করেছে, তারা সাম্রাজ্যবাদী বৈদেশিক নয়, তারা ভারতের মুক্তিকামী ভারতেরই সৈনিক।

১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দের সূচনাতেই আসামের উত্তর-পূর্ব কোণে আজাদ হিন্দ্

বাহিনীর আক্রমণ আসন্ন হয়ে উঠল। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনা ছিল সরল, অথচ সুদূরপ্রসারী। পঞ্চাশ হাজার ভারতীয় সেনা, তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে ইম্ফল-কোহিমা অঞ্চল আক্রমণ করবে, তারপর ত্রিশ মাইল উত্তরে অগ্রসর হয়ে, অধিকার করবে তখনকার বেঙ্গল-আসাম রেলওয়ে। ইংরেজ বাহিনীর ১৪-সংখ্যক রেজিমেণ্ট এই অঞ্চল রক্ষায় নিযুক্ত ছিল। তাদের পরাস্ত করে তারা পশ্চিম-দক্ষিণে অগ্রসর হবে কলকাতার দিকে।

আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর একাংশ দক্ষিণ থেকে টিড্ডিমের দিকে অগ্রসর হল, অন্যান্য অংশ আরও উত্তরে চিন্দুইন নদী পার হয়ে পশ্চিম দিকে ছুটল। ১৭-সংখ্যক ব্রিটিশ রেজিমেণ্ট পালিয়ে ইম্ফল পৌঁছোবার আগেই তাদের পরিবেষ্টিত করে ফেলা এদের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ১৭-সংখ্যক রেজিমেণ্টের অধিনায়ক জেনারেল কাওয়ান টিড্ডিমে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে রাতারাতি চল্লিশ মাইল হটে গেলেন। তাদের পিছনে পশ্চাদ্ধাবন করল আজাদী ফৌজ।

ইম্ফল উপত্যকায় এসে ঘাঁটি স্থাপন করল বিভিন্ন ইংরেজ সৈন্যদল। ইম্ফলের উত্তরে কোহিমা রোড। এই রাস্তায় আশি মাইল গেলে পাওয়া যায় কোহিমা, তারও চল্লিশ মাইল পরে ডিমাপুর। আজাদী ফৌজ কোহিমা পাহাড়ের উপর দিয়ে এসে রাস্তা বন্ধ করে ফেলল। কোহিমা পড়ল বিচ্ছিন্ন হয়ে। পাহাড়ের মাথায় ৫,০০০ ফুট উপরে **কোহিমা**; এখানে তিন হাজার ইংরেজ সৈন্য আগে থেকেই ছিল। তা ছাড়া নানাস্থান থেকে ইংরেজের সৈন্যরা এসে পড়ল কোহিমা রক্ষার জন্যে।

এরা এসে পৌঁছোবার পূর্বেই আজাদী ফৌজের অধিনায়ক জেনারেল **শাহ নওয়াজ** কোহিমায় ভারতের জাতীয় পতাকা উড্ডীন করলেন। চৌদ্দ দিন তিনি কোহিমা অধিকার করে রেখেছিলেন। তারপর, রসদের অভাব তাঁকে বিব্রত করে তুলল। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের নিজস্ব বিমানবহর না থাকায়, রসদ সরবরাহের ভার জাপানী সৈন্যের উপর প্রদত্ত হয়েছিল। তারা হয়ত আজাদী ফৌজের কৃতিত্বে ঈর্ষাপরবশ হয়েই রসদ পাঠাতে অবহেলা করেছিল। কারণ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রথম থেকেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে বসেছিলেন যে, ভারত আক্রমণে জাপসৈন্যকে অংশ গ্রহণ করতে তিনি দেবেন না।

যাই হোক, ১৪ই মে আজাদ-ফৌজ কোহিমা পরিত্যাগ করে পশ্চাৎপদ হল।

অবশেষে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর, জাপান আত্মসমর্পণ করার ফলে, ভারতবর্ষ শান্তির মুখ দেখল আবার।

ততদিনে ইংলণ্ডে **চার্চিল**-মন্ত্রিসভার পতন ঘটেছে। শ্রমিক দলের নেতা

অ্যাটলি হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি ভারতকে স্বাধীনতা দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। চার্চিলের সময় সার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস ভারতে এসে বহু আলোচনা করেও ভারতবাসীদের স্বাধীনতা দেবার কোন উপায় বার করতে পারেন নি। তাঁর অসামর্থ্যের প্রধান কারণ ছিল, চার্চিলের অনমনীয় মনোভাব। ভারতকে স্বাধীনতা প্রদানে তাঁর আন্তরিক অনিচ্ছা ছিল।

অ্যাটলি এবারে **পুনরায়** আলাপ-আলোচনা চালাবার জন্যে তিনজন মন্ত্রীকে প্রেরণ করলেন ভারতে। তাঁরা এসে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন। কিন্তু হিন্দু ও মুসলিম নেতৃগণের মতদ্বৈধ কিছুতেই দূর হল না। জিন্না-পরিচালিত মুসলিম-লীগ কিছুতেই হিন্দুদের সঙ্গে যৌথ শাসন-যন্ত্রে মিলিত হতে রাজী হল না। ঘোর সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম লীগের অসংগত ও অনমনীয় মনোভাব এবং কংগ্রেসের মুসলিম তোষণ-নীতি ও দুর্বলতার জন্যে ভারত দ্বিখণ্ডিত হল। অ্যাটলি-গভর্নমেণ্ট মুসলিম-অধ্যুষিত উত্তর-পশ্চিম অংশ ও পূর্বাঞ্চলের পূর্ববঙ্গ একত্র করে **পাকিস্তান** রাষ্ট্র গঠন করে দিলেন। ভারতবর্ষের বাকী অংশটা **ভারত** বা **ইণ্ডিয়া** নামেই পরিচিত হতে থাকল। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই অগস্ট ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে।
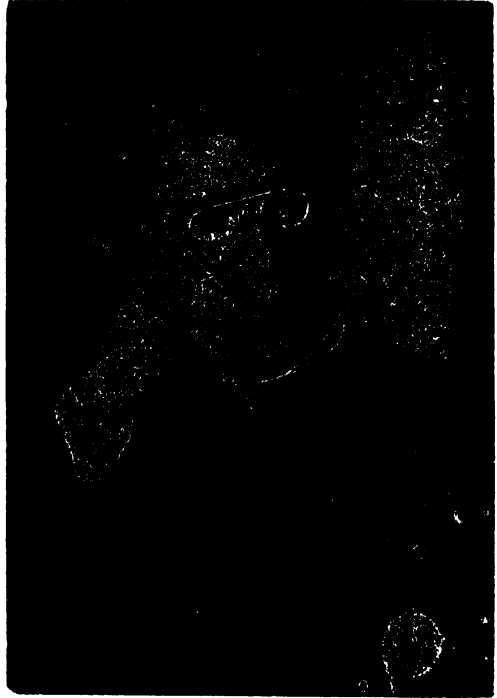
জগদীশচন্দ্র বসু

স্বাধীন ভারত

স্বাধীন ভারতের গভর্নর-জেনারেল হলেন প্রথমে **লর্ড মাউণ্টব্যাটেন,** পরে **চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী।** প্রধান মন্ত্রিপদে কংগ্রেস-নেতা **জওহরলাল নেহেরু** প্রথম থেকেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর লালবাহাদুর শাস্ত্রী

প্রধান মন্ত্রী হন। তাসখন্দে তাঁর মৃত্যু হলে জওহরলাল নেহেরুর কন্যা ইন্দিরা গান্ধী প্রধান মন্ত্রী হয়েছেন। জাতির দুর্ভাগ্য, ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধী আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।

ভারতবর্ষ ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি স্বাধীন সার্বভৌম সাধারণতন্ত্রে পরিণত হয়। সাধারণতন্ত্র হওয়ার পরেও ভারত ব্রিটিশ কমনওয়েলথের তুল্য অংশীদার হয়েই আছে। বড়লাট পদ তুলে দেওয়া হয়েছে। ভারত সাধারণ-তন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি হন **ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ**। রাজেন্দ্রপ্রসাদের মৃত্যুর পর
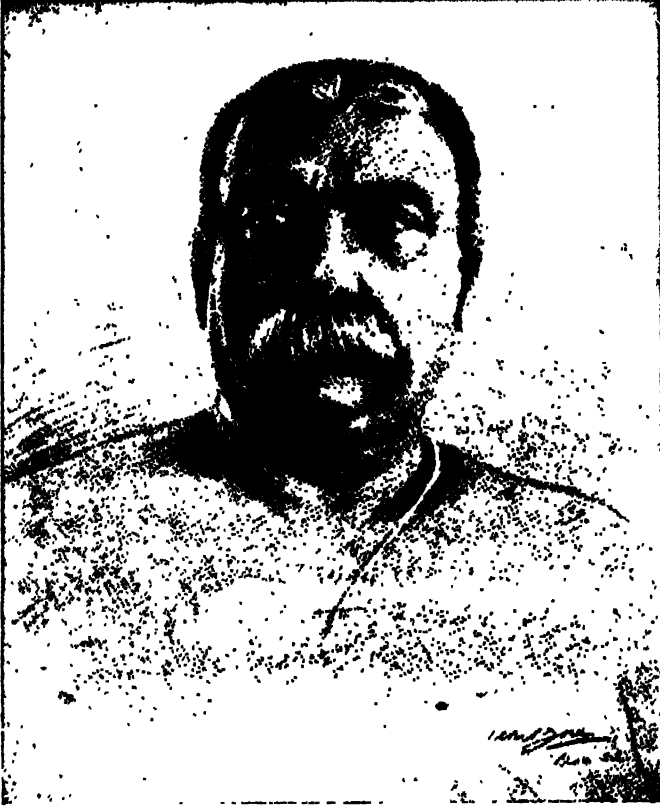
সার আশুতোষ

১৯৬২ খ্রীস্টাব্দে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন রাষ্ট্রপতি হন। তিনি অবসর গ্রহণ করলে ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দের ১২ই মে ডাঃ জাকীর হোসেন রাষ্ট্রপতি হন। ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে তাঁর মৃত্যু হলে উপরাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হন।

ভারতবর্ষ পুরোপুরি রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেছে। দেশীয় রাজ্যগুলি

ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে সম্মিলিত হওয়ায় দেশের শাসন-ব্যবস্থায় একটা ঐক্যের সৃষ্টি হয়েছে। হায়দরাবাদ ও জুনাগড় অনেক গোলমালের পর ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যগুলিকে প্রধানতঃ ভাষার ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করা হয়েছে। পূর্বেকার পাঁচটি ফরাসী উপনিবেশ ও পোর্তুগিজ উপনিবেশগুলি ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গোয়া অধিকারের জন্য সারা ভারতব্যাপী প্রবল আন্দোলন হয়। বহু ভারতীয় গোয়ার পোর্তুগিজ কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিগৃহীত ও বন্দী হয়। শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের সামরিক প্রচেষ্টায় গোয়া পোর্তুগিজ কবলমুক্ত হয়। সেই সঙ্গে দমন ও দিউ-ও পোর্তুগিজ কবলমুক্ত হয়। ভারতের আভ্যন্তরীণ খাদ্য ও অর্থনৈতিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা চলছে। হিসাব-পত্রের সুবিধার জন্যে নতুন দশমিক মুদ্রা, নতুন ওজন ও পরিমাণ প্রণালী এবং সর্বভারতীয় পঞ্জিকা প্রচলিত হয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের কতকগুলি বিষয়ে মতের মিল না হওয়ায় এবং পাকিস্তান থেকে অগণিত বাস্তুহারা ক্রমাগত ভারতবর্ষে চলে আসায় অনেক কঠিন ও জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়েছে।

তবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বাধীন ভারত অল্প সময়ের মধ্যেই একটা বিশিষ্ট স্থান অর্জন করেছে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু বৈদেশিক নীতিতে তাঁর বিচক্ষণতা, নিরপেক্ষ ও উদার নীতির জন্যে সর্বত্র খ্যাতিলাভ করেন। "পঞ্চশীল" নীতি প্রচার করে বর্তমান বিরোধ-কণ্টকিত রাষ্ট্রসমূহের দুয়ারে ভারত শান্তির বাণী পৌছে দিচ্ছে। কোরিয়া, নয়া চীন, পশ্চিম-এশিয়া, ইন্দোচীন প্রভৃতি বহু আন্তর্জাতিক সমস্যার প্রতি স্বাধীন ও নিঃস্বার্থ মতবাদের দ্বারা বিশেষ করে এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহ এবং পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছেও ভারত একটা সম্মানজনক স্থান অধিকার করেছে।

কাশ্মীরের সেতু

কাশ্মীর-সমস্যা পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের বিরোধের একটি প্রধান

কারণ। জম্মু ও কাশ্মীর একটি দেশীয় রাজ্য। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে দুর্ধর্ষ পার্বত্যজাতিরা অতর্কিতে এই রাজ্য আক্রমণ করে দেশবাসীর উপর নৃশংস অত্যাচার চালায়। আক্রমণকারীরা অবাধগতিতে অগ্রসর হতে থাকে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে অক্টোবর রাজধানী শ্রীনগর বিপন্ন হলে কাশ্মীরের মহারাজা লুণ্ঠনকারীদের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে ভারত সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং কাশ্মীর রাজ্যকে ভারতরাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত করার বিধিগত চুক্তিপত্রে সহি করেন। ভারত সরকার সাময়িকভাবে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং কাশ্মীর রক্ষাকল্পে সেখানে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র পাঠায়। ইতিমধ্যে মহারাজা শেখ আবদুল্লা ও জাতীয় সমিতির অপরাপর কতিপয় নেতার সাহায্যে একটি কার্যকারী গভর্নমেণ্ট গঠন করেন।

পার্বত্য উপদলের কাশ্মীর আক্রমণের পশ্চাতে পাকিস্তান সরকারের সক্রিয় সহযোগ আছে জানতে পেরে ভারত সরকার ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে

কায়েদে আজম জিন্না ও মহাত্মা গান্ধী

ডিসেম্বর কাশ্মীর-সমস্যার সমাধান রাষ্ট্রসংঘের হস্তে ন্যস্ত করল। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই অগস্ট কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা ভারতের প্রতি আনুগত্যের অভাব এবং পাকিস্তানের সহিত গোপনে সহযোগিতা করার অপরাধে পদচ্যুত ও বন্দী হন। বর্তমানে তিনি মুক্তিলাভ করেছেন।

রাষ্ট্রসংঘ কাশ্মীর-সমস্যার সমাধানকল্পে অনেকবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু নানা স্বার্থগত কারণে আজ পর্যন্ত সমস্যাটি অমীমাংসিত রয়েছে। আইনতঃ জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য আজ ভারতের অন্তর্ভুক্ত—যদিও পাকিস্তান এই নিয়ে এখনও গণ্ডগোল চালাচ্ছে।

১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর কোনরকম যুদ্ধ ঘোষণা না করেই পাকিস্তান জম্মুতে সৈন্যদল পাঠায়। তারা বহু মার্কিনী প্যাটন ট্যাঙ্ক, বিমান ইত্যাদি নিয়ে যুদ্ধ চালায়। স্থলবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল জয়ন্তনাথ চৌধুরী এবং বিমান-বাহিনীর অধ্যক্ষ অর্জন সিং-এর রণকুশলতায় পাকিস্তানী সৈন্য বিপর্যস্ত হয়। তাদের অসংখ্য ট্যাঙ্ক ও বিমান বিধ্বস্ত হয়। শেষে রাষ্ট্রসংঘের নির্দেশে ২৩শে সেপ্টেম্বর যুদ্ধবিরতি ঘটে।

১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তর্গত তাসখন্দে এক বৈঠকের আয়োজন হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ও পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁ বৈঠকে যোগদান করেন। সেখানে ভারত ও পাকিস্তানের সমস্যা মিটে যাবার কথা ঘোষণা করা হয়।

পাকিস্তান জোর করে ভারতের কচ্ছে সৈন্যদল পাঠায়। ভারতের সঙ্গে এ নিয়ে যুদ্ধ বাধে। শেষ পর্যন্ত কচ্ছের ব্যাপার এক আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনালে দেওয়া হয়। সেই ট্রাইবুনালের রায়-অনুযায়ী ভারতকে কচ্ছের কতকাংশ পাকিস্তানকে দিতে বলা হয়।

ইন্দিরা গান্ধী

হিমালয়ের অপরাজেয় শৃঙ্গ এভারেস্ট-বিজয় সাম্প্রতিক কালের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে ২৯শে মে স্বাধীন ভারতের নাগরিক তেনজিং নোরগে নিউজিল্যাণ্ডের হিলারীর সহিত এই গিরি-শৃঙ্গের শিখরদেশে সর্বপ্রথম আরোহণ করেন। ১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দে এক ভারতীয় দল পর পর চারবার এভারেস্ট-শৃঙ্গে আরোহণ করেন।

১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দে সারা ভারতে যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে কেন্দ্রে

কংগ্রেস দল জয়ী হলেও ভারতের কয়েকটি রাজ্যে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারে নি।

কম্যুনিস্ট চীনের ভারত সীমান্ত লঙ্ঘন ও ভারতের বহু সহস্র বর্গমাইল এলাকা জোর করে দখল করার ফলে ভারত এক অস্বস্তিকর সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে।

১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর ভারতীয় শাসন-সংবিধান রচিত হয়। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি তা চালু হয়। তার পর থেকে এ পর্যন্ত ২১ বার শাসন-সংবিধান সংশোধিত হয়েছে।

ভারতের আয়তন ৩২,৬৮,০৮১ বর্গ কিলোমিটার (১২,৬২,২৭৫ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা (১৯৬১ খ্রীঃ) ৪৩,৯০,৭২,৫৮২ (সিকিম সমেত ; পাকিস্তান-কবলিত জম্মুকাশ্মীরের অংশ বাদে)। এর মধ্যে হিন্দু ৩৬,৬৫,২৬,৮৬৬, শিখ ৭৮,৪৫,৯১৫, জৈন ২০,২৭,২৮১, বৌদ্ধ ৩২,৫৬,০৩৬ (১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে ছিল ১,৮০,৮২৩), মুসলমান ৪,৬৯,৪০,৭৯৯, খ্রীস্টান ১০,৭২,৮,০৮৬।

ভারতে প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা ৯৪১ (১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে ছিল ৯৪৬)। প্রতি বর্গ মাইলে লোকসংখ্যা ৩৭৩ (১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে ছিল ২৮৭)।

ভারতে বিদেশীর সংখ্যা ৫৯,৭৭৪ (১৯৬২)। এর মধ্যে ১০,৬২৭ জন চীনা এবং ১৪,৯৮৮ জন তিব্বতী। বিদেশে গায়েনা, সিংহল, ফিজি, কেনিয়া, মালয়, ব্রহ্মদেশ, মরিসাস, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ আফ্রিকা, পাকিস্তান, ত্রিনিদাদ ও টোব্যাকো, যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি স্থানের ভারতীয়দের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি।

শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ২৪ (১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে ছিল ১৬·৬)। এর মধ্যে পুরুষ ৩৪·৫ ও নারী ১৩ জন।

বর্তমানে ভারতের লোকসংখ্যা প্রায় একান্ন কোটি।

পাকিস্তান

গ্রেটব্রিটেন ১৯৪৭, ১৫ই অগস্ট যখন ভারতকে স্বাধীনতা দেয় তখন ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়ে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়। বহুদিন ধরে বহু মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতা পাকিস্তান সৃষ্টির ষড়যন্ত্র করে আসছিলেন। প্রধানতঃ কায়েদে আজম মহম্মদ আলি জিন্নার চেষ্টায়ই পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়। ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্রদের দ্বারা 'পাকিস্তান' নামকরণ হয়। পাকিস্তানের (Pakistan) P দ্বারা পঞ্জাব, A দ্বারা আফগান অঞ্চল, K দ্বারা কাশ্মীর, I দ্বারা ইসলাম, S দ্বারা সিন্ধু ও Tan দ্বারা বেলুচিস্তান বোঝানো হয়।

নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের লোকসংখ্যা ৯,৩৭,২০,৬১৩ (৪,৯৩,০৮,৬৪৫ পুরুষ, ৪,৪৪,১১,৯৬৮ মহিলা) (১৯৬১ খ্রীঃ)। আয়তন ৯,৪৬,৭২০ বর্গ কিলোমিটার (৩,৬৫, ৯২৯ বর্গ মাইল)। এই জনসংখ্যার ৮৮·১% মুসলমান ও ১২·৪% হিন্দু। রাজধানী ইসলামাবাদ।

লিয়াকৎ আলি খাঁ

পাকিস্তান দুই অংশে গঠিত, পশ্চিম-পাকিস্তান ও পূর্ব-পাকিস্তান। মাঝখানে প্রায় এক হাজার মাইলের ব্যবধান। পশ্চিম-পাকিস্তানের লোকসংখ্যা ৪,০৮,১৫,০০০ (২,১৭,৪৮,০০০ পুরুষ, ১,৯০,৬৭,০০০ মহিলা)। আয়তন ৮,০১,৪০৮ বর্গ কিলোমিটার (৩,০৯,৪২৪ বর্গ মাইল)। এই অংশের রাজধানী লাহোর। পশ্চিম পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু প্রদেশ এবং বেলুচিস্তান পশ্চিম-পাকিস্তানের অন্তর্গত।

পূর্ব-পাকিস্তান পূর্ব-বাংলা ও শ্রীহট্ট জেলা নিয়ে গঠিত। পূর্ব-পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা। পূর্ব-পাকিস্তানের লোকসংখ্যা ৫,০৮,৪৪,০০০ (২,৬৫,২২,০০০ পুরুষ, ২,৪৩,২২,০০০ মহিলা)। আয়তন ১,৪২,৭৯৭ বর্গ কিলোমিটার (৫৫,১৩৪ বর্গ মাইল)।

খয়েরপুর ও বাহবালপুর দেশীয় রাজ্য পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

কায়েদে আজম মহম্মদ আলি জিন্না হন পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর-

জেনারেল আর **লিয়াকৎ আলি খাঁ** প্রথম প্রধানমন্ত্রী। জিন্নার মৃত্যুর পর খাজা নাজিমুদ্দীন দেশের বড়লাট হন। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর লিয়াকৎ আলি খাঁ আততায়ীর হস্তে নিহত হলে নাজিমুদ্দীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন এবং গোলাম মহম্মদ বড়লাট-পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৫৩, ১৭ই এপ্রিল পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন পদচ্যুত হন এবং জনাব মহম্মদ আলি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে পূর্ব-পাকিস্তানে যে সাধারণ নির্বাচন হয়, তাতে সম্মিলিত ফ্রণ্ট দল মুসলিম লীগকে প্রায় সকল কেন্দ্রে পরাজিত করে। পূর্ব-পাকিস্তানের মত পশ্চিম-পাকিস্তানেও আজ মুসলিম লীগ পর্যুদস্ত।

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ পাকিস্তান ঐশ্লামিক সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র বলে ঘোষিত হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হলেন মেজর জেনারেল ইস্‌কান্দার মীর্জা এবং প্রধানমন্ত্রী হলেন হাসান শহীদ সুরাবর্দী।

ব্যাপক দুর্নীতি ও অযোগ্যতার জন্য ইস্‌কান্দার মীর্জা ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর সামরিক শাসনের প্রবর্তন করেন। সেই সময়ে মালিক ফিরোজ খাঁ নূন্‌ ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। রাষ্ট্রপতি মীর্জা তাঁকে পদচ্যুত করেন এবং আইনসভা ভেঙ্গে দেন। পরে ২৭শে অক্টোবর মীর্জা পদত্যাগ করেন এবং জেনারেল মহম্মদ আয়ুব খাঁ কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। বর্তমানে ইয়াহিয়া খাঁ পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান।

১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে পাক-মার্কিন সামরিক মৈত্রী স্থাপিত হয়। পাকিস্তানকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া সামরিক সাহায্য দেওয়ায় ভারত এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অপরাপর রাষ্ট্রে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সম্পর্কের আরো কিছু অবনতি হয়েছে।

১৯৫৯ সালে মার্কিন ও জার্মান অর্থনীতিক উপদেষ্টারা পাকিস্তানকে বিপুল-ভাবে সাহায্য করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া নানাভাবে পাকিস্তানকে সাহায্য দিয়ে চলেছে। ১৯৬১ সালে জেনারেল আয়ুব খাঁ স্বয়ং মার্কিন মুল্লুকে গিয়ে আর এক দফা অর্থ সাহায্যের জন্য ধর্না দেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট মিঃ কেনেডি আয়ুবকে বিমুখ করেন নি।

পাকিস্তান ভারতের নিকট বহুভাবে উপকৃত। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যাপারে পাকিস্তানকে প্রভূত সাহায্য করেছেন এবং পাকিস্তানের বার বার ভারতের সীমান্ত অতিক্রম, ভারতীয় সম্পত্তি লুণ্ঠন প্রভৃতি একান্ত অসংগত আচরণসত্ত্বেও তার প্রতি বন্ধুত্বের মনোভাব দেখিয়ে চলেছেন। কিন্তু পাকিস্তানের ভারতবিরোধী কার্যকলাপ দেশে বিদেশে বেড়েই চলেছে।

ইরান

ভারত হতে কিছু পশ্চিমে ইরান দেশ অবস্থিত। এ দেশ পারস্য নামেও পরিচিত ছিল। এর উত্তর দিকে সোভিয়েট রাশিয়া ও কাস্পিয়ান সাগর, পূর্বে আফগানিস্তান ও পাকিস্তান, দক্ষিণে পারস্যোপসাগর, ওমান উপসাগর এবং পশ্চিমে ইরাক ও তুরস্ক। ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে এক সরকারী আদেশ জারি করে এর নাম হয় ইরান। আর্যদেরই একটি দল ইরানে এসে বাস করতে থাকে।

ইরান হল বিখ্যাত কবি ওমর খৈয়মের দেশ। এখানকার লোকেরা সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করত। ছোট ছোট গ্রামে তারা বাস করত। চাষ-আবাদ এবং ভেড়া চরানো ছিল তাদের উপার্জনের পথ। এদের মধ্যে একটা কোন সংঘবদ্ধ জাতি ছিল না, ছোট ছোট উপজাতিতে এরা বিভক্ত ছিল।

ইরান দেশটি যে স্থানে অবস্থিত বহু প্রাচীন কাল হতেই ঐ অঞ্চলে অনেক বড় বড় সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন হয়। পর পর আসিরিয়, মিডিয়, চ্যালডিয়ান, বাবিলন সাম্রাজ্য প্রভৃতির পতন হলে কাইরাস নামক একজন বহুদেশজয়ী পারসিক যোদ্ধা এখানে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন।

কাইরাস সর্বপ্রথম দেশের লোকদের একত্র করে, তাদের এক জাতিতে পরিণত করেন (৫৪৯ খ্রীস্টপূর্বাব্দ)। তিনি যে রাজবংশ স্থাপন করেন, তাকে বলে **একিমিনিড-বংশ**। তিনি পারসিকদের তিনটি জিনিস শিখিয়েছিলেন—ঘোড়ায় চড়তে, তীর-ধনুক নিয়ে যুদ্ধ করতে, আর সত্য কথা বলতে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত চামড়ার পোশাক পরে তারা যুদ্ধ করত।

কাইরাস এমনি সুশিক্ষিত সৈন্যদল নিয়ে এশিয়া-মাইনর, প্যালেস্টাইন,

আসিরিয়া এবং বাবিলন (৫৩৮ খ্রীস্টপূর্বাব্দ) জয় করেছিলেন। ভারতবর্ষও বোধহয় তিনি আক্রমণ করেছিলেন। তিনি জেরুজালেম অধিকার করে তা ইহুদীদের দেন।

একটা দেশ জয় করেই পারসিকরা সেখানে **সেট্রাপ** বা গভর্নর নিযুক্ত করত এবং বিজিত দেশের লোকদের জন্যে যতদূর সম্ভব ভাল আইন তৈরি করে তারা যাতে ভাল ভাবে থাকতে পারে, তার চেষ্টা দেখত। এক রাজ্য থেকে আর এক রাজ্যে যাওয়া-আসার সুবিধার জন্যে তারা ভাল ভাল রাস্তা তৈরি করে দিত—যাতে দেশের ব্যবসায়ীদের মাল নিয়ে যাতায়াতের কোন অসুবিধা না হয়। হাজার হাজার মাইল রাস্তা তারা তৈরি করেছিল এবং যাতায়াতের সময় পথিকদের বিশ্রামের অসুবিধা যাতে না হয়, সেজন্যে রাস্তার পাশে পাশে তারা অসংখ্য সরাইখানাও তৈরি করে দিয়েছিল।

একটা দেশ জয় করলে পারসিকরা সে দেশের ভাল জিনিসগুলো সব শিখে নিত। বাবিলন জয় করে তারা বড় বড় প্রাসাদ তৈরি করতে শিখল, মিশর জয় করে মন্দিরে কারুকাজ করা শিখে নিল। তারপর তারা নিজেদের দেশে চমৎকার সব শহর গ'ড়ে তুলতে আরম্ভ করল।

রাজা দারায়ুস

ইরানে আজ পর্যন্ত যত রাজা রাজত্ব করেছেন, তার মধ্যে **দারায়ুস** সবচেয়ে বড়। রাজা দারায়ুসের আমলেই পারসিক সভ্যতা সবচেয়ে বেশী উন্নত হয়েছিল এবং এঁরই আমলে ইরানের অধীন দেশের লোকেরা সবচেয়ে বেশী সুবিচার ও সদ্ব্যবহার পেয়েছিল। সম্রাট্ দারায়ুসের সাম্রাজ্য সিন্ধুনদীর উপকূলভাগ হতে মিশরদেশ পর্যন্ত সুবিস্তৃত ছিল।

ইরানের **পার্সেপোলিস** নামক শহরে ছিল দারায়ুসের প্রাসাদ। প্রাসাদের দেয়াল ছিল বহুমূল্য কাঠের, সেই কাঠের উপর সোনার পাত মোড়া, তার সামনে বহুমূল্য ভারতীয় সিল্কের পর্দা ঝুলত। প্রাসাদের ছাদ ছিল রুপার তৈরী টালির। যে পালঙ্কে দারায়ুস শয়ন করতেন সেটা দেখতে ছিল চমৎকার একটি আঙ্গুর গাছের মত এবং খাঁটী সোনার তৈরী। তার মধ্যে মধ্যে সবুজ রংএর বহুমূল্য হীরা বসানো থাকত, সেগুলোকে দেখাত ঠিক যেন আসল আঙ্গুর!

দারায়ুস শুধু যে শৌখিন লোকই ছিলেন তা নয়; তাঁর শক্তিও বড় কম ছিল না। তাঁর সৈন্যদল ছিল বিরাট্, সেই দলে অনেক দেশের লোক ছিল। মিশরের লোক, মধ্য-অফ্রিকার সিংহ-চর্ম-পরা নিগ্রো, উত্তর-

আফ্রিকার উট-সওয়ার কাফ্রী—এরা ছিল দারায়ুসের সৈন্য। হাতি-সওয়ার একদল হিন্দুও তাঁর সৈন্যদলে ছিল। পারসিকরা তো ছিলই। এই সৈন্যদল নিয়ে দারায়ুস যখন যুদ্ধে যেতেন, শত্রুরা ভয়েই তাঁর পথ ছেড়ে দিত।

তাঁর জয়যাত্রা সর্বপ্রথম আঘাত পেল গ্রীসে। গ্রীস আক্রমণ করে দারায়ুস কিছুতেই জয়লাভ করতে পারলেন না। ৪৯০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে বিখ্যাত **মারাথনের** যুদ্ধে তাঁর সৈন্যেরা ক্ষুদ্র রাষ্ট্র এথেন্সের কাছে পরাজিত হয়েছে এই সংবাদ পাওয়ার কিছুদিন পরেই দারায়ুস মারা যান।

রাজা দারায়ুস

দারায়ুসের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র **জেরাক্সেস** সিংহাসনে আরোহণ করলেন। তিনি নানাজাতি সমন্বিত এক বিপুল বাহিনী নিয়ে ছোট গ্রীস-দেশকে আক্রমণ করেন। এই সময় ইতিহাস-প্রসিদ্ধ **থার্মোপলির** গিরিবর্ত্মের যুদ্ধে পারসিকরা জয়লাভ করে বটে কিন্তু তারা বিশেষ সুবিধা করতে পারল না। থার্মো-পলিতে স্পার্টাবীর **লিওনিডাস** ও তাঁর তিনশত সহকর্মী অসীম বীরত্ব দেখিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জন করেন। জেরাক্সেস ৪৮০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে **সালামিসে** এবং ৪৭৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে প্লেটিয়ায় পরাজিত হন। পরবর্তী পারসিক সম্রাট্‌গণ গ্রীসের সঙ্গে আরও যুদ্ধ চালাতে লাগলেন। কিন্তু গ্রীকজাতির বীরত্বের সম্মুখে তাঁরা ক্রমেই হটে যেতে লাগলেন। ইরান-সম্রাটের গ্রীস-বিজয়ের স্বপ্ন সম্পূর্ণভাবে অতৃপ্ত রয়ে গেল।

একিমিনিড-বংশ ২২০ বছর কাল এক বিশাল সাম্রাজ্যের উপর শাসন চালাবার পরে ম্যাসিডোনিয়ার বিখ্যাত বীর আলেকজাণ্ডার ৩৩৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে

তৃতীয় দারায়ুসকে পরাজিত করে এই সাম্রাজ্য জয় করেন এবং পার্সেপোলিস শহর অগ্নিদগ্ধ করেন।

প্রাচীন যুগের পারসিকেরা খুব সভ্য ও ধর্মব্যাপারে উদার ছিল। তারা

রাজা দারায়ুস পর্বত-গাত্রে শিলালিপি উৎকীর্ণ করাচ্ছেন

খুব উঁচুদরের শিল্পী ছিল। ভারতের বিখ্যাত তাজমহলে পারসিক শিল্পকলার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

পারসিক সম্রাট্‌গণ খুব সুদক্ষ শাসক ছিলেন। দেশের মধ্যে অনেক বড় বড় রাস্তা থাকায় চারদিকে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা ছিল। ভারতীয় আর্যগণের সঙ্গে প্রাচীন পারসিকদের নিকট-সম্বন্ধ ছিল। এদের **জোরস্তার** ধর্ম এবং

বৈদিক ধর্মের মধ্যে যোগাযোগ আছে। একিমিনিড শিল্পরীতি ভারতীয় মৌর্য শিল্পকলাকে প্রভাবিত করেছে বলে মনে হয়।

একিমিনিড-রাজবংশের অবসানের পরে আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি

যুদ্ধক্ষেত্রে দারায়ুস

সেলুকস ইরানে এক গ্রীক রাজবংশের প্রবর্তন করেন। এর পর এখানে অপরাপর অর্ধ-বৈদেশিক গ্রীক শাসনকর্তাদের কর্তৃত্ব বহুদিন ধরে চলে। এই দীর্ঘকাল ভারতের পশ্চিমে এশিয়ার প্রায় সর্বত্র গ্রীক সভ্যতা ও গ্রীক সংস্কৃতি প্রভাব বিস্তার করে। ভারতীয় কুশান সাম্রাজ্যও গ্রীক শিল্প ও গ্রীক সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

সাসানিড রাজবংশ

খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে, ইরানে একটি জাতীয় আন্দোলনের ফলে, **সাসানিড** নামে এক দেশীয় রাজবংশ সিংহাসনে বসে। এই বংশের রাজত্বের সময় সামরিক

শক্তি, সাহিত্য, শিল্প, চিত্রাঙ্কন—সমস্ত দিকেই ইরান বিশেষ উৎকর্ষতা লাভ করে। সাসানিডদের সঙ্গে কনস্টান্টিনোপলের পূর্ব-রোম-সাম্রাজ্যের শত শত বছর ধরে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলেছে। এ যুগে ইরানের একজন রাজা সা-পুর এক সংঘর্ষে রোম-সম্রাট্ ভেলিরিয়েনকে বন্দী করেন।

ভারতে সাসানিডদের সমসাময়িক ছিল গৌরবময় **গুপ্তযুগ**। এ সময়ে ইরান ও ভারতের মধ্যে শিল্প ও বাণিজ্য-বিষয়ক নানা সম্বন্ধ ছিল। সাসানিডদের যুগেই বোধ হয় পারসিকদের ধর্মপুস্তক **আবেস্তা** রচনা সম্পূর্ণ হয়।

আরব-শক্তির অধীনে

ইসলাম ধর্মের অভ্যুত্থানের পর, সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি, ইরান আরব-শক্তির অধীনে যায়। মুসলমানেরা তখন নতুন উন্মাদনা নিয়ে দেশের পর দেশ জয় করতে থাকে এবং সিরিয়া, মেসোপোটেমিয়া (বর্তমান ইরাক), মিশর—সর্বত্রই তাদের অধিকার বিস্তার লাভ করে। ইরানীরা বিজেতা আরবদের রীতিনীতি গ্রহণ করে, কিন্তু তাদের প্রাচীন সভ্যতার বৈশিষ্ট্য তারা হারায় নি। ইরানীরা আর্য-জাতি আর আরবেরা সেমিটিক জাতিভুক্ত লোক, সেজন্যে ইরানীরা তাদের জাতিগত ও ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখল। ইরানের বিলাস ও ঐশ্বর্য সরল মরুভূমিবাসী আরবজাতির জীবনযাত্রার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।
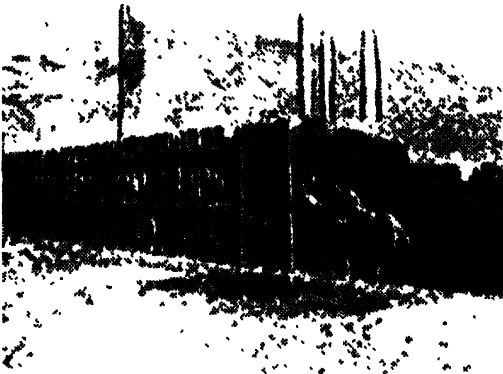
জেরাক্সেসের ভগ্ন প্রাসাদের একাংশ

নবম শতাব্দীতে বাগদাদের আরব-সাম্রাজ্য হ্রাসপ্রাপ্ত হয় ও অনেক অংশে বিচ্ছিন্ন হয়। শীঘ্রই দলে দলে সমরপ্রিয় তুর্কীজাতি পূর্বদিক থেকে এসে বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্য সৃষ্টি করে ও ইরান তাদের অধিকারে যায়। এ সময়ে গজনীর তুর্কী সুলতান মামুদ এক বিরাট সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়েছিলেন।

এর পরে ইরান **সেলজুক** তুর্কীদের অধীন হয়। তারপর এখানে আর একটি তুর্কীশক্তি, খিভা-রাজ্যের প্রভুত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু শীঘ্রই চেঙ্গিস খাঁর

নেতৃত্বে, মঙ্গোলজাতি যখন দুর্বার গতিতে রাজ্যের পর রাজ্য জয় করছিল তখন ইরানও মঙ্গোলদের করতলগত হয়। তুর্কীদের রাজত্বের সময় এবং অন্যান্য

আলেকজাণ্ডার পার্সেপোলিস শহর অগ্নিদগ্ধ করছেন

যুগেও পারসিক সাহিত্যে অনেক বড় বড় কবির আবির্ভাব হয়। তাঁদের মধ্যে **ফিরদৌসি** (৯৩৭-১০২০ খ্রীঃ), **ওমর খৈয়ম, জালালুদ্দিন রুমি** এবং **হাফেজের** নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তৈমুর ও নাদিরশাহ

সামারকন্দের নিষ্ঠুর বিজয়ী তুর্কী বীর **তৈমুর** (১৩৩৫-১৪০৫ খ্রীঃ) ১৩৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইরান অধিকার করেন। তিনি ভারতবর্ষের অতুল ঐশ্বর্যের সংবাদ শুনে,

রোম-সম্রাট্ ভেলিরিয়েন, ইরানরাজ সা-পুরের হাতে বন্দী হলেন

অসংখ্য সৈন্য নিয়ে, ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন। ভারতে মুসলমান সুলতানদের তখন পতন-অবস্থা। তৈমুরকে বাধা দেবার জন্যে দেশের ভারতীয়েরা একসঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ করল, কিন্তু জয়লাভ করতে পারল না।

দিল্লীর কাছে পৌঁছে তৈমুর অগণিত বন্দীকে হত্যা করলেন। তারপর তাঁর হিংস্র সৈন্যেরা দিল্লীতে ঢুকে, অবাধে লুঠতরাজ ও হত্যালীলা চালাল। দিল্লীর

রাজপথে মানুষের রক্তের স্রোত বইয়ে, অসংখ্য নারীর সম্মান হানি করে, তৈমুর দেশে ফিরে গেলেন।

এই পরধর্মদ্বেষী নির্দয় অত্যাচারী তৈমুর কিন্তু শিল্পানুরাগী ও লেখাপড়ায় শিক্ষিত ছিলেন। তৈমুরের বংশধরেরা আরও একশত বছর রাজত্ব করেন। এই সময়কে তিমুরিড যুগ বলে। এ যুগে ইরান, বোখারা, হিরাট প্রভৃতি স্থানে শিল্প ও সাহিত্যচর্চার যথেষ্ট উন্নতি হয়। পারসিক সাহিত্য, চিত্রাঙ্কন এবং তুর্কী সাহিত্য খুব উৎকর্ষতা লাভ করে। ইরানের তিমুরিড যুগ ইতালির রেনেসাঁস—বিদ্যার নবোন্মেষের যুগের সমসাময়িক কাল।

ইরান তুর্কী ও মঙ্গোলদের সামরিক অধিকারে যায়, কিন্তু নিজের

কবি ফিরদৌসি একটি বালকের মুখে তাঁর নিজের রচিত কবিতা শুনছেন

সংস্কৃতির প্রভাবে তাদের জয় করে। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইরানে এক জাতীয় জাগরণের ধাক্কায় বিদেশী তিমুরিডগণ বিতাড়িত হন এবং **সাফাভি** নামে দেশীয় এক রাজবংশ ইরানের সিংহাসনে বসেন। তাঁরা ভারতে মোগল-সাম্রাজ্যের সমসাময়িক। সাফাভি-বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি **শা আব্বাস** (প্রথম) সম্রাট্ আকবরের সময়ের লোক। তিনি তাঁর রাজধানী **ইসফাহানকে** খুব উন্নত এবং অনেক সুন্দর সুন্দর শিল্প ও কারুকার্যখচিত প্রাসাদ দ্বারা শোভিত করেছিলেন।

সাফাভি-বংশ ১৫০২ হতে ১৭২২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁদের রাজত্বকাল ইরানের শ্রেষ্ঠ গৌরবের যুগ। শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য সকল দিকে পারসিকরা অতুলনীয় পারদর্শিতা অর্জন করে। পশ্চিম-এশিয়া, ভারতের মোগল-দরবার প্রভৃতি সর্বত্র পারসিক ভাষা বিদগ্ধজনের ভাষায় পরিণত হয়।

কনস্টান্টিনোপলের অটোমান তুর্কীদের প্রাসাদসমূহ নির্মাণে পারসিকদের স্থাপত্য-আদর্শ বিস্তৃত হয়। এই আদর্শের প্রভাব আগ্রার তাজমহল নির্মাণেও লক্ষ্য করা যায়।

সাফাভি-বংশের পতনের কিছু পর, পরম অত্যাচারী ও নৃশংস **নাদিরশাহ**

কবি ওমর খৈয়াম

(১৬৬৮-১৭৪৭ খ্রীঃ) ইরানের সিংহাসনে আরোহণ করলেন। সম্রাট্ হবার আগে তাঁর নাম ছিল নাদিরকুলি খাঁ। নাদির বিখ্যাত যোদ্ধা এবং বীর ছিলেন। তিনি আফগানদের ইরান থেকে বিতাড়িত করেন।

তারপর তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তৈমুরের মত তিনিও দিল্লীর রাজপথে মানুষের রক্তের স্রোত বইয়ে দেন। লুটপাট করে তিনি কোটি কোটি টাকা তো নিলেনই, সম্রাট্ শাহজাহানের সাধের ময়ূর-সিংহাসনটিও তিনি সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। দেশে ফিরে নাদিরশাহ রাজ-সিংহাসনে অভিষিক্ত হলেন। কিন্তু তাঁর অত্যাচারে দেশের লোক এত অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল যে, শেষে তাঁর নিজের দেহরক্ষীদের হাতেই তাঁকে নিহত হতে হয়। নাদিরশাহের মৃত্যুর পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর পারসিক ইতিহাস শুধু গৃহ-বিবাদ, দুর্নীতি ও কুশাসনের কাহিনী।

বিংশ শতাব্দীতে ইরান

ঊনবিংশ শতাব্দী হতে ইরানের উপর নজর পড়ল সাম্রাজ্যবাদী ইংলণ্ড এবং রাশিয়ার। রাশিয়া বহুদিন ধরে ইরানের উত্তর দিকে চাপ দিচ্ছিল আর ইংলণ্ড, রাশিয়ার হাত থেকে তার ভারত-সাম্রাজ্য রক্ষা করার অভিপ্রায়ে, পারস্য-উপসাগরের দিক্ দিয়ে ক্রমাগত ইরানের উপর ধাক্কা দিচ্ছিল। দুই বড় শক্তির পীড়নে দুর্বল ইরান দ্রুত পতনের দিকে ধাবিত হতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইরানের দক্ষিণ অঞ্চলে খুব ভাল তেলের খনি আবিষ্কৃত হওয়ায় ইংরেজরা সেটা দখল করতে চাইল। ইরানের শক্তি কমাতে না পারলে সুবিধা হবে না। খনিগুলো তারা ছাড়তে চাইবে না বুঝে, ইংলণ্ড এবং রাশিয়া একজোট হয়ে ইরান দেশটিকে দুই ভাগ করে ফেলবার বন্দোবস্ত করল। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজরা ইরানের দক্ষিণ দিক্ এবং রাশিয়ানরা তার উত্তর দিক্‌টা দখল করে নিল।

১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেধে ওঠার সময় ইরান চরম দুর্গতির মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল। ইরান যুদ্ধে নিরপেক্ষতা ঘোষণা করল, কিন্তু দুর্বলের অবলম্বিত ব্যবস্থার কোন মূল্য নেই। যুদ্ধের সময় বিভিন্ন পক্ষের শক্তিরা অনবরত ইরানের উপর দিয়ে তাদের সৈন্য চালনা করতে লাগল, ইরানীদের মতামত তারা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করল।

১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের বলশেভিক বিদ্রোহে, রাশিয়ার জার যখন সিংহাসনচ্যুত হলেন, বলশেভিকরা তখন উত্তর-ইরানের উপর সব দাবি ত্যাগ করে ইরানকে রাশিয়ার কবল থেকে মুক্তিদান করল। ইংলণ্ড দেখল এই সুযোগ। দক্ষিণ-ইরান থেকে ইংরেজরা অমনি সৈন্য চালনা করে ইরানের দুর্বল শাহকে এমন কোণঠাসা করে ধরল যে, উপায়ান্তর না দেখে, তিনি ইংরেজদের কর্তৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য হলেন। তেলের খনিগুলি শোষণ করার জন্যে ইংরেজরা ইতিপূর্বে **ইঙ্গ-ইরান**

তৈল কোম্পানি গঠন করেছিল। তারা ইরানের তেলের কল্যাণে প্রভূত অর্থলাভ করতে লাগল। ইংরেজদের মনের ইচ্ছা ছিল, ধীরে ধীরে ইরানকে সম্পূর্ণরূপে কবলিত করে তাকে ভারতবর্ষের সঙ্গে জুড়ে নেওয়া। তাদের এই মতলব কিন্তু সফল হল না।

তৈমুরের ইরান বিজয়

রেজা শাহ পাহ্‌লবী

১৯২০ খ্রীস্টাব্দে বলশেভিকরা ইরানের উত্তর দিকের **জিলান** নামক একটা প্রদেশ জয় করে সেখানে সোভিয়েট-গবর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করল। তারপর তারা মাজান্দেরান নামক ইরানের সব চেয়ে উর্বর স্থানটি আক্রমণ করল।

এই মাজান্দেরানে **রেজা খাঁ** নামে এক যুবক ছিলেন। এক কৃষকের ক্ষেতে তিনি কৃষিকার্য শিখেছিলেন; কিন্তু বলশেভিকরা মাজান্দেরান আক্রমণ করবার পর, তিনি সৈন্যদলে নাম লিখিয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলেন।

ইরানের যে এক মহাবিপদের দিন এসেছে, বিদেশীরা এসে দেশটিকে যে টুকরা টুকরা করে ফেলবার চেষ্টা করছে, সেটা তিনি অন্তরে অন্তরে অনুভব করেছিলেন। তিনি বুঝলেন যে, আসন্ন বিপদ্ থেকে দেশকে রক্ষা করতে হলে, একটা শক্তিশালী সৈন্যদল সংগ্রহ করা এবং জীবন পণ করে যুদ্ধ করা দরকার।

ইরানের তখন যিনি শাহ, তিনি ছিলেন খুব দুর্বলচিত্ত লোক। তাঁর

দ্বারা কিছু হবে না বুঝে, রেজা খাঁ নিজেই দেশরক্ষার দায়িত্ব নিজের হাতে নেবেন বলে ঠিক করলেন।

তিন হাজার সৈন্য নিয়ে তিনি রওনা হলেন রাজধানী **তেহরানে।** সেখানে গিয়ে শাহকে অনুরোধ করলেন যে, তাঁকে প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত করা হোক। শাহ বাধ্য হয়ে রেজা খাঁকে প্রধান সেনাপতি করতে রাজী হলেন।

রেজা খাঁ এই দায়িত্ব গ্রহণ করে সবার আগে ঘোষণা করলেন যে, ইংরেজের সঙ্গে ইরানের সন্ধি বাতিল হয়ে গেল। তিনি জিলানের সোভিয়েট-গবর্নমেণ্টও ভেঙ্গে দিলেন। তিন বছরের মধ্যেই তিনি ইরানের লুপ্ত শক্তি অনেকটা ফিরিয়ে আনলেন এবং নিজে হলেন ইরানের প্রধান মন্ত্রী। ইরানের শাহ ইওরোপ বেড়াতে গেলেন, আর ফিরলেন না। দু' বছর পর ইরানের লোকেরা, মস্ত সভা করে, রেজা খাঁকেই শাহ নির্বাচিত করল। সিংহাসনে বসবার পর তাঁর নাম হল **মহম্মদ রেজা শাহ পাহ্লবী।**

তৈমুর

রেজা শাহ গবর্নমেণ্ট পরিচালনায় যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। দেশের যে-সব বড় বড় জমিদার গবর্নমেণ্টকে অগ্রাহ্য করে নিজেদের খুশিমত চলতে আরম্ভ করেছিলেন, তিনি তাঁদের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করলেন। ইংরেজরাও তাদের সৈন্য সরিয়ে নিতে বাধ্য হল। রাশিয়ানদের সঙ্গে ইংরেজদের বন্ধুত্ব বজায় থাকলে, তারা একজোট হয়ে, আবার সুযোগ পেলেই অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে, এই ভেবে রেজা শাহ বুদ্ধি করে ইংরেজ ও রাশিয়ানদের মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে দিলেন।

রেজা শাহের আমলে ইরানের অনেক উন্নতি হয়েছিল। দেশের সর্বত্র শান্তি

ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। রেলওয়ে স্থাপিত হয়ে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের অনেক সুবিধা হয়।

রেজা শাহের শক্তিশালী শাসনে ইরান ঐক্যবদ্ধ হয়। পরাক্রান্ত সামন্ত-শ্রেণী, যাঁরা বরাবর জনসাধারণকে উৎপীড়ন করতেন তাঁরা গবর্নমেণ্ট-বিরোধী হয়ে ওঠেন। দেশে একটা ব্যাপক জাতীয়তাবোধের সাড়া জেগে ওঠে। যে বিদেশীরা ইরানের তৈল-ঐশ্বর্য কেড়ে নিয়ে দেশকে দরিদ্র করছিল, তাদের উপরই পারসিকদের বেশী রাগ পুঞ্জীভূত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ইরান নানা-ভাবে নিজের শক্তিসঞ্চয় করতে লাগল।

শা আব্বাস

এই ভাবে ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কেটে গেল। কিন্তু ঐ বৎসর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে জার্মেনী রাশিয়া আক্রমণ করবার পর ইরানের অবস্থা অন্য রকম দাঁড়িয়ে গেল। ইংরেজরা দেখল যে, জার্মেনী যদি ককেশাস পর্বত অতিক্রম করে ইরানে এসে পৌছায়, তাহলে ভারতবর্ষের বিপদ্ ঘটবে। তারা ২৫শে অগস্ট রাশিয়ানদের সঙ্গে একত্রে ইরানে সৈন্য পাঠিয়ে, তার উত্তর দিকে ঘাঁটি করে জার্মেনীকে আটকাবার ব্যবস্থা করল।

ইংরেজ ও রাশিয়ানরা ইরানে সৈন্য চালনা করবার পর রেজা শাহ প্রথমটা বাধা দিলেন, কিন্তু এবার তারা দুজন, তাঁর চেয়ে বেশী শক্তিশালী বলে তিনি আর পেরে উঠলেন না।

নাদিরশাহ

ইরানের শাসন-ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ল এই বৈদেশিক আক্রমণে। ইরানের শাহ সিংহাসন ত্যাগ করলেন। তাঁর পুত্র আরোহণ করলেন সিংহাসনে।

১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারি ব্রিটেন ও রাশিয়া চুক্তিবদ্ধ হয়ে ইরানকে পূর্ণ স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক সাহায্য দিতে স্বীকৃত হল।

১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি ইরান যুদ্ধ ঘোষণা করল জাপানের বিরুদ্ধে

অবশ্য সক্রিয়ভাবে জাপান-যুদ্ধে ইরানকে কোনদিনই অবতীর্ণ হতে হয় নি। তবে তার তৈল-সম্পদ্ দিয়ে মিত্রশক্তির যথেষ্ট সাহায্যই সে করতে পেরেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়ার অপরাপর উদীয়মান জাতির ন্যায় ইরানের জনগণের মধ্যেও বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী, বিশেষ করে ইংরেজদের
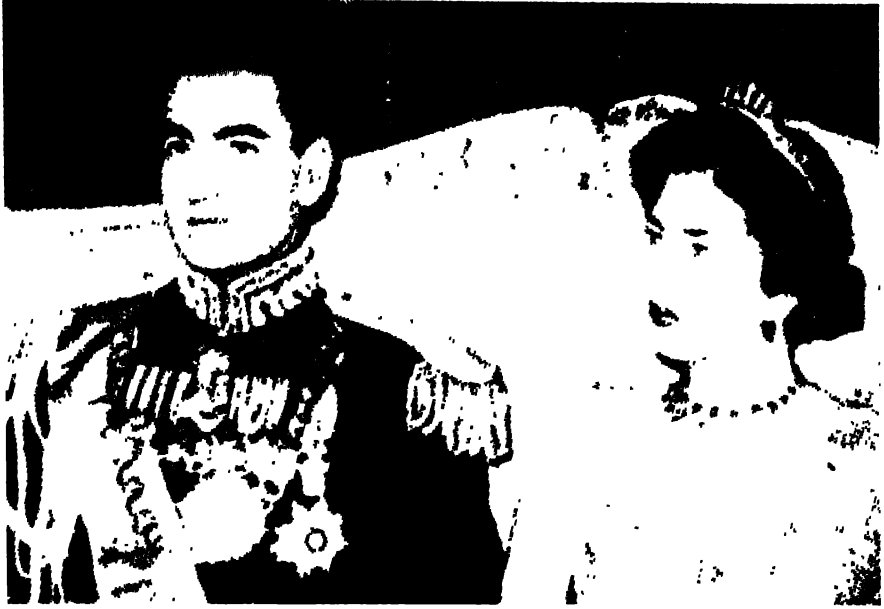
শাহ মহম্মদ রেজা পাহ্লবী ও তাঁর মহিষী

বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ বেড়ে ওঠে। তারা উপলব্ধি করল যে, ইংরেজদের অপসারিত করে দেশের অতুল তৈল-সম্পদ্ নিজেদের হস্তগত করতে না পারলে তাদের শিল্প, বাণিজ্য—কিছুরই উন্নতি হবে না। ইরান দরিদ্রই থেকে যাবে এবং পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করতে পারবে না।

ইংরেজরা পারসিকদের নবজাগরণ লক্ষ্য করে যুদ্ধের পর তৈল ব্যবসায়ে ইরানকে কতকগুলি সুবিধা দেয়। কিন্তু পারসিকগণ এতে সন্তুষ্ট হল না। তারা দেখল যে, ইঙ্গ-ইরান তৈল কোম্পানি বজায় থাকলে সাম্রাজ্যবাদীরা ইরানের বাণিজ্য ও রাজনীতিতে কর্তৃত্ব ও হস্তক্ষেপ করবে, তাই তারা তেলের খনিগুলি সম্পূর্ণ দখল করার জন্যে উঠে পড়ে লাগল। দেশব্যাপী জোর আন্দোলন শুরু হল। শেষ পর্যন্ত ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে বর্তমান শাহ মহম্মদ রেজা পাহ্লবী আইনের দ্বারা সমুদয় তৈল-সম্পদ্ ইরানের জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করলেন।

ইরানের এই আইন পাস করার ফলে ইংলণ্ড অত্যন্ত চটে যায়। ইরানের তৈল হাতছাড়া হলে ইংলণ্ডের ভীষণ আর্থিক বিপর্যয় হবে। রাশিয়াকে প্রতিরোধ

করার জন্যেও ইরান ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির হাতে থাকা দরকার। ইরানের তখনকার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ মহম্মদ মোসাদেক তেলের খনিগুলি কাজে খাটাবার জন্যে, আমেরিকার কাছে অর্থসাহায্য চেয়েছিলেন, কিন্তু সেদিকে তিনি বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। ইরানের বৃহৎ **আবাদান** তৈল-কারখানা অনেকদিন বন্ধ থাকায় এবং ইঙ্গ-ইরান তৈল কোম্পানির তীব্র প্রতিকূলতায় দেশে খুব আর্থিক বিপর্যয় ঘটে এবং বহু দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়। ডাঃ মোসাদেক খুব দক্ষতা ও সাহসিকতার সঙ্গে ইরানের এই বিপদ কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করেন।

কিন্তু শাহ ও তাঁর দল সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী শক্তিদের পরোক্ষ সহায়তায় ডাঃ মোসাদেকের বিপক্ষে চক্রান্ত করছিলেন। শাহ স্বাস্থ্যের অজুহাতে দেশত্যাগ করতে চাচ্ছেন টের পেয়ে মোসাদেক রাজার ক্ষমতা হ্রাস করা ও তাঁর সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত করার সংকল্প করলেন। রাজকীয় বাহিনী একটি 'কুপ' বা অতর্কিত আক্রমণ দ্বারা গবর্নমেণ্ট হস্তগত করতে প্রয়াসী হয়। কিন্তু ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে অগস্ট মাসে তাদের এ প্রচেষ্টা বিনষ্ট করে দেওয়া হয়। তখন রাজা ও রানী উত্তর-ইরান হতে রোমে পালিয়ে যান, কিন্তু পলায়নের পূর্বে শাহ মোসাদেকের স্থলে সেনাপতি জাহেদিকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করেন।

এরপরে দ্রুতগতিতে নাটকীয়ভাবে ঘটনাপরম্পরা চলতে থাকে যার ফলে শাহের সামরিক কর্মচারীদের সাহায্যে অবশেষে মোসাদেকের পতন ঘটে। কম্যুনিস্ট-ভাবাপন্ন গণতান্ত্রিক 'তুদে' দলকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়। শাহ তখন তেহরানে ফিরে আসেন ও বৈদেশিক অর্থসাহায্যের জন্যে আবেদন করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবিলম্বে ইরানকে অর্থসাহায্য করে এবং ইংলণ্ড ও ইরানের মধ্যে তৈলবিরোধের নিষ্পত্তি সাধনে অগ্রসর হয়। ডাঃ মোসাদেককে রাজদ্রোহিতার দায়ে অভিযুক্ত করা হয় এবং তাঁকে তিন বছরের জন্যে নির্জন কারাবাসে দণ্ডিত করা হয়। মোসাদেক শেষ পর্যন্ত অজ্ঞাত কারণে নিহত হন।

১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দের ৫ই অগস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড ও ইরানের মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদিত হয়। পূর্বতন ইঙ্গ-ইরান তৈল কোম্পানিকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে কাজ শুরু হয়। ঠিক হয়, ইরান তৈল ব্যবসায়ের অর্ধেক লাভ পাবে।

১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর জাফা শরিফ-ইমামি ইরানের প্রধান মন্ত্রী হন। বর্তমানে আমীর আব্বাস হুভেয়িদা প্রধান মন্ত্রী।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির দাবাখেলায় ইরানের ভৌগোলিক অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি-গোষ্ঠী, অপরদিকে রুশ শক্তি-গোষ্ঠী— দু'পক্ষই ইরানকে নিজেদের আওতায় রাখবার জন্যে চেষ্টা করে এসেছে।

ইরানের তৈল-সম্পদ্ এ ব্যাপারকে করে তুলেছে আরও জটিল। যা হোক, বর্তমানে ইরানে ইঙ্গ-মার্কিন প্রাধান্য বিরাজ করছে। ইঙ্গ-মার্কিন-পুস্ট বাগদাদ চুক্তির অন্যতম সদস্য ইরান। ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দের ৫ই মার্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইরানের এক দ্বি-পক্ষীয় চুক্তি সাধিত হয়েছে।

ইরানের আয়তন ১৬,২১,৮৬০ বর্গ কিলোমিটার (৬,২৭,০০০ বর্গ মাইল)।

জাতীয়তাবাদী নেতা ডাঃ মোসাদেক

এর মধ্যে বিস্তৃত অঞ্চল মরুভূমি। ইরানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে মাত্র ১৩ জন লোকের বাস।

ইরানের লোকসংখ্যা ২,৫৭,৮১,০৯০ (১৯৬৬, অক্টোবর)। রাজধানী তেহেরান (লোকসংখ্যা—২৮,০৩,১৩০)। ইরানের জনসংখ্যার অধিকাংশ সিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান। সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানের সংখ্যা ৮,৫০,০০০। শিক্ষিত লোকের সংখ্যা শতকরা ৪০ জন।

এশিয়া মহাদেশে আকারে ছোট যে কয়টি দেশ আছে, জাপান তাদের মধ্যে একটি; কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত এই দেশটি ছিল এশিয়ার মধ্যে সব চেয়ে বেশী শক্তিশালী।

জাপান উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত কয়েকটি দ্বীপের সমষ্টি। তন্মধ্যে হনশিউ-হোক্কাইডো, কিউশিউ ও শিককু প্রধান।

একশো বছরের'ও কম সময়ের মধ্যে জাপান এত শক্তিশালী হয়ে ওঠে! এশিয়া ভূখণ্ডের পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে পাঁচটি প্রধান ও আরও কয়েকটি ছোট ছোট দ্বীপ নিয়ে জাপানীদের দেশ। অনেকদিন পর্যন্ত তারা নিজেরাও দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও যেত না, অন্য দেশের কোন লোক এলে তাকেও জাপানে ঢুকতে দিত না। দেশে বড় বড় সব **দাইমিও** অথবা জমিদার ছিল। এরাই ছিল দেশের সব ধন-সম্পত্তির মালিক। এই জমিদারগণ ছাড়া আর একদল শক্তিশালী ও ভারতীয় ক্ষত্রিয়দের ন্যায় সম্ভ্রান্ত সামরিক সম্প্রদায় ছিল। তাদের জাপানী ভাষায় বলে **সামুরাই**।

জাপানে একজন রাজা অবশ্য ছিলেন, জাপানী ভাষায় তাঁকে বলে **মিকাডো**। কিন্তু সামুরাইদের প্রতাপ ছিল মিকাডোর চেয়ে অনেক বেশী। তারা সব সময়েই একজন আর একজনের সঙ্গে লড়াই করে জমিদারি

বাড়াবার চেষ্টা করত। সামুরাইদের মধ্যে যে সব চেয়ে বেশী ক্ষমতাশালী হয়ে উঠত, তার পরামর্শ মেনে চলা ছাড়া রাজার কোন উপায় থাকত না। সামুরাইদের একটা খুব বড় গুণ ছিল, নিজের অথবা দেশের সম্মান রক্ষার জন্যে দরকার হলে তারা প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হত না। অপমানিত হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে তারা হারাকিরি (আত্মহত্যা) করাও ভাল মনে করত।

সামুরাই

জাপানের ইতিহাস প্রায় তিন হাজার বছরের অধিক পুরাতন। জাপানীরা মনে করে যে, তাদের সম্রাট্‌বংশ সূর্যদেব হতে উদ্ভুত হয়েছে, এবং সেই বংশই ধারাবাহিক ভাবে আজ পর্যন্ত চলে এসেছে। এইজন্যে জাপানীরা চিরকাল দেশের সম্রাট্‌কে দেবতার মত ভক্তি করে। ৬৬০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে সম্রাট্ জিম্মু থেকে জাপানের সম্রাট্‌বংশের উদ্ভব।

সম্ভবতঃ জাপানীদের পূর্ব-পুরুষেরা কোরিয়া ও মালয় হতে জাপানে আসে। জাপানীরা মঙ্গোল জাতিভুক্ত লোক। দেশের নাম জাপান পরে দেওয়া হয়। প্রথমে জাপানের কতক অংশকে যামাতো বলত। প্রায় ২০০ খ্রীস্টাব্দে জিংগো-নামক এক রানী যামাতো রাজ্যের অধীশ্বরী ছিলেন। কোরিয়ার সঙ্গে যামাতোর নিকট-সম্পর্ক ছিল এবং কোরিয়ার মারফতেই চীন-সভ্যতা যামাতোতে আমদানী হয়েছিল। চীনের লিখিত ভাষাও কোরিয়ার ভিতর দিয়ে প্রায় ৪০০ খ্রীস্টাব্দে জাপানে পৌঁছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, জাপানে প্রথমে বড় বড় জমিদারদের হাতেই ক্ষমতা বেশী ছিল, কেন্দ্রীয় শক্তির ক্ষমতা সুসংহত ছিল না। কয়েকটি মুষ্টিমেয় অভিজাত বংশ অনেক সময় জাপানে প্রকৃত ক্ষমতার মালিক ছিল। প্রথম শোজা-বংশ জাপানে আধিপত্য লাভ করে। তাদের সময়ে বৌদ্ধধর্ম জাপানে রাজধর্মে

পরিণত হয়। শোজা-বংশের কিছু পর একজন বিখ্যাত জাপানী-প্রধান **কামাটোরী** 'ফুজিওয়ারা' নামে বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। সম্রাট্ একরূপ এই বংশেরই হাতের পুতুল ছিলেন। কামাটোরীর আমলে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা অনেকটা সুসংবদ্ধ

পুরাতন টোকিও নগরী
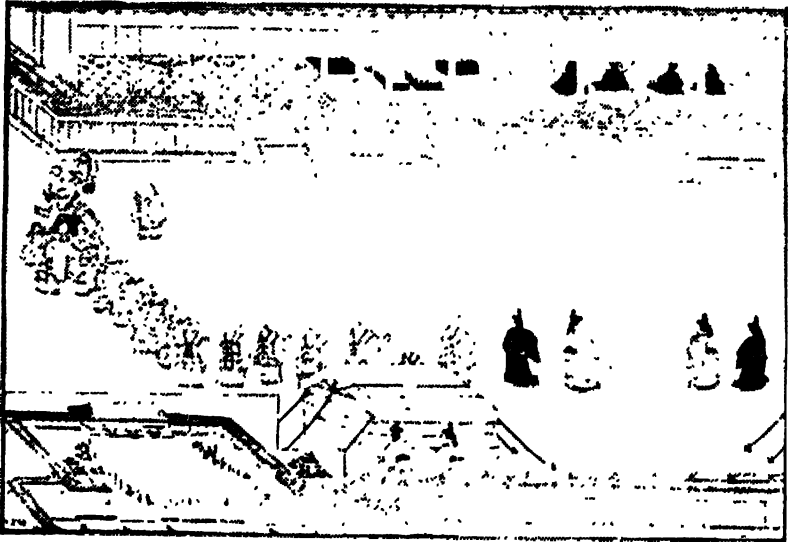
সিন্তোধর্ম বা পূর্বপুরুষদের পূজা

হয়। জাপানের প্রথম রাজধানী ছিল **নারা**। ৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে **কিয়োতোকে** করা হয় রাজধানী এবং বর্তমান যুগে, **টোকিওতে** রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত, প্রায় ১১০০ বছর কাল ধরে এই কিয়োতোই ছিল জাপানের রাজধানী।

জাপানীরা নিজেদের দেশকে বলে **দাই নিপ্পন** অথবা 'উদীয়মান সূর্যের দেশ'। চীন ও কোরিয়া হতে ষষ্ঠ শতাব্দীতে জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ করে। জাপানের প্রাচীন ধর্মকে বলে **সিন্তোধর্ম** অথবা 'দেবতাদের আচরিত পন্থা'। এই ধর্মে প্রকৃতি ও পূর্বপুরুষদের পূজা করার একটা সংমিশ্রণ-প্রথা দেখা যায়। এ একটি যোদ্ধাজাতির ধর্ম। এ ধর্মের জোরে জাপানে প্রাচীন রোমের মত দেশের লোককে সম্রাট্ ও মুষ্টিমেয় কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য-ভক্তি শেখানো হয়েছে। যদিও জাপান তার সভ্যতা ও সংস্কৃতি চীন ও কোরিয়া থেকে আমদানি করে, কিন্তু জাপানে এসে ঐ সভ্যতা নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়ে ওঠে।
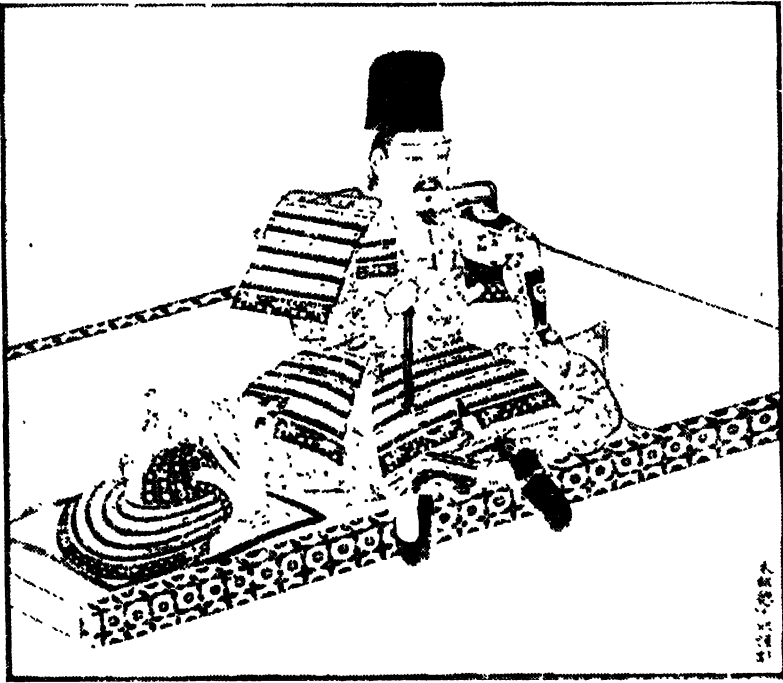
সোগান যুগের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম সোগান যোরিতোমো

চীনারা সৈনিকদের কোনদিনই সমাজে বড় স্থান দেয় নি, ব্যবসায়ীদের স্থানই বরাবর সেখানে উচ্চে; কিন্তু জাপানে চিরকাল সৈনিক-শ্রেণীই শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করে এসেছে। বৌদ্ধধর্ম প্রবেশের সময় হতে জাপানে শিল্প ও সংস্কৃতির ইতিহাস শুরু হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম জাপানের রাজধর্ম। বর্তমানে বৌদ্ধধর্ম ও সিন্তোধর্ম জাপানের প্রধান ধর্ম। সিন্তোদের এক লক্ষ এবং বৌদ্ধদের ১,০৬,৬৩৪টি উপাসনাস্থান আছে। জাপানে কয়েক সহস্র গির্জাও আছে।

সোগান যুগ

বহু বছর পর্যন্ত ফুজিওয়ারা-বংশ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। দ্বাদশ শতাব্দীতে **তাইরা** এবং **মিনামোতো** নামে দুই ক্ষমতাপন্ন **দাইমিও**-বংশের উদ্ভব হয়। মিনামোতো-পরিবারের **য়োরিতোমো** নামে একজন লোক এই সময় জাপানে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শাসনকর্তা হন। তখনকার সম্রাট্ তাঁকে **সোগান** অথবা 'প্রধান সেনাপতি' এই উপাধিতে ভূষিত করেন।

জাপানের সম্রাট্ তাঁর প্রধান সেনাপতিকে "সোগান" উপাধিতে ভূষিত করছেন

এরপর থেকে এই 'সোগান' উপাধি, উত্তরাধিকারসূত্রে দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকে। এখন থেকে এই সোগানই হয় জাপানের প্রকৃত শাসনকর্তা। প্রায় সাতশ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন নামজাদা বংশের সোগানরা জাপান দেশকে শাসন করেন। সম্রাটের হাতে এই সময় কোন ক্ষমতা থাকে না। **কামাকুরা** নামক স্থানে য়োরিতোমো তাঁর সামরিক রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। এজন্যে এ যুগের সোগানদের বলা হয় 'কামাকুরা সোগান'। এ যুগের শাসনকালে দেশে শান্তি ও সুনিয়ম স্থাপিত হয়।

১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে **আশিকাগা** নামে একটা নতুন সোগান-বংশের শাসনকাল আরম্ভ হয়। এদের সময় চীনে মিঙ্গ-বংশ রাজত্ব করছিল এবং এরা চীনের

নিকট হতে চিত্রাঙ্কন, কাব্য, গৃহনির্মাণ, দর্শন-বিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা করে। তারপর কিছুদিন জাপানে খুব জোর গৃহবিবাদ ও কলহ চলে।

অবশেষে তিন জন ব্যক্তি, শত বৎসরের গৃহযুদ্ধ থেকে জাপানকে উদ্ধার
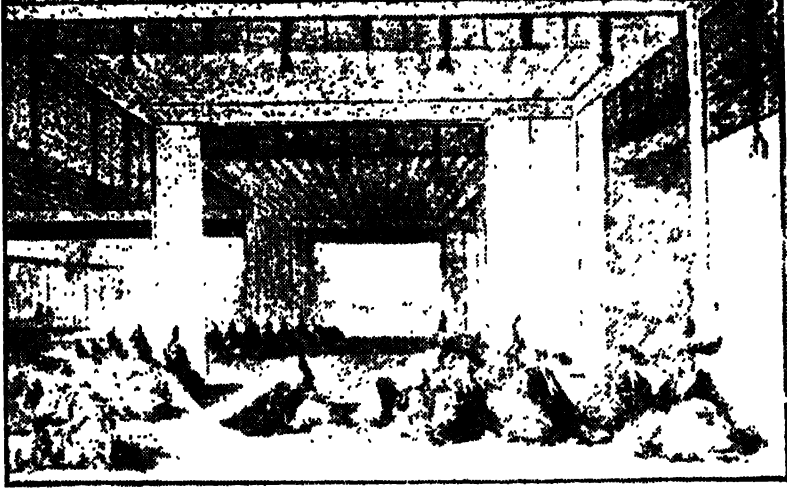
সোগানদের দরবার-গৃহ

করেন। তাঁরা হলেন **নোবুনাগা** নামে একজন দাইমিও অথবা জমিদার, দ্বিতীয়, **হিদেযোশী** নামে একজন কৃষক-সম্প্রদায়ের নেতা এবং তৃতীয়,
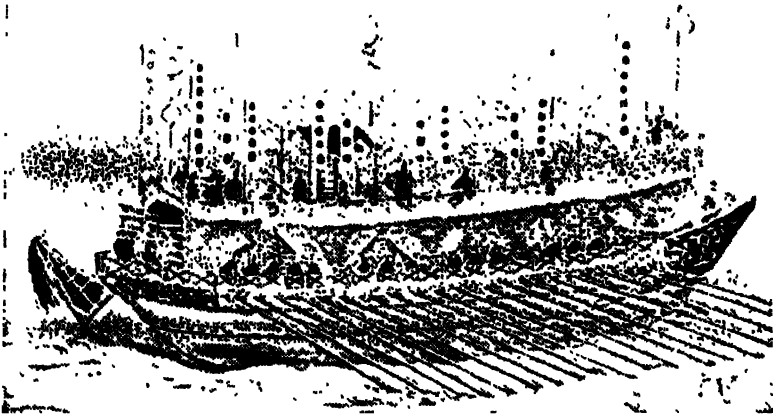
সোগানদিগের যুদ্ধ-জাহাজ (১৮৫০ খ্রীঃ)

তোকুগাওয়া ইযেযাশু নামে একজন শক্তিশালী জমিদার। তাঁদের মধ্যে ইযেযাশু সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সোগানপদ লাভ করেন এবং তিনি

তোকুগাওয়া সোগান-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইযেযাশু **'জেদো'** নগর নির্মাণ করেন। এই নগরই পরবর্তী কালে **টোকিও** নামে পরিচিত হয়।

তোকুগাওয়া-বংশের আমলে একজন সোগান একদল পোর্তুগিজ খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকের উদ্ধত আচরণে চটে গিয়ে তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলেন এবং অবশিষ্ট পৃথিবীর কাছ থেকে জাপানের দরজা একেবারে বন্ধ করে দিলেন। তিনি কঠোর ব্যবস্থা করলেন যে, কোন জাপানী বিদেশে যেতে পারবে না এবং বিদেশ থেকেও কোন লোক জাপানে ঢুকতে পাবে না। এইভাবে জাপান, দুই শতাব্দীরও বেশী সময় পর্যন্ত, পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকল। এ ইতিহাসের একটা অভিনব ব্যাপার! এর ফলে ঐ সময়ে অন্যান্য দেশের মত জাপানে উন্নতি হল না বটে, কিন্তু দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রইল।

অ্যাডমিরাল প্যেরী জাপানে অবতরণ করছেন

অবশেষে জাপান বাধ্য হয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি তার দরজা খুলে দিল। জাপানীদের সব কিছুই অদ্ভুত রকমের। এই সময় আবার তারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে, আশ্চর্য ক্ষিপ্রগতিতে এক অসাধারণ ব্যাপারকে সম্ভব করল। শীঘ্রই জাপানীরা বিভিন্ন ইওরোপীয় দেশে ছুটে গিয়ে তাদের শিল্প, সভ্যতা, সংস্কৃতি, শাসননীতি ও সামরিক বিদ্যা শিক্ষা করে তাদেরই প্রবল সমকক্ষ হয়ে দাঁড়াল।

আমেরিকার একজন নৌ-সেনাধ্যক্ষ কমোডোর **ম্যাথু সি প্যেরী** ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কতকগুলি যুদ্ধজাহাজ নিয়ে এসে জোর করে জাপানে

আলেকজান্ডারের সহিত পারসিকগণের যুদ্ধ

অবতরণ করেন। ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে প্যেরী এক চুক্তি করে জাপানের সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্যব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। আমেরিকার দেখাদেখি ইওরোপীয় জাতিরাও বাণিজ্যের লোভে জাপানে এসে উপনীত হল। জাপানীরা দেখল এদের বাধা দেওয়া বৃথা, কিন্তু তারা মনে মনে জ্বলতে লাগল। কি করে বিদেশীদের উন্নত অস্ত্রবিজ্ঞানে পারদর্শী হওয়া যায় সেজন্যে উন্মুখ হয়ে উঠল।

নবীন জাপানের প্রথম সম্রাট্—মুৎসিহিতো

দিকে দিকে জাপানী তরুণদের আধুনিক সামরিক জ্ঞান আয়ত্ত করবার জন্যে পাঠানো হল। **প্রিন্স ইতো, ওকুমা, ওকাকুরা** প্রমুখ প্রতিভাবান্ নেতারা, জাপানের জাতিগত দোষ-ত্রুটিগুলির সংশোধন করে দেশে নানাবিধ কার্যকরী সংস্কার-ব্যবস্থার প্রবর্তনের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

উন্নত পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির সংস্পর্শে এসে, জাপানে জাতীয়তার আবির্ভাব হল। এ পর্যন্ত দেশের ক্ষমতা ছিল সোগান, দাইমিও এবং সামরিক শ্রেণীর সামুরাইদের হাতে। অধিকাংশ জনসাধারণ অত্যন্ত দুর্দশায় কালযাপন করত। সোগানরা দেশের ভীষণ অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে অপারগ হওয়ায় জনসাধারণের অপ্রিয়ভাজন হলেন। ফলে, তাঁরা ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষমতা ত্যাগ করলেন এবং জাপানের সিংহাসনে সম্রাট্‌কে প্রতিষ্ঠিত করা হল।

প্রথম সম্রাটের নাম **মুৎসিহিতো**। তাঁর সিংহাসনে উপবেশন জাপানী ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা এবং এরই নাম **মেইজি** পুনঃপ্রতিষ্ঠা। 'মেইজি' জাপানী শব্দ, তার অর্থ 'নবযুগ'। 'মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠা' মানে আবার নবযুগের আরম্ভ। এবার মিকাডো বা সম্রাটের ক্ষমতা আস্তে আস্তে বাড়তে শুরু করল। দেশের লোকেরা অন্ধভাবে সামুরাইদের অনুসরণ না করে, দেশের সম্রাট্‌কে সম্মান করতে শিখল।

নবযুগ

বিদেশীরা জাপানে আসা-যাওয়া আরম্ভ করবার পর, জাপানীরা সেই সব দেশের রাজনীতি নিয়েও আলোচনা আরম্ভ করল। অন্য দেশের যেটি ভাল, সেটিকে নিজেরা গ্রহণ করতে লাগল। এই সময় জাপানীরা **জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে** জোর আন্দোলন আরম্ভ করে দিল। সেই আন্দোলনের ধাক্কা জমিদারেরা সামলাতে পারলেন না, দেশ থেকে জমিদারী প্রথা উঠে গেল। কৃষকেরা হল জমির মালিক।

রাজনীতি-ক্ষেত্রেও অনেক পরিবর্তন হল। এতদিন মিকাডো চলতেন সামুরাইদের পরামর্শে। এবার দেশে প্রজাদের প্রতিনিধি নিয়ে **পার্লামেণ্ট** গঠিত হল। **প্রিন্স ইতো** দেশের শাসনসংস্কারের প্রথম খসড়া তৈরি করেন। এই শাসনসংস্কার অনেকটা প্রাশিয়ার শাসনব্যবস্থার ভিত্তিতে রচিত হল। জাপানের শাসনসংস্কারে প্রজাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে থেকে লোক নিয়ে, একটি মন্ত্রিসভা গঠন করে, মিকাডোকে পরামর্শ দেবার ব্যবস্থা হল। ঠিক হল, মিকাডো এই সব মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে সব কাজ করবেন, আর মন্ত্রীরা সব সময় তাঁদের কাজের জন্যে এবং রাজাকে যে-সব পরামর্শ দেবেন, তার ফলাফলের জন্যে, পার্লামেণ্টের কাছে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য থাকবেন।

তবে দেশের সামরিক বিভাগের উপর রাজার ক্ষমতা অক্ষুন্ন রইল। সৈন্য-বিভাগ এবং নৌ-বিভাগ সম্বন্ধে মন্ত্রীরা রাজাকে পরামর্শ দিতে পারতেন না। ঐ দুটি বিভাগ রাজা প্রধান সেনাপতিদের সঙ্গে পরামর্শ করে চালাতেন। প্রধান সেনাপতিদের কোন কাজের জন্যে মন্ত্রীরা তাঁদের কৈফিয়ত তলব করতে পারতেন না।

নবযুগের আরম্ভের পর, জাপানীদের আর্থিক অবস্থাও অনেক ভাল হতে লাগল। যারা দেশে কারখানা তৈরি করত, কিংবা বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করত, গবর্নমেণ্ট থেকে তাদের টাকা দিয়ে সাহায্য করা হত। জাপানী চাষীদের যাতে শুধু জমির ফসলের আয়ের উপর নির্ভর করে থাকতে না হয়, সেজন্যে তাদের রেশম-গুটির চাষ, ফল-ফুলের চাষ এবং নানারকম কুটীর-শিল্প শিক্ষা দেওয়া হল। ঘরে বসে তারা কাপড়-বোনা

জাপানের ওশাকা দুর্গ

এবং খেলনা, চীনামাটির বাসন প্রভৃতি তৈরি করে অবসর সময় টাকা রোজগার করত।

এই নবজাগরণের পর, অতি অল্প সময়ের মধ্যে জাপান বিভিন্ন উন্নতিকর ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে, শীঘ্রই খুব ক্ষমতাপন্ন দেশ হয়ে উঠল। চীন ছিল এই সময় অন্তঃকলহে দ্বিধাবিভক্ত এবং সাম্রাজ্যবাদী পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির অন্যায় হস্তক্ষেপ দ্বারা জর্জরিত। জাপান ইতিমধ্যে, ইওরোপীয় দেশগুলির নীতি অবলম্বন করে প্রবল হয়ে উঠেছিল। শীঘ্রই সে চীনের দুর্বলতা দেখে, নিজের শক্তি প্রসারকল্পে, তার সঙ্গে এক যুদ্ধ বাধাল এবং অল্প কয়েক দিনের মধ্যে, অনায়াসে এই যুদ্ধ জিতে, চীনদেশের উপর তার ক্ষমতা-বিস্তারের সূত্রপাত করল।

এই যুদ্ধ ১৮৯৪-৯৫ খ্রীষ্টাব্দের **চীন-জাপান যুদ্ধ** নামে খ্যাত। এই

যুদ্ধে জয়ের ফলে জাপান ফরমোজা ও অন্যান্য কয়েকটি দ্বীপ অধিকার করল। কোরিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করা হল। জাপান অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য শক্তির ন্যায় চীনে কতকগুলি বিশেষ সুবিধা আদায় করল।

রুশ-জাপান যুদ্ধ

জাপানের পাশেই, সমুদ্রের ওপারে, কোরিয়া দেশটি চীনের অন্তর্গত একটি প্রদেশ ছিল। রাশিয়ার নজর পড়ল এই কোরিয়ার উপর। চীন-জাপান যুদ্ধ-জয়ের ফলে কোরিয়া এবং মাঞ্চুরিয়াস্থিত **পোর্ট আর্থার** বন্দরে জাপান যে অধিকার লাভ করেছিল, রাশিয়া সেখানে বাধা দিল। জাপান বুঝতে পারল যে, রাশিয়া যদি কোরিয়া দখল করতে পারে, তাহলে সেখান থেকে জাপানকেও সে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে পারবে; ঘরের এত কাছে একটা সাম্রাজ্যলোলুপ জাতিকে আসতে দিলে, ভবিষ্যতে তারও বিপদ্ ঘটতে পারে। তাই জাপান ঠিক করল, রাশিয়াকে কোন মতেই কোরিয়া দখল করতে দেওয়া হবে না।

পোর্ট আর্থারে জাপানের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধ

চীনের রাজা তখন দুর্বল, কোরিয়াকে পরের আক্রমণ হতে রক্ষা করবার ক্ষমতা তাঁর নেই। জাপান, চীনের রাজার হাত থেকে কোরিয়া কেড়ে নিল, কিন্তু তাকে জাপানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত তখনই করল না। কোরিয়াকে স্বাধীন রাজ্য বলে ঘোষণা করে সে তার অভিভাবকত্ব আরম্ভ করে দিল।

কোরিয়ার উত্তর-পশ্চিম দিকের বিরাট ভূমিখণ্ড **মাঞ্চুরিয়াও** কোরিয়ারই মত চীনের একটি প্রদেশ। কোরিয়াকে স্বাধীন করে দেবার সঙ্গে সঙ্গে জাপান, মাঞ্চুরিয়ার দক্ষিণে, **লিয়াওটুং** নামক একটি উপদ্বীপ দখল করে নেয়। রাশিয়া এই ব্যাপারে ভয়ানক অসন্তুষ্ট হয়ে জাপানের ব্যবহারের নিন্দা করতে আরম্ভ করল। জাপান তখন লিয়াওটুং উপদ্বীপটি চীনকে ফিরিয়ে দেয়।

লিয়াওটুং-এর স্বাধীনতার জন্যে রাশিয়ার বিন্দুমাত্র গরজ ছিল না। সে প্রতিবাদ করেছিল এই জন্যে যে, কোরিয়া এবং লিয়াওটুং, এই দুটো জায়গা জাপানের হাতে থাকলে তার নিজের অসুবিধা। কাজেই জাপান চীনকে লিয়াওটুং ফিরিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়া এসে সেটা দখল করে নিল।

সাইবিরিয়ার পূর্বদিকে প্রশান্ত-মহাসাগরের তীরে রাশিয়ার ভাল বন্দর একটাও ছিল না। **ভ্লাডিভোস্টক** নামে একটা বন্দর ছিল বটে, কিন্তু তার সামনের সমুদ্র শীতকালে জমে যেত বলে, সারা বছর জাহাজ-চলাচলে অসুবিধা হত। এই অসুবিধা দূর করবার জন্যে রাশিয়া, লিয়াওটুং উপদ্বীপ দখল করেই সেখানে **পোর্ট আর্থার** এবং **ডেইরেন** নামক দুটি বন্দর অধিকার করল।

এই সব ব্যাপার নিয়ে জাপানের সঙ্গে রাশিয়ার ভীষণ সংঘর্ষ বেধে গেল। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে জাপান ইংলণ্ডের সঙ্গে এক মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করে নিল। ইংলণ্ডও রাশিয়ার অগ্রগতি মোটেই ভাল চোখে দেখছিল না। অবশেষে ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে রাশিয়া ও জাপানের বিরোধ চরমে উঠল এবং শীঘ্রই দুই দেশের মধ্যে এক ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হল। মুকদেনে উভয় পক্ষই ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল। ৎসুসিমায় রাশিয়ার নৌবাহিনী বিধ্বস্ত হয়ে গেল। রাশিয়া ক্রমাগত হেরে যেতে লাগল। এই যুদ্ধে জাপান বিস্ময়কর নৈপুণ্য দেখিয়ে জয়লাভ করল। এতে পৃথিবীর সব দেশের কাছেই জাপানের সম্মান অনেক বেড়ে গেল। এশিয়ার ক্ষুদ্র দেশ জাপানের পক্ষে অতবড় ইওরোপীয় রাজ্য রাশিয়াকে পরাজিত করা, এশিয়ার অবনত জাতিদের মনে প্রচুর উৎসাহ ও উন্মাদনা এনে দিল।

রাজনৈতিক দল

রাশিয়াকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে জাপানের শক্তি দ্রুত বাড়তে লাগল। ব্যবসা-বাণিজ্য, নৌ-শক্তি, সামরিক বিদ্যা সমস্ত দিকে আধুনিক উন্নত পাশ্চাত্ত্য শক্তিসমূহের অনুকরণ করে, জাপান অতি সত্বর একটি প্রধান শক্তিতে পরিণত হতে আরম্ভ করল। গণতান্ত্রিক নীতিতে রাজনৈতিক দল গঠিত হল। কিন্তু জাপানের নবজাগরণে একটি অদ্ভুত স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান জাপানে সংমিশ্রিত হয়েছিল একদিকে যান্ত্রিক ও শিল্পসভ্যতা, আর একদিকে মধ্যযুগীয় সামন্ত-আদর্শ, একদিকে পার্লামেণ্ট

শাসন এবং অপরদিকে স্বৈরাচার ও সামরিক কর্তৃত্ব। সম্রাটকে সম্মুখে প্রতীকস্বরূপ রেখে, তাঁর নামে কতিপয় অভিজাত পরিবার ও সামরিক শ্রেণী দেশে আধিপত্য চালিয়েছে। বস্তুতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত মুষ্টিমেয়

জাপানের একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্ প্রিন্স হীরোবুমী ইতো

কয়েকটি শক্তিশালী পরিবারই জাপানের শিল্পে ও রাজনীতিতে অটুট প্রভাব বিস্তার করেছে।

জাপানে প্রথমে দুটো রাজনৈতিক দল গড়ে উঠেছিল, একটির নাম **সেজুকাই,** অপরটি **মিনসিতো**। সেজুকাই দলের ধারণা ছিল যে, বিদেশের সঙ্গে বেশী বাণিজ্য না করে, দেশের লোকদের নিজেদের মধ্যে, ব্যবসা-বাণিজ্য

করাই ভাল। জাপানীরা কোন কারখানা তৈরি করলে অথবা চাষবাসের জন্যে দরকার হলে, সরকারী তহবিল থেকে টাকা দিয়ে সাহায্য করা, দেশের পক্ষে ভাল বলে তারা মনে করত।

জাপানের প্রায় সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্যই দেশের চারটি পরিবারের হাতের মুঠোয় ছিল। তাদের নাম **মিৎসুই, মিৎসুবিশি, যাসুদা** এবং **সুমিতোমো**। এদের মধ্যে আবার মিৎসুই পরিবারটিই ছিল সবচেয়ে বেশী ধনী। এই মিৎসুই-বংশ সেজুকাই দলের নেতা, আর মিনসিতো দলের নেতা হল মিৎসুবিশি-বংশ।

মিনসিতো দল চাইতেন যে, বিদেশের সঙ্গে জাপানের বাণিজ্য ক্রমেই বাড়তে থাকুক এবং বাণিজ্য চালাবার জন্যে দেশে বড় বড় জাহাজ তৈরী হোক। এঁদের এই মতের কারণও যে না ছিল, তা' নয়। মিৎসুবিশিদের খুব বড় বড় জাহাজের কারখানা ছিল; কাজেই জাপান বৈদেশিক বাণিজ্যের দিকে ঝোঁক দিলে, বেশী করে জাহাজ তৈরী হবে এবং এঁতে তাঁদের লাভ বেশী হবে, এই ছিল তাঁদের ধারণা।

সেজুকাই এবং মিনসিতো ছাড়া, জাপানের সৈন্য এবং নৌ-বিভাগের বড় বড় সেনাপতিরা মিলে, আর একটা দল গড়ে তুলেছিলেন। তার নাম সামরিক দল। জাপানে প্রথম পার্লামেণ্ট গঠিত হবার পর, সেজুকাই দলের হাতে দেশের শাসন-ভার চলে আসে। তারপরে প্রবল হয়ে উঠল মিনসিতো দল; তারা সেজুকাইদের হাত থেকে দেশ-শাসনের দায়িত্ব কেড়ে নিল। ক্রমে সেজুকাই এবং মিনসিতো দুই দলই কোণঠাসা হয়ে গেল।

পরিশেষে দেশের শাসন-ভার এসে পড়ল সামরিক দলের হাতে। দেশজয়ের আকাঙ্ক্ষা এঁদের মনে অত্যন্ত প্রবল ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চার বছর আগে, কোরিয়াকে জাপান তার নিজস্ব সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। জাপানের উত্তরে **সাখালিন** নামে একটা দ্বীপ আছে, সেটা ছিল রাশিয়ার। রুশ-জাপান যুদ্ধের পর জাপান, তার অর্ধেকটা আদায় করে নেয়।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ামাত্র জাপান মিত্রশক্তির পক্ষে যোগদান করে জার্মেনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। সে চীনে জার্মেনীর অধিকারভুক্ত সাণ্টুং প্রদেশস্থ কিয়উচউ দখল করে। এর অর্থ, এখন থেকে জাপান রীতিমত মূল চীন-ভূখণ্ডে সাম্রাজ্য প্রসার করতে শুরু করল। অন্যান্য শক্তিরা যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল দেখে জাপান ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে চীনের উপর কুখ্যাত **একুশ দফা দাবি** চাপিয়ে দিল—এবং তার কতকটা সে আদায় করেও নেয়।

যুদ্ধের পর কিছুদিন জাপান চীনের প্রতি আক্রমণ থেকে বিরত থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধী-নীতি ও ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ওয়াশিংটন চুক্তির ফলে জাপান কয়েক বছর চুপচাপ থাকে, তবে ভিতরে ভিতরে তার সাম্রাজ্যবাদী অভিযান তীব্রবেগেই চলছিল।

অবশেষে সমস্ত ন্যায়-নীতি উপেক্ষা করে জাপান ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে তুচ্ছ অজুহাতের উপর মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে। সাংহাইর নিকটবর্তী অঞ্চলেও চীনাদের উপর অযথা বর্বরোচিত আক্রমণ চালায়। এই সময় চীনের বালক
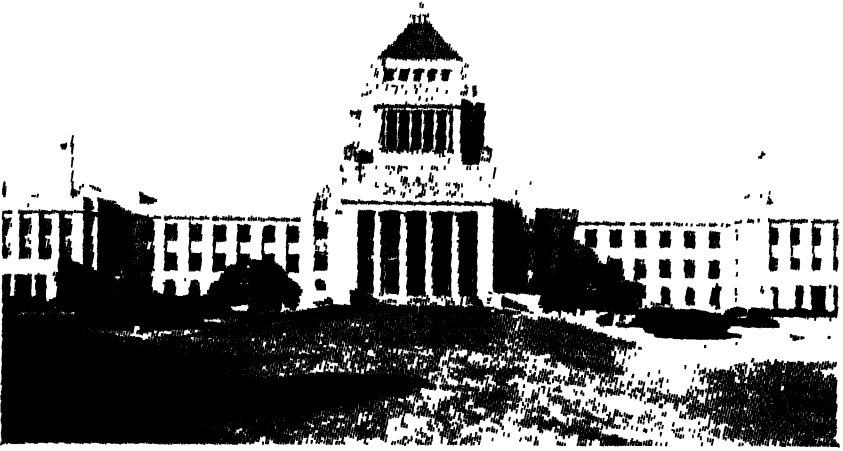
জাপ পার্লামেণ্ট

ও যুবকগণ নির্ভীকভাবে ও অসীম বীরত্বের সঙ্গে জাপানকে বাধা দিয়েছিল, কিন্তু চিয়াং কাইশেকের স্বার্থপর নীতির জন্যে তারা বিশেষ সফলতা অর্জন করতে পারে নি। জাপান মাঞ্চুরিয়া জয় করে সেখানে মাঞ্চুকুয়ো নামে একটি তাঁবেদার রাষ্ট্র গঠন করে।

এইভাবে রাজ্যবিস্তার করেও জাপানের লোভ কমল না। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সমস্ত চীনদেশটিকে অধিকার করবার জন্যে, অত্যন্ত অন্যায়রূপে সে প্রবল যুদ্ধ আরম্ভ করল। চীনের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করবার পর তার নিজেরও যথেষ্ট শক্তিক্ষয় হল; কিন্তু তবুও তার সাম্রাজ্যলোভ হ্রাস পেল না। চীনের বিভিন্ন দল এই সময়ে তাদের বিভেদ ভুলে জাপানকে জোর বাধা দিয়েছিল ও জাপানের জিনিসপত্র বয়কট করে তাকে খুব কাবু করেছিল। ভারত তখন নানাভাবে চীনের প্রতি সহানুভূতি দেখায় ও জাপানের নির্মম আক্রমণ-নীতির নিন্দা করে।

দেশের উন্নতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত পরের রাজ্য গ্রাস করবার লোভ জাপানের খুব বেশী ছিল; কিন্তু তাই বলে নিজের দেশের উন্নতির দিকে দৃষ্টি দিতেও সে ভোলে নি। ক্রমে, জাপানের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির খুব উন্নতি হয়। দেশের শিক্ষা-বিস্তারের জন্যও তারা যথেষ্ট চেষ্টা করে।

জাপানের মৃৎশিল্প

জাপানের লোকসংখ্যা খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে চলে এর জন্যে তাদের একটু অসুবিধায় পড়তে হয়। জাপানীদের সাম্রাজ্য-বিস্তার প্রয়াসের এটা একটা বড় কারণ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিয়ে জাপানের খুব লাভ হয়েছিল। সেই সময় সে, দেশে খুব বড় বড় অনেক কল-কারখানা স্থাপন করে দেশের অনেক লোকের আয়ের ব্যবস্থা করে। জাপানী কাপড়, জাপানী রেশম, জাপানী শাল-আলোয়ান, খেলনা, চীনামাটির বাসন, এমন কি, লোহার কলকবজা পর্যন্তও জাপানীরা পৃথিবীর সর্বত্র চালান দিয়ে প্রচুর অর্থোপার্জন করে।

এইভাবে জাপানের শিল্প-সমৃদ্ধি বেড়ে যাওয়ার ফলে জাপানের অহমিকা ও সাম্রাজ্য-বিস্তারের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ গগনস্পর্শী হয়ে ওঠে। ফলে পৃথিবীর সব-কিছুকেই তুচ্ছজ্ঞান করা হয়ে উঠল তার পক্ষে স্বাভাবিক—আর তাই অবশেষে পৃথিবীর ভয়াবহ বিপর্যয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে তাকে টেনে নিয়ে আসে। জাপানের ক্রমবর্ধমান উন্নতির ফলে ইওরোপের অনেক দেশ ও আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্র তখনই তাকে ঈর্ষার চোখে দেখতে আরম্ভ করে দিয়েছিল।
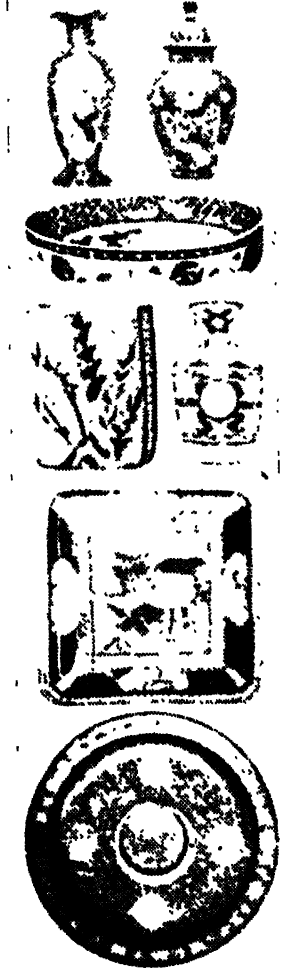
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

চীন-জাপান যুদ্ধকালে, পূর্বেকার ফরাসী-অধিকৃত ইন্দোচীন এবং ব্রহ্মদেশ, এই দুই দেশের ভিতর দিয়ে চীন সরকার অস্ত্রশস্ত্রাদির সরবরাহ লাভ করতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মেনীর হাতে ফ্রান্স পরাস্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই জাপান ফরাসী সরকারের নিকট দাবি করল যে, ইন্দোচীনের ভিতর দিয়ে এই **সরবরাহ বন্ধ** করতে হবে। পেতঁ্যার অধীনে ফরাসী তাঁবেদার সরকার তখনই সম্মত হল এই প্রস্তাবে। তখন জাপান ইংরেজ সরকারের কাছেও দাবি পাঠাল যে ব্রহ্মদেশের ভিতর দিয়েও অনুরূপভাবে রাস্তা বন্ধ করতে হবে। ইংরেজরা তখন যুদ্ধে বিব্রত, কাজেই তারা জাপানকে অসন্তুষ্ট করতে সাহস করল না। তারা তিন মাসের জন্যে বর্মা রোড বন্ধ করে দিল।

তিন মাস পরে এই পথ আবার মুক্ত করে দিল ইংরেজ সরকার। এতে জাপান রুষ্ট হল। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর, সে জার্মেনী ও ইতালির সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হল। এই সন্ধির শর্ত অনুযায়ী সামরিক, বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক সকল বিষয়েই, একযোগে ও একলক্ষ্যে কাজ করবার জন্যে প্রস্তুত হল এই তিনটি দেশ।

এই সন্ধির বলে জাপান সুদূর প্রাচ্যে একাধিপত্য স্থাপন করতে সমর্থ হবে, এই ছিল তার আশা; কিন্তু এক্ষেত্রে তার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্র যাতে ইওরোপীয় বিশ্বযুদ্ধে কোনমতে জড়িয়ে না পড়ে, তারই জন্যে প্রাণপণ চেষ্টার অন্ত ছিল না জাপানের; কিন্তু তার আত্মম্ভরিতা তখন এতই প্রবল যে, জাপান অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস করত যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার উন্নতির অন্তরায় হলে তাকেও সে সহজেই পর্যুদস্ত করতে পারবে।

ফলতঃ জাপ সরকারের মতিগতি উত্তরোত্তর এতই আক্রমণাত্মক হয়ে উঠল যে, ১৯৪১, ৬ই ডিসেম্বর তারিখে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তখনকার প্রেসিডেণ্ট **রুজভেণ্ট** শান্তি কামনা করে সরাসরি জাপ-সম্রাটের কাছে এক ব্যক্তিগত আবেদন প্রেরণ করলেন। কিন্তু তাতে ফল কিছুই হল না।

কোন চরম-পত্র প্রদান না করেই, ৭ই ডিসেম্বর সকাল ৭টায় জাপানী বিমানবহর বোমাবর্ষণ করল মার্কিন-অধিকৃত **পার্ল হারবার** বন্দরে। ম্যানিলাস্থিত মার্কিন ঘাঁটিও আক্রান্ত হল।

এইসব ব্যাপার সংঘটিত হওয়ার সম-সময়েই, জাপান যুদ্ধঘোষণা করল

ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। ৭ই তারিখেই রাত্রে সে সিঙ্গাপুরে বোমাবর্ষণ করল, সঙ্গে সঙ্গে জাপ-সৈন্য মালয় ও থাইল্যাণ্ডে অবতরণ করে এক চমকপ্রদ দৃশ্যের সৃষ্টি করল।

ব্রিটেন, কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ-আফ্রিকা, সবাই **একযোগে যুদ্ধঘোষণা** করল জাপানের বিরুদ্ধে। জাপ-সৈন্য, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের স্থানে স্থানে অবতরণ করল এবং তারা ইংরেজ যুদ্ধ-জাহাজ **"প্রিন্স অব ওয়েলস্"** ও **"রিপাল্স্"** ডুবিয়ে দিল।

জাপ-সৈন্য জলে, স্থলে ও ব্যোম-পথে আক্রমণ করল হংকং।
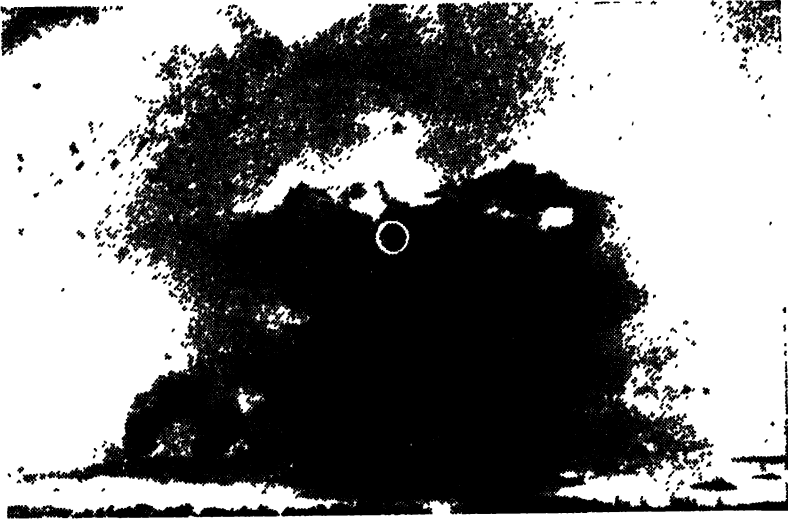
পার্ল হারবারে বোমাবর্ষণ

২৫শে ডিসেম্বর হংকং আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। মালয়ের বহু স্থানে, বোর্নিওতে এবং পেনাংয়ে যুদ্ধ চলল। সর্বত্রই মিত্রশক্তিকে পশ্চাৎপদ হতে হল।

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারি, জাপ-সৈন্য **ম্যানিলা** অধিকার করল। তারপর তারা **সিঙ্গাপুরে** প্রবলবেগে বোমাবর্ষণ শুরু করল।

বাতান দ্বীপে মার্কিন সেনাপতি ম্যাক-আর্থারের সৈন্যদলের উপর ভীষণ আক্রমণ করল জাপ-সৈন্য। জাপানের প্ররোচনায় থাইল্যাণ্ড ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করল। সিঙ্গাপুরের যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনী ক্রমশঃ পশ্চাৎপদ হতে লাগল। ১৫ই ফেব্রুয়ারি **সিঙ্গাপুরের পতন** হল।

এই সময়ে জাপানী কর্তৃপক্ষ সিঙ্গাপুরে যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সৈন্য ও সেনাপতিগণকে **আজাদ হিন্দ্ বাহিনী** গঠন করবার জন্যে পরামর্শ দিতে লাগল। ৭ই মার্চ রেঙ্গুন পরিত্যাগ করল ইংরেজ-সেনা। এদিকে জাভাও আত্মসমর্পণ করল জাপ-সৈন্যের কাছে। ১২ই তারিখে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ থেকে ইংরেজ-সৈন্য অপসৃত হল। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সর্বাধিনায়ক **নেতাজী সুভাষচন্দ্র**, আন্দামান ও নিকোবর অধিকার করে তাদের নতুন নামকরণ করলেন **'স্বরাজ'** ও **'শহীদ'** দ্বীপপুঞ্জ।

হিরোসিমায় পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ

তারপর সিংহলের রাজধানী কলম্বো, এবং মাদ্রাজ রাজ্যের বন্দরসমূহে জাপানীরা বোমাবর্ষণ করল।

জাপানীরা চট্টগ্রাম ও আসামে বোমাবর্ষণ করল। এ আক্রমণের সঙ্গে অবশ্য আজাদ হিন্দ্ ফৌজের কোন সংস্রব ছিল না।

কলকাতায় প্রথম বোমাবর্ষণ হল ২০শে ডিসেম্বর (১৯৪২)।

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে চীন-যুদ্ধে জাপানীদের **বিপর্যয় শুরু** হল।

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম কয়েক মাস, মিত্রশক্তির মনোযোগ প্রধানতঃ জার্মেনীর দিকেই নিবদ্ধ থাকায় প্রাচ্যের রণাঙ্গনে চাঞ্চল্যকর পরিণতি কিছু ঘটতে পারে নি। তবে জেনারেল **ম্যাক-আর্থার** সর্বত্রই জাপ নৌ ও বিমানবহরের শক্তিকে ক্রমশঃ খর্ব করে আসছিলেন। ১৯শে ফেব্রুয়ারি

আইওজিমা অধিকৃত হল। এপ্রিলের মাঝামাঝি **ওকিনাওয়াতে** হল তুমুল যুদ্ধ। ৬০০০০ জাপ-সৈন্য মার্কিন অগ্রগতির প্রতিরোধ করল। তাদের কামানের বহর ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। এখানে যুদ্ধ চলল ৮২ দিন। অবশেষে ২১শে জুন মার্কিন সৈন্যদল ওকিনাওয়া অধিকার করল।

এদিকে চীনে অবস্থিত জাপ-সৈন্য ক্রমে ক্রমে পরাজিত হচ্ছিল। চীনা সৈন্যদল মার্কিন সমর-শিক্ষকদের কাছে আধুনিক যুদ্ধপ্রণালী শিক্ষা করে জাপানীদের সমকক্ষ হয়ে উঠল। তারা **কোরেলিন** থেকে জাপ-সেনাদের বিতাড়িত করল ২৯শে জুলাই।

আবার **রাশিয়া** ওদিকে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করল. দ্রুতগতিতে মাঞ্চুরিয়ায় এসে উপস্থিত হল রুশ-বাহিনী। জাপ-নিয়ন্ত্রিত মাঞ্চুকুয়ো-সরকারের পতন হল। মাঞ্চুকুয়ো-সম্রাট্ ছিলেন জাপানের ক্রীড়াপুত্তলী, তাঁকে বন্দী করে নিয়ে গেল রুশেরা। রুশ-সেনা জাপানে উপস্থিত হল।

এদিকে বিশ্বযুদ্ধের দ্রুত সমাপ্তি ঘটাবার জন্যে **পারমাণবিক বোমা** নিক্ষেপ করল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের **হিরোসিমা** ও **নাগাসাকি** বন্দরে (৬ই ও ৯ই অগস্ট, ১৯৪৫)। বন্দর দুটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। এই সর্বনাশা অস্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার আর কোন উপায়ই রইল না জাপানের। জাপ-সম্রাট্ হিরোহিতো নিজে অগ্রসর হয়ে সন্ধি প্রার্থনার উপদেশ দিলেন মন্ত্রিসভাকে। সেই অনুসারে টোকিও উপসাগরে **"মিসৌরী"** জাহাজে মিত্রশক্তির কাছে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করল জাপান (২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫)।

জাপানের যুদ্ধকালীন প্রধান মন্ত্রী তোজো

তারপর ৯ই সেপ্টেম্বর, চীনস্থিত দশ লক্ষ জাপ-সৈন্য, চীনা সেনাপতি হো-ইং-চীনের কাছে নানকিং শহরে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করল।

মিত্রশক্তি জাপানের উপর অপেক্ষাকৃত সদয় ব্যবহার করল। হিরোহিতোকে সিংহাসনচ্যুত করা হল না। মিত্রশক্তির পক্ষ হতে জেনারেল ম্যাক-আর্থার হলেন জাপানের শাসনকর্তা। তাঁর নিয়ন্ত্রণে জাপ-মন্ত্রিসভা আভ্যন্তরীণ শাসন-কার্য চালিয়ে যেতে লাগলেন।

যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী **তোজো** ও তাঁর সহকর্মিগণ যুদ্ধাপরাধী হিসাবে মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত হলেন।
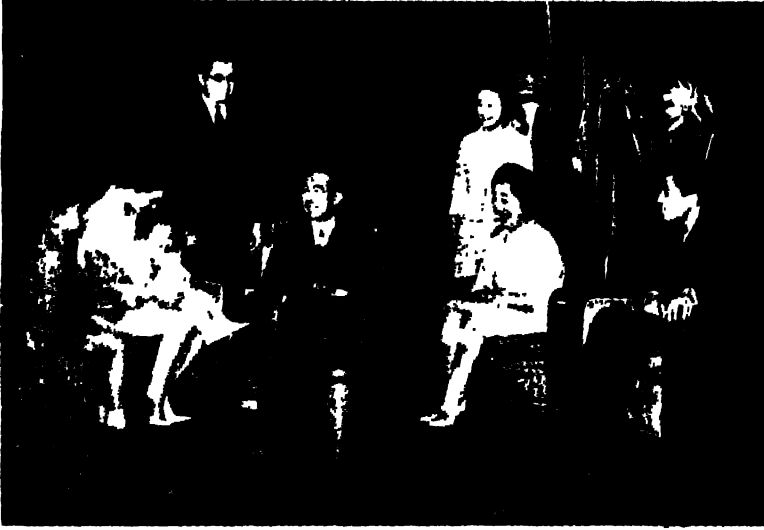
সপরিবারে জাপ সম্রাট্ হিরোহিতো

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, জাপান জেনারেল ম্যাক-আর্থারের নির্দেশে, ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শে এক গণতান্ত্রিক শাসন সংবিধান রচনা করেছে।

যুদ্ধোত্তর যুগে, ইঙ্গ-মার্কিন চক্রের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরোধিতা ক্রমেই তীব্র হয়ে ঘনিয়ে উঠছে। এই বিরোধ-দ্বন্দ্বে আমেরিকা প্রাচ্যে জাপানকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে শক্তিশালী ঘাঁটিরূপে পরিণত করতে চায়। এই উদ্দেশ্যে জাপানীদের সামরিক শৌর্যকে জাগিয়ে তোলার জন্যে আবার জোর চেষ্টা চলছে।

রাশিয়া, চীন, ভারত প্রভৃতি দেশের অমতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সান-ফ্রান্সিসকোতে রাষ্ট্রসংঘের এক বৈঠকে (৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫১ খ্রীঃ) **জাপ-শান্তিচুক্তি** প্রস্তাব পাস করায়। এই বৈঠকে ৪৯টি অকম্যুনিষ্ট দেশ চুক্তি

অনুমোদন করে। জাপান ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে এপ্রিল স্বাধীন রাষ্ট্র বলে পরিগণিত হয়।

১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই অগস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জাপানের এই মর্মে এক চুক্তি হয় যে, জাপানের অস্ত্রনির্মাণের পূর্ণ অধিকার থাকবে।

১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের, ২৫শে ফেব্রুয়ারি নবুসুকে কিশি জাপানের প্রধান মন্ত্রী হন। ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি প্রধান মন্ত্রী থাকেন।

১৯৬০ খ্রীঃ জাপানের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক নূতন চুক্তি হয়। এই চুক্তির বিরুদ্ধে জাপানে এক প্রবল আন্দোলন হয়। তার ফলে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের জাপান পরিদর্শন স্থগিত হয়।

১৯৬০ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই জুলাই হায়াতো ইকেদা প্রধান মন্ত্রী হন। ইসাকু সাতো বর্তমান প্রধান মন্ত্রী।

জাপানে শিন্টো ও বৌদ্ধধর্মের লোকের সংখ্যাই বেশী। শিন্টো ধর্মাবলম্বীদের উপাসনাস্থান প্রায় এক লক্ষ, বৌদ্ধ মন্দিরের সংখ্যা ১,০৬,৬৩৪।

জাপানের প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই সহশিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

টোকিওতে অবস্থিত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এশিয়ার মধ্যে সর্বাপেক্ষা কর্মব্যস্ত।

জাপানের আয়তন ৩,৬৯,৬৬২ বর্গ কিলোমিটার (১,৪২,৭২৬.৫ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ৯,৮২,৮১, ৯৫৫ (১৯৬৫, ১লা অক্টোবর)। জনসংখ্যা প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ২৬৫·৯ জন।

টোকিও জাপানের রাজধানী। বর্তমানে টোকিওই পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা জনবহুল শহর। লোকসংখ্যা ১,০৯,০৫,২৬৪ (১৯৬৬ খ্রীঃ)।

আরবদেশের পশ্চিমে ঈজিপ্ট, উত্তরে সিরিয়া ও ইরাক, একটু পূর্বে ইরান এবং খানিকটা দূরে, উত্তর-পশ্চিমে এশিয়া-মাইনর। আকারে আরবদেশ ইওরোপের প্রায় চার ভাগের এক ভাগ, কিন্তু অধিকাংশই তার ফাঁকা মরুভূমি। দেশটির তিন দিকে শুধু সমুদ্রের তীরে তীরে এবং উত্তর দিকের খানিকটা জায়গায় গাছপালা জন্মায়। সেই কয়টি জায়গাতেই শহর এবং গ্রাম গড়ে উঠেছে। এইগুলি নিয়েই আরবদের দেশ।

আরবদের মধ্যে দুইরকম লোক ছিল। এক ধরনের আরব ঘরবাড়ি তৈরি করে চাষ-আবাদের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করত। আর এক ধরনের আরব ছিল যারা মরুভূমির মধ্যে ঘুরে বেড়াত এবং তার মধ্যে কোন লোককে পেলেই তার যথাসর্বস্ব লুটপাট করে তারই দ্বারা জীবনধারণ করত। আরবদের এক শহর থেকে আর এক শহরে প্রায়ই মরুভূমির উপর দিয়ে যেতে হয়, কাজেই মরুভূমির দস্যু-আরবদের হাতে পড়বার ভয় খুব বেশী থাকে। মরুভূমির এই আরবদের বলে **বেদুইন**। এদের কোন ঘরবাড়ি নেই, যেদিন যেখানে রাত হয়, সেদিন সেখানেই তাদের বাস।

আরবরা খুব দুর্দান্ত প্রকৃতির লোক। ঝগড়া, মারামারি এদের মধ্যে লেগেই ছিল। ঘোড়ায় চড়ে, তীর-ধনুক নিয়ে, কত যে যুদ্ধ এরা পরস্পরের সঙ্গে করেছে, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তাই বলে আরবদের অসভ্য বলা

চলে না। অতি প্রাচীন কাল থেকেই এদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চা ছিল। মাঝে মাঝে এক একটি শহরে বিরাট মেলা বসত। সেই মেলায় দূর-দূরান্তর থেকে আরবরা আসত। সেখানে কবিতা-প্রতিযোগিতা হত। যাদের কবিতা সব চেয়ে ভাল হত, তারা পুরস্কার পেত। অঙ্ক-শাস্ত্রের চর্চাতেও আরবরা খুব উন্নতি করেছিল। দুই চাকা ও চার চাকার গাড়ি, আরবরা সবার আগে আবিষ্কার করেছিল। অনেকের ধারণা, সূর্যঘড়ি আরবদেরই আবিষ্কার।

আরব যদিও পশ্চিম-এশিয়ার সভ্য-দেশগুলির কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, তথাপি পুরাকালে ওদেশে সভ্যতার বিশেষ কিছু উন্মেষ হয় নি। আরবরা
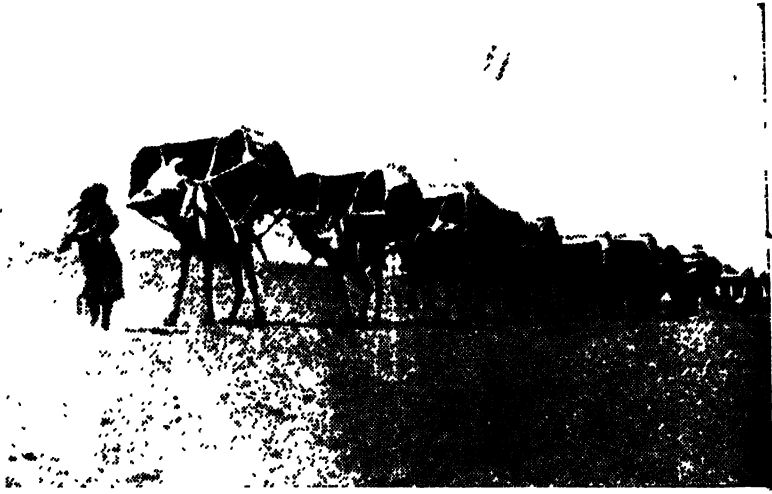
আরবের মরুভূমিতে বণিকের দল

প্রতিবেশী দেশগুলিকে জয় করবার চেষ্টা করে নি; বিদেশীর পক্ষেও, মরুভূমির এই দুঃসাহসিক যাযাবর জাতি আরবদের জয় করা খুব সহজ হয় নি। আরবদেশ সমৃদ্ধিশালী দেশ ছিল না এবং বিদেশীদের প্রলুব্ধ হবার মত কোন আকর্ষণও ওদেশে ছিল না। শহরের মধ্যে ছিল দুটি—মক্কা ও মদিনা (জেথিব)। দেশের অন্যান্য প্রায় সব স্থানেই ছিল বিস্তৃত মরুভূমির উপরে নির্মিত সাধারণ কুটীর।

আরবরা প্রথমে বিভিন্ন জাতি, দল ও পরিবারে বিভক্ত ছিল। ঐ সময়েও মক্কা শহর তাদের ধর্মস্থান ছিল। মক্কায় অনেক দেবদেবীর মূর্তি ছিল। আরবরা বৎসরে একবার সেখানে তীর্থ করতে যেত।

যে-আরব জাতি বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল তারা সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নতুন উদ্দীপনা ও উন্মাদনায় জয়ের গৌরবে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে এল একটা ব্যাপক উৎসাহ,

বেদুইন

আত্মবিশ্বাস ও দুর্জয় সাহস। আরবদের এই জাগরণের জন্যে যিনি দায়ী, তাঁর নাম **হজরত মহম্মদ**।

হজরত মহম্মদ

আরবদের মাঝে **মহম্মদ** (৫৭০—৬৩২ খ্রীঃ) নামে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। **মক্কা** শহরে তাঁর জন্ম। মক্কা শহরের একটি স্থানে ৩৬০টি পাথরের মূর্তি ছিল, আরবরা এই মূর্তিগুলোকে পূজা করত। মূর্তিগুলি যে জায়গায় থাকত, সেখানকার নাম ছিল **কাবা**। মহম্মদ যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, সেই পরিবারের হাতে ছিল এই কাবার রক্ষণাবেক্ষণের ভার। বৎসরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে, চারিদিক্ থেকে আরবরা মক্কায় কাবা দর্শন করতে এবং এই সব মূর্তির পূজা দিতে আসত।

মহম্মদ ছেলেবেলা থেকেই কাবার কাছে থেকে আরবদের এই পূজা দেখতেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের খবর জানবার জন্যে তাঁর তখন থেকেই অসীম আগ্রহ ছিল। অন্য দেশের লোকেরা কিভাবে তাদের দেবতার পূজা দেয়, সেই সব জানবার জন্যে তাঁর খুব কৌতূহল হল। বিদেশে খ্রীস্টান, ইহুদী, পারসিক প্রভৃতি নানা জাতির লোকের সঙ্গে মিশে, তিনি তাদের ধর্ম

জাতীয় পোশাকে একজন আরব

সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করতেন। খ্রীস্টান এবং পারসিকরা এক ভগবানের উপাসনা করে, কোন মূর্তির পূজা তারা করে না, এই জিনিসটা মহম্মদের কাছে খুব ভাল লাগল। তাঁর ধারণা হল, মূর্তিপূজা ভাল নয় এবং মক্কার কাবায় মূর্তিপূজা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত।

মহম্মদ দিনরাত শুধু এই সব কথাই চিন্তা করতেন। এমনি যখন তাঁর মনের অবস্থা, তখন একদিন তিনি এক অপূর্ব সত্য উপলব্ধি করলেন। তাঁর মনে বিশ্বাস হল যে, ঈশ্বর এক; এই ঈশ্বরই সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র,

জলবায়ু, শীত-গ্রীষ্ম প্রভৃতি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। বিভিন্ন দেবতার মূর্তি পূজা করলে এই এক এবং অনন্ত ঈশ্বরকে জানা যাবে না। তাঁর মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হল যে, আরবরা ৩৬০টি দেবতার মূর্তিপূজা করে অন্যায় করছে।

এই সত্য উপলব্ধি করবার পর মহম্মদ তাঁর বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজন সবাইকে সে কথা জানালেন এবং বললেন যে, এই নতুন সত্য প্রচারের

আরবের তাঁবু

জন্যে, তিনি ঈশ্বরের আদেশ পেয়েছেন। কেউ কেউ তাঁর কথা বিশ্বাস করল, অনেকে করল না।

আবুবকর (৫৭৩—৬৩৪ খ্রীঃ) নামে মক্কার একজন ধনী বণিক, এই নতুন সত্যের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে মহম্মদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। কিছুদিন পরেই তাঁরা আরবদের মূর্তিপূজা করতে নিষেধ করতে লাগলেন এবং এক ঈশ্বরের উপাসনায় মন দেওয়া উচিত, এই কথা প্রচার করতে শুরু করলেন। আরবেরা এতে দস্তুরমত চটে গেল; মহম্মদকে রাস্তায় দেখতে পেলেই তারা তাঁকে টিটকারি দিত, তাঁকে লক্ষ্য করে নোংরা জিনিস ছুড়ত এবং তাঁকে হত্যা করতেও চেষ্টা করেছিল। মহম্মদ সে সব গ্রাহ্যও করলেন না।

মহম্মদের বিপদ্ কিন্তু কাটল না। তিনি সংবাদ পেলেন যে, তাঁকে হত্যা করবার জন্যে, আবার একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছে। তিনি তখন আবুবকরকে সঙ্গে নিয়ে **মদিনা** নামক শহরের দিকে রওনা হলেন।

মক্কা থেকে মদিনা ২৭০ মাইল দূর, মরুভূমির উপর দিয়ে তার পথ। মদিনার লোকেরা মক্কায় কাবা দর্শনে এসে, মহম্মদের নতুন সত্যের কথা শুনে, অনেকেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। অনেক কষ্টে মরুভূমি পার হয়ে
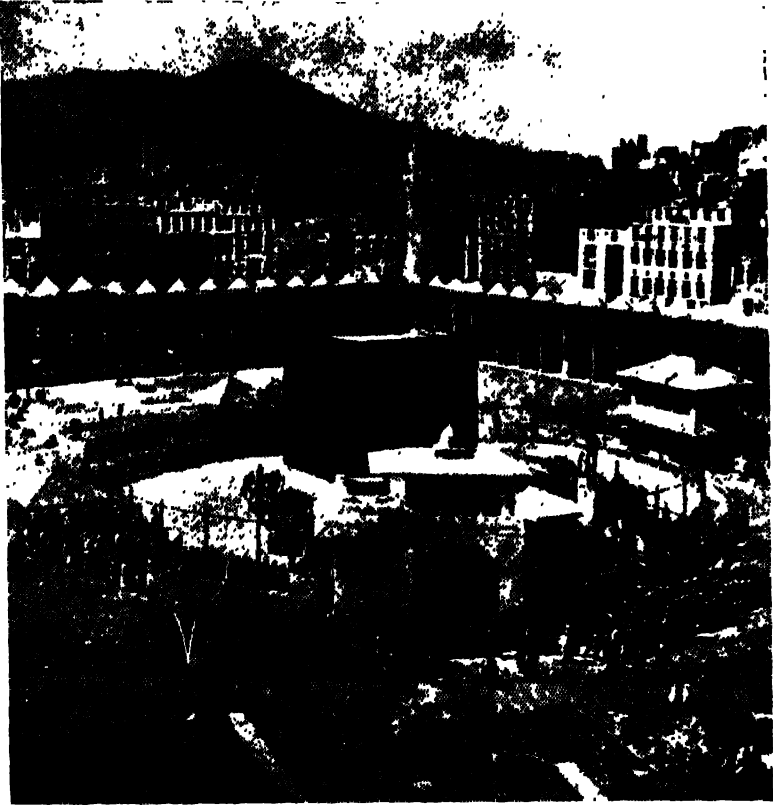
কাবা মসজিদ

যখন তিনি মদিনায় এসে পৌঁছালেন, মদিনার লোকেরা তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিল। মহম্মদের মক্কা থেকে মদিনায় গমনকে **হিজিরা** বলে। এর তারিখ ৬২২ খ্রীস্টাব্দ। এই সময় হতে মুসলমানদের বৎসর গণনা করা হয়। মদিনার যে-সকল লোক মহম্মদকে সাহায্য করেছিল তাদের নাম হল আন্সার বা সাহায্যকারীর দল।

আরবী ভাষায় ঈশ্বরকে বলে আল্লা। আল্লার উপাসনার জন্যে মদিনায় মহম্মদ

একটি মসজিদ তৈরি করলেন। মাটি এবং পাথর দিয়ে, শিষ্যদের সাহায্যে, মহম্মদ নিজের হাতে এই মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন। দিনের মধ্যে পাঁচবার মদিনার লোকেরা এই মসজিদে আসত প্রার্থনা করতে। এইখানে থেকেই মহম্মদ তাঁর নতুন সত্যকে **ইসলাম** ধর্ম বলে ঘোষণা করেন। 'ইসলাম' আরবী শব্দ; তার মানে হচ্ছে, 'ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ করা'।

মদিনায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে মহম্মদ ঠিক করলেন, আরবদের মন থেকে কুসংস্কার দূর করবার জন্যে যুদ্ধ করতে হবে। তিনি বেশ বুঝতে পারলেন যে, শুধু মুখের কথায় আরবদের মধ্যে ইসলাম ধম প্রচার করা সম্ভব হবে না। এই বুঝে, মহম্মদ অনেক লোকজন নিয়ে, মক্কার দিকে রওনা হলেন সবার আগে মক্কার লোকদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করবার জন্যে।

কয়েক বৎসর ধরে মক্কার লোকদের সঙ্গে মহম্মদের যুদ্ধ চলল। অবশেষে মক্কার লোকেরা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে রাজী হল শুধু একটি শর্তে যে, মক্কা শহরকেই তিনি তাঁর ধর্ম প্রচারের প্রধান কেন্দ্র করবেন। মূর্তিপূজার আমলে, দূর থেকে আরবরা যেমন তীর্থ করতে মক্কায় আসত, ইসলাম ধর্মের প্রচারের পরেও যেন তেমনি, মুসলমানেরা তীর্থ করতে মক্কাতেই আসে। মহম্মদ এতে রাজী হলেন। মক্কায় প্রবেশ করে তিনি শিষ্যদের নিয়ে কাবায় গেলেন এবং শিষ্যদের সাহায্যে সেই ৩৬০টি মূর্তি বাইরে সরিয়ে দিলেন।

মক্কা জয় করবার পর মহম্মদের ধারণা হল যে, সমস্ত পৃথিবী জয় করে সব দেশে ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠা তিনি করেন, এটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। কিন্তু তখনও তিনি মক্কা এবং মদিনা, এই দুটি শহর ছাড়া, আরবদেশের আর কোথাও তাঁর নূতন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। তাই তিনি সবার আগে আরবদেশ জয় করতে মন দিলেন। আরব-জয় সম্পূর্ণ হওয়ার পর, ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে, ৬২ বৎসর বয়সে মহম্মদ দেহত্যাগ করেন।

ইসলাম ধর্মের বিস্তার

মহম্মদের মৃত্যুর পর, আবুবকর মুসলমানদের খলিফা নিযুক্ত হলেন। মুসলমানদের ধর্মগুরুকে বলে **খলিফা**; খলিফাদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতাও ন্যস্ত ছিল। আরবে ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠার পর, আরবরা **জেরুজালেম** এবং **সিরিয়া** জয় করল। তারপর তারা ইরান আক্রমণ করে সেখানকার লোকদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করল। ইরানের পর, আরবরা মিশর

জয় করে তথাকার লোকদেরও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করল। মিশরের অতি প্রাচীন সভ্যতা লোপ পেয়ে গেল, তার জায়গায় উদিত হল নতুন ইসলাম সভ্যতা ভূমধ্যসাগরের তীর ধরে। উত্তর-আফ্রিকার সবখানি জায়গা জয় করে আরবরা সেখানেও ইসলামের প্রতিষ্ঠা করল। তারপর তারা জয় করল **স্পেন** ও **পোর্তুগাল**। যে আরব সেনাপতি স্পেন জয় করেন তাঁর নাম **তারিক**। তাঁর নাম থেকেই জিব্রাল্টার নাম হয়েছে।

আরবদের এই অভিযান প্রতিহত হয়েছিল শুধু দুটি জায়গায়।
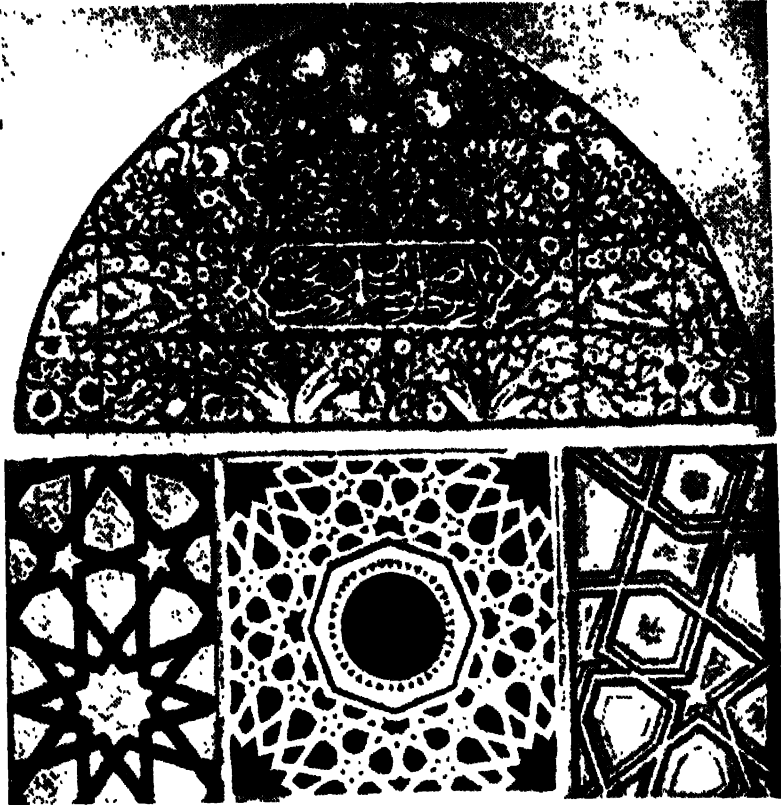
সারাসেন-স্থাপত্যের একটি সুন্দর নিদর্শন

কনস্টান্টিনোপল শহর আক্রমণ করে অনেক যুদ্ধের পরেও তারা সেটি জয় করতে পারে নি, এবং স্পেন জয় করবার পর, দক্ষিণ-ফ্রান্সে টুরস্ নামক যুদ্ধক্ষেত্রে, ফ্রাঙ্ক বীর চার্লস মারটেলের কাছে তারা পরাজিত হয় (৭৩২ খ্রীঃ)। মারটেলের কাছে পরাজয়ের ফলেই ইওরোপ আরবদের গ্রাস থেকে রক্ষা পায়। আরবরা এ-যুগে ভারতবর্ষ আক্রমণ করে সিন্ধুদেশে তাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত

করেছিল। এর বেশী তারা আর এগোয় নি অথবা রাজপুত-শৌর্যের জন্যে অগ্রসর হতে পারেনি। পরে তুর্কী-মুসলমানেরা ভারতবর্ষ জয় করে।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে, আরবদের বিজয়-অভিযান, দুর্বার গতিতে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ে। শীঘ্রই মরুভূমির যাযাবর জাতি একটা বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকারী হল। পশ্চিমে, সুদূর স্পেন থেকে পূর্বে মঙ্গোলিয়া ভূখণ্ড পর্যন্ত তাদের বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপিত হল। মরুভূমিবাসী বলে আরবদের আর একটি নাম **সারাসেন**। আগে তারা সরল, অনাড়ম্বর জীবন যাপন করত। সাম্রাজ্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইরান ও কনস্টান্টিনোপলের প্রভাবে, তারা বিলাসী ও জাঁকজমকপ্রিয় হয়ে উঠল। এখন তাদের মধ্যে, শক্তিশালী খলিফাপদগৌরবের জন্যে বিবাদ-বিসংবাদ শুরু হল। এই খলিফা ছিলেন একাধারে আরব-সাম্রাজ্যের সম্রাট্ ও ধর্মগুরু।

আবুবকর এবং **ওমর** (৫৮১—৬৪৪ খ্রীঃ) যখন খলিফা ছিলেন তখন আরবদের মধ্যে একতা, ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন ও গণতান্ত্রিক-ভাব জাগ্রত ছিল। আরব-সাম্রাজ্যের প্রথম একশত বৎসর পর্যন্ত **উম্মিয়াদ**-বংশ রাজত্ব করে। সিরিয়ার দামাস্কাস নগরী তাদের রাজধানী ছিল। এখানে ছিল অনেক সৌধ, মসজিদ, কৃত্রিম ঝরনা ও উদ্যান। এই সময় আরবরা, সারাসেন-স্থাপত্য নামে একরূপ সহজ শিল্পকলার প্রচলন করে।

উম্মিয়াদ-বংশের পর, **আব্বাসাইড**-বংশ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। আরবরা স্পেনে যে রাজ্য ও সভ্যতা গড়ে তুলেছিল, সেখানে উম্মিয়াদ-বংশই মূল আরব-রাজ্য থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকল। উত্তর-আফ্রিকার মুসলমান রাজ্যসমূহও আব্বাসাইড-বংশের অধীনতা মানল না।

হারুন অল-রসিদ

আব্বাসাইড-বংশের খলিফাগণ সারা মুসলমান জগতের অধীশ্বর রইলেন না বটে, কিন্তু তাঁরাও বিরাট সাম্রাজ্যের মালিক ছিলেন। তাঁদের ক্ষমতাও ছিল অসীম। এই বংশের আমলে, আরব সাম্রাজ্যের রাজধানী ইরাক দেশে টাইগ্রিস নদীর তীরে **বাগদাদে** স্থাপিত হয়েছিল। এটি ছিল অসংখ্য সৌধমণ্ডিত এক প্রকাণ্ড নগর। এতে ছিল অনেক বড় বড় অফিস, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, লাইব্রেরী, দোকান এবং অসংখ্য সুন্দর রাস্তা ও উদ্যান। নগরের বণিকেরা পূর্বে

জাপান—

ভারতবর্ষ ও অপরাপর দেশ এবং পশ্চিমে ইওরোপের সঙ্গেও জোর ব্যবসা-বাণিজ্য চালাত।

বাগদাদের খলিফাদের মধ্যে হারুন অল-রসিদের নাম সব চেয়ে প্রসিদ্ধ। তিনি ৭৮৬—৮০৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর দরবারে চীনের সম্রাট্ ও পশ্চিম-ইওরোপের সম্রাট্ শার্লামেনের কাছ থেকে রাজদূতগণ এসেছিলেন। **হারুন অল-রসিদ** (৭৬৬—৮০৯ খ্রীঃ) খুব শৌখিন লোক ছিলেন। মার্বেল পাথরে নির্মিত বিরাট প্রাসাদে তিনি থাকতেন। মণি-রত্ন-খচিত পোশাক পরতেন, রেশমী পোশাক পরা হাজার হাজার ক্রীতদাস তাঁর সেবা করত।

হারুন অল-রসিদ

হারুন অল-রসিদ রাত্রে খুব কম ঘুমোতেন, গভীর রাত্রে বাগদাদের রাজপথে ঘুরে বেড়ানো ছিল তাঁর একটা শখ। এইভাবে অনেক রাত্রে তাঁর জীবনে অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটত। এমনি সব ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রেই অপূর্ব সাহিত্য **আরব্য-উপন্যাসের** সৃষ্টি।

হারুন অল-রসিদ তাঁর গরিব প্রজাদের দুঃখে দুঃখিত হতেন। যতদূর সাধ্য তাদের তিনি সাহায্য করতেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়, হাসপাতাল, অনাথাশ্রম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার জন্যে তিনি অনেক টাকা খরচ করতেন। তিনি খুব ধর্মভীরু লোক ছিলেন। প্রখর রোদে তেতে ওঠা মরুভূমির বালির উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে, প্রতি বৎসর তিনি মক্কায় যেতেন তীর্থ করতে। হারুন অল-রসিদের মৃত্যুর পর বাগদাদের গৌরব ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে যায়।

আব্বাসাইড-খলিফাদের চরম উন্নতির সময়ে বাগদাদ নগর জ্ঞানে, গুণে, গরিমায় ও শিল্প-বিজ্ঞানে বিশেষ উন্নতির পরিচয় দিয়েছিল। আরবদের মধ্যে এই যুগে ধর্ম-ব্যাপারে কোন গোঁড়ামি ছিল না। সকল সভ্য দেশের

সংস্কৃতি ও সভ্যতার সঙ্গেই তাদের আদান-প্রদান ছিল। চিকিৎসা-বিদ্যা ও গণিত-শাস্ত্রে তারা ভারতীয়দের কাছে অনেক কিছু শিক্ষালাভ করে। ভারতীয় পণ্ডিত ও বিজ্ঞানীরা দলে দলে বাগদাদে আসতেন। অনেক আরব শিক্ষার্থীও, উত্তর-ভারতের বিখ্যাত তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিশেষ করে চিকিৎসা-বিদ্যায় জ্ঞান আহরণ করতে আসতেন। আরব পণ্ডিতরা, বিভিন্ন শাস্ত্রের অনেক সংস্কৃত বই আরবী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। তবে তাঁরা নিজেরাও অনেক বিদ্যায় উন্নত গবেষণা ও আবিষ্কার করেছিলেন।

আরব বা সারাসেন-সংস্কৃতি শুধু এশিয়া ও আফ্রিকার মুসলমান-সভ্যতার কেন্দ্রগুলিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। পশ্চিমে, আরব-স্পেনের রাজধানী **কর্ডোবা** এবং **গ্রানাডা** নগরেও আরব-সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ হয়েছিল। কর্ডোবা নগর তখন সভ্যতায় ইওরোপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের যশ সারা ইওরোপে ও পশ্চিম-এসিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। গ্রানাডা নগরের সে যুগের বিখ্যাত **অল্-হামরাহ প্রাসাদ** আজিও বিদ্যমান আছে।

হারুন অল-রসিদের প্রাসাদ

হারুন অল-রসিদের মৃত্যুর পর অল্পদিনের মধ্যেই আরব-সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন ধরল। প্রাদেশিক শাসকগণ নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করলেন। খলিফাগণ ক্রমেই শক্তিহীন হতে লাগলেন। তাঁদের রাজ্যের আয়তন ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হতে লাগল। ইসলামের একতা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। মিশর, ইরান, আফগানিস্থান প্রভৃতি আলাদা আলাদা স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হল।

এই সময়, মধ্য-এশিয়ার তুর্কীরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে দলে দলে পশ্চিম দিকে ছুটে আসতে লাগল। আব্বাস-বংশের কাছ থেকে রাজ্যভার কেড়ে নিয়ে, তারা এসে বাগদাদ অধিকার করল। এদের নাম **সেলজুক তুর্কী**। এদের মধ্যে **সুলতান সালাদিন** সব চেয়ে নামজাদা নৃপতি। তিনি

খ্রীষ্টানদের সঙ্গে তৃতীয় ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধে (১১৮৯—১১৯২ খ্রীঃ) খুব কৃতিত্ব ও সামরিক নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন। সেলজুক তুর্কীগণ কিছুকাল বেশ শক্তির সঙ্গে প্রভুত্ব চালিয়ে যান। কিন্তু শীঘ্রই ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মঙ্গোলিয়া

আল্-হামরাহ প্রাসাদ
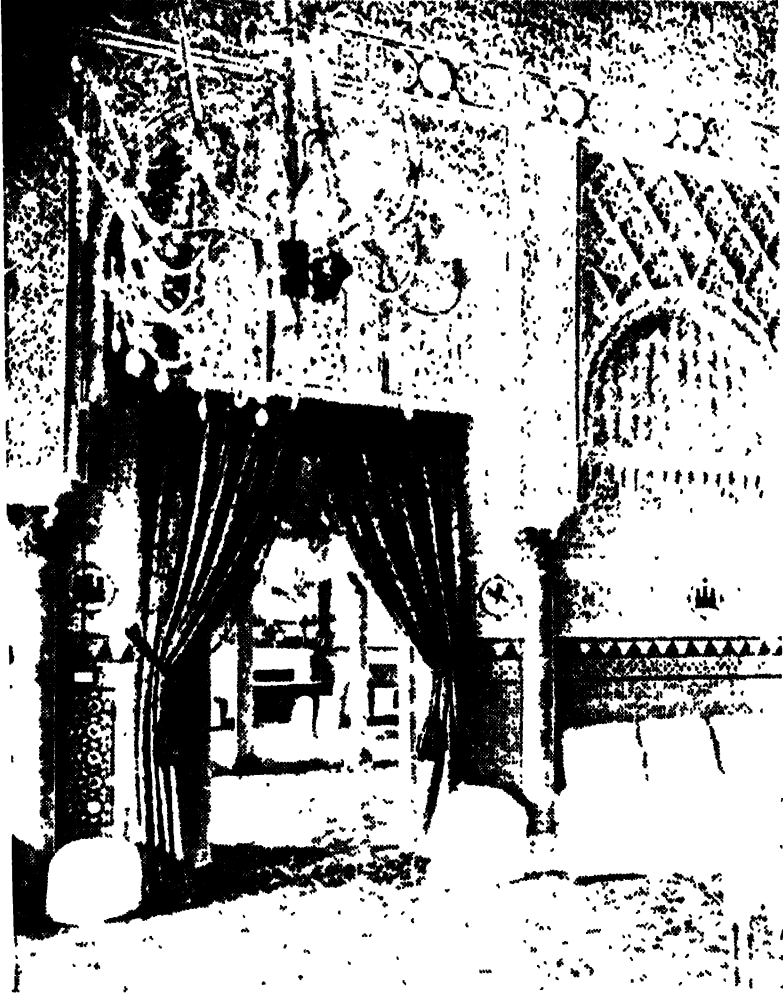
থেকে দুর্দান্ত **চেঙ্গিস খাঁ** (১১৬২—১২২৭ খ্রীঃ) এবং তাঁর বংশধরেরা ঝড়ের বেগে এসে, বাগদাদ সাম্রাজ্য ধ্বংস করে দেন।

বাগদাদ ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে, পশ্চিম-এশিয়ার আরব-সভ্যতা লোপ পেয়ে গেল। দূরে দক্ষিণ-স্পেনে গ্রানাডায় আরব সভ্যতা আরও কিছুদিন চলেছিল। মূল আরবদেশের প্রাধান্য শীঘ্রই একেবারে কমে গেল। কিছু

পরে আরব-রাজ্যগুলি, পশ্চিম-এশিয়ার **অটোমান তুর্কী** সুলতানদের অধীনে চলে গেল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত আরবদেশ এই তুর্কী-সাম্রাজ্যের অন্তর্গতই ছিল। ঐ যুদ্ধের সময়ে ইংরেজের উসকানিতে আরবজাতি তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।

আরবের লরেন্স

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়, আরব দেশগুলো ছিল তুর্কী-সাম্রাজ্যের অধীন এবং তুরস্ক ছিল জার্মেনীর পক্ষে। ইংরেজরা বুঝতে পারে যে, তুর্কীদের বিরুদ্ধে আরবদের বিদ্রোহী করে তুলতে পারলে তুর্কীদের শক্তি কমে যাবে এবং তাতে ব্রিটিশ পক্ষের লাভ হবে। আরবদের এই বিদ্রোহ ঘটাবার জন্যে যিনি তাদের দেশে গিয়েছিলেন, তাঁর নাম **কর্নেল টমাস এডওয়ার্ড লরেন্স** (১৮৮৮—১৯৩৫ খ্রীঃ)।

সুলতান সালাদিন

লরেন্স একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা, প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও আবিষ্কারক। তিনি আরবী ভাষা, আরবী কায়দা প্রভৃতি খুব ভাল করে শিখেছিলেন। আরবী পোশাক পরলে তাঁকে ইংরেজ বলে চেনবার কোন উপায়ই ছিল না। লরেন্স তুরস্কের বিরুদ্ধে, আরবদের বিদ্রোহী করে তোলেন এবং আরব-সৈন্য নিয়েই তুরস্ক আক্রমণ করেন। লরেন্সের এই কাজের ফলে, ব্রিটিশ সৈন্যদের পক্ষে সিরিয়া ও মেসোপোটেমিয়া (বর্তমান ইরাক) জয় করে তুরস্ককে কাবু করা সহজ হয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে আরব দেশ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, আরব অঞ্চলে কয়েকটি রাজ্য গড়ে ওঠে। তাদের নাম হেজাজ, প্যালেস্টাইন, ট্রান্সজর্ডান, সিরিয়া, ইরাক, ইয়েমেন এবং সৌদি আরব। এদের মধ্যে একমাত্র সৌদি আরব স্বাধীন হয়। পাশ্চাত্ত্য শক্তিরা, যুদ্ধের সময়কার তাদের প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গিয়ে, আরবদের স্বাধীনতা না দিয়ে তাদের অভিভাবক হয়ে বসে। প্যালেস্টাইন, ট্রান্সজর্ডান, ইরাক, ইত্যাদির অভিভাবক হল ইংলণ্ড আর সিরিয়ার অভিভাবক হল ফ্রান্স। এই কয়টি দেশ পাশাপাশি থাকলেও, এদের কারো সঙ্গে কারোর সদ্ভাব ছিল না।

প্যালেস্টাইন নিয়ে আরবদের সঙ্গে ইহুদীদের ভীষণ গোলযোগ চলে। আরবদের দাবি, প্যালেস্টাইন আরবদের দেশ; ইহুদীরা বলে যে, না, ওটা তাদের দেশ, ওর উপর আরবদের কোন অধিকার নেই। শেষ পর্যন্ত, প্যালেস্টাইনকে ভাগ করে এক অংশ আরবদের এবং অপর অংশ ইহুদীদের দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাতেও গোলযোগ মেটে নি।

সৌদি আরব

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আরবদেশে দুজন রাজা ছিলেন প্রধান। একজনের নাম **হুসেন** (১৮৫৬—১৯৩১ খ্রীঃ), অপর জন **ইবন সৌদ**। হুসেন হজরত মহম্মদের বংশধর। তিনি ছিলেন হেজাজের রাজা এবং মক্কায় ছিল তাঁর বাস। মক্কা হেজাজের রাজধানী। তুরস্কের সঙ্গে ইংরেজদের যখন যুদ্ধ চলছিল তখন তারা হুসেন এবং ইবন সৌদ দুজনের সঙ্গেই ভাব রেখে চলছিল। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর, ইংরেজরা হুসেনের পরম শত্রু ইবন সৌদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। এতে ইবন সৌদের ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়। ইবন সৌদ হুসেনকে আক্রমণ করে তাঁকে একেবারে বিধ্বস্ত করে ফেলেন। হুসেন তাঁর বড় ছেলে আলির হাতে দেশের শাসনভার ছেড়ে দেন; কিন্তু ইবন সৌদ থামলেন না, তিনি হেজাজ জয় করে মক্কায় তাঁর রাজধানী স্থাপন করলেন। আলি সিংহাসন ত্যাগ করলেন এবং হুসেন পলায়ন করলেন সাইপ্রাস দ্বীপে। সাইপ্রাসে ভগ্নহৃদয়ে হুসেন প্রাণত্যাগ করেন।

হুসেনের অনেক ছেলে ছিল। তাঁদের মধ্যে একজনের নাম **ফৈজল**। তিনি প্রথমে সিরিয়ার রাজা হন, কিছুদিন পরে সেখান থেকে ইরাকে গিয়ে, ইরাকের সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজা ফৈজল ইওরোপ

ভ্রমণে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মারা যান। তারপর রাজা হন তাঁর ছেলে **গাজী**। গাজী কিছুদিন পরে মোটর-দুর্ঘটনায় নিহত হন। তখন তাঁর নাবালক ছেলে **দ্বিতীয় ফৈজল** ইরাকের রাজা হলেন। হুসেনের আর এক ছেলে **আবদুল্লা** ট্রান্সজর্ডানের রাজা হন। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে রাজা আবদুল্লা আততায়ীর হস্তে নিহত হন। ট্রান্সজর্ডান রাষ্ট্রকে বর্তমানে জর্ডান বলে।

ইবন সৌদ

আরবদেশে **ইবন সৌদই** সব চেয়ে ক্ষমতাশালী নৃপতি হলেন। তাঁর পুরো নাম, আবদুল আজিজ ইবন আবদুর রহমান অল ফৈজল অল সৌদ।

ইবন সৌদ

চেহারাটি তাঁর বিশাল, ছয় ফুট চার ইঞ্চি লম্বা, আর ঠিক সেই অনুপাতে চওড়া।

মুসলমানদের মধ্যে যেমন **সিয়া** এবং **সুন্নি** বলে দুটো ভাগ আছে, তেমনি **ওয়াহাবী** বলেও আর একটা শাখা আছে [ওয়াহাবী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা অষ্টাদশ শতাব্দীর মহম্মদ ইবন আবদুল ওয়াহাব]। ইবন সৌদ ওয়াহাবী।

আরবের নেজ্‌দ নামক স্থানের এক শহরে ইবন সৌদের জন্ম। **ইবন রশিদ** নামক এক ব্যক্তি তখন নেজ্‌দের রাজা। ইবন সৌদের বাবা রশিদকে তাড়িয়ে, নেজ্‌দের সিংহাসন দখল করবার জন্যে যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে ইবন সৌদ এমন বীরত্ব দেখান যে, রশিদকে তাড়াবার পর, তাঁর বাবা সিংহাসনে না বসে, ইবন সৌদকেই নেজ্‌দের রাজা বলে ঘোষণা করেন। তখন তাঁর বয়স ২৬ কি ২৭ বৎসর।

এর পর থেকে ইবন সৌদ আরবদেশের ছোট ছোট রাজ্যগুলি একটির পর একটি দখল করে সেগুলিকে নিয়ে বড় একটি রাজ্য গড়ে তোলেন এবং তারই নাম দেন, **সৌদি আরব**। ইবন সৌদের সুযোগ্য নেতৃত্বে আরবে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়, এবং মুসলমান তীর্থযাত্রীদের প্রতিবৎসর জেদ্দা বন্দর হতে মক্কা যাবার পক্ষে অনেক সুবিধাজনক ব্যবস্থা হয়।

ইরাকে যেমন ব্রিটিশ তৈল-কোম্পানি লাভের একাধিপত্য ভোগ করছে, তেমনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও সৌদি আরবের তেলের খনির সুবিধা ভোগ করবার জন্যে সেখানে তৈল-কোম্পানি খুলেছে।

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মিশর, ইরাক, জর্ডান, সৌদি আরব, সিরিয়া, লেবানন, ইয়েমেন প্রভৃতি দেশগুলি মিলিত হয়ে **আরব রাষ্ট্রসংঘ** নামে একটি ঐক্যসমিতি গঠন করে। আরব রাষ্ট্রগুলি সকলেই ইহুদীদের ইজরেল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিশেষরূপে বিদ্বেষভাবাপন্ন।

ইবন সৌদ অপসারিত হলে ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর ফৈজল ইবন আবদুল-আজিজ (জন্ম ১৯০৫ খ্রীঃ) সৌদি আরবের রাজা হন। তিনি ইবন সৌদের ভ্রাতা। বর্তমান রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রিন্স খালেদ ইবন আবদুল-আজিজ যুবরাজ ও ডেপুটি প্রধান মন্ত্রী।

সৌদি আরবের আয়তন ৯,২৭,০০০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৮০ লক্ষ (১৯৬৩ খ্রীঃ)। রাজধানী মক্কা ও রিয়াধ। মক্কার জনসংখ্যা ২,৫০,০০০। রিয়াধের লোকসংখ্যা ৩ লক্ষ।

মস্কট ও ওমান

মস্কট ও ওমান আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্বাংশে অবস্থিত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের একাংশে পর্বত, অপর এক অংশে উপত্যকা, অন্য অংশে সমুদ্র-

তীরস্থ সমভূমি। পর্বতশ্রেণী কোথাও কোথাও ৯০০০ ফুট পর্যন্ত উচ্চ। উপত্যকা সাধারণতঃ ১০০০ ফুট উঁচু। সমুদ্রতীরস্থ সমভূমি কোথাও ১০ মাইল চওড়া, কোথাও চওড়া খুবই সামান্য। মস্কট ও ওমানের খেজুর খুব ভাল এবং প্রচুর ফলে। সেই সব খেজুরের বেশির ভাগ ভারতবর্ষে আসে।

মস্কট ও ওমানের বর্তমান সুলতান সৈয়দ বিন তৈমুর (জন্ম ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই আগস্ট)। তিনি ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারি তাঁর পিতা সুলতান তৈমুর বিন ফৈজলের স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি তাঁদের বংশের ত্রয়োদশ উত্তরাধিকারী। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে তাঁর একটি সন্তান হয়; তাঁর নাম কোয়াবাস।

মস্কট ও ওমানের আয়তন ২,১২,০০০ বর্গ কিলোমিটার (৮২,০০০ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ৭,৫০,০০০। অধিবাসী প্রধানতঃ আরব মুসলমান। প্রধানতঃ বোম্বাই ও গুজরাটের কিছু সংখ্যক হিন্দু ভারতীয় ব্যবসায়ী এখানে আছে। মস্কট ও ওমানের রাজধানী মস্কট (লোকসংখ্যা ৬,২০৮)।

কুওয়াইট

কুওয়াইট পারস্য উপসাগরের কূলে অবস্থিত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। শেখ সাবা অল-আওয়েল ১৭৫৬ থেকে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এখানে রাজত্ব করেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তখনকার রাষ্ট্রপ্রধান শেখ মুবারক তুরস্কের ভয়ে গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে এক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। তখন থেকে কুওয়াইট একরকম ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার কুওয়াইটকে স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনার ক্ষমতা দেয়, কিন্তু দেশটি ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণাধীনই থাকে।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জুন রাজ্যটি একরূপ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। সেই সময় প্রয়োজন হলে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট তাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়।

কুওয়াইট ও সৌদি আরব ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে নিরপেক্ষ অঞ্চল (৩,৫৬০ বর্গ মাইল, ৫,৭০০ বর্গ কিলোমিটার) যুগ্মভাবে পরিচালনা করত, সেই অঞ্চল ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে দুই রাজ্যের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যায়।

শেখ সাবা এস-সেলিম এস-সাবা তাঁর ভ্রাতার মৃত্যুর পর ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে নভেম্বর এর শাসনকর্তা হন। কুওয়াইটের তিনি দ্বাদশ আমীর। এর বর্তমান যুবরাজ শেখ জবির অল-আহম্মদ অল-জবির এস-সাবা।

এর আয়তন ২৪,২৮০ বর্গ কিলোমিটার (৯,৩৭৫ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ৪,৬৮,৩৮৯ (১৯৬৫ খ্রীঃ)। অধিবাসী প্রধানতঃ মুসলমান।

ব্রিটিশ ও আমেরিকান পরিচালিত কুওয়াইট অয়েল কোম্পানি থেকে রাজ্যের প্রভূত আয় হয়ে থাকে।

কুওয়াইট রাষ্ট্রসংঘের ১১১তম সভ্য।

বাহ্‌রায়েন

বাহ্‌রায়েন পারস্য উপসাগরের কূলে আরব উপদ্বীপের পূর্বাংশে অবস্থিত একটি রাজ্য। রাজ্যটি কয়েকটি দ্বীপের সমষ্টি। দ্বীপগুলির মধ্যে বাহ্‌রায়েন সব চেয়ে বড়। আয়তন ২৫০ বর্গ মাইল।

বাহ্‌রায়েন ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দ থেকে ব্রিটিশের একটি আশ্রিত রাজ্য। বর্তমানে ব্রিটিশ রক্ষণাধীন হলেও রাজ্যটি স্বাধীন। এর শাসক শেখ ইশা বিন সুলেমান অল খলিফার ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে জন্ম হয়।

বাহ্‌রায়েনের তৈলখনিগুলি মার্কিন সহযোগিতায় পরিচালিত হয়।

এর লোকসংখ্যা ১,৮২,২০৩ (১৯৬৫ খ্রীঃ)। রাজধানী মানামা। রাজধানীর লোকসংখ্যা ৬২,০০০ (১৯৬৫ খ্রীঃ)।

ইয়েমেন

ইয়েমেন আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে অবস্থিত একটি প্রাচীন রাজ্য। প্রাচীনকালে ইয়েমেন সেবার রাজত্বের অংশ ছিল। সে সময়ে এর মধ্য দিয়ে উষ্ট্রপালের সাহায্যে আফ্রিকা ও ভারতের বাণিজ্য চলত। বাইবেলে দেখা যায় যে, সেবার রানী ইয়েমেনের সোনা, রত্ন ইত্যাদি রাজা সলোমনকে উপহার দিয়েছিলেন।

ইমাম আহম্মদ এক সময়ে ইয়েমেনের রাজা ছিলেন। তিনি ১৯৪৮-১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর তিনি নিহত হন। আবদুল্লা অল-সালালের নেতৃত্বে ইয়েমেনকে প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করা হয় (২৭শে সেপ্টেম্বর)। প্রজাতন্ত্রী সৈন্যদলকে ঈজিপ্ট সাহায্য করে। ইমাম আহম্মদের পুত্র সইফ অল-ইসলাম অল-বাদ্‌রকে (ইমাম মনসুর বিল্লা মহম্মদকে) সৌদি আরব সাহায্য করে। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বর দুই পক্ষের মধ্যে এক চুক্তি হয় ও যুদ্ধবিরতি ঘটে। অবশ্য এই যুদ্ধবিরতি যথারীতি পালিত হয় না।

১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে আগস্ট প্রেসিডেন্ট নাসের ও রাজা ফৈজল এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। তাতে স্থির হয়, ইয়েমেনের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য দেশে গণভোট গৃহীত হবে। প্রজাতন্ত্রী ও রাজকীয় দলের মধ্যে ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর এক সম্মেলন হয়। কিন্তু গণভোট গ্রহণের কোন ব্যবস্থা হয় না। সানা, তায়িজ, হোদেদা প্রভৃতি স্থানে এখনও ঈজিপ্টের বহু সৈন্য আছে। ইয়েমেনের পার্বত্য অঞ্চল রাজকীয় সেনার দখলে আছে।

ইয়েমেন ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হয়।

মার্শাল আবদুল্লা অল-সালাল ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। বর্তমানে লেফটেন্যান্ট জেনারেল হাসান অল-আম্‌রি প্রধান মন্ত্রী।

ইয়েমেনের আয়তন ১,৯৫,০০০ বর্গ কিলোমিটার (৭৫,০০০ বর্গ মাইল) এবং এর লোকসংখ্যা ৮০,০০,০০০ (১৯৫৮ খ্রীঃ)। ইয়েমেনের রাজধানী সানা। ইয়েমেন প্রধানতঃ মুসলমান রাষ্ট্র। রাশিয়া, চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইয়েমেনকে বিভিন্নভাবে সাহায্য দিয়ে চলেছে।

ভারতবর্ষের উত্তরদিকে একটা জায়গায়, চীনদেশের পশ্চিম-সীমান্ত এসে রাশিয়ার সঙ্গে মিশেছে। চীনদেশের এই অংশে একটা প্রকাণ্ড মরুভূমি আছে, তার নাম **গোবি** মরুভূমি। এই মরুভূমির পশ্চিমে **তুর্কী** নামক একটা ভবঘুরে জাতি এসে বসবাস আরম্ভ করেছিল। কিছুদিন তারা সেখানে থাকার পর, **তাতার** নামে একটা দুর্দান্ত জাতি এসে তুর্কীদের সেখান হতে তাড়িয়ে দিল। তাতারদের কাছে তাড়া খেয়ে, তুর্কীরা সোজা পশ্চিম দিকে ছুটল এবং এসে ঠেকল একেবারে ভূমধ্যসাগরের তীরে। এই জায়গাটার নাম **আনাতোলিয়া**। ফাঁকা পেয়ে তারা এবার এখানেই বসবাস শুরু করল।

আনাতোলিয়ার দক্ষিণেই আরবদের দেশ। আরবরা মুসলমান, তাদের সংস্পর্শে এসে তুর্কীরাও মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করল। আরবরা তুর্কীদের একটু কৃপার চক্ষেই দেখত, কারণ তারা হল বনেদী মুসলমান, আর তুর্কীরা মুসলমান হয়েছে পরে। কিন্তু তুর্কীদের অধ্যবসায়, রণদক্ষতা, কূটবুদ্ধি এবং রাজ্যশাসনের ক্ষমতা তখনকার আরবদের চেয়ে অনেক ভাল ছিল বলে, তারা অল্পদিনের মধ্যেই এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলল।

এশিয়ায়, পারস্য-উপসাগর থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত সবখানি জায়গা, আফ্রিকায় মিশর এবং ইওরোপে কৃষ্ণসাগরের পশ্চিম তীর থেকে আরম্ভ করে

আদ্রিয়াতিক সাগরের পূর্ব-তীর পর্যন্ত, এতখানি স্থান তারা তুর্কী-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিল। এশিয়া-মাইনর এবং বলকান-অঞ্চলের সবটাই এই তুর্কী-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিল। আরবদেশকে বাদ দিয়ে এশিয়ার পশ্চিম দিকের অবশিষ্ট অংশটিকে বলে **এশিয়া-মাইনর** এবং ইওরোপের দক্ষিণ-পূর্ব-অংশটিকে বলে **বলকান**।

সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ

এশিয়া-মাইনর অবশ্য এখনও তুর্কীদের অধীনেই আছে, কিন্তু বলকান এবং মিশর তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে অনেক দিন। তুরস্কের সম্রাট্‌কে বলা হত **সুলতান**; সাম্রাজ্যের অধীশ্বর তো তিনি ছিলেনই, তা ছাড়া তিনি মুসলমানদের ধর্মগুরু হিসাবেও সম্মান পেতেন। এই জন্যে সুলতান ছাড়াও তাঁকে বলা হত **খলিফা**।

যে তুর্কীরা এই বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে, তাদের নাম **অটোমান তুর্কী**। তাদের পূর্বে বাগদাদে, যারা

দ্বিতীয় মহম্মদের কনস্টান্টিনোপল জয়

আরবদের ক্ষমতাচ্যুত করেছিল, তারা হল **সেলজুক তুর্কী**। অটোমান তুর্কীরা প্রথমে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, মঙ্গোলদের দ্বারা তুর্কীস্থান থেকে বিতাড়িত

হয়ে এশিয়া-মাইনরে উপস্থিত হয়। তারা তাদের শক্তি এশিয়া-মাইনরে ভালরূপে স্থাপিত করবার পর ক্রমে দার্দানেলিজ-প্রণালী পার হয়ে বলকান-অঞ্চলে মাসিডোনিয়া, সার্বিয়া এবং বুলগেরিয়া জয় করে। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে অটোমান সুলতান **দ্বিতীয় মহম্মদ** পূর্ব-রোমক সাম্রাজ্যের রাজধানী, **কনস্টান্টি-নোপল** অধিকার করেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে, বিশেষ করে বিখ্যাত তুর্কী-সম্রাট্ **সোলেমানের** আমলে, তুর্কীরা বাগদাদ, হাঙ্গেরী, মিশর এবং আফ্রিকার অন্যান্য স্থান জয় করে। তাদের শক্তিশালী নৌ-বহরের জোরে, তারা ভূমধ্যসাগরেও আধিপত্য বিস্তার করে। কিছুদিন ধরে তাদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতা চলল। কিন্তু অবশেষে, ১৫৭১ খ্রীস্টাব্দে লেপান্তোর নৌ-যুদ্ধে অটোমানরা খ্রীস্টান শক্তিদের কাছে হেরে যায়।

বিখ্যাত তুর্কী-সম্রাট্ সোলেমান

তুর্কীরা খুব দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ও সামরিক কৌশলে সুনিপুণ ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে তারা ছিল ভীষণ ও নির্মম। **জানিসারিস** নামে একদল রাজকীয় খ্রীস্টান-ক্রীতদাসদের দ্বারা গঠিত সেনানী, তুর্কী-সাম্রাজ্যের প্রধান শক্তি ছিল। এদের জোরেই তারা অনেকদিন সমরক্ষেত্রে অপরাজেয় ছিল। দেশের শাসক ও রাজপুরুষবৃন্দ যুদ্ধবিদ্যাকেই জীবনের পেশা করতেন। এই ব্যাপারে, তাঁদের প্রাচীন স্পার্টাবাসীদের সঙ্গে তুলনা করা যায়। দেশ-শাসন ও রাজ্য-গঠন ব্যাপারে তুর্কী-শাসকগণ কিন্তু পটুতা দেখাতে পারেন নি। বর্তমান যুগের নতুন নিয়ম-প্রণালীর সঙ্গে তাঁরা নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারলেন না বলে ক্রমে তাঁদের পতন আরম্ভ হল।

তুর্কী-সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন

তুর্কী-সাম্রাজ্য বেশীদিন টিকল না। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব থেকেই তার ভাঙ্গন ধরল। তুর্কী সুলতানরা ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে কোন মনোযোগ দিলেন না, ফলে দেশে কোন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় নি। তুর্কীদের স্বভাবে প্রাচীনকালের যাযাবর-বৃত্তির খানিকটা থেকে গেল। অবশ্য তারা

রাজধানী কনস্টাণ্টিনোপলে (বর্তমান ইস্তাম্বুলে) অনেক সুন্দর সুন্দর সৌধ ও প্রাসাদ গড়েছিল ; কিন্তু তারা, তাদের বিশাল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন জাতি-ধর্ম-বিশিষ্ট প্রজাদের আপন করতে পারল না। বিশেষ করে, খ্রীস্টান প্রজাদের মধ্যে একটা ব্যাপক অসন্তোষ বেড়েই যেতে লাগল। সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন ধরার এইগুলিই প্রধান কারণ।

সোলেমানের রাজত্বের পর তুরস্কের পতন আরম্ভ হলে সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি রাজমন্ত্রী **কিউপ্রিলিদের** আমলে তুরস্ক আবার কিছুদিনের জন্যে পরাক্রান্ত হয়ে ওঠে।' বলকান ভূভাগে তাদের অগ্রাভিযান আবার উগ্র হয়ে ওঠে এবং অস্ট্রিয়া প্রমুখ পূর্ব-ইওরোপের দেশগুলি বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। কারা মুস্তাফার নেতৃত্বে তুর্কীরা ১৬৮৩ খ্রীস্টাব্দে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা অবরোধ করে। এই সময়ে পোল্যাণ্ডের বীর নৃপতি **সোবিয়েস্কি** খ্রীস্টান শক্তিদের সমবেত করে তুর্কীদের বিরুদ্ধে জোর আক্রমণ চালিয়ে তাদের ভিয়েনা হতে বিতাড়িত করেন। এর পর থেকে তুর্কীরা আর ইওরোপের ভয়ের কারণ হয় নি। আস্তে আস্তে তাদের ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন বিস্তীর্ণ তুর্কী-সাম্রাজ্যে দুর্বলতা দেখা দিল, পূর্ব-ইওরোপের উদীয়মান শক্তি রাশিয়া তখন তার প্রতি লোলুপ-দৃষ্টিতে তাকাতে আরম্ভ করল। রাশিয়ার প্রসিদ্ধ জার বা সম্রাট্ পিটারের বৈদেশিক অগ্রসর-নীতি হতেই তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়ার অভিযান আরম্ভ হয়। জারিনা দ্বিতীয় ক্যাথারিন কৃষ্ণসাগর অঞ্চলে রীতিমত তুরস্কের বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে থাকেন। তিনি পর পর কয়েকটি যুদ্ধে তুর্কীদের হটিয়ে দিয়ে, ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে, কাচুক-কাইনারজি সন্ধি দ্বারা কৃষ্ণসাগরের উত্তর অংশ দখল করেন। এইভাবে ক্ষীয়মাণ তুর্কীশক্তির বিরুদ্ধে পূর্ব-ইওরোপে রাশিয়ার ক্রমাগত অগ্রাভিযান থেকেই **প্রাচ্য-সমস্যার** উদ্ভব হয়।

ফরাসী-বিপ্লবের, মানব-অধিকারের বাণীর ছোঁয়াচ লেগে, বলকান-অঞ্চলের খ্রীস্টান জাতিরা, তুর্কী-অধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠল। গ্রীস ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই স্বাধীন হল। অপরাপর বলকান-জাতিপুঞ্জের ত্রাণকর্তার ভান করে রাশিয়া, সমস্ত ঊনবিংশ শতাব্দী, বার বার পূর্ব-ইওরোপের তুর্কী-সাম্রাজ্যের উপর প্রবল হানা দিতে লাগল।

উন্নত ইওরোপীয় শক্তিগুলির মত তুরস্ক আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী ও শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ে অগ্রসর হতে পারে নি। তাই সে রাশিয়াকে ঠেকাতে পারে নি, ক্রমেই হটে যেতে লাগল। শীঘ্রই সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যেত কিন্তু ইংলণ্ড,

অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের বাধাদানের জন্যে, রাশিয়া বিশেষ সুবিধা করতে পারল না এবং ঘুণেধরা তুর্কী-সাম্রাজ্য কোন রকমে টিকে গেল।

তুরস্কের প্রতি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের কোন দরদ ছিল না। ইংলণ্ড তার প্রাচ্য-সাম্রাজ্য রক্ষার জন্যেই তুরস্কের পক্ষ টেনেছে ও প্রবল শক্তিশালী রাশিয়াকে বলকান-অঞ্চলে অগ্রসরে বাধা দিয়েছে। এই বাধাপ্রদান-নীতি থেকেই **ক্রিমিয়ার যুদ্ধ** (১৮৫৪—১৮৫৬ খ্রীঃ) ও ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে **বার্লিন-কংগ্রেস** প্রভৃতির উদ্ভব হয় [রাশিয়া ভূমধ্যসাগরে একটা নিজস্ব বন্দর স্থাপন করতে চেয়েছিল। তুরস্ক, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও সার্দিনিয়া এতে বাধা দেয়। ফলেই ক্রিমিয়ার যুদ্ধ বাধে]। হতভাগ্য তুরস্ক তখন দুর্বল ও শতধাবিভক্ত। প্রবল শক্তিদের বিভিন্নমুখী এই স্বার্থান্বেষী সংগ্রামকে বাধা দেবার তার কোন ক্ষমতা ছিল না। যে কোন সময়ে তার বিরাট সাম্রাজ্য ধ্বসে পড়ে যেতে পারত। এই সময় তুরস্কের নাম দেওয়া হয়েছিল 'ইওরোপের পীড়িত মানব'।

১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে সুলতান **দ্বিতীয় আবদুল হামিদ** তুরস্কের সিংহাসনে বসেন। খ্রীস্টান প্রজাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করায় তাঁর খুব দুর্নাম ছিল। আবদুল হামিদ মুসলমান জগতের খলিফা বা ধর্মগুরুরূপে একটা সার্বজনীন ইসলাম-আন্দোলনের সৃষ্টির জন্যে চেস্টা করেছিলেন। কিন্তু তুর্কী যুবকেরা তাঁর চাল ধরে ফেলল।

১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে তুরস্কে "তরুণ তুর্কীদল" গঠিত হয়। তারা দেশের শাসন-বিধির ও নিয়ম-কানুনের আমূল পরিবর্তন করতে চায়। কোরান এবং হদিসের আইনগুলো সব ভগবান তৈরি করে দিয়েছেন, এ সব আইন বদলাবার অধিকার মানুষের নেই, তাদের চিরকাল এগুলোকেই মেনে চলতে হবে,—তুরস্কের তরুণ দল, এই যুক্তি কিছুতেই মেনে নিতে পারল না।

একদল তরুণ তুর্কী, ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে পালিয়ে গিয়েছিল। সেখানে লেখাপড়া শিখে তাদের আরও বেশী চোখ খুলে গেল। তারা বুঝল যে, তুর্কী-সাম্রাজ্য যে ভাবে চলছে, সেই ভাবে তাকে চলতে দিলে, কিছুতেই তাকে টিকিয়ে রাখা যাবে না। সাম্রাজ্যের মধ্যে খ্রীষ্টান, মুসলমান এবং ইহুদী এই তিন ধর্মের লোক রয়েছে। এই তিন রকমের লোককে নিয়ে সাম্রাজ্য রাখতে হলে তিন জনেরই মতামত, তিন জনকেই কিছু কিছু করে মানতে হবে। তারা ভাবল যে, ফরাসীদের মত একটা পার্লামেন্ট গঠন করে সেই পার্লামেন্টের হাতে যদি আইন তৈরি এবং দেশ-শাসনের ভার দেওয়া যায়, তা হলে এই সাম্রাজ্য হয়ত টিকে যেতে পারে।

বর্তমান গ্রীসের অন্তর্ভুক্ত **সালোনিকা** ছিল তখন তুর্কী-সাম্রাজ্যের অধীন। তরুণ তুর্কীরা তাদের নতুন আদর্শকে বাস্তব রূপ দেবার জন্যে সকলের আগে এই সালোনিকাতে একটা **বিদ্রোহ** ঘোষণা করে দাবি করল যে, সালোনিকার জন্যে সুলতানকে একটা শাসনতন্ত্র ঠিক করে দিতে হবে।

আবদুল হামিদ তখনও তুরস্কের সুলতান; তিনি কোন উচ্চবাচ্য না করে

লেপাস্তোর নৌ-যুদ্ধ

চট করে তরুণ দলের এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন। এই তরুণদের হাতেই সালোনিকা শাসনের ক্ষমতা চলে এল।

এই ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গে, সমস্ত তুর্কী-সাম্রাজ্যের উপর দিয়ে একটা মহা বিপদের ঝড় বয়ে গেল। সুলতান আবদুল হামিদের দুর্বলতা বুঝতে পেরে, তুর্কী-সাম্রাজ্যের পাশের সব কয়টি দেশ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। **বুলগেরিয়া** স্বাধীনতা ঘোষণা করে সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে গেল। **গ্রীস** ক্রীট দ্বীপটি কেড়ে নিল। **অস্ট্রিয়া** বোসনিয়া এবং হারজেগোভিনা নামক দুটি জায়গা দখল করে নিল।

আরবেরাও বিদ্রোহ আরম্ভ করল। মেসোপোটেমিয়া (বর্তমান ইরাক), সিরিয়া, মক্কা ও নেজ্‌দ্ নামক আরব দেশগুলোতে স্বাধীনতা-আন্দোলন আরম্ভ হল এবং এই সব কয়টি জায়গাতেই, তুর্কী সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গেল।

তরুণ তুর্কীদল, সুলতান আবদুল হামিদকে সিংহাসনচ্যুত করেছিল; কিন্তু এই দল নানারূপ অন্তরায়ের জন্যে, কোন কিছু সুবিধা করতে পারল না। দেশের মধ্যে আর্থিক দুর্গতি এবং বাইরে বৈদেশিক ষড়যন্ত্রের জন্যে, তাদের দেশ-সংস্কারের প্রচেষ্টাগুলি ব্যর্থ হয়ে গেল। এই সময়, বলকান দেশগুলি একটি সংঘের সৃষ্টি করে। তুরস্কের দুর্বলতা ও আভ্যন্তরীণ কলহ লক্ষ্য করে এই বলকান-সংঘ, ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে, তুরস্ক আক্রমণ করে সহজেই তাকে পরাজিত করে। এর কিছুদিন পূর্বে, ইতালীর সঙ্গে যুদ্ধেও তুরস্ক হেরে যায়। এই ভাবে যখন সমস্ত সাম্রাজ্য ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়, তখন ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীব্যাপী **প্রথম বিশ্বযুদ্ধ** আরম্ভ হয়।

জানিসারিস

যখন ইওরোপে বিশ্বযুদ্ধ বেধে গেল তখন তরুণ তুর্কীদল ভাবল যে, তারা যদি যুদ্ধে জার্মেনীর পক্ষে যোগ দেয়, তাহলে জার্মেনী তাদের অস্ত্র-শস্ত্র দেবে। এই অস্ত্রের সাহায্যে তারা বিদ্রোহী আরবদের শায়েস্তা করতে পারবে, চিরশত্রু রাশিয়ার বিরুদ্ধেও প্রতিশোধ নিতে পারবে।

আরবরা তুর্কীদের উলটো পথ ধরল। তারা দেখল যে, যুদ্ধে ইংরেজের পক্ষে যোগ দিলেই বরং ভবিষ্যতে কিছু লাভের আশা আছে। তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্যে, ইংরেজ সৈন্য এসে যখন মেসোপোটেমিয়ায় ঘাঁটি বসাল, আরবরা তখন তাদের কোন বাধা দিল না। ওদিকে তুর্কীরা এগিয়ে এসে, সিরিয়া দখল করে সেখানকার আরবদের কাবু করে রাখল। নেজ্‌দের রাজা ইবন সৌদ, যাতে তুর্কীদের পক্ষে যোগ দিয়ে না বসেন সে জন্যে, ইংরেজরা তাঁকে একটা মোটা টাকা ঘুষ দিয়ে নিরপেক্ষ করে রেখে দিল।

এই সব বন্দোবস্ত শেষ করে ইংরেজরা এবার সোজাসুজি তুরস্কের রাজধানী **কনস্টান্টিনোপল** আক্রমণ করতে গেল। তুরস্কের রাজধানী

এখন হয়েছে **আনকারা,** তখন ছিল কনস্টান্টিনোপল। কনস্টান্টিনোপলে পৌঁছতে হলে দার্দানেলিজ-প্রণালী পার হয়ে যেতে হয়। দার্দানেলিজ-প্রণালীর কাছেই **গ্যালিপলি** উপদ্বীপ। তুর্কীরা সেখান থেকে ইংরেজদের বাধা দিল। এই গ্যালিপলিতে ইংরেজদের সঙ্গে তুর্কীদের ভীষণ যুদ্ধ হয়
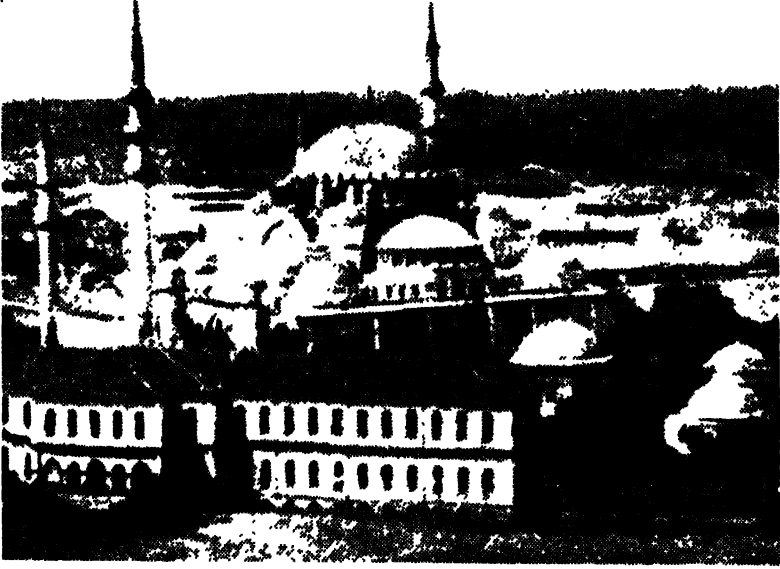
ইস্তাম্বুলের একটি সুদৃশ্য মসজিদ

এবং ইংরেজ হেরে যায়। **মুস্তাফা কামাল** এই যুদ্ধে সেনাপতিত্ব করেন এবং অপূর্ব বীরত্বের পরিচয় দেন।

এই সময় **হুসেন** নামক মক্কার একজন বড় আরব নেতা তুর্কী-সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। তুর্কীরা চটে মদিনায় সৈন্য পাঠাল এবং মক্কার উপর কামানের গোলাবর্ষণ করল। মক্কা এবং মদিনা মুসলমানদের তীর্থক্ষেত্র; তার উপর আক্রমণ হওয়াতে তুর্কীদের উপর আরবদেশের সব মুসলমান ক্ষেপে গেল। হুসেনের তৃতীয় পুত্র ফৈজলের নেতৃত্বে, তারা তুর্কীদের আক্রমণ করল।

কর্নেল লরেন্স আরবী ভাষা শিখে, একেবারে আরবদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন। তিনি ইংরেজ সেনাপতির কাছ থেকে টাকা এবং অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে এসে আরবদের সাহায্য করতে লাগলেন। ইংরেজরা দুই দিক থেকে তুর্কীদের

আক্রমণ করল। মুস্তাফা কামাল নিজে এই অভিযান ঠেকাবার জন্যে তাড়াতাড়ি এলেন, কিন্তু ইংরেজরা তখন অনেক দূর এগিয়ে গেছে। তিনি কিছুই করতে পারলেন না। তুর্কীরা হেরে গেল।

অবশেষে বাধ্য হয়ে তারা ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করল। সন্ধিতে ঠিক হল যে, মিশরের উপর তুরস্কের আর কোন দাবি থাকবে না। তা ছাড়া, আরব দেশগুলোও তুর্কী-সাম্রাজ্য ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করবে। এই ভাবে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তুর্কী-সাম্রাজ্য একেবারে ভেঙে গেল।

তুর্কী-রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা

মুস্তাফা কামাল বুঝতে পারলেন যে, নানা জাতি, নানা ধর্মের লোক নিয়ে, সাম্রাজ্য গড়বার চেষ্টা করার চেয়ে শুধু তুর্কীদের একত্র করে স্বাধীন দেশ হিসাবে তুরস্ককে শক্তিশালী করে তোলা ভাল। তিনি সেই চেস্টাই করতে লাগলেন।

মুস্তাফা কামাল নিজে কিন্তু তুর্কী ছিলেন না; তাঁদের দেশ ছিল তুরস্কের বাইরে, আলবেনিয়ায়। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে সালোনিকায় তাঁর জন্ম। ২৪ বৎসর বয়সে তিনি তুরস্কের সৈন্যদলে যোগদান করেন এবং তখন থেকেই তিনি বড় বড় যুদ্ধে লড়াই করেন। তিনি অত্যন্ত একগুঁয়ে এবং কঠোর প্রকৃতির লোক ছিলেন।

ইংরেজরা, সিরিয়ায় তুর্কীদের হারিয়ে দেবার পর, তুরস্ককে নিরস্ত্র করে রাখবার চেস্টা করে। তখন তুরস্কের যিনি সুলতান ছিলেন, তাঁর নাম ছিল ভ্যানেদ্দিন। আনাতোলিয়ায় সৈন্যদের নিরস্ত্র করবার কাজ কেমন ভাবে চলেছে, তা তদারক করবার নাম করে সুলতানের অনুমতি নিয়ে, মুস্তাফা কামাল সেখানে গেলেন। কিছুদিনের মধ্যেই সুলতান সংবাদ পেলেন যে, কামাল আনাতোলিয়ায় গিয়ে, সৈন্যদের নিরস্ত্র তো করেনই নি, বরং সেখানে তিনি একটা বিদ্রোহের বন্দোবস্ত করছেন। সুলতান আবার ইংরেজদের ঘাঁটাতে সাহস পেলেন না, তিনি কামালকে ডেকে পাঠালেন। কামাল তো ফিরে গেলেনই না, উলটে সুলতানকে জানিয়ে দিলেন যে, তুরস্কের স্বাধীনতা-অর্জন না-করা পর্যন্ত তিনি আনাতোলিয়া থেকে এক পা-ও নড়বেন না।

সুলতান, গবর্নমেণ্ট এবং ইংরেজ এই তিন শক্তি তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল। তবু কামাল দমলেন না। এই অবস্থার মধ্যেও তিনি তুরস্কের জন্যে একটা **জাতীয় পরিষদ** (গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল এসেমব্লি) গড়ে তুললেন। দেশের নানা স্থান থেকে প্রতিনিধির দল ছদ্মবেশে এসে সেই পরিষদে যোগ দিলেন, এবং মুস্তাফা কামালকে সভাপতি নির্বাচিত করলেন। কয়েক মাস পর, আবার সেই পরিষদের সভা তিনি ডাকলেন; এই সভায় প্রতিনিধিরা তাঁর মন্ত্রি-পরিষদ নির্বাচন করে দিলেন। এইবার কামাল, আনকারা শহরে তাঁর রাজধানী বসিয়ে, সেখানে ঘাঁটি স্থাপন করলেন। সেখান থেকেই তিনি **তুরস্কের স্বাধীনতা** ঘোষণা করলেন।

ইংরেজরা এই সময় এমন সব ভুল করতে লাগল যে, কামালের তাতে খুব সুবিধে হয়ে গেল। তারা এক চাল দিয়ে আনকারায় সংবাদ পাঠাল যে, তুরস্কের স্বাধীনতা এবং তার জাতীয় পরিষদের কর্তৃত্ব ইংরেজরা মেনে নিতে রাজী আছে।

এই খবর পেয়ে আনকারায় তুর্কীরা মহা খুশী হয়ে যায়। তারা কনস্টাণ্টিনোপলে গিয়ে, জাঁকজমক করে, জাতীয় পরিষদের সভা ডাকবার আয়োজনে মেতে উঠল। কামাল কিন্তু ইংরেজের মতলবে সন্দেহ করেছিলেন। তিনি তুর্কীদের সাবধান করে দিতে চাইলেন, কিন্তু তাঁর কথা একজনও কানে তুলল না। তুর্কীরা সব ছুটল কনস্টাণ্টিনোপলের দিকে। সেখানে গিয়ে, ঘটা করে সভা করবার মাস দুই পরেই, তাদের সব আনন্দ শেষ হয়ে গেল। হঠাৎ একদিন ইংরেজ সৈন্যেরা এসে কনস্টাণ্টি-নোপলের সমস্ত সরকারী বাড়ি দখল করে নিল এবং চল্লিশজন **জাতীয়তাবাদী নেতাকে গ্রেফতার** করে তাঁদের মাল্টাদ্বীপে পাঠিয়ে দিয়ে, বন্দী করে রাখল।

ইংরেজদের উপর তুর্কীদের মনের ভাব যখন এই রকম, তখন তারা আবার একটি কাণ্ড করে তুর্কীদের মন আরও বেশী বিষাক্ত করে তুলল। তিনজন তুর্কীকে দিয়ে সই করিয়ে, তারা একটা সন্ধিপত্র বের করে বলল যে, **সেভার্স** নামক জায়গায় এটা ইংলণ্ড এবং তুরস্কের মধ্যে সই হয়েছে।

এই সন্ধিপত্রে, ইংরেজরা দেখাল যে, তুর্কীরা দার্দানেলিজ-প্রণালীর দক্ষিণদিকের স্থানটি ইংলণ্ডকে, পশ্চিমদিকের আঙুর ক্ষেত পরিপূর্ণ জায়গাগুলো গ্রীসকে, এবং তার সব চেয়ে ভাল তুলা যেখানে উৎপন্ন হয়, সেই স্থানটি ইতালীকে ছেড়ে দিতে রাজী হয়েছে। তুর্কীদের নিজেদের জন্যে অবশিষ্ট রইল শুধু পাহাড়গুলো।

এই ঘটনায় তুর্কীরা একেবারে ক্ষেপে উঠল। এবার তারা ভাল করেই বুঝে নিল যে, ইংরেজরা তাদের বন্ধু নয়। তুরস্ক স্বাধীন দেশ হয়ে বেঁচে থাকে এটা তারা চায় না। যে-কোন প্রকারে তুর্কীদের দাবিয়ে রাখাই তাদের আসল উদ্দেশ্য।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং ইতালী তখন একজোট হয়ে, গ্রীসকে উসকিয়ে দিল তুরস্ক আক্রমণ করতে। তুর্কীরা এতেও ভয় পেল না। কামাল পূর্ণ উদ্যমে জাতীয় সৈন্যদল সংগ্রহ করতে লাগলেন। এই দলে কামান ছিল না, আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রও ছিল না বললেই চলে। তবু কামালের এই সৈন্যদল দুর্জয় শক্তির পরিচয় দিল।

আশি হাজার সুশিক্ষিত এবং কামান-বন্দুকে সজ্জিত সৈন্য নিয়ে, গ্রীকেরা আনকারা দখল করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করল, কিন্তু কামালের পঁচিশ হাজার সৈন্যকে তারা কিছুতেই সেখান থেকে হটাতে পারল না। চৌদ্দ দিন প্রচণ্ড যুদ্ধের পর গ্রীকেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল।

ইওরোপের দেশগুলোর চোখ এবার খুলল, তারা স্বীকার করল যে, তুর্কী জাতিকে ধ্বংস করে ফেলা অসম্ভব। তুরস্কের একটা অংশ এশিয়ায় আর একটা ইওরোপে অবস্থিত। ইওরোপে তার যে অংশ আছে, তার মধ্যে থ্রেস নামক স্থানটি তুর্কীরা ছাড়তে রাজী হয় নি। সেভার্সের সন্ধিতে ইংরেজরা সেটা গ্রীকদের বিলিয়ে দিয়েছিল। গ্রীসের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করবার পর, তুর্কীরা থ্রেস আবার দখল করে নিয়েছিল।

জাতি-গঠন

মুস্তাফা কামাল এবার ঘর গোছানোর দিকে মন দিলেন। ইংরেজরা বুঝল যে, তুরস্কের সঙ্গে এবার একটা সন্ধি করা দরকার। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে সুইজারল্যাণ্ডের **লজান** নামক শহরে ইংরেজ ও তুর্কী প্রতিনিধিরা মিলে, **সন্ধিপত্র** রচনা করবেন এই ঠিক হল। ইংরেজরা কিন্তু লজান-বৈঠকে প্রতিনিধি পাঠাবার জন্যে, কামালকে অনুরোধ না করে তুর্কী সুলতানকে সেই অনুরোধ করে পাঠাল।

জাতীয় পরিষদের সদস্যেরা এই অপমানে ভয়ানক অসন্তুষ্ট হলেন। মুস্তাফা কামাল গুরুত্বপূর্ণ আইন পাস করে এই অপমানের খানিকটা শোধ নিলেন।

এতদিন তুরস্কের সুলতান ছিলেন মুসলমানদের ধর্মগুরু খলিফা। জাতীয় পরিষদের এক আইনে ঘোষণা করা হল যে, সুলতানের পদ আর থাকবে না, সুলতান শুধু ধর্মগুরুর কাজই করবেন, রাজনীতিতে তিনি হাত

দিতে পারবেন না। তারা একজন নতুন খলিফাও নির্বাচন করে দিল। এই আইন পাস হবার সঙ্গে সঙ্গে, তুরস্কের সুলতান দেশ ছেড়ে পলায়ন করে, এক ব্রিটিশ যুদ্ধ-জাহাজে আশ্রয় নিলেন। শেষ পর্যন্ত ধর্মগুরুর পদও তুলে দেওয়া হল।

ইংরেজদের চাল তো ব্যর্থ হলই, ফলও হল উলটো। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, তুরস্কের সুলতানকে নিমন্ত্রণ করে এবং জাতীয় পরিষদকে অবজ্ঞা করে তুর্কীদের দেখানো যে, দেশের বাইরে সুলতানেরই সম্মান বেশী, জাতীয় পরিষদ কিছু নয়। কামাল সে চাল নষ্ট করে দিলেন। সুলতানকে সিংহাসন ছেড়ে পালাতে হল এবং ইংরেজরা জাতীয় পরিষদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে লজান-বৈঠকে দেখা করতে বাধ্য হল।

ইসমেত নামে কামালের এক বন্ধু ছিলেন, তাঁকে নেতা করে কামাল লজান-বৈঠকে একদল প্রতিনিধি পাঠিয়ে দিলেন। ইংরেজ দলের নেতা ছিলেন লর্ড কার্জন। কার্জন ইসমেতের দাবি মানতে রাজী হলেন না, দুজনে প্রায় হাতাহাতির উপক্রম হয়ে শেষ পর্যন্ত বৈঠক সেবারকার মত ভেঙে গেল।

কয়েক মাস পর আবার সেই বৈঠক আরম্ভ হল। এবারকার বৈঠকে, কামাল এবং ইসমেত যা চেয়েছিলেন তাই হল। সেভার্সের সন্ধি উলটে গেল। সমগ্র আনাতোলিয়া, থ্রেসের পূর্ব-অঞ্চল এবং কনস্ট্যান্টিনোপল তুরস্কের অন্তর্ভুক্ত থাকবে, ইংরেজরা একথা মেনে নিল। এতদিনে তুরস্ককে আলাদা একটা দেশ হিসাবে স্বীকার করতে ইওরোপের লোকেরা বাধ্য হল। কামাল আবার জাতীয় পরিষদে আইন পাস করিয়ে ঘোষণা করলেন, তুরস্ক আর কোনদিন কোন সুলতানকে এনে সিংহাসনে বসাবে না। তুরস্ক হবে **প্রজাতন্ত্র**, প্রজাদের প্রতিনিধিরা দেশ শাসন করবেন।

তুরস্ককে প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করবার পর, মুস্তাফা কামাল তার **প্রথম রাষ্ট্রপতি** নির্বাচিত হলেন (২৯শে অক্টোবর, ১৯২৩ খ্রীঃ)। এবার তিনি আর একটা আইন পাস করালেন যে, তুরস্কে কোন খলিফা থাকবেন না। তিনি ঠিক করে দিলেন যে, ধর্মের নামে মুসলমান শাস্ত্রের বিধানকে ভগবানের আইন বলে জাহির করে দেশ-শাসন এবং ধর্মানুষ্ঠানকে তিনি এক সঙ্গে জড়িয়ে রাখতে দেবেন না। প্রজাদের প্রতিনিধিরা তাঁদের জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে আইন পাস করবেন এবং সেই আইন সবাইকে মেনে চলতে হবে। শাসন-কর্তারা জাতীয় পরিষদের তৈরী আইন মেনে দেশ শাসন করবেন। ধর্মানুষ্ঠান যে-যার নিজের ইচ্ছামত ঘরে বসে করবে, তার সঙ্গে রাজ্যশাসনের কোন সম্পর্ক থাকবে না।

এই ভাবে খলিফার কর্তৃত্ব নষ্ট করে দেওয়ায়, অন্যান্য দেশের মুসলমানেরা কামালের বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন চালিয়েছিল ; কিন্তু তাতে তিনি দমেন নি। তিনি যা করেছিলেন, তার কোন অদলবদল হতে দেন নি।

মুস্তাফা কামালের সংস্কার

স্বাধীন তুরস্কের শক্তিশালী গবর্নমেণ্ট গঠনের পর, কামাল (১৮৮১—১৯৩৮ খ্রীঃ) সমাজ-সংস্কারে মন দিলেন। **কাজীর বিচার** তুলে দিয়ে, তিনি বিচারের ভার দিলেন শিক্ষিত বিচারকদের হাতে। **স্কুল-কলেজ** প্রতিষ্ঠা করে তিনি আধুনিক শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার বন্দোবস্ত করে দিলেন। টেক্‌নিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করে তুর্কীদের তিনি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে শেখালেন। তুরস্কে এতদিন এ সব কিছুই ছিল না। শিক্ষা বলতে তুর্কীরা শুধু ধর্মশিক্ষাই বুঝত। **তুর্কী ফেজ** পরা তুলে দিয়ে তিনি ইওরোপীয় কায়দায় হ্যাট পরা প্রচলন করলেন। মুসলমান হলেই তাকে ফেজ পরতে হবে, তুর্কীদের এই ধারণা তিনি ভেঙে দিলেন।

তুর্কী মেয়েরা **পর্দা-প্রথা** মেনে চলত, বোরখা না পরে তারা কারও সামনে বের হত না। কামাল এই পর্দা-প্রথা তুলে দিলেন। মেয়েরা স্বাধীন ভাবে পথে বেরোতে আরম্ভ করল, সরকারী চাকরিও তাদের মধ্যে অনেকে গ্রহণ করল। পর্দা-প্রথা দূর করতে গিয়ে, কামালকে অনেকের বিরাগভাজন হতে হয়েছিল, কিন্তু কোন বাধা তিনি গ্রাহ্য করেন নি। মেয়েদের জন্যে তিনি স্কুল-কলেজ করে দিয়ে, তাদের লেখাপড়া শেখবার বন্দোবস্ত করে দিলেন।

তুর্কী ভাষা তখনও লেখা হত আরবী হরফে। এই দুরূহ হরফের বদলে কামাল, তুর্কী ভাষা **ল্যাটিন হরফে** লেখবার ব্যবস্থা করলেন। ইংরেজী ভাষা যে অক্ষরে লেখা হয়, তাকে বলে ল্যাটিন হরফ। এইভাবে দেশের সমাজ ও শিক্ষা-ব্যবস্থায় কামাল আমূল পরিবর্তন এনে দিলেন।

দেশের লোকদের **আর্থিক অবস্থা** ভাল করবার জন্যে, কামাল বড় বড় রাস্তা এবং রেলওয়ে তৈরি করে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা করে দিলেন।

ধীরে ধীরে কৃষকদের তিনি আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যেও চাষ করতে শেখালেন। এতে চাষীদের আয় অনেক বেড়ে গেল। কামাল যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন পর্যন্ত তিনিই ছিলেন তুরস্কের রাষ্ট্রপতি।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কামাল আতাতুর্কের মৃত্যু হলে তাঁর স্থলে **জেনারেল ইসমেত ইনোনু** অভিষিক্ত হলেন তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি-পদে। ১৯৩৯

খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বেজে উঠল রণ-দামামা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হল। তুরস্ক কালবিলম্ব না করে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সঙ্গে মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ হল। স্থির হল, যুদ্ধ যদি ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত সংক্রামিত হয়, তা হলে তুরস্ক যথাসাধ্য সাহায্য করবে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে।
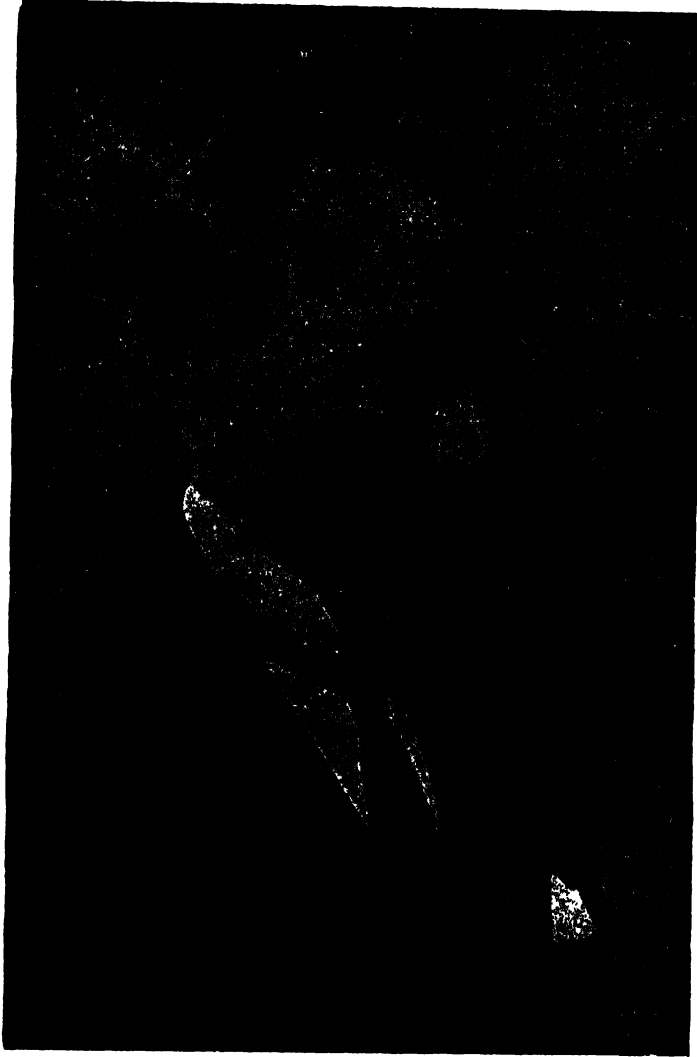
মুস্তাফা কামাল

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই রাশিয়ার সঙ্গে তুরস্কের একটা সন্ধি ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধবার সঙ্গে সঙ্গেই, তুরস্কের বৈদেশিক মন্ত্রী, মহম্মদ সারা জোগলু মস্কো যাত্রা করলেন—এই সন্ধি-বন্ধনকে দৃঢ়তর ভিত্তির উপরে স্থাপন করবার

জন্যে। কিন্তু তাঁর আশা সফল হল না। রাশিয়া দাবি করল যে, রাশিয়ার শত্রু-স্থানীয় কোন দেশের কোন জাহাজ যদি দার্দানেলিজ-প্রণালীতে প্রবেশ করতে চায়, তবে উক্ত প্রণালীর রক্ষক হিসাবে তুরস্ককে সেই জাহাজ আটক করতে হবে। সারা জোগলু এ প্রস্তাবে রাজী হতে না পেরে দেশে ফিরে এলেন।

১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে দারুণ ভূমিকম্পে, তুরস্কের রাজধানী আনকারা ও তৎসন্নিহিত আনাতোলিয়া প্রদেশ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হল।

তুরস্কের দৃঢ় সংকল্প ছিল যে, সে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কোন পক্ষাবলম্বন করবে না, নিরপেক্ষ থাকবে। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চিলের প্রাণপণ চেস্টাও সে-সংকল্প থেকে তুরস্ককে বিচ্যুত করতে পারে নি। মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও প্রধান মন্ত্রী চার্চিল এক সময়ে কাইরোতে স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট ইনোনুর সঙ্গে এ-বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। তা সত্ত্বেও মিত্রশক্তির সঙ্গে তুর্কীরা যোগ দেয় নি ; কিন্তু ১৯৪৪-এর মাঝামাঝি, জার্মেনীকে বিপর্যয়ের মুখে দেখে, তখন তুরস্ক তার ও জাপানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করল। ১৯৪৫-এর গোড়ার দিকে এই দুই দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধই ঘোষণা করল।

১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে তুরস্কে এক সাধারণ নির্বাচন হয়, তাতে অনেকদিন পরে, কামাল আতাতুর্ক-সৃস্ট 'রিপাবলিকান পিপলস্ পার্টি' হেরে যায় এবং বিপুল সংখ্যাধিক্যে, **ডেমোক্রেটিক দল** জয়লাভ করে। ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দের নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। সেলাল বেয়ার রাষ্ট্রপতি হন। তাঁর সময়ে প্রধান মন্ত্রী হন আদনান মেন্দেরেস। ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে মে একটা বিরাট ছাত্র-আন্দোলনের ফলে দেশে সামরিক কর্তৃত্ব শুরু হয়। বেয়ার ও মেন্দেরেস বন্দী হন ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর (মেন্দেরেসের ফাঁসি হয়) এবং জেনারেল সি গুরশেল দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন।

অস্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে, তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়ার ক্রমাগত অগ্রসর-নীতির ফলে, বিখ্যাত প্রাচ্য-সমস্যার সৃষ্টি হয়। তুরস্কের তখন আগা-গোড়া রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিপক্ষ মনোভাব ছিল। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের সোভিয়েট বিপ্লবের পর ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত, রাশিয়ার সঙ্গে তুরস্কের মৈত্রীভাব বজায় ছিল। তারপরে সোভিয়েট রাশিয়া আবার ঐতিহাসিক দার্দানেলিজ-প্রণালীর দিকে সোৎসুক দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ক্রমে সে তুরস্কের উত্তর-অঞ্চল বরাবর সৈন্য ও সমর-সরঞ্জাম মোতায়েন করে। এর ফলে তুরস্ক নিজের নিরাপত্তার জন্যে আতঙ্কিত হয় এবং পশ্চিম-ইওরোপের রাষ্ট্রগোষ্ঠী ও মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যপ্রার্থী হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে তুরস্ককে হাতে পেয়ে খুব সুবিধা লাভ করে।

ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি তাদের পূর্ব-ভূমধ্যসাগর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় তুরস্ককে এখন তাদের প্রধান ঘাঁটিতে পরিণত করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের সাহায্যনীতি অনুসারে, তুরস্কে অকাতরে অর্থব্যয় করে। বর্তমানে মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিক্সনের সাহায্যপুষ্ট হয়ে তুরস্কের আভ্যন্তরীণ আর্থিক উন্নতি হচ্ছে এবং দ্রুতগতিতে সে একটি আধুনিক উন্নত সামরিক শক্তি হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

তুরস্কের প্রেসিডেণ্ট সি সুনে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তুরস্কের রাজধানী আনকারাতে একটি বৃহৎ সামরিক মিশন নিযুক্ত রেখেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিচালনাধীনে তুরস্কে অসংখ্য নৌ-ঘাঁটি ও বিমান-ঘাঁটি তৈরী হয়েছে। রাশিয়া তুরস্কের কাছে এই সকল ব্যাপারের

জোর প্রতিবাদ করেছে, কিন্তু তুরস্কের নীতি এখন সম্পূর্ণ কম্যুনিস্ট-বিরোধী। তুরস্কে কম্যুনিজম বে-আইনী বলে ঘোষিত।

তুরস্ক মধ্যপ্রাচ্যের আরব রাষ্ট্রসংঘের শক্তিতে খুব বিশ্বাসী নয়। সে এখন ক্রমাগত ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিগোষ্ঠীর দিকেই ঝুঁকে পড়েছে। তারাও মধ্য-প্রাচ্যে তুরস্কের উপরই বেশী নির্ভরশীল। ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে তুরস্ক গ্রীসের সঙ্গে উত্তর-অতলান্তিক চুক্তি সংস্থার সদস্য হয়েছে এবং তখন হতে পশ্চিম-এশিয়া প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

তুরস্কের প্রধান মন্ত্রী সুলেমান ডেমিরেল

১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্তানের সঙ্গে তুরস্কের সামরিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক চুক্তির সম্পাদন হয়। এই ব্যবস্থার ফলে তুরস্ক এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে অক্টোবর তুরস্কের প্রেসিডেন্ট হন। তিনি ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দের ১০ই নভেম্বর পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট-পদে আসীন থাকেন। তাঁর পরে পর পর ইসমেত ইনেনু (১৯৩৮, ১১ই নভেম্বর —১৯৫০, ২১শে মে), সেলাল বেয়ার (১৯৫০, ২২শে মে—১৯৬০, ২৭শে মে) ও সি গুরশেল (১৯৬১, ২৬শে অক্টোবর—১৯৬৬, ২৭শে মার্চ) প্রেসিডেন্ট হন। বর্তমান প্রেসিডেন্ট সি স্থনে ১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে মার্চ প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। বর্তমান প্রধান মন্ত্রী স্থলেমান ডেমিরেল।

তুরস্কের আয়তন ৭,৮০,৫৭৬ বর্গ কিলোমিটার (৩,০১,৩০২ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ৩,১৩,৯১,২০৭ (১৯৬৫ খ্রীঃ)। তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারা (লোকসংখ্যা ৯,০২,২০০)। প্রধান শহর ইস্তাম্বুল (কনস্ট্যান্টিনোপল)। এর লোকসংখ্যা ১৭,৫০,০০০।

তুরস্কের শতকরা ৯৮·৯২ জন মুসলমান। কিন্তু ইসলাম সরকারী ধর্ম নয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হয়। তুরস্কে শিক্ষার হার দ্রুত বেড়ে চলেছে।

প্যালেস্টাইন

(ইজরেল-জর্ডন)

পশ্চিম-এশিয়া অঞ্চলে, আরবের উত্তর-পশ্চিম ও সিরিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত ছিল প্যালেস্টাইন নামে একটি ক্ষুদ্র দেশ। এই দেশটি ইহুদী ও খ্রীস্টানদের ধর্মজগতের কেন্দ্রস্থল। খ্রীস্টধর্মের তীর্থক্ষেত্ররূপে, যুগে যুগে এই স্থানটি ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ইহা ঈজিপ্টের সন্নিকটবর্তী দেশ।

মধ্য ও পশ্চিম-এশিয়া অঞ্চলের অপরাপর দেশের মত, প্যালেস্টাইনের সভ্যতাও বহু পুরাতন। ইহুদী বা হিব্রুদের ধর্মপুস্তকে আমরা বহু প্রাচীনকাল থেকে, ইহুদী জাতির প্যালেস্টাইনে বসবাসের উল্লেখ পাই। যতদূর জানা যায়, খ্রীস্টপূর্ব বার শত বৎসরেরও অনেক আগে থেকে ইহুদীরা, দক্ষিণ-প্যালেস্টাইনের **জুডিয়া** রাজ্যে বসতি আরম্ভ করে। কিছুকাল পরে তাদের রাজধানী হয় **জেরুজালেম** নগরী।

সেকালের আশেপাশের বড় বড় সাম্রাজ্যের সঙ্গে ইহুদীদের ইতিহাস জড়িত। ইহুদীদের 'ওল্ড টেস্টামেণ্ট' নামে ধর্মপুস্তক থেকে আমরা জানতে পারি যে, দক্ষিণে মিশর এবং উত্তরে ক্রমাগত পরিবর্তনশীল সিরিয়া, আসিরিয়া ও বাবিলন সাম্রাজ্যের সঙ্গে ওদের নানারূপ কাহিনী ঘনিষ্ঠভাবে মিশে আছে। প্যালেস্টাইন দেশটি ছিল এশিয়াস্থিত সাম্রাজ্যগুলির সঙ্গে মিশরের যোগাযোগ-পথ।

'ওল্ড টেস্টামেণ্ট' অর্থাৎ হিব্রু-বাইবেল বা ধর্মপুস্তক লেখার জন্যে হিব্রুরা পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়ে আছে। এজেকিয়েল, আমোস, ইসায়া প্রভৃতি বিখ্যাত ধর্মনিষ্ঠ দার্শনিকদের সহায়তায় এই বই লিখিত হয়। এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থের মধ্যে অনেক আইন, কাহিনী, ইতিবৃত্ত, স্তোত্র, উপদেশাবলী, কাব্য, উপন্যাস এবং রাজনৈতিক তথ্যের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। চ্যালডিয়ান রাজশক্তির অধীনে বাবিলনে, বন্দী-অবস্থায় থাকাকালেই বোধ হয়, ইহুদী

আব্রাহামের প্যালেস্টাইনে প্রবেশ

দার্শনিকগণ এই বিরাট ধর্ম-সাহিত্য একত্রে সংগৃহীত করেন। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে আমরা এই সাহিত্যের প্রথম পরিচয় পাই।

উক্ত বিখ্যাত গ্রন্থে, ইহুদীদের ইতিহাসে, আব্রাহামের কাহিনী থেকে ধারাবাহিক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। **আব্রাহাম** সম্ভবতঃ ছিলেন বাবিলনের প্রসিদ্ধ নৃপতি হামুরাবীর সমসাময়িক। তিনি সেমিটিক জাতির

অন্তর্গত, যাযাবর-দলপতির মত ছিলেন। তাঁর নিজের ভ্রমণকাহিনী, তাঁর পুত্র-পৌত্রাদির নানা গল্প এবং কি করে তারা মিশরে বন্দী হয়েছিল, এই সব কথা ওল্ড টেস্টামেণ্টে পাওয়া যায়। পরে খ্রীস্টপূর্ব ষোড়শ শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে **মোজেস** বা **মুশার** নেতৃত্বে ইহুদী জাতি, অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতার পর দক্ষিণ-প্যালেস্টাইনে কানান দেশ আক্রমণ করে অধিকার করে।

এই সময় প্যালেস্টাইনের সমুদ্রের উপকূল-অঞ্চলে **ফিলিস্টাইন** নামে এক অ-সেমিটিক, ইজিয়ান সভ্যতাভুক্ত জাতি বাস করত। ফিলিস্টাইনদের
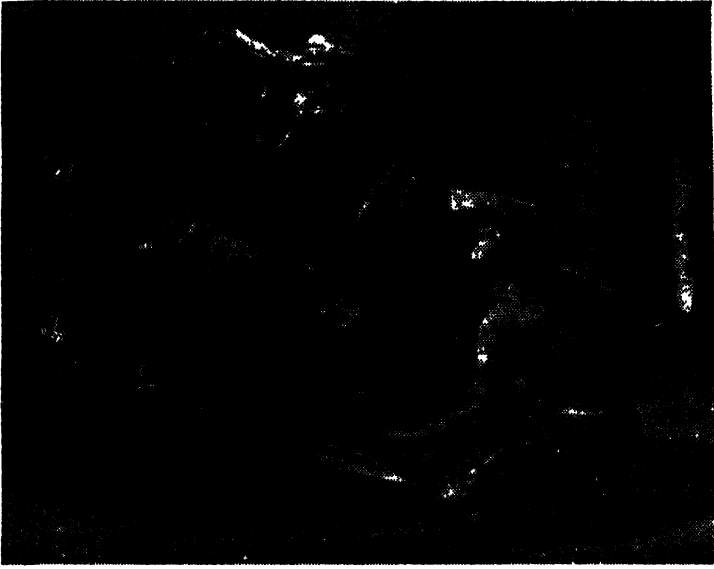
সল ও ডেভিড

নগরগুলির মধ্যে গাজা, আসদদ, আস্কেলন এবং যোপ্পা সমধিক প্রসিদ্ধ। বহু শতাব্দী পর্যন্ত আব্রাহামের ইহুদী বংশধরদের সঙ্গে ফিলিস্টাইন, মোয়াবাইটিস ও মিডিয়ানাইটিসদের যুদ্ধ-বিগ্রহ চলে। **'বুক অফ জাজেস'** গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে।

প্রথমে ইহুদীরা পুরোহিত-বিচারকদের শাসনাধীনে ছিল। প্রায় খ্রীস্টপূর্ব দশম শতাব্দীতে তারা **সল** নামে এক রাজা নির্বাচিত করে। **সল** বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। তাঁর উত্তরাধিকারী **ডেভিড** অধিক পটুতার সঙ্গে রাজ্যশাসন করেন। এই সময় ইহুদাদের উন্নতির

যুগের উন্মেষ হয়। ডেভিডের পুত্র **সলোমনের** রাজত্বকাল জেরুজালেমের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। বিভিন্নপ্রকারের উন্নতি, আড়ম্বর এবং মন্দির ও সৌধ-নির্মাণের জন্যে সলোমনের রাজত্ব ইহুদীদের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এসময়ে ইহুদীদের উন্নতির প্রধান কারণ, ফিনিশিয়দের সমৃদ্ধিশালী নগরী টায়ারের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও বন্ধুত্ব। সলোমন একটি ছোট রাজ্যের অধীশ্বর হলেও মিশরের একজন ফেরো তাঁর সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন।

ইহুদীদের উন্নতির যুগ বেশী দিন ধরে চলতে পারে নি। ক্রমেই তাদের পতন হতে থাকে। নিজেদের মধ্যে তাদের ঝগড়া ও গৃহ-বিবাদ লেগেই ছিল। তাছাড়া, ইহুদীদের দু'টি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র, ইজরেল ও জুডার চারদিকে আসিরিয়া, বাবিলন ও মিশর প্রভৃতি নামজাদা সাম্রাজ্য থাকায়, ইহুদী রাষ্ট্রদ্বয় ক্রমেই হীনবল হতে থাকে। খ্রীস্টপূর্ব ৭২১ অব্দে আসিরিয়গণ, ইজরেল রাষ্ট্রকে পরাভূত করে ইহুদীদের বন্দী-ভাবে বাবিলনে চালান দেয়। কিছুদিন পর **নেবুচাডনেজার** নামে চ্যালডিয়ান সম্রাট্ জুডা রাজ্য বিনষ্ট করেন, জেরুজালেম নগরী ধ্বংস করে পুড়িয়ে দেন এবং অবশিষ্ট ইহুদীদের বাবিলনে বন্দী করে রাখেন।
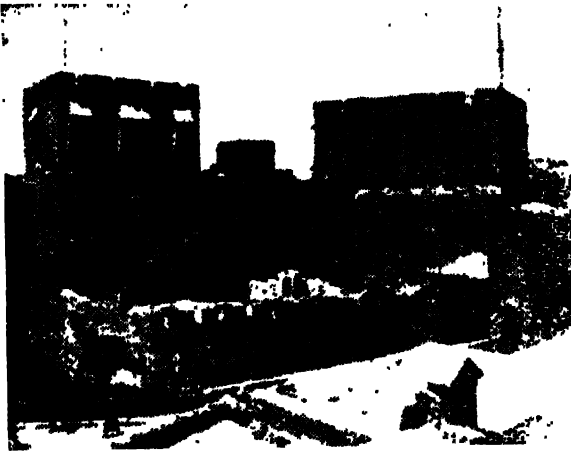
ডেভিডের "টাওয়ার"

তারপর খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে যখন একিমিনিড-বংশের প্রথম সম্রাট্ **কাইরাস** পারসিক সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন তখন ইহুদীগণ পুনরায় জেরুজালেম নগরী নির্মাণ করে সেখানে এসে আবার বসবাস আরম্ভ করে। এই থেকে বহুদিন পর্যন্ত ইহুদীরা পারসিক শক্তির অধীনে থাকে।

খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে, গ্রীক-বীর আলেকজাণ্ডার যখন দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিলেন, তখন মিশর-অভিযানের পথে, তিনি এই জেরুজালেম নগরী জয় করেন। তারপর থেকে অনেক দিন জেরুজালেম ছিল সেলুকস ও তাঁর পরবর্তী গ্রীক-শাসকদের অধীন। গ্রীকেরা বহু বৎসর ধরে সেখানে রাজত্ব

করেছিল। তারপরে কিছুকাল পর্যন্ত এই রাজ্য স্বাধীন ছিল। কিন্তু এরপর যখন রোমের স্বর্ণযুগ আরম্ভ হয়, সেই সময় রোমানদের মধ্যে **পম্পে** নামে এক বড় বীরের অভ্যুদয় হয়েছিল। তিনি প্যালেস্টাইনের বিরুদ্ধে এক অভিযান পরিচালিত করেন। তাঁর বিজয়-বাহিনীর কাছে ইহুদীদের প্রতিরোধ চূর্ণ হয়ে গেল, সেনাপতি পম্পে জেরুজালেম জয় করে বিজয়ীর বেশে সগৌরবে নগরে প্রবেশ করলেন।

রাজা সলোমন

এরপরও জেরুজালেমে ইহুদীরা ক্ষমতা লাভের জন্যে রাজনৈতিক গণ্ডগোল সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল বটে, কিন্তু ৭০ খ্রীষ্টাব্দে রোমানগণ জোর করে জেরুজালেম অধিকার করল এবং ইহুদীদের মন্দির ধ্বংস করে দিল। রোমানরা জেরুজালেমকে বিনষ্ট করে উহা আবার নিজেদের অভিরুচি-অনুসারে গঠিত করে। তারা বহুদিন ইহুদীদের ঐ নগরীতে বাস করতে দেয় নি।

'জন দি ব্যাপ্‌টিস্ট'

ইহুদীরা এই বিপর্যয়ে খুব দুঃখিত হল এবং আবার কবে স্বাধীনতা পাবে এই চিন্তায় তারা দিন কাটাতে লাগল। প্যালেস্টাইনে **জর্ডন** নামে একটি নদী আছে। **জন** নামে একজন ইহুদী এই নদীর উপর ঘুরে বেড়াতেন এবং ইহুদীদের আশার বাণী শোনাতেন। তিনি সবাইকে বলতেন,

সলোমনের মন্দিরের ভিতরের একটি দৃশ্য

"তোমাদের মনটা খুব পরিষ্কার রেখ, কোন অন্যায় বা অসৎ চিন্তা মনে স্থান দিও না, তাহলে ভগবান তোমাদের প্রতি সদয় হবেন।"

মন থেকে সব অসৎ ভাব দূর করবার জন্যে, তিনি ইহুদীদের জর্ডন নদীর জলে স্নান করতে বলতেন। এই স্নানকে বলা হত **ব্যাপ্‌টিজম্‌** এবং জর্ডন নদীর জলে স্নান করতে উপদেশ দিতেন বলে জনের নাম হয়ে গেল **'জন দি ব্যাপ্‌টিস্ট'**।

যীশুখ্রীষ্ট

একদিন জন যখন সবাইকে উপদেশ দিচ্ছেন, সেই সময় খুব অল্পবয়সের একটি ছেলে এসে সেখানে উপস্থিত হল জনের উপদেশ শোনবার জন্যে। ছেলেটি জনের খুড়তুতো ভাই। সে ছুতোর-মিস্ত্রীর কাজ করত, কিন্তু ঐ সঙ্গে ইহুদীদের সমস্ত ভাল ভাল বইগুলো সে পড়ে নিয়েছিল। বালকটির নাম **যীশু** (৪ খ্রীঃ পূর্বাব্দ—৩০ বা ৩৩ খ্রীস্টাব্দ), প্যালেস্টাইনের **নাজারেথ** নামক শহরে তার শৈশবকাল কাটে। জন তার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলে দেখলেন

নেবুচাডনেজার-কর্তৃক জুডা রাজ্যের ধ্বংস-সাধন

যে, যীশুর বয়স অল্প হলে কি হবে, এই বয়সে সে প্রচুর জ্ঞান সঞ্চয় করেছে। জন যীশুর প্রতি আকৃষ্ট হলেন এবং তাকে আর নাজারেথে ফিরে যেতে দিলেন না।

জনের সঙ্গে কিছুদিন থাকবার পর, যীশু নির্জনে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর মনে এই বিশ্বাস জন্মাল যে, রোমানদের অধীনতা থেকে প্যালেস্টাইনের মুক্তি তাঁকেই আনতে হবে, তিনিই প্যালেস্টাইনকে স্বাধীন করবেন এবং তার রাজা হবেন, এইটিই ভগবানের ইচ্ছা। কিন্তু দেশকে রোমানদের কবল থেকে মুক্ত করতে হলেই যুদ্ধ করতে হবে, তাতে

অনেক লোক মারা যাবে এবং এইভাবে যুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জন করলেও যে তা বেশী দিন রক্ষা করা যায় না, অন্যান্য দেশের বেলায়ও তা দেখা গেছে।

কিন্তু যদি সদুপদেশ এবং ভগবানের বাণী প্রচারের দ্বারা মানুষের মন জয় করা যায়, প্রত্যেক মানুষের মনে যদি ভ্রাতৃভাব জাগিয়ে তোলা যায়, তাহলে সারা পৃথিবীতে এক নতুন পবিত্র সভ্যতার সৃষ্টি হবে। কেউ কাউকে আক্রমণ করবে না, পরের দেশ কেউ কেড়ে নেবে না, প্রত্যেক দেশের স্বাধীনতা চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকবে। অবশ্য এইভাবে মানুষের মনে পরিবর্তন আনতে অনেক সময় লাগবে।

যীশু এই ভেবে ঠিক করলেন যে, তিনি সৈন্য-সামন্ত সংগ্রহ করে রোমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না, সারা পৃথিবীর লোকদের ভগবানের বাণী শুনিয়ে তাদের মধ্যে তিনি এক নতুন ধর্মভাব ও মানবতা জাগিয়ে তুলবেন।
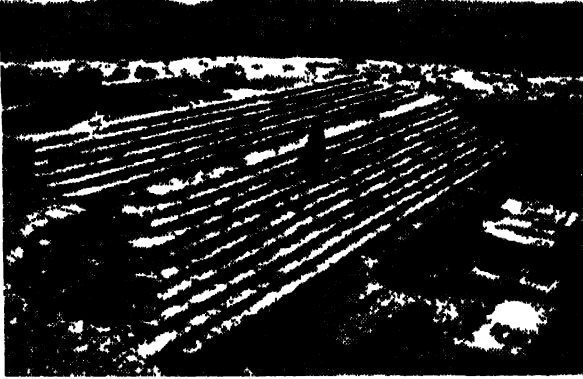
জেরুজালেম নগরীর ধ্বংসাবশেষ

যীশু তখন তাঁর বাণী প্রচার আরম্ভ করলেন। দেশের লোকদের তিনি শোনাতে লাগলেন, "দেখ, আমাদের আইনে বলে নরহত্যা করা নিষেধ, কিন্তু আমি বলি, তোমরা মানুষের উপর ক্রোধ পর্যন্ত করো না। সবাইকে যদি তোমরা ভালবাস, তাহলে দেখবে কারও উপর রাগ করবারই দরকার হবে না। যখন তুমি অন্যায় কর, তোমার মনটা হয়ত একটু খারাপ হয়। কিন্তু সে-কথা তোমার মনে থাকে না, নিজেকে তুমি ক্ষমা কর। তেমনি অপরে যদি তোমার প্রতি অন্যায় করে, তাকেও তুমি ক্ষমা করো। তোমাদের যদি কেউ ক্ষতি করে, তাদের প্রতিও তোমরা ক্রুদ্ধ হয়ো না, তাদেরও তোমরা ভাল করো। যারা তোমাদের ভালবাসে, তাদের ভালবাসা তো সহজ। যারা তোমাদের ঘৃণা করে, তাদেরও যদি ভালবাসতে পার, তাহলে সেটাই হল আসল প্রেম। ভগবান্ এতে তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হবেন, তোমাদের আশীর্বাদ করবেন।"

যীশুর মুখের এই সব উপদেশ শুনে, বহুলোক তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে লাগল। এইরূপে প্রচার করতে করতে যীশু নাজারেথে এসে উপস্থিত হলেন। এখানে এসে তিনি যখন বললেন যে, ইহুদীদের উদ্ধারের জন্যে তিনি ভগবানের বাণী প্রচার করছেন, নাজারেথের লোকেরা তখন ভয়ানক চটে গেল। তারা বলাবলি করতে লাগল, "এ তো সেই আমাদের মিস্ত্রীর ছেলে। এর বাপ-মা, ভাই-বোন সবাইকে আমরা

জেরুজালেম নগরীর পুনর্গঠন

জানি। এ আবার ভগবানের আদেশ পেল কবে, আমাদের উদ্ধারই বা এই মিস্ত্রীর ছেলে কি করে করবে?"

যীশুকে তারা সোজা জানিয়ে দিল, "নাজারেথ শহর থেকে চলে যাও।"

নিজের আত্মীয়-স্বজন, নিজের শহরের লোকেরা তাঁকে বিশ্বাস করল না দেখে, দুঃখিতমনে, যীশু নাজারেথ ছেড়ে চলে গেলেন। নাজারেথ থেকে চলে গিয়ে যীশু তারপর অন্য সব জায়গায় ভগবানের বাণী প্রচার করতে লাগলেন।

জেরুজালেমে প্রতি বৎসর বড় একটা উৎসব হত। চারদিক থেকে ইহুদীরা সবাই সেখানে আসত। রাজা **হিরড** খুব চমৎকার একটি মন্দির তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন; সেই মন্দিরের সামনে একটি চত্বরে অসংখ্য পশু বলি দেওয়া হত।

প্যালেস্টাইনের সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে প্রচার করবার পর, এই রকম এক উৎসবে, যীশু রওনা হলেন জেরুজালেমে। সেখানকার লোকজনেরা তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে বিরাট আয়োজন করল। যীশু আসছেন শুনে সব লোক রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে গেল তাঁকে দেখবার জন্যে।

জেরুজালেম শহরে প্রবেশ করেই যীশু সোজা গেলেন উৎসব-মন্দিরে। সেখানে তিনি দেখলেন, অনেক পশু বিক্রি হচ্ছে, ইহুদীরা সেগুলি টাকা দিয়ে কিনছে আর মন্দিরের সামনে নিয়ে গিয়ে বলি দিচ্ছে। এই সুযোগে চতুর ব্যবসায়ীরা বেশ দুপয়সা লুটে নিচ্ছে। যীশু এতে ভীষণ চটে গেলেন—ভগবানের মন্দিরে এ সব কি ব্যাপার? তিনি নিজেই এক চাবুক হাতে নিয়ে পশু-বিক্রেতাদের তাড়া করলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিষ্যেরা দোকান-পাট সব ভেঙে দিয়ে, মন্দিরের ত্রিসীমানা থেকে তাদের বার করে দিল।

জর্ডন নদী

জেরুজালেমের কোন লোক এতক্ষণ যীশুর বিরুদ্ধে কোন কথা বলে নি। রোমানরাও চুপ করে ব্যাপার দেখছিল। মন্দিরের এই ঘটনায় লোভী ব্যবসায়ীরা যীশুর উপর ভয়ানক চটে গেল। গোলমালের আশঙ্কায় রোমানরাও চিন্তিত হয়ে উঠল। যীশুর উপর তারা কড়া নজর রাখল। যীশু মন্দির থেকে তাঁর নতুন বাণী প্রচার আরম্ভ করলেন। মন্দিরের পুরোহিতেরা এ সব পছন্দ না করলেও কিছু বলতে ভরসা পেল না; কারণ, তারা দেখল, যীশুর পক্ষে অনেক লোক রয়েছে। তারা গোপনে যীশুর বিরুদ্ধে নানা রকম মিথ্যা প্রচারের দ্বারা তাঁর বিরুদ্ধে লোকদের মন বিষাক্ত করে তুলবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল।

যীশু এইসব খবর পেয়ে খুব দুঃখিত হলেন। তিনি দেখলেন, ক্রমেই তাঁর শত্রু-সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। বারজন শিষ্য সর্বদা তাঁর কাছে কাছে

থাকত; তাদের তিনি খুব ভালবাসতেন এবং বিশ্বাস করতেন। তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল **জুডাস ইসকারিয়ট**। যীশু যে ঠিক কি চান, জুডাস তা বুঝতে পারত না, কাজেই যীশুর বিরুদ্ধে নানা কথা শুনে তাঁর উপর তার ভক্তি টলে গেল। সে ভাবল যে, যীশুকে মন্দিরের পুরোহিতদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে কিছু টাকা রোজগার করাই বরং ভাল। যীশু যে কখন একা থাকতেন, পুরোহিতরা সে খবরটা কিছুতেই বার করতে পারত না। এই খবরটি একবার পেলেই তারা এসে তাঁকে ধরতে পারত। জুডাস ঠিক করল, এই খবর সে তাদের পৌঁছে দেবে।

একদিন রাতে এই বারজন শিষ্যকে নিয়ে খাওয়া শেষ করে যীশু শহরের বাইরে গেলেন। কয়েকজন শিষ্য তাঁর সঙ্গে গেল, কিন্তু জুডাস রয়ে গেল। সে গিয়ে খবরটি তুলে দিল পুরোহিতদের কানে। জুডাসের এই বিশ্বাস-ঘাতকতা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি মর্মান্তিক ঘটনা।

ক্রুশ-বিদ্ধ যীশুখ্রীষ্ট

পুরোহিতরা গিয়ে যীশুকে গ্রেফতার করে নিয়ে এল। **পন্টিয়াস পাইলেট** নামক একজন রোমান তখন জেরুজালেমের গবর্নর। তিনি এবং পুরোহিতরা যীশুর বিচার করলেন এবং তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। হুকুম হল যে, জেরুজালেমের সীমানার বাইরে যীশুকে ক্রুশ-বিদ্ধ করে হত্যা করা হবে।

যীশুকে যখন হাতে পায়ে পেরেক ঠুকে ক্রুশে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, তখনও তিনি ভগবানের কাছে তাঁর শত্রুদের হ'য়ে ক্ষমা চেয়ে বলেছিলেন, "হে ভগবান, আমার হত্যাকারীদের ক্ষমা কর। এরা কি করছে, তা জানে না।"

যীশুকে ইহুদীরা তাদের রাজা মনে করত বলে তাঁকে তারা বলত 'খ্রীষ্ট'। 'খ্রীষ্ট' মানে ত্রাণকর্তা। যীশু যে নতুন বাণী প্রচার করেছিলেন, সেই বাণীই আজ পৃথিবীতে খ্রীষ্টধর্ম নামে পরিচিত।

মধ্যযুগে প্যালেস্টাইন

রোমান সাম্রাজ্যের পতন হলে প্যালেস্টাইন নিয়ে পূর্ব-রোমক সাম্রাজ্যের সম্রাট্গণ ও ইরানের সাসানিড-বংশের নৃপতিদের মধ্যে বহুদিন যুদ্ধ-বিগ্রহ চলে। ইসলাম-শক্তির অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে প্যালেস্টাইন আরব-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। আরব বা সারাসেন রাজারা প্যালেস্টাইনের খ্রীস্টানদের তীর্থস্থানগুলি নিয়ে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করেন নি। সেলজুক তুর্কীরা যখন প্যালেস্টাইন অধিকার করল তখন থেকেই খ্রীস্টানদের পবিত্র স্থানগুলি ও তীর্থযাত্রীদের উপর বিশেষ অত্যাচার-উৎপীড়ন শুরু হল।

প্যালেস্টাইনে খ্রীস্টান-তীর্থযাত্রীদের উপর নিগ্রহের কাহিনী ইওরোপে ক্রমাগত ছড়াবার পর ইওরোপীয়দের মধ্যে একটা ভীষণ চাঞ্চল্য দেখা দিল। রোমের পোপ সমস্ত দেশের খ্রীস্টানদের আহ্বান করলেন, প্যালেস্টাইনে গিয়ে তীর্থস্থানগুলি তুর্কীদের কবল থেকে জোর করে উদ্ধার করবার জন্যে। এ-থেকেই একাদশ শতাব্দীতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে খ্রীস্টানদের ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ শুরু হল।

প্রথম ক্রুসেডের সময় ১০৯৯ খ্রীস্টাব্দে, খ্রীস্টান নায়কেরা এবং নাইট বা ধর্ম-যোদ্ধাগণ তুমুল যুদ্ধ করে মুসলমানদের হাত থেকে জেরুজালেম উদ্ধার ও জয় করেন। তারপর তাঁরা সেখানে খ্রীস্টান জেরুজালেম-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু আরব ও তুর্কীদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে এ-রাজ্য বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। মিশরের বিখ্যাত সুলতান সালাদিন ১১৮৭ খ্রীস্টাব্দে জেরুজালেম অধিকার করেন। এর থেকে তৃতীয় ক্রুসেডের উৎপত্তি, যাতে ইংলণ্ডের বীর রাজা রিচার্ড যুদ্ধ করেন। প্যালেস্টাইন কিছুকাল সেলজুক তুর্কী ও মিশরের মামলুকদের অধীনে থাকবার পর অটোমান তুর্কীদের হস্তগত হয়। অটোমান তুর্কীরা বহুদিন পর্যন্ত এদেশের উপর রাজত্ব করে।

ইজরেল রাষ্ট্র

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়েও প্যালেস্টাইন ছিল তুর্কী-সাম্রাজ্যের অধীন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজরা তুরস্কের কাছ থেকে প্যালেস্টাইন কেড়ে নেয়। প্যালেস্টাইন নামে স্বাধীন হয় বটে, কিন্তু ইংরেজ থাকে তার অভিভাবক।

হিটলার জার্মেনী থেকে ইহুদীদের তাড়িয়ে দেবার পর, ইংরেজরা তাদের প্যালেস্টাইনে স্থান দেয়, কিন্তু আরবরা এতে ভীষণ আপত্তি করে। প্যালেস্টাইনে এতদিন তারাই ছিল সংখ্যায় বেশী, ইহুদীদের আগমন তাদের মনঃপূত হল না। এই নিয়ে সেখানে ভীষণ দাঙ্গা হয়। তারপর ইংরেজরা প্যালেস্টাইন ভাগ করে তার একদিকে আরবদের, আর একদিকে ইহুদীদের থাকতে বলে।

রাষ্ট্রসংঘে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর প্যালেস্টাইনকে দু' ভাগে ভাগ করার এক প্রস্তাব পাস হয়। ঠিক হয়, ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা অক্টোবরের মধ্যে এই প্যালেস্টাইন বিভাগের কাজ সম্পূর্ণ করা হবে। ইহুদীরা পাবে ৮০৪৮ বর্গমাইল এবং আরবরা পাবে ৪৫০০ বর্গমাইল। জেরুজালেম নগরী (আয়তন ২৮৯ বর্গমাইল) রাষ্ট্রসংঘের নির্বাচিত এক শাসনকর্তার দ্বারা শাসিত হবে।

১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই মে ইংরেজ প্যালেস্টাইন ছেড়ে চলে যায়। **ইজরেল** রাষ্ট্র গঠিত হয়। ইজরেল রাষ্ট্রই হয়েছে ইহুদীদের স্বাধীন এবং নিজস্ব দেশ; কিন্তু প্যালেস্টাইনের আরব-অংশ এই ইহুদী-রাজ্যকে স্বীকার করে নিতে রাজী হয় নি কখনও। এমন কি সিরিয়া, ঈজিপ্ট, ইরাক, লেবানন, সৌদি আরব ও জর্ডন সশস্ত্র হয়ে ইজরেলকে একযোগে আক্রমণ করেছিল; কিন্তু তারা যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারে নি। ইত্যবসরে রাষ্ট্রসংঘ প্যালেস্টাইন-সমস্যায় হস্তক্ষেপ করে।

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে আরব রাজ্যগুলির সঙ্গে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ইজরেলের সন্ধির চুক্তি হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন শান্তি প্রতিষ্ঠা হয় নি। সীমান্ত সংঘর্ষ লেগেই আছে। ইজরেলের সীমানাও ঠিকভাবে নির্দিষ্ট হয় নি। আরব রাষ্ট্র-সংঘ ইজরেলের প্রতি অত্যন্ত শত্রুভাবাপন্ন।

নূতন জেরুজালেম নগরী এখন ইজরেলের অধীন এবং পুরাতন নগরী জর্ডনের অধীন। ইজরেলের রাজধানী আগে ছিল তেল আভিভে। এখন নূতন জেরুজালেমই ইজরেল রাষ্ট্রের রাজধানী।

১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে সুয়েজ খাল সংকটের সময় ইজরেল ঈজিপ্টের সিনাই উপদ্বীপ দখল করে নেয়। গাজা অঞ্চলও সে দখল করে। পরে রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাব অনুযায়ী দু'টি স্থানই ছেড়ে দেয়। গাজা অঞ্চল রাষ্ট্রসংঘের প্রেরিত সৈন্যদলের রক্ষণাধীনে আছে।

ইজরেল রাষ্ট্র স্বাধীন দেশরূপে রাষ্ট্রসংঘে আসন লাভ করেছে। ভারতও নতুন ইজরেল রাষ্ট্রকে স্বীকার করে নিয়েছে। দীর্ঘযুগ ধরে ইহুদীগণ পৃথিবীর নানাস্থানে ছড়িয়ে ছিল। ইহুদী-রাষ্ট্র গঠনের মধ্যে দিয়ে তারা নিজস্ব একটি দেশ পেয়েছে।

সম্প্রতি সম্মিলিত আরব যুক্তরাষ্ট্র, জর্ডন, ইরাক ও সিরিয়ার সঙ্গে ইজরেলের যুদ্ধ বাধে। মাত্র পাঁচ দিনের যুদ্ধে ইজরেল সিনাই উপত্যকা ও জর্ডনের পশ্চিমাংশ দখল করে নেয়। ইজরেল যে-স্থান দখল করে তার আয়তন ইজরেল রাষ্ট্রের চার গুণ। ইজরেলী সৈন্য সম্মিলিত আরব যুক্তরাষ্ট্র ও জর্ডনের সামরিক শক্তিকে বিধ্বস্ত করে এবং সম্মিলিত আরব যুক্তরাষ্ট্র, জর্ডন, ইরাক ও সিরিয়ার বিমান-শক্তিকে ধ্বংস করে।

ইজরেল রাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডাঃ ওয়াইৎসম্যান (২৭শে নভেম্বর, ১৮৭৪ খ্রীঃ রাশিয়ায় জন্ম) ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে পরলোকগমন করেছেন। প্যালেস্টাইনে এই ইহুদী-রাষ্ট্র স্থাপনের আন্দোলনের তিনি অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন। তারপর ইঝাক বেঞ্জভি ইজরেলের রাষ্ট্রপতি (১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে রাশিয়ায় জন্ম) হন। ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন এস জে শাজার। লেভি এশকর্ল ছিলেন ইজরেলের প্রধান মন্ত্রী। তাঁর স্থলে প্রধান মন্ত্রী হয়েছেন শ্রীমতী গোলডা জেফারসন (মেয়ার নামে পরিচিতা)।

ইজরেলের পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর, উত্তরে লেবানন ও সিরিয়া, পূর্বে জর্ডন এবং দক্ষিণে সম্মিলিত আরব যুক্তরাষ্ট্রের সিনাই। এর আয়তন ২০,৭০০ বর্গ কিলোমিটার (৭,৯৯৩ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ২৬,৫৭,০০০। এর মধ্যে ২৩ লক্ষ ৪৫ হাজার ইহুদী, ২,২৩,০০০ মুসলমান, ৫৮,০০০ খ্রীস্টান। লোকবসতি প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১৩১'২ জন। ইজরেলে ইহুদীদের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে।

ভারতের ইতিহাস শুধু ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। পুরাকালে প্রাচীন গ্রীসের মত, ভারতবর্ষও উপনিবেশ বিস্তার ও অসংখ্য ঔপনিবেশিক-রাজ্য নির্মাণে অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছিল। স্থলপথে ও জলপথে ভারতীয় সদাগর, ধর্মপ্রচারক এবং পরিব্রাজকবৃন্দ ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করে দূর-দূরান্তে ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্ম ছড়িয়েছিল। সে যুগের ভারতবাসী, তার উদার সভ্যতা দ্বারা, ভারতের আশপাশের বহু দেশকে প্রভাবিত করেছিল। হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম তাদের আদর্শ, প্রেরণা ও শিল্পকলা নিয়ে নানাজাতির লোকের মধ্যে সভ্যতা প্রসারিত করেছিল। ভারতের উত্তর-পশ্চিমে, মধ্য-এশিয়া, তুর্কীস্থান প্রভৃতি বিস্তৃত অঞ্চলে, ভারতীয় সভ্যতার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া গেছে। ভারত-সংস্কৃতি অধিক প্রসার লাভ করেছিল পূর্বদিকে ইন্দোচীন, মালয় ও পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অঞ্চলে (বর্তমান ইন্দোনেশিয়া)।

যুগে যুগে ভারতীয় বণিক ও ব্যবসায়ীর দল অর্থ ও অজানার মোহে পূর্বভাগের অসংখ্য দেশগুলির আবিষ্কারের জন্যে অগ্রসর হয়েছে। ইন্দোচীন, শ্যাম (থাইল্যাণ্ড), ব্রহ্মদেশ এবং পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপগুলিকে ভারতবাসীরা সাধারণ ভাবে **সুবর্ণভূমি** নামে অভিহিত করত। জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপগুলির মসলাদ্রব্যও তাদের আকৃষ্ট করত। বস্তুতঃ খ্রীষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীতে

আরবদের এবং পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ইওরোপীয়দের যেসব জিনিস আকৃষ্ট করেছিল, ভারতীয়েরাও প্রাচীনকালে সে সব আকর্ষণের দ্বারাই প্রলুব্ধ হয়ে ঐ দেশগুলিতে ছুটে যেত।

ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ প্রচারকদের উৎসাহ, ক্ষত্রিয় ও অভিজাতবংশীয় যুবকদের অভিযান-লিপ্সা এবং দুঃসাহসিক নাবিকদের সমুদ্র-বিচরণের ফলে, ক্রমে
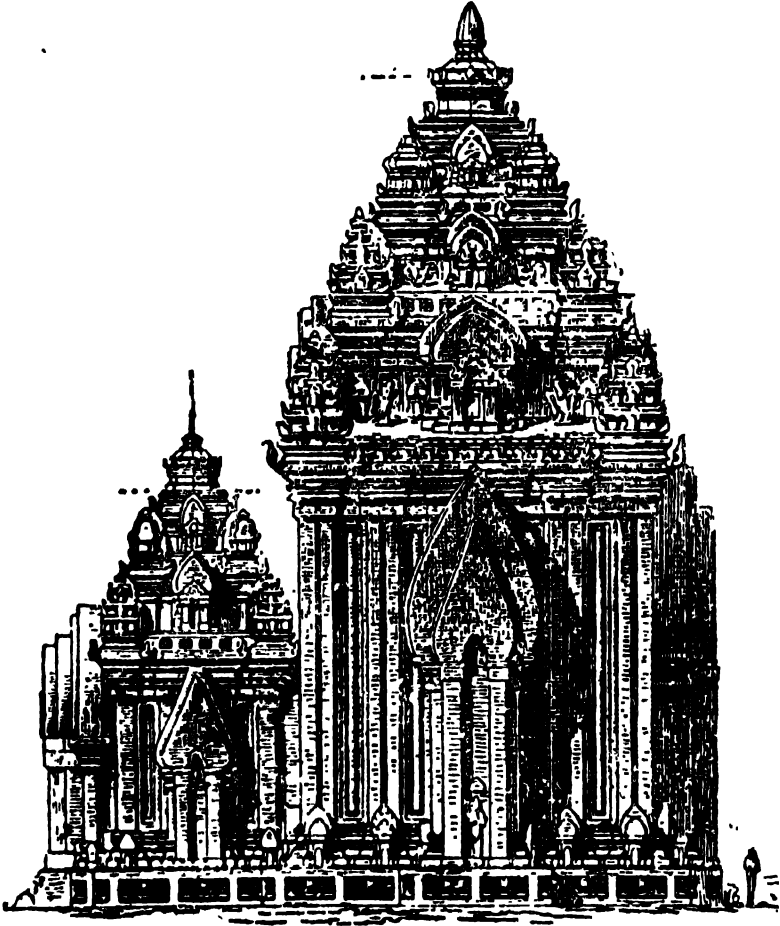
পো-নগরের মন্দির

ইন্দোচীন উপদ্বীপ ও পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে অগণিত ভারতবাসী গিয়ে বসতি স্থাপন করল। এদের মধ্যে অনেকে স্থায়ী-ভাবে ঐসব বিদেশে বসবাস শুরু করল। তারা স্থানীয় স্ত্রীলোকদেরই বিয়ে করত—এবং তাদের উন্নত সভ্যতার প্রভাবে ঐ সব স্থানের সমাজ, রীতিনীতি হিন্দু-আদর্শ দ্বারা প্রভাবান্বিত হল। হিন্দুসভ্যতা, শিল্প-সাহিত্য ও ধর্ম স্থানীয় লোকদের মধ্যে ছড়াল।

হিন্দুরাও সেখানকার লোকদের কিছু কিছু রীতিনীতি গ্রহণ করল। কখনো কখনো কোন সামরিক অভিযাত্রী জোর করে রাজনৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে একটা হিন্দুরাজ্যের পত্তন করত। এরূপে অনেক ঔপনিবেশিক হিন্দুরাজ্য ও সাম্রাজ্যের উৎপত্তি হয়। স্থানীয় অধিবাসিগণ ধীরে ধীরে হিন্দুদের সঙ্গে মিশে গিয়ে হিন্দু নাম, সংস্কৃত অথবা পালি ভাষা এবং হিন্দুধর্ম ও নিয়ম-প্রথা গ্রহণ করত।

ইন্দোচীন, মালয় ও ইন্দোনেশিয়ায় দলে দলে ভারতবাসীর অভিগমন ও উপনিবেশ-বিস্তারের ইতিহাস অনেক বৌদ্ধ জাতকগল্প, কথাসরিৎসাগর ও অপরাপর কাহিনীতে লিপিবদ্ধ আছে। ঐতিহাসিক যুগে, ভারতীয়রা প্রথমে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর অনতিপূর্বে বা পরে সুবর্ণভূমিতে উপনিবেশ স্থাপন আরম্ভ করে। রোমক ঐতিহাসিক টলেমির লেখা হতে জানা যায় যে, দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতীয়রা সুবর্ণভূমিতে অনেক বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল। দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে মালয় উপদ্বীপ, কাম্বোডিয়া, আনাম, সুমাত্রা, জাভা, বালি ও বোর্নিও দ্বীপে বহু হিন্দুরাজ্য গড়ে ওঠে। এ রাজ্য-গুলির ইতিহাস সংস্কৃত তাম্রশাসন ও চৈনিকদের বিবরণে পাওয়া যায়। এসকল রাজ্যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম, বিশেষ করে শৈবধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের প্রচার হয়েছিল। ভারতীয় সভ্যতার ব্যাপক বিস্তৃতির ফলে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের লোকেরা, দীর্ঘ হাজার বছর ধরে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবে গড়ে উঠেছিল।

চম্পা ও কম্বোজরাজ্য

ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণ অনেক বড় বড় সাম্রাজ্যও স্থাপন করেছিল। এসব সাম্রাজ্যের কোন কোনটা, মূল ভারতের হিন্দুরাজ্যের অবসানের পরেও, সুবর্ণভূমিতে তাদের স্বাধীন সত্তা বজায় রেখেছিল। ইন্দোচীনে চম্পা ও কম্বোজ নামে দুটি শক্তিশালী রাজ্যের অভ্যুত্থান হয়েছিল।

চম্পা রাজ্যের কয়েকজন রাজার নাম উল্লেখযোগ্য, যথা, জয়পরমেশ্বর-বর্মদেব ঈশ্বরমূর্তি, রুদ্রবর্মন, হরিবর্মন, মহারাজাধিরাজ শ্রীজয়ইন্দ্রবর্মন এবং জয়সিংহবর্মন। এঁরা বিখ্যাত বীর ছিলেন এবং কম্বোজ জাতি ও প্রসিদ্ধ মঙ্গোলবীর কুবলাই খানের আক্রমণ সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করেছিলেন। চম্পারাজগণের চীনাদের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল। এ রাজ্য ১৫০ খ্রীষ্টাব্দ

থেকে ১৪৭১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তেরশত বৎসরেরও অধিককাল চলেছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে মঙ্গোলজাতীয় আনামীদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে চম্পারাজ্যের অবসান হয়। চম্পায় অনেক বর্ধিষ্ণু নগর গড়ে উঠেছিল, সুন্দর সুন্দর হিন্দু ও বৌদ্ধমন্দিরে সারা দেশটি শোভিত হয়েছিল।

চম্পার উপকূলে **কৌঠার** বোধহয় হিন্দুদের প্রথম উপনিবেশ। চম্পার সবচেয়ে প্রাচীন স্মৃতিচিহ্নগুলি কৌঠার কিংবা তার নিকটবর্তী স্থানসমূহেই
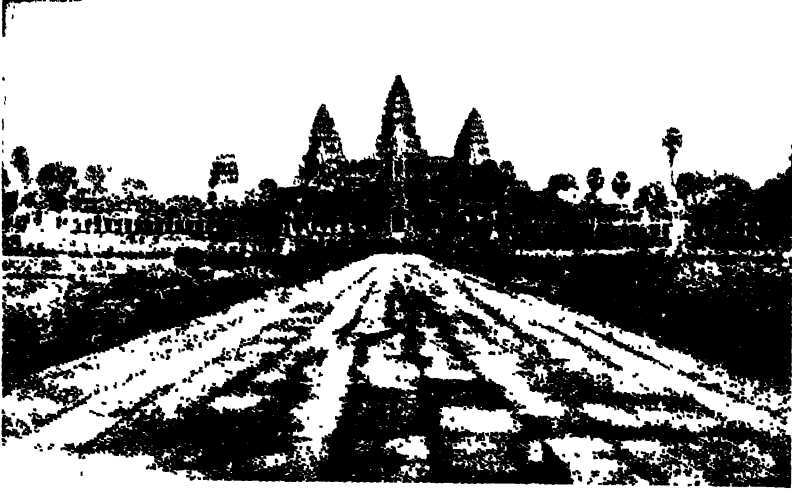
আঙ্কোরভাট

পাওয়া গেছে। সবচেয়ে বেশী শিলালিপি পাওয়া গেছে **পো-নগরে**; কারণ সেইটিই ছিল প্রাচীন কৌঠারের রাজধানী।

হিন্দু কম্বোজরাজ্যের উৎপত্তির ইতিহাস কতকটা অস্পষ্ট, তবে প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে কম্বোজরাজ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা বর্তমান কাম্বোডিয়ার দক্ষিণ অংশে অবস্থিত ছিল। চীনারা একে ‘ফু-নান’ বলত। এ রাজ্য খুব প্রতাপশালী হয়ে ওঠে ও অনেক সামন্ত-রাজ্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। কম্বোজ সম্বন্ধে একজন চৈনিক লেখক বলেছেন: “ভারত হতে এক হাজারের বেশী ব্রাহ্মণ এসে এখানে বাস করছেন। দেশের লোকেরা তাঁদের ধর্ম অনুসরণ করে আর তাঁদের কাছে নিজেদের মেয়েদের বিয়ে দেয়। এই পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ দিনরাত তাঁদের শাস্ত্রগ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেন।” ফু-নানের রাজগণ ভারত ও চীনে তাঁদের রাষ্ট্রদূতগণকে পাঠাতেন।

ফু-নানের একটি সামন্তরাজ্য, কম্বোজদেশ ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাধান্য লাভ করে। এই সামন্ত-প্রদেশের নাম থেকেই পরে গোটা রাজ্যের নাম কম্বোজ হয়। কম্বোজের হিন্দুরাজারা নয়শত বৎসর পর্যন্ত মহা আড়ম্বরে রাজত্ব করেন। এ রাজ্যের বীর্যশালী নৃপতিদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় এবং সপ্তম জয়বর্মন, যশোবর্মন এবং দ্বিতীয় সূর্যবর্মনের নাম উল্লেখযোগ্য। পঞ্চদশ শতাব্দীতে পূর্বদিক থেকে আনামী জাতি এবং পশ্চিমদিক থেকে থাইদের ক্রমান্বয় আক্রমণে কম্বোজরাজ্যের পতন হয়।

কম্বোজরাজ্য চম্পারাজ্য থেকে অনেক বেশী ক্ষমতা অর্জন করেছিল। কম্বোজ-সাম্রাজ্যের পূর্ণ পরিণতির সময়ে বহু অঞ্চল এর অন্তর্বর্তী ছিল। অনেক সংস্কৃত তাম্রশাসন থেকে আমরা এ সাম্রাজ্যের বিস্তৃত ইতিবৃত্ত জানতে পারি। জগৎ-বিখ্যাত **আঙ্কোরভাট** মন্দির, **আঙ্কোরথোমের** মন্দিরসমূহ এবং আরও অসংখ্য মন্দিরের অপরূপ কারুকার্যাবলী, কম্বোজ-বাসীদের অসাধারণ মানসিক উন্নতি ও উৎকর্ষতার উজ্জ্বল সাক্ষ্য আজও দিচ্ছে।

আঙ্কোরভাট (ওঙ্কারধাম) পৃথিবীর এক আশ্চর্য মন্দির। ইহা একটি বিষ্ণুমন্দির। কম্বোজের রাজধানী যে আঙ্কোরথোমে আবিষ্কৃত হয়েছে, তার অনতিদূরেই এই আঙ্কোরভাট অবস্থিত। এ বিরাট মন্দির নানা স্তরে বিভক্ত। প্রধান অংশে পৌঁছাতে গেলে, বহু চত্বর ও অলিন্দ অতিক্রম করে উচ্চ সোপান বেয়ে উঠতে হয়। মন্দিরের প্রাচীরগাত্রে খোদিতচিত্রের অপূর্ব নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। কোথাও রামায়ণের কাহিনী, কোথাও পৌরাণিক কথা, কোথাও বা মহাভারতের কাহিনী প্রভৃতি ভাস্করের সুনিপুণ হস্তে মূর্তি পেয়েছে। এ মন্দিরে আটটি গগনস্পর্শী চূড়া আছে। এ বিশাল মন্দিরের চারিদিক পাথরের দেওয়ালে বেষ্টিত, তার নানা অংশে তোরণ ও গ্যালারি।

শুধু কম্বোজ কেন, সমগ্র হিন্দুজগৎ খুঁজলেও আঙ্কোরভাট মন্দিরের আর তুলনা মিলবে না। কম্বোজের সমস্ত দুঃখ-ধ্বংসের ভিতরেও এই আঙ্কোরভাট এখনও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

রাজা যশোবর্মনের সময় (বোধ হয় ৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে) আঙ্কোরে রাজধানী স্থাপিত হয়। কেহ কেহ বলেন, প্রসিদ্ধ নৃপতি সপ্তম জয়বর্মনের সময় এই রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ হচ্ছে বর্তমান আঙ্কোরথোম।

আঙ্কোরভাট রাজা দ্বিতীয় **সূর্যবর্মনের** রাজত্বকালে নির্মিত হয়। সূর্যবর্মনের রাজত্বকাল সম্ভবতঃ ১১১২ থেকে ১১৬২ খ্রীষ্টাব্দ।

রাজধানী আঙ্কোরথোমের তখনকার নাম ছিল **যশোধরপুর**। বিশাল প্রাকার—প্রায় ন' মাইল ধরে চতুষ্কোণ যশোধরপুরকে বেষ্টন করে রয়েছে।

বায়ন মন্দির

পাঁচটি দরজা দিয়ে এই নগরে প্রবেশ করা যেত। নগরটির ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে **বায়ন মন্দির** অবস্থিত। এখন বায়নের মন্দিরচূড়া মাটির উপর লুটিয়ে পড়েছে, অনেক শতাব্দী ধরে সেখানে আর মঙ্গল-ঘণ্টা বাজে না। বায়নের বাইরের দিকটা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেলেও মন্দিরের ভিতরকার অংশ

এখনও অনেকটা দাঁড়িয়ে আছে। তাতে স্থাপত্য-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বায়ন মন্দির নির্মাণেই বোধ হয় কম্বোজের স্থপতিদের নৈপুণ্যের চরম

বায়ন মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ স্থাপত্যের নিদর্শন

পরিণতি হয়েছিল। কম্বোজের দুর্ভেদ্য বনানীর ভিতর তার অসংখ্য কীর্তি আজও লুক্কায়িত রয়েছে। ভারত-ইতিহাসের এক বড় গৌরবের কাহিনী কম্বোজের অগণিত ভগ্ন-নিদর্শনের মধ্যে নিহিত আছে।

শ্রী-বিজয় রাজ্য

সুমাত্রা দ্বীপে অতি প্রাচীন কালে, শ্রী-বিজয় নামে হিন্দুরাজ্য গঠিত হয়। এ রাজ্য বোধ হয় চতুর্থ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সপ্তম শতাব্দীর শেষ-ভাগে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। চৈনিক পরিব্রাজক **আই-সিং** বলেন যে, দক্ষিণ-সাগরের দ্বীপগুলির মধ্যে শ্রী-বিজয় বৌদ্ধ বিদ্যাচর্চার একটি কেন্দ্রস্থল ছিল এবং শ্রী-বিজয় রাজ্যের বাণিজ্য-অর্ণবপোতসমূহ ভারতবর্ষ ও শ্রী-বিজয়ের মধ্যে আনাগোনা করত। আই-সিংএর বিবরণ থেকে আরও জানা যায় যে, চীনের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল শ্রী-বিজয় নগরী। মালয় উপদ্বীপে, লিগোরে আবিষ্কৃত একটি শিলালিপি থেকে পরিষ্কাররূপে জানা যায় যে, শ্রী-বিজয় দ্রুতগতিতে একটি বড় বাণিজ্য ও নৌশক্তিতে পরিণত হচ্ছিল। পার্শ্ববর্তী রাজন্যবর্গ, শ্রী-বিজয়রাজকে তাঁদের অধিরাজ বলে মানতেন।

শ্রী-বিজয় রাজ্য ৬৭৫ থেকে ৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ কালের মধ্যে অনেক দেশ জয় করেছিল। অষ্টম শতাব্দীতে সমগ্র মালয় উপদ্বীপের উপর এর আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শ্রী-বিজয়ের উন্নতির সময় চীনের সঙ্গে এ রাজ্যের নিয়মিত দৌত্যকার্য চলত।

সুবর্ণভূমিতে ভারতীয় সভ্যতার প্রসার

বোর্নিও, জাভা ও মালয় উপদ্বীপে যে সংস্কৃত শিলালিপিগুলি পাওয়া গিয়েছে তাতে বেশ বুঝতে পারা যায় যে, ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম এবং রাজনৈতিক ও সমাজব্যবস্থার রীতিনীতি এই সব দেশগুলিতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তাদের সম্পূর্ণ জয়ও করেছিল। পশ্চিম-জাভার সমাজ ছিল হিন্দু-প্রাধান্যপূর্ণ। আজও তার রাজদরবারে দেখা যায় যাবতীয় হিন্দু-আইন-কানুন। উপনিবেশগুলিতে ভারতীয় স্থানসমূহের নাম দেওয়া হত ;—যেমন, চম্পারাজ্য, চন্দ্রভাগা, গোমতীনদী প্রভৃতি।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, গণেশ প্রভৃতি বহু দেবদেবীর অনেক মূর্তি নানাস্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে। বিবিধ মূর্তি ও শিলালিপিগুলি হতে প্রতীয়মান হয়, যেমন ব্রাহ্মণ্যধর্ম, বৌদ্ধধর্মও সেরূপ এ-সকল অঞ্চলে খুব প্রধান হয়ে উঠেছিল। সুবর্ণভূমির লোকেরা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের জোর চর্চা করত। প্রাপ্ত লেখাগুলিতে উন্নত ধরনের নির্ভুল সংস্কৃত জ্ঞানের

পরিচয় পাওয়া যায়। চীন-পরিব্রাজক **ফা-হিয়েন**-এর লেখায় দেখা যায় যে, সে সময়ে জাভাতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রচলিত ছিল। তবে কাশ্মীরের রাজপুত্র **গুণবর্মন** প্রভৃতির চেষ্টায় শীঘ্রই বৌদ্ধধর্মও জাভায় একটি প্রধান ধর্ম হয়ে ওঠে। গুণবর্মন প্রথম লঙ্কাদ্বীপে যান, সেখান থেকে জাভায় গিয়ে তথাকার রানী-মাতাকে তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। দেশের লোকেরাও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতে থাকে।

গুণবর্মনের নাম ও যশঃ অচিরে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। চীনের বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অনুরোধে চীন-সম্রাট্ গুণবর্মনকে তাঁর দেশে আমন্ত্রণ করেন। গুণবর্মন নন্দিন নামক হিন্দু বণিকের জাহাজে চড়ে, ৪৩১ খ্রীস্টাব্দে চীনের অন্তর্গত নানকিং নগরীতে উপস্থিত হন। কয়েক মাসের মধ্যেই, পঁয়ষট্টি বৎসরে বয়সে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য সুবর্ণভূমিতে বিশেষভাবে বিস্তৃত হয়। নানা কেন্দ্রে ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন হত, বিদেশী পণ্ডিতেরাও এসব স্থানে জ্ঞান আহরণের জন্যে আসতেন। শ্রী-বিজয় ছিল বৌদ্ধধর্মের একটি শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। এখানে মহাযান বৌদ্ধমত পালিত হত।

এ যুগে ভারত ও তার উপনিবেশগুলির মধ্যে নিয়মিত আদান-প্রদান ও নিবিড় সম্পর্কের বন্ধন ছিল। ঔপনিবেশিকগণ দূরপ্রাচ্যে ভারতীয় ভাবধারা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বহন করে নিয়ে যেত। অনেকের ধারণা যে বৌদ্ধধর্মই ভারতের বাইরে ছড়িয়েছে, হিন্দুধর্ম ছড়ায় নি, কিন্তু সে ধারণা অত্যন্ত ভুল। ব্রহ্মদেশ ও থাইল্যাণ্ড ব্যতীত সুবর্ণভূমির অপরাপর বিস্তৃত অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও হিন্দু-সভ্যতাই দৃঢ়তরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভারতে বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের অভ্যুত্থানের সমসমকালে যে পৌরাণিক ও হিন্দুধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল, সেই ধর্মধারাই উপনিবেশ অঞ্চলে অধিক প্রাধান্য লাভ করেছিল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবদেবীর পূজার প্রচলনই বেশী হয়েছিল। ভারতীয় আদর্শের বৈশিষ্ট্য এখানেও প্রতিফলিত হয়েছিল। বিভিন্ন ধর্মমতের লোক পাশাপাশি বাস করলেও তাদের ভিতর কোন বিরোধ-বিসংবাদ ছিল না। বিভিন্ন ধর্মপন্থীদের মধ্যে পরিপূর্ণ সম্প্রীতির ভাবই বিদ্যমান ছিল।

শৈলেন্দ্র-সাম্রাজ্য

অষ্টম শতাব্দীতে সুবর্ণভূমির অধিকাংশ রাজ্য একটি প্রবল সাম্রাজ্যের অধীনে চলে যায়। এই বিস্তৃত সাম্রাজ্য চারশত বৎসরেরও অধিককাল

শৈলেন্দ্র-রাজবংশের অধিকারে ছিল, সুতরাং এই যুগকে শৈলেন্দ্র-সাম্রাজ্যের যুগ বলা চলে। এই সাম্রাজ্যের অধিপতিগণ আগে মালয় উপদ্বীপে তাঁদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেন, শ্রী-বিজয় রাজ্যের হাত থেকে লিগোর অংশ জয় করেন এবং অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে জাভায় তাঁদের আধিপত্য বিস্তার করেন।

শৈলেন্দ্র-সাম্রাজ্যের যুগে দ্বীপময় ভারতের বিরাট অঞ্চলে শাসনশৃঙ্খলায় একটা ঐক্যের সৃষ্টি হয়। এ সাম্রাজ্য অসাধারণ গৌরব ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছিল। এ যুগে একটি অভিনব সংস্কৃতি-রীতির প্রবর্তন হয়েছিল। মহাযান বৌদ্ধধর্মের নতুন উদ্যম এবং জাভাতে চণ্ডি কলসন ও **বরবুদার** মন্দিরে যে অপূর্ব শিল্পকলার পরিচয় পাওয়া যায়, তা শৈলেন্দ্র ভূপতিদের উৎসাহ ও প্রেরণাতেই সম্ভবপর হয়েছিল।

কোন্ বিশেষ স্থানটি শৈলেন্দ্রদের শাসনকেন্দ্র ছিল, তা এখনও ঠিকমত জানা যায় নি। খুব সম্ভব জাভা কিংবা মালয় উপদ্বীপের কোন জায়গায় তাঁদের শাসনকেন্দ্র স্থাপিত ছিল। অনেক আরব লেখক শৈলেন্দ্র-সাম্রাজ্যের উচ্চ প্রশংসা করে গেছেন। তাঁরা একে জাবাগ, জাবাজ অথবা মহারাজের সাম্রাজ্য নামে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁদের লেখা থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে, এ সাম্রাজ্য যেমন ছিল দূরবিস্তৃত তেমনি এর ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরের অবধি ছিল না। ইন্দোনেশিয়ার শৈলেন্দ্রদের নৌ-শক্তি ও বাণিজ্য-প্রতিপত্তি পৃথিবীর নানা জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করত। অষ্টম শতাব্দীই শৈলেন্দ্র-সাম্রাজ্যের পূর্ণ গৌরবের যুগ।

বাংলাদেশের পাল সম্রাট্‌গণের সঙ্গে শৈলেন্দ্র সম্রাট্‌দের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। জানা যায় যে, ৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে **কুমারঘোষ** নামে একজন বাঙ্গালী মহাযান বৌদ্ধপন্থী শৈলেন্দ্র-রাজগণের রাজগুরু ছিলেন। আরব লেখকগণের মত চৈনিক বিবরণীতেও শৈলেন্দ্র-সাম্রাজ্যের শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। চৈনিক লেখায় এ সাম্রাজ্য সান-ফো-সি নামে অভিহিত হয়েছে। দশম শতাব্দীতে চীনের সঙ্গে শৈলেন্দ্রদের বহুবার রাজদূত বিনিময় হয়েছিল। এ সময়ে শৈলেন্দ্রদের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক প্রতিপত্তি খুব প্রসারলাভ করেছিল।

একাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ-ভারতের শক্তিশালী চোল নৃপতিদের সঙ্গে শৈলেন্দ্রদের দীর্ঘ সংগ্রামের কাহিনী উল্লেখযোগ্য। প্রসিদ্ধ চোল সম্রাট্ রাজেন্দ্র চোলের রাজত্বকালে চোলদের নৌ-সাম্রাজ্য খুব বিস্তৃতি লাভ করে। রাজেন্দ্র

চোল ভারতের পূর্ব উপকূলে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন, পালরাজকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে বাংলাদেশের কতকাংশও তিনি জয় করেছিলেন। তাঁর প্রবল নৌবহর সাগরবক্ষে দূরদূরান্তে গর্বভরে বিচরণ করে 'বেড়াত। শীঘ্রই তাঁর যুদ্ধজাহাজবহর শৈলেন্দ্র-সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। এই যুদ্ধে শৈলেন্দ্রগণ পরাজিত হন এবং তাঁদের সাম্রাজ্যের নানাস্থানে চোল সম্রাটের অধীন হয়।

শৈলেন্দ্র-সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান এরূপ ছিল যে, পূর্ব ও পশ্চিম-এসিয়ার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য একরূপ তাদের কর্তৃত্বাধীনেই ছিল। এই ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর প্রভুত্ব লাভ করবার মানসেই বোধ হয়, চোল সম্রাট্ শৈলেন্দ্র-সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সমরাভিযান প্রেরণ করেছিলেন। চোলগণ বেশ কিছুকাল শৈলেন্দ্রদের উপর যদিও কর্তৃত্ব করেছেন, তবু সুদূর সুবর্ণভূমির উপর বেশীদিন আধিপত্য বজায় রাখা তাঁদের পক্ষে সহজ হয় নি। একাদশ শতাব্দীর শেষ-দিকেই আবার শৈলেন্দ্রগণ তাঁদের পূর্বাবস্থা ফিরে পান। এর পরেও দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের সাম্রাজ্য বেশ ক্ষমতাশালী ছিল।

চোল সম্রাট্দের হাত থেকে শৈলেন্দ্র-সাম্রাজ্য তার পূর্ব স্বাধীনতা ফিরে পেলেও পূর্ব গৌরব আর বেশীদিন অটুট রাখতে পারল না। শীঘ্রই চারদিক্ দিয়ে ভাঙ্গন শুরু হওয়ায় সাম্রাজ্য গরিমা ম্লান হতে লাগল। সাম্রাজ্য, উত্তর দিকে থাইল্যাণ্ডের নতুন সামরিক বিজয়ীজাতি থাইদের দ্বারা আক্রান্ত হল এবং দক্ষিণ দিকে নববলীয়ান মলায়ু রাজ্য তাকে বিপর্যস্ত করল। শৈলেন্দ্র-সাম্রাজ্যের প্রভুত্ব নষ্ট হল এবং উহা বিগতশ্রী হয়ে একটি ক্ষুদ্র শক্তিতে পরিণত হল। চতুর্দশ শতাব্দীতে জাভার এক নতুন রাজশক্তি শৈলেন্দ্র-রাজ্য জয় করে। মালয় উপদ্বীপের বর্তমান কেড্ডাতে যে শৈলেন্দ্রদের একটি ছোট রাজ্য ছিল, তার শেষ হিন্দুরাজা ১৪৭৪ খ্রীস্টাব্দে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন।

শৈলেন্দ্র-সাম্রাজ্যের যুগে ইন্দো-জাভা শিল্প অসামান্য উৎকর্ষতা লাভ করে-ছিল। পৃথিবীবিখ্যাত বৌদ্ধ বরবুদার মন্দির সম্ভবতঃ অষ্টম কি নবম শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল। মধ্য-জাভার যে অঞ্চলে **চণ্ডি কলসন,** চণ্ডি সারি, চণ্ডি সেবু প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর মন্দির অবস্থিত, তারই সন্নিকটে কেদু সমতলক্ষেত্রে বরবুদার দণ্ডায়মান রয়েছে। ঐ মন্দিরের বিরাট সুসমঞ্জসতা এবং ওর অজস্র অপূর্ব মণ্ডনশিল্পসম্ভারের তুলনা এক কাম্বোডিয়ার আঙ্কোরভাট ব্যতীত পৃথিবীতে আর কোনও মন্দিরে আছে কিনা সন্দেহ।
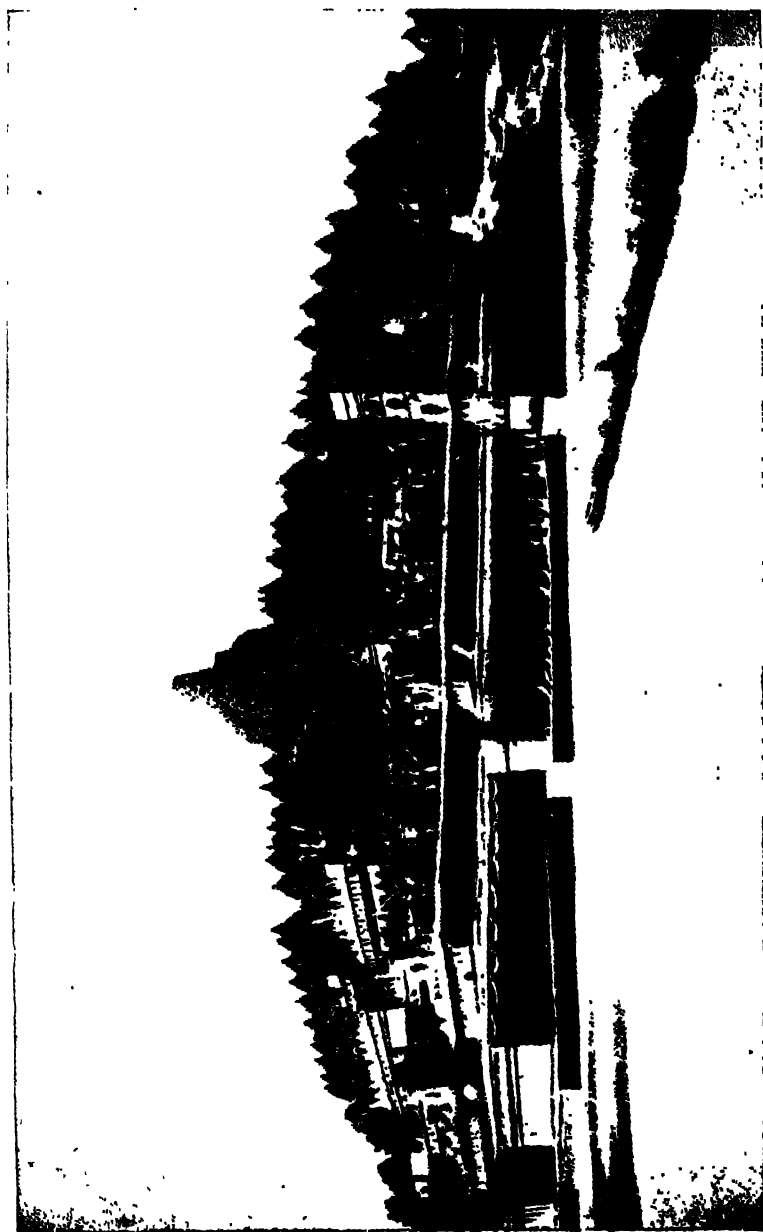
বরবুদার মন্দির

বরবুদার মন্দির একটি ছোট পাহাড়ের শীর্ষদেশে অবস্থিত। এ পাহাড়টি সবুজ কেদু সমতলভূমির উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, দূরে দূরে পাহাড়শ্রেণীর বেষ্টনী। মহান্ বরবুদার সৌধ পর পর নয়টি স্তরে গঠিত, সর্বোচ্চ স্তরের কেন্দ্রদেশে মুকুটের মত একটি স্তূপ স্থাপিত। সর্বনিম্ন স্তরের দৈর্ঘ্য ১৩১ গজ আর সর্বোচ্চ স্তরের ব্যাস মাপ ৩০ গজ। মন্দিরের ভিতরে অনেক গ্যালারি ও তাদের গায়ে কারুকার্যমণ্ডিত অগণিত মূর্তি। মন্দিরে বহু ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি আছে। গ্যালারির প্রত্যেক পাশের মধ্যদেশে সোপানাবলী ও তোরণ আছে। এই সোপান বেয়ে উপরের গ্যালারিতে যেতে হয়। গ্যালারিগুলির অসংখ্য মূর্তি-নির্মাণে আশ্চর্য ভাস্কর্য-শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এই মূর্তিগুলির অধিকাংশই বুদ্ধের জীবনী ও জাতক-কাহিনীগুলির অবলম্বনে রচিত হয়েছে। বরবুদারের শিল্পরীতি দেখে মনে হয় যে, এর আদর্শ প্রধানভাবে ভারতের গুপ্তযুগের উন্নত শিল্পকৌশল থেকেই নেওয়া হয়েছে।

মজাপহিৎ সাম্রাজ্য

শৈলেন্দ্র-সাম্রাজ্য ব্যতীত আরও কয়েকটি রাজ্য জাভায় প্রাধান্য লাভ করেছিল। অষ্টম শতাব্দীর প্রথমদিকে মধ্য-জাভায় মাতারাম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে মধ্য-জাভাই ছিল রাজনীতি, জ্ঞান ও বিদ্যার শীর্ষস্থান। মধ্য-জাভা অঞ্চলে শৈলেন্দ্র শাসকবৃন্দের আধিপত্যের ফলে, মূল-জাভার রাজগণ ক্রমেই পূর্ব-জাভায় গিয়ে বাস করা শুরু করেন। আস্তে আস্তে পূর্ব-জাভা প্রধান হয়ে উঠতে থাকে। দশম শতাব্দীর মাঝা-মাঝি থেকে পূর্ব-জাভা বড় হয়ে উঠতে আরম্ভ করে। এর পর প্রায় পাঁচ শত বৎসর পর্যন্ত পূর্ব-জাভাই হিন্দু কৃষ্টি ও সভ্যতা কৃতিত্বের সঙ্গে ধারণ করে। পূর্ব-জাভায় **কাদিরি** রাজ্য ও **সিংহসারি**-বংশের রাজত্বকাল উল্লেখযোগ্য। তারপর রাজকুমার **বিজয়ের** বিচিত্র সংগ্রাম-কাহিনীর সঙ্গে বিখ্যাত মজাপহিৎ রাজ্যের উৎপত্তির ইতিহাস জড়িত।

বিজয়ের সুচতুর চক্রান্তে পূর্ব-জাভার একস্থানে একটি নতুন লোকালয় গড়ে ওঠে। এই স্থানই মজাপহিৎ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কথিত আছে যে, নতুন উপনিবেশের এক অধিবাসী একটি মজা বা বিল্বফলের স্বাদ গ্রহণ করেন এবং তিনি ঐ ফলটিকে পহিৎ বা তিক্ত দেখে ছুঁড়ে ফেলে দেন। এই ঘটনা

থেকেই ঐ স্থানটির নাম হয় মজাপহিৎ বা তিক্ত-বিল্ব। এই সময়ে চীন-সম্রাট্ কুবলাই খাঁ জাভার বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। জাভার রাজা ছিলেন বিজয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী। বিজয় চীন-অভিযানের সুযোগ নিয়ে মজাপহিতে নিজের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। চীনা সৈন্যগণ জাভা ছেড়ে চলে গেলে
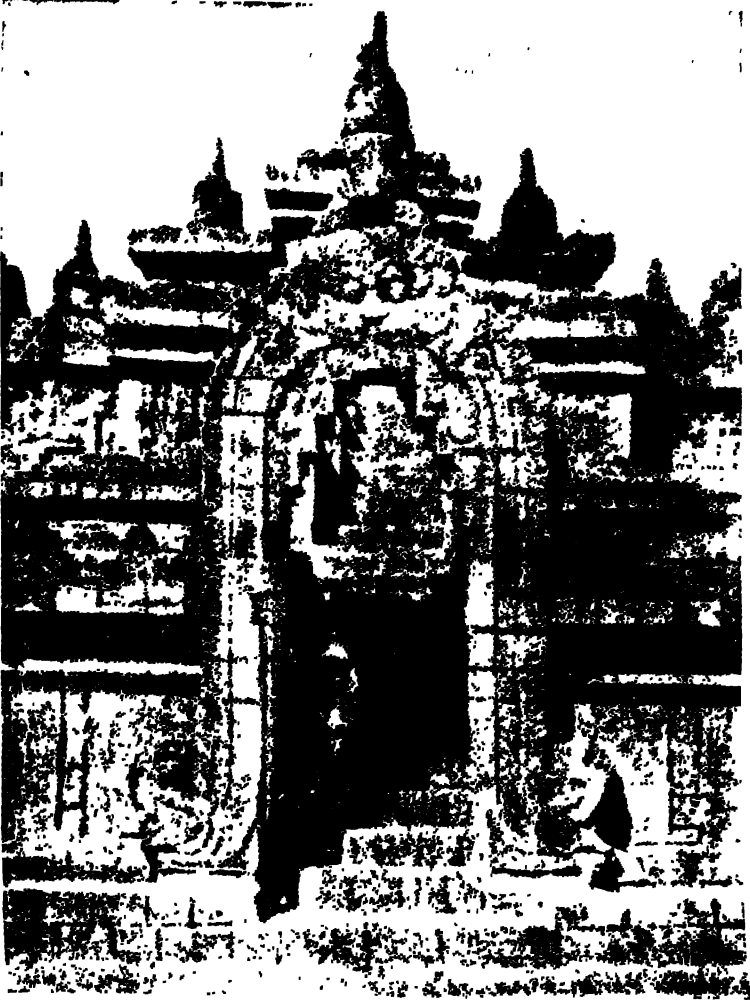
বরবুদার সোপানাবলী

বিজয় জাভার অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভু হলেন, মজাপহিৎ নগরী হল তাঁর রাজধানী। তিনি চীন-সম্রাটের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করলেন।

বিজয় সিংহাসনে উপবেশন করে কৃতরাজস জয়বর্ধন উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি শান্তি ও সমৃদ্ধিতে রাজত্ব চালিয়ে ১৩০৯ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান। কৃত-

রাজসের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জয়নাগর সিংহাসনে বসেন। জয়নাগরের রাজত্বকালে অনেক বিদ্রোহ হয়, তার মধ্যে কুটি নামক এক ব্যক্তির বিদ্রোহ খুব প্রবল হয়েছিল। রাজা জয়নাগরের **গজামদ** নামক এক বীর বিশ্বস্ত অনুচরের চেষ্টায় কুটির বিদ্রোহ দমিত হয়। এই সময় মজাপহিৎ বা জাভার মহারাজার অসীম ক্ষমতা ছিল, অন্য সাতজন নৃপতি তাঁর বশ্যতা স্বীকার করতেন। জাভা ছিল জনবহুল দেশ ও মূল্যবান্ মসলাদ্রব্যে পূর্ণ। রাজপ্রাসাদ সোনা, রুপা ও নানাপ্রকার মহার্ঘ প্রস্তরাদির দ্বারা শোভিত ছিল। গজামদ অনেকদিন পর্যন্ত জাভা-রাজ্যের শাসনব্যাপারে প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সুবর্ণভূমির অনেকগুলি দ্বীপ জয় করেছিলেন। তিনি বালি দ্বীপ অধিকার করেন।

এরপর উল্লেখযোগ্য রাজার নাম রাজসনাগর। এই রাজার আমলে মজাপহিৎ আক্রমণশীল সাম্রাজ্যবাদী নীতি অবলম্বন করে। এই সময় জাভা আশে-পাশের প্রধান দ্বীপগুলি এবং মালয় উপদ্বীপের বৃহৎ অংশের উপর রাজনৈতিক প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা করে। জাভার নৌবহর খুব শক্তিশালী ছিল। অধীন রাজন্যবর্গ নিজেদের আভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা বজায় রেখে মজাপহিৎ সম্রাট্‌কে নানারূপ কর ও উপঢৌকন প্রদান করতেন। ১৩৬৫ খ্রীস্টাব্দে **'নাগরকৃতগামা'** নামে কাব্য রচিত হয়। এই কাব্যে অধীন রাজাদের বিশদ বিবরণ আছে। এতে দেখা যায় যে, বর্তমান ইন্দোনেশিয়ার অধিকাংশ দ্বীপ ও মালয় উপদ্বীপ জুড়ে মজাপহিৎ সাম্রাজ্যের অধিকার স্থাপিত হয়েছিল। এই যুগে জাভা পূর্ণ উন্নতি লাভ করে। তার আন্তর্জাতিক প্রতিপত্তিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

নাগরকৃতগামা কাব্যে আরও জানা যায়, মজপহিতের দূরদূরান্ত দেশের সাথে বাণিজ্যের সম্পর্ক ছিল। ঐ সব দেশ থেকে নিয়মিতভাবে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণ মজাপহিতে আসতেন। যে সমস্ত দেশ থেকে সর্বদা লোকেরা এখানে আসত, তার মধ্যে গৌড় অর্থাৎ বাংলাদেশের উল্লেখ আছে। এই বিদেশীরা জাহাজে চড়ে দ্রব্যসম্ভারসহ মজাপহিতে আগমন করত। মজাপহিতের লোকেরা বিদেশী বণিক, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদের সাদরে অভ্যর্থনা করত। এই চরম উন্নতির কালে জাভার শাসনপ্রণালী খুব সুনিয়ন্ত্রিত ও উন্নত ধরনের ছিল। রাজা রাজসনাগরের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। নিজেদের মধ্যে বিবাদ ও গৃহযুদ্ধই এর জন্যে প্রধানতঃ দায়ী। পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই জাভার অবনতির সূত্রপাত হয়। সাম্রাজ্যের

অন্তর্ভুক্ত বহু রাজ্য এই সময় চীনের সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করে। জাভার পরবর্তী দুর্বল হিন্দুরাজাদের রাজত্বের অনতিকালের মধ্যে মুসলমানগণ ঐ দেশ দখল করে।

সুমাত্রা দ্বীপের উত্তর অংশে কতকগুলি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সমাবেশ ছিল। এদের

বরবুদারের গ্যালারি

মধ্যে কলহ-বিবাদ লেগেই থাকত। এর থেকেই ক্রমে সুমাত্রায় ইসলাম ধর্মের প্রবেশের সুবিধা হয় এবং সুমাত্রা হতে ঐ ধর্ম চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম পারলাক্ রাজ্য এবং তারপর সমুদ্র নামে একটি ছোট রাজ্যে মুসলমান শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমুদ্র থেকেই ভবিষ্যতে সুমাত্রা নামের উদ্ভব হয়।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে মালয় উপদ্বীপে যে সব রাজ্য বড় হয়ে ওঠে, তার মধ্যে মালাক্কা ব্যবসা-বাণিজ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করে। সেকেন্দার শা নামে এক

বুদ্ধমূর্তি (বরবুদার)

সুলতান মালাক্কার শ্রীবৃদ্ধির পত্তন করেন। তিনি নানারূপ চেষ্টা ও কৌশল দ্বারা সিঙ্গাপুর হতে মালাক্কায় বাণিজ্যকেন্দ্র স্থানান্তরিত করেন। এই সময় থেকে মালাক্কা বাণিজ্য ও রাজনীতিতে অসাধারণ শ্রেষ্ঠতা লাভ করে। এই

রাজ্য ইসলাম ধর্মের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়, এবং এস্থান থেকেই ঐ ধর্ম মালয় উপদ্বীপের নানাভাগে বিস্তৃত হয়। মালাক্কার দ্বিতীয় রাজা একজন মুসলমান মহিলাকে বিয়ে করেন এবং নিজে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। গুজরাট ও ইরান থেকে অনেক মুসলমান বণিক এসে মালাক্কায় বসবাস করেন। রাজার সাহায্যে তাঁরা দেশের লোকদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। মালাক্কা কেন্দ্র থেকে ইসলাম ধর্ম শুধু মালয় নয়, জাভা, সুমাত্রা এবং অপরাপর দ্বীপের নানা জাতির মধ্যেও বিস্তার লাভ করে। মালাক্কার ঐশ্বর্য ও বাণিজ্যিক প্রতিপত্তিই সুবর্ণভূমিতে ইসলাম-অভিযানের সাফল্যের অন্যতম কারণ।

পোর্তুগিজদের বিবরণে পাওয়া যায় যে, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিকে জাভার কতকগুলি বন্দরে মুসলমান শাসকদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু তখনও স্বাধীন হিন্দুরাজার রাজত্ব বর্তমান ছিল। ক্রমে বৈবাহিক ও অপরাপর শান্তিপূর্ণ উপায়ে ইসলাম-প্রভাব জাভার অভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করেছিল। হিন্দু রাজপরিবারের অনেকে মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করায় এবং অনেক সামন্ত-পরিবারের নতুন ধর্মে অনুরক্ত হওয়ার ফলেই জাভায় মুসলমান ধর্মের প্রসার-লাভের পথ সুগম হয়েছিল।

মজাপহিৎ হাতছাড়া হবার পরেও জাভার হিন্দুরাজা কিছুকাল পূর্ব-জাভায় নিজের হিন্দুধর্ম ও স্বাধীনতা অব্যাহত রেখেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিদেশী আক্রমণ প্রতিরোধ করতে অসমর্থ হওয়ায় তিনি বাধ্য হয়ে দলবলসহ বালি দ্বীপে গিয়ে আশ্রয় লাভ করেন। বালি দ্বীপের লোকেরা তাঁদের সাদরে আহ্বান করল। তখন থেকে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র হল ঐ ক্ষুদ্র দ্বীপ। আজ পর্যন্ত ঐ দ্বীপই নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও হিন্দু-সভ্যতা ও ঐতিহ্যের ধারা বহন করে আসছে আর জাভার পুরাতন মহিমা ও গরিমার সাক্ষ্য দিচ্ছে কেবল এখন তার প্রাচীন কীর্তিস্তম্ভগুলি। বর্তমানে বালি দ্বীপের হিন্দুধর্মাবলম্বীর সংখ্যা প্রায় ষোল লক্ষ।

ইওরোপীয়দের আগমন

ইসলাম শক্তির প্রধান আশ্রয় মালাক্কা-সাম্রাজ্য বেশীদিন ক্ষমতা বজায় রাখতে পারল না। শীঘ্রই বিভিন্ন ইওরোপীয় দেশের দুঃসাহসিক অভিযাত্রী বণিকের দল পূর্বাঞ্চলের নানা দেশে এসে ভিড় জমাতে শুরু করল। এদের

মধ্যে অগ্রণী ছিল পোর্তুগিজেরা। সুবর্ণভূমিতেও তারাই আগে এসে হানা দিল। পোর্তুগিজদের সঙ্গে অনতিবিলম্বে মালাক্কার রাজশক্তি ও আরব ব্যবসায়িগণের সংঘর্ষ বেধে গেল। পোর্তুগিজ নেতা **আলবুকার্ক** ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দে মালাক্কা অধিকার করে মুসলমানদের বাণিজ্যের প্রতিপত্তি বিনষ্ট করলেন। পোর্তুগালের রাজধানী **লিসবন** পৃথিবীর মধ্যে ব্যবসার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হল। পূর্বদেশগুলি থেকে মূল্যবান্ মসলাদি এবং অন্যান্য দ্রব্যসম্ভার পোর্তুগিজেরাই ইওরোপে বণ্টন করতে লাগল।

পোর্তুগালের পর স্পেন পূর্বাঞ্চলের দেশগুলিতে অভিযান চালাল। ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে স্পেন ফিলিপাইন দ্বীপগুলি গ্রাস করল এবং সেস্থান থেকে প্রভূত অর্থসম্পদ অর্জন করতে লাগল। বাণিজ্যব্যাপারে অবশ্য পোর্তুগিজগণই স্পেনীয়দের চেয়ে বেশী সমৃদ্ধি লাভ করতে লাগল। শীঘ্রই ইওরোপের অন্যান্য দেশগুলি, স্পেন ও পোর্তুগালের বিপুল অর্থাগম দেখে হিংসাপরবশ হয়ে উঠল।

ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ডই প্রথম সুবর্ণভূমি অঞ্চলে পোর্তুগিজদের প্রবল প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াল। পোর্তুগিজদের অধিকৃত স্থানগুলি ক্রমে ওলন্দাজ কিংবা ইংরেজদের হাতে গিয়ে পড়ল। ইংরেজ ও ওলন্দাজ বণিকদল তাদের অধিকতর দক্ষতা ও বিচক্ষণতার জোরে পোর্তুগিজদের পৃথিবীবিস্তৃত শক্তিকে বিপর্যস্ত করে বিভিন্ন স্থানে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করল। ইংরেজ ও ওলন্দাজদের সুগঠিত বণিক-কোম্পানিদল সর্বত্র অবাধগতিতে প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল।

ইংরেজ ও ওলন্দাজগণ পূর্ব-দ্বীপাঞ্চল থেকে পোর্তুগিজদের একপ্রকার বিতাড়িত করল বটে, কিন্তু মহার্ঘ মসলাদ্রব্যের কাড়াকাড়ি নিয়ে তাদের পরস্পরের মধ্যেই তীব্র বিরোধ বেধে যায়। এসময় একবার ১৬২৩ খ্রীষ্টাব্দে মালাক্কা দ্বীপের আম্বয়নার ওলন্দাজ গভর্নর নানা অভিযোগ উপস্থাপিত করে ইংরেজ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কতিপয় কর্মচারীর প্রাণদণ্ডের বিধান করেন। ইতিহাসে এই ঘটনা "আম্বয়নার হত্যাকাণ্ড" বলে আখ্যাত। পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ইংরেজ ও ওলন্দাজদের ভিতর এই কলহ-সংঘর্ষ অবশ্য বেশী দিন চলেনি, কারণ ইংরেজগণ সেখানে ব্যর্থমনোরথ হয়ে শীঘ্রই ভারতবর্ষে ফিরে আসে। অতএব এরপর থেকে ওলন্দাজগণই সুবর্ণভূমিতে ব্যবসা-বাণিজ্য ও কর্তৃত্বে সর্বেসর্বা হয়ে উঠল।

জাভা, সুমাত্রা, বালি প্রভৃতি দ্বীপসমূহ এইভাবে ওলন্দাজদের অধীনে

গেল। এ অঞ্চলে হল্যাণ্ডের এক বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য স্থাপিত হল। এ সাম্রাজ্য দীর্ঘদিন চলার পর সম্প্রতি এর বিলোপ ঘটেছে। ভারতে ইংরেজ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বণিকদের মত ওলন্দাজ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বণিকরাও জাভা প্রভৃতি স্থানে অকথ্য শোষণ, অনাচার ও দুর্নীতি চালিয়েছিল। বণিক-সম্প্রদায় ঐসব দেশের জনসাধারণের কল্যাণের দিকে আদৌ দৃষ্টিপাত করে নি। তারা কি করে যাবতীয় অর্থসম্পদ আত্মসাৎ করে হল্যাণ্ডে নিয়ে যাবে, এ নিয়েই ব্যস্ত ছিল।

ওলন্দাজ বণিকগণ ক্রমেই অধিকতর অনাচার ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে লাগল। অবশেষে ওলন্দাজ সরকার ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সরাসরি নিজেদের হাতে সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব নিয়ে নিল। হল্যাণ্ডের প্রত্যক্ষ শাসনেও জাভার লোকদের অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি হল না। দেশের কৃষককুলের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হতে লাগল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ওলন্দাজ সরকার জাভা এবং অন্যান্য দ্বীপে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এবং কিছু কিছু অপরাপর সংস্কারের প্রবর্তন করে। এ সময় থেকে দেশবাসীর মধ্যে একটি নতুন অধিকার-সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। বিংশ শতাব্দীতে তাঁদের মধ্যে জাতীয়তার আন্দোলন সূত্রপাত হয় এবং ক্রমেই তাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্যে জোর দাবি ও সংগ্রাম করতে থাকেন। ১৯২৭-২৮ খ্রীস্টাব্দে এই দ্বীপপুঞ্জে হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তীব্র বৈপ্লবিক আন্দোলন দেখা দেয়, ওলন্দাজ সরকারও বিপ্লবীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালায়, কিন্তু কোন কিছুতেই তাঁদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে নির্মূল করতে সমর্থ হয় না।

ইন্দোনেশিয়া

পূর্ব-দ্বীপপুঞ্জে ওলন্দাজ সাম্রাজ্যের বেশী অংশ বর্তমানে স্বাধীনতা পেয়ে "ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র" নামে পরিচিত হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার লোক-সংখ্যার মধ্যে জাভায়ই অধিক লোকের বাস। জাভার জাতীয়তাবাদীরা স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করতে থাকেন, হল্যাণ্ড তাদের কিছু কিছু অধিকারও দিয়েছিল, কিন্তু সে অতি নগণ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত এই ভাবে চলে। জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অবতরণ করবার পর ঘটনার মোড় ঘুরে যায়।

জাপান দ্রুত যুদ্ধে জয়লাভ করে দ্বীপাঞ্চল অধিকার করে। জাপানীরা ওলন্দাজ শাসনকর্তাদের বিতাড়িত করে এবং অধিকাংশ ইওরোপীয়দের অন্তরীণ করে আবদ্ধ রাখে। তারা দেশের জনসাধারণ বা ইন্দোনেশীয়দের সহানুভূতি লাভের উদ্দেশ্যে, তাদের প্রতিনিধিদের হাতে দেশের শাসনদায়িত্ব অর্পণ করে। জাপানীদের পরাজয়ের পর, তারা যখন দ্বীপপুঞ্জ ছেড়ে চলে যায়, তখন তাদের অস্ত্রশস্ত্র রসদের বেশির ভাগ ইন্দোনেশীয়দের হাতেই দিয়ে যায়। এর ফলে, ইন্দোনেশীয়দের শক্তি অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়। তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় যে, তারা আর বিতাড়িত ওলন্দাজ সরকারের অধীনতা কখনই স্বীকার করবে না।

যুদ্ধের অবসানে জাভার অধিক অংশের উপর কর্তৃত্ব ও মেলা অস্ত্রশস্ত্রাদি ইন্দোনেশীয়দের হাতেই ছিল। ইন্দোনেশীয়রা ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি করে যে, তখনই তাদের দেশের স্বাধীনতা মেনে নিতে হবে। কিন্তু ওলন্দাজ সরকার পীড়াপীড়ি করতে থাকে যে, ইন্দোনেশিয়ার কর্তৃত্বে পুনরায় বসবার পরেই, শুধু তারা সাম্রাজ্যের প্রজাদের কতটা অধিকার মঞ্জুর করবে, সে-বিষয়ে কথাবার্তা চালাতে পারে। চরমপন্থী ইন্দোনেশীয়গণ এতে তীব্র আপত্তি প্রকাশ করে। এরূপ অচল অবস্থা বেশ কিছুকাল চলে, দু পক্ষের মধ্যে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধবিগ্রহ চলতে থাকে। শেষে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই অগস্ট ডাঃ সুকর্ণ ও ডাঃ হাতার নেতৃত্বে ইন্দোনেশীয়গণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

ভারত তখন সবেমাত্র স্বাধীনতা লাভ করেছে। ইন্দোনেশিয়াও যাতে স্বাধীনতা লাভ করে, সেজন্যে ভারতীয় নেতারা চেস্টা করতে থাকেন। সোভিয়েট রাশিয়াও ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা সমর্থন করে। অবশেষে, নানা গণ্ডগোলের পর ওলন্দাজ সরকার ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর, আমস্টার্ডাম রাজপ্রাসাদে এক অনুষ্ঠান দ্বারা ইন্দোনেশীয়দিগকে স্বাধীনতা প্রদান করে। শুধু পশ্চিম নিউগিনি ওলন্দাজদের হাতে থাকে। ২৭শে ডিসেম্বর সংযুক্তরাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়। ডাঃ সুকর্ণ প্রথম সভাপতি হন। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুলাই ইন্দোনেশিয়ার সকল রাষ্ট্র এক অধিকতর শক্তিশালী কেন্দ্রের অধীন হ'তে স্বীকৃত হয়।

সেই অনুযায়ী ইন্দোনেশিয়ার নাম রাখা হয় **ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র** (১৫ই অগস্ট)।

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে যে ওলন্দাজ ইন্দোনেশিয়া সংঘ গঠিত হয়েছিল তা ১৯৫৪

খ্রীষ্টাব্দের ১০ই অগস্ট ভেঙ্গে যায়। পশ্চিম নিউগিনি (ইরিয়ান) ওলন্দাজদের অধিকারে থাকে। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে পশ্চিম নিউগিনি ইন্দোনেশিয়ার অধিকারে এসেছে।

১৯৫২ থেকে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাষ্ট্রবিরোধী দল বিদ্রোহ ঘোষণা করে যুদ্ধ চালাতে থাকে। ডাঃ সুকর্ণ বহু চেষ্টার পর ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে বিদ্রোহ দমন করেন।

ডাঃ সুকর্ণ

১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর রাষ্ট্রসংঘ ইন্দোনেশিয়ার পশ্চিম নিউগিনি অধিকারের প্রস্তাব বাতিল করে দেয়। তখন ইন্দোনেশিয়া সরকার ওলন্দাজদের সকল সম্পত্তি ও কাজকারবার জোর করে দখল করে। ৪৬ হাজার ওলন্দাজ দেশ ত্যাগ করে চলে যায়।

ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের রাজধানীর নাম হয়েছে জাকার্তা বা যোগ্যকর্তা (আগেকার বাটাভিয়া)। জাকার্তা জাভা দ্বীপে অবস্থিত। প্রাচীন সুবর্ণভূমির অধিকাংশ দ্বীপ নিয়ে বর্তমান ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র গঠিত। এই রাষ্ট্রের অন্তর্গত অসংখ্য দ্বীপমালার মধ্যে জাভাই সবচেয়ে প্রধান ও কেন্দ্রস্থল। ইন্দোনেশিয়ার শতকরা ৯০ জন মুসলমান।

১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ইন্দোনেশিয়া সরকারকে উচ্ছেদের জন্য এক কম্যুনিস্ট ষড়যন্ত্র হয়। ইন্দোনেশীয় সেনাবাহিনী কঠোর হস্তে সেই বিদ্রোহ দমন করে। প্রায় ৮০ হাজার কম্যুনিস্ট নিহত হয়। ১৮ই অক্টোবর কম্যুনিস্ট দল নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়।

ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেণ্ট সুহারতো

ডাঃ সুকর্ণ ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে সারা জীবনের জন্য ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি বলে ঘোষিত হন। কিন্তু ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারি তাঁকে রাষ্ট্রপতির পদ ছাড়তে হয়েছে। জেনারেল সুহারতো বর্তমানে রাষ্ট্রপ্রধান।

ইন্দোনেশিয়ার আয়তন ১৯,০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার (৫,৭৫,৪৫০ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ৯,৭০,৮৫,৩৪৮ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

বর্তমান মালয় ও ইন্দোচীন

মালয় যুক্তরাষ্ট্র

ব্রহ্মদেশ জয় করবার পর, ইংরেজরা দক্ষিণে মালয় উপদ্বীপের দিকে অগ্রসর হয়। তারা **সিঙ্গাপুর** দ্বীপ অধিকার করে একে একটি শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্র ও পোতাশ্রয়ে পরিণত করে। সিঙ্গাপুর থেকে ব্রিটিশশক্তি উত্তরদিকে মালয়ের অভ্যন্তরে অভিযান করতে থাকে। **মালয়দেশে** অনেক ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল, তাদের অধিকাংশই ছিল থাইল্যাণ্ডের অধীন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে, ইংরেজগণ থাইল্যাণ্ডকে কোণঠাসা করে মালয়-রাজ্যগুলি দখল করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মালয়ের স্বাধীনতাকামী অধিবাসীদের মধ্যে বেশ একটা অসন্তোষ ও বিদ্রোহের ভাব দেখা দেয়। যা হক, অনেক আলাপ-আলোচনার পর ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে আগস্ট থেকে মালয় যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। পার্লিসের রাজা রাষ্ট্রপ্রধান হন।

মালয় ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রসংঘের ৮২তম সদস্য হয়।

মালয়েশিয়া

মালয় যুক্তরাষ্ট্র, সিঙ্গাপুর, উত্তর বোর্নিও (সাবা) ও সারাওয়াক ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর একসঙ্গে মিলিত হয়ে মালয়েশিয়া রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দের ৯ই আগস্ট সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।

মালয়ের ৯টি রাজ্যের শাসকের মধ্য থেকে মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হবার রীতি প্রবর্তিত হয়েছে। বর্তমানে টুয়াংকু ইসমাইল নাসিরুদ্দীন শাহ্ ইবনি অল-মারহুম সুলতান জয়নাল আবিদিন রাষ্ট্রপ্রধান। প্রধান মন্ত্রী টংকু আবদুল রহমান।

মালয়েশিয়ার আয়তন ১,২৭,১৯৮ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ৯৩,৮৮,৯২২ (১৯৬৪ খ্রীঃ)। রাজধানী কুয়ালালামপুর।

সিঙ্গাপুর

সিঙ্গাপুর মালয় উপদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত একটি স্বাধীন রাজ্য।

একদা সুমাত্রার শ্রীবিজয় কোর্ট নামে এক যুবরাজ নিজে একটি নগরী স্থাপনের উদ্দেশ্যে সিঙ্গাপুর দ্বীপে এসে হাজির হন। এখানে এসে এক অদ্ভুত জন্তু তাঁর চোখে পড়ে। তাঁর লোকেদের মুখে তিনি শোনেন, জন্তুটির নাম 'সিংহ'। তিনি তাই থেকে তাঁর নগরী-রাজ্যের নাম রাখেন সিংহপুর অর্থাৎ বর্তমানের সিঙ্গাপুর।

সিঙ্গাপুরের সভাপতি ইয়ুসুফ বিন ইশাক

সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লী কিউয়ান ইউ

১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে সিঙ্গাপুর ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকারে আসে। তখন থেকে সিঙ্গাপুর এক বাণিজ্যপ্রধান স্থানে পরিণত হয়। বর্তমান সিঙ্গাপুরের জন্ম হয় ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে।

১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সিঙ্গাপুর জাপানের দখলে থাকে। ১৪০ বছর ব্রিটিশের দখলে থাকবার পর ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে সিঙ্গাপুর স্বয়ংশাসিত রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দে মালয়েশিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৯৬৫

খ্রীষ্টাব্দের ৯ই আগস্ট সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং স্বাধীন গণতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। সিঙ্গাপুর ১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর রাষ্ট্রসংঘের সদস্য তালিকাভুক্ত হয়।

সিঙ্গাপুরের পররাষ্ট্র মন্ত্রী এস রাজরত্নম্

সিঙ্গাপুরের বর্তমান সভাপতি ইয়ুসুফ বিন ইশাক, প্রধানমন্ত্রী লী কিউয়ান ইউ, পররাষ্ট্র মন্ত্রী এস রাজরত্নম্।

এর আয়তন ৫৮১·৫ বর্গ কিলোমিটার (২২৪·৫ বর্গ মাইল) এবং লোকসংখ্যা ১৯,৫৫,৬০০ (১৯৬৭ খ্রীঃ)।

ভিয়েৎনাম

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ভিয়েৎনামের উত্তরাংশ টংকিং নামে পরিচিত ছিল। ১১১ খ্রীষ্টাব্দে চীনা হান বংশীয়দের দ্বারা টংকিং অধিকৃত হয়। ৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহা চীনা কবল থেকে মুক্ত হয়। তারপর বিভিন্ন সময়ে ইহা চীন সম্রাটদের আওতায় আসে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভিয়েৎনামীরা চম্পা (ভিয়েৎনামের মধ্যস্থল) রাজ্যের অধিকাংশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কোচিন-চীন (ভিয়েৎনামের দক্ষিণাংশ) দখল করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে চীনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে, ফ্রান্স চীনের দক্ষিণ-পূর্বে আনাম আক্রমণ করে অধিকার করে। ক্রমে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে ক্ষমতা বিস্তৃত করে সেখানে বৃহৎ **ফরাসী ইন্দোচীন-সাম্রাজ্যের** প্রতিষ্ঠা করে। ফ্রান্স থাইল্যাণ্ডের হাত থেকে কাম্বোডিয়া রাজ্য কেড়ে নেয়। ইন্দোচীনের উত্তরভাগে আনাম ও টংকিংএর আনামীরা চীনাদের সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্কিত। আনামীরা বৌদ্ধ। তাদের ভিতরই প্রথম জাতীয়তার চেতনা জাগ্রত হয়।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে জাপান ভিয়েৎনাম দখল করে এবং এইখান থেকে মালয়ে আক্রমণ চালায়। যুদ্ধশেষে জাপানীরা ইন্দোচীন পরিত্যাগ করার সময় আনামীরা তাদের কাছ থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র পায় এবং **ভিয়েৎমিন** নামে জাতীয়তাবাদী গবর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করে। **ডাঃ হো চি মিন** এই দলের নায়ক। তাঁর দল আনামের সম্রাট্ **বাও দাইকে** অপসারিত করে। বাও দাই জাপান কর্তৃক স্বীকৃত গবর্নমেণ্টের কর্তা ছিলেন। ডাঃ হো চি মিন কম্যুনিস্ট। তাঁর কম্যুনিস্ট প্রভাবিত শাসনকে ফ্রান্স স্বীকার করে না নিয়ে বাও দাইয়ের অধীনে **ভিয়েৎনাম** গবর্নমেণ্ট গঠন করে। এজন্য ফ্রান্সকে ভয়াবহ যুদ্ধ করতে হয়।

অবশেষে দীর্ঘ আলোচনা ও বিতর্কের পর ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জুলাই জেনেভাতে যুদ্ধবিরতি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই যুদ্ধ-বিরতি সম্পর্কে যে তদারকী কমিশন গঠিত হয়েছিল, তার সভাপতি-পদ দেওয়া হয়েছিল ভারতকে। এই চুক্তির দ্বারা ভিয়েৎনাম রাজ্যটি বর্তমানে উত্তর ভিয়েৎনাম (ভিয়েৎমিন) ও দক্ষিণ ভিয়েৎনাম—এই দুই অংশে বিভক্ত হয়েছে।

১৭ অক্ষরেখা বরাবর দেশটি বিভক্ত হয়েছে। বেন হাই নদী দুই দেশের মধ্যে অবস্থিত।

দক্ষিণ ভিয়েৎনাম

এই অংশের নাম ভিয়েৎনাম প্রজাতন্ত্র (Republic of Vietnam). রাষ্ট্রটি মধ্য ভিয়েৎনামের দক্ষিণাংশের ১৮টি প্রদেশ এবং ভিয়েৎনামের দক্ষিণাংশের ২৭টি প্রদেশ নিয়ে গঠিত।

১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর জনসাধারণের ভোটে সম্রাট্ বাও দাই অপসারিত হন। ংগো-দিন-দিয়েম প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান হন। ২৬শে অক্টোবর ভিয়েৎনাম প্রজাতন্ত্র নামকরণ হয়।

১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দে ১লা নভেম্বর ংগো-দিন-দিয়েম ও তাঁর ভাইকে গুলি করা হয়। সামরিক কর্তৃপক্ষ দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। পরে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন জেনারেল ংগুয়েন ভ্যান থিউ এবং প্রধান মন্ত্রী হন ংগুয়েন ভ্যান লক।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামের আয়তন ১,৭১,৬৬৫ বর্গ কিলোমিটার (৬৬,২৬৩ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ১ কোটি ৫১ লক্ষ। রাজধানী সায়গন। এই রাষ্ট্র কম্যুনিস্ট-বিরোধী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একে প্রচুর সাহায্য দিয়ে থাকে। যাতে এই রাষ্ট্র কম্যুনিস্ট উত্তর ভিয়েৎনামের কবলে না পড়ে তার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বহুবৎসর ধরে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের হয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। প্রবল যুদ্ধ চালানো সত্ত্বেও এখনও কোন মীমাংসা হয় নি।

উত্তর ভিয়েৎনাম

এই অংশের নাম গণতন্ত্রী ভিয়েৎনাম রাষ্ট্র (Democratic Republic of Vietnam). এই রাষ্ট্র উত্তর ভিয়েৎনামের ২৪টি প্রদেশ, মধ্য ভিয়েৎনামের উত্তরাংশের ৪টি প্রদেশ এবং দুইটি কেন্দ্রশাসিত শহর –হানয় ও হাইফং নিয়ে গঠিত।

হো চি মিন গণতন্ত্রী ভিয়েৎনামের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী ফাম ভ্যান ডং।

এর আয়তন ১,৬৩,১০৩ বর্গ কিলোমিটার (৬৩,৩৪৪ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ১,৭৮,০০,০০০ (১৯৬৭ খ্রীঃ)। রাজধানী হানয়। এই রাষ্ট্র কম্যুনিস্ট প্রভাবাধীন।

কাম্বোডিয়া

কাম্বোডিয়া ফরাসী ইন্দোচীনের অধীন ছিল। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ফরাসী অধিকারে আসে। বিখ্যাত আঙ্কোরভাট মন্দির এখানেই অবস্থিত।

১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই নভেম্বর কাম্বোডিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহা পূর্ণ স্বাধীন হয় এবং রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হয়।

রাজা নরোদম সিহানুক ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দের ২০শে জুন রাষ্ট্রপতি হন। তাঁর মা রানী কোসামাক সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা হন। কিন্তু তাঁর কোন ক্ষমতা নেই।

কাম্বোডিয়ার অধিবাসীদের বেশির ভাগ বৌদ্ধ। এর আয়তন ১,৮১,০০০ বর্গ কিলোমিটার (৭১,০০০ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ৬২,৬০,০০০ (১৯৬৬ খ্রীঃ)।

কাম্বোডিয়ার রাষ্ট্রপতি প্রিন্স নরোদম সিহানুক

লেয়স

লেয়স ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে ফরাসী আশ্রিত রাজ্যরূপে পরিগণিত হয় এবং ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে জুলাই স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ইহা ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রাষ্ট্রসংঘে যোগদান করে।

লেয়সে রাজতন্ত্র বর্তমান। শ্রী সাবাং বাথানা তাঁর পিতার মৃত্যুর পর ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর রাজা হন। প্রিন্স সৌভানা ফৌমা ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে আগস্ট প্রধান মন্ত্রী হন।

লেয়স কম্যুনিস্ট-বিরোধী রাষ্ট্র। ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দে জুলাই ও আগস্ট মাসে উত্তরাংশে বিরাট কম্যুনিস্ট বিপ্লব দেখা দেয়। প্রধান মন্ত্রীর অক্লান্ত চেষ্টায় তা শান্ত হয়।

রাষ্ট্রের অধিকাংশ অধিবাসী বৌদ্ধ। এর আয়তন ২,৩৬,৮০০ বর্গ কিলোমিটার (৮৮,৭৮০ বর্গ মাইল) এবং লোকসংখ্যা ২৩,০০,০০০ (১৯৬৬ খ্রীঃ)। রাজকীয় রাজধানী লুয়াং প্রবাং (লোকসংখ্যা ৫০,০০০) এবং সরকারী রাজধানী ভিয়েঁতিয়েঁ (লোকসংখ্যা ১,২৫,০০০)।

ব্রহ্মদেশ

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ভূখণ্ডে ব্রহ্মদেশ পুরাকালে উত্তর ও দক্ষিণ ব্রহ্ম এই দুই রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই দুই রাজ্যের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ লেগেই ছিল। কখনো কখনো একজন শক্তিমান্ নৃপতি দুই অংশকে একত্রিত করে থাইল্যাণ্ড (শ্যামদেশ) পর্যন্ত আক্রমণ করতেন। বাংলাদেশ ও আসামের পূর্বাংশের সঙ্গে প্রাচীনকালের ব্রহ্মদেশের নানারূপ সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতীয় সভ্যতা ব্রহ্মদেশ ও থাইল্যাণ্ডেও বিস্তৃতভাবে ছড়িয়েছিল।

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ব্রহ্মদেশ ইংরেজের প্রভাবাধীন থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজের সঙ্গে ব্রহ্মদেশের বিরোধ শুরু হয়। ব্রহ্মদেশের রাজা অধিক সাহসী হয়ে আসাম আক্রমণ করেন এবং তা জয় করেন। শীঘ্রই ইংরেজদের সাথে বর্মীদের যুদ্ধ বাধে। পর পর তিনটি যুদ্ধ হয়, অবশেষে ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজ সম্পূর্ণ ব্রহ্মদেশকে তার ভারতীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করে। ইংরেজ ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল ব্রহ্মদেশকে ভারতীয় সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে। এইভাবে পৃথক্‌ভাবে শাসিত হতে থাকার পর ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারি ব্রহ্মদেশ তার স্বাধীনতা ফিরে পায়। ব্রহ্মদেশ এখন ব্রিটিশ কমনওয়েলথের বাইরে একটি স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র।

উ উইন মং ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে ব্রহ্মের সভাপতি হন এবং উ নু ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে মার্চ মাসে প্রধানমন্ত্রী হন। জেনারেল নি উইন বর্তমানে মন্ত্রিসভার চেয়ারম্যান।

কম্যুনিস্ট ও অন্যান্য বিদ্রোহীদের উপদ্রবে ব্রহ্মদেশের শান্তি বিঘ্নিত হতে থাকে। জেনারেল নি উইনের নেতৃত্বে ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ থেকে ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দেশে সামরিক আইন প্রবর্তিত ছিল।

ব্রহ্মে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী (শতকরা ৮০ ভাগ)।

ব্রহ্মের আয়তন ৬,৭৮,০০০ বর্গ কিলোমিটার (২,৬১,৭৮৯ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ২,৫৮০০০০০ (১৯৬৭ খ্রীঃ)। রাজধানী রেঙ্গুন (লোকসংখ্যা ১৬,১৬,৯৪৮)।

থাইল্যাণ্ড

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আর সব দেশ যখন ইওরোপীয়দের অধীনে চলে যায়, তখন আশ্চর্যরূপে একমাত্র **থাইল্যাণ্ডই** স্বাধীন থেকে যায়। ইংলণ্ড, থাইল্যাণ্ডের পশ্চিমে ব্রহ্মদেশ ও দক্ষিণে মালয়ের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে আর পূর্বদিকে ফ্রান্স ইন্দোচীনে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দুই শক্তির হুমকির ফলে থাইল্যাণ্ডকে দুপাশের অনেক রাজ্য ছেড়ে দিতে হয়েছিল। দুই প্রবল বিবদমান শক্তির মাঝখানে পড়ায় থাইল্যাণ্ডের অবশিষ্টাংশ কোনপ্রকারে স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে এক রক্তপাতহীন বিপ্লবের পর রাজা প্রজাধীপক শাসনতন্ত্রের সংশোধনপত্রে স্বাক্ষর করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে সিংহাসন ত্যাগ করতে হয়। তাঁর পরে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র যুবরাজ আনন্দ মহীদল সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ৯ই জুন তাঁর মৃত্যুর পর আনন্দ মহীদলের ছোট ভাই ভূমিবল আদুল যাদেজ (জন্ম ১৯২৭, ৫ই ডিসেম্বর) রাজা হন।

বর্তমানে ফিল্ড মার্শাল থানম কিত্তিকাচোর্ন প্রধান মন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী।

থাইল্যাণ্ডের নাম ছিল আগে শ্যাম। ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে তার বদলে নাম হয় থাইল্যাণ্ড।

থাইল্যাণ্ডের অধিকাংশ অধিবাসী বৌদ্ধ। এর আয়তন ৫,১৪,০০০ বর্গ কিলোমিটার (১,৯৮,২৫০ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ৩২,০০,০০০ (১৯৬৭ খ্রীঃ)। রাজধানী ব্যাংকক (লোকসংখ্যা ২৩ লক্ষ)।

গ্রীস ইওরোপের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত একটি উপদ্বীপ। এর পূর্বদিকে ইজিয়ান সাগর, দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর ও পশ্চিমে আইওনিয়ান সাগর অবস্থিত। গ্রীসের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ঐ দেশের ইতিহাসের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। গ্রীসের ভৌগোলিক অবস্থিতি এর ইতিহাসকে স্বতন্ত্র রূপ দান করেছে। এর উপদ্বীপস্থ উপকূলের ভগ্নতা, সমুদ্র-সাহচর্য, জল-বায়ু ও প্রকৃতির কৃপণতা—প্রত্যেকটিই এর জাতীয় জীবনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে। জাতীয় অনৈক্য, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও গণতন্ত্র-প্রীতি, সমুদ্রবিলাস ও উপনিবেশ-বিস্তার এবং সভ্যতা ও কৃষ্টি—সব কিছুই গ্রীসের প্রকৃতির দান।

প্রাচীনকালে গ্রীস এক দেশ হলেও এক রাষ্ট্র ছিল না। এখানে অনেক স্বাধীন নগর-রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। গ্রীসের ইতিহাস বলতে এই সব নগর-রাষ্ট্রের পৃথক্ পৃথক্ কাহিনীর সমষ্টিকেই বোঝায়। বর্তমান ইওরোপীয় সভ্যতার জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য ইত্যাদিতে প্রায় সব কিছুই প্রাচীন গ্রীসের দান। গ্রীসের ছোট রাষ্ট্রগুলিতে গণতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতি প্রথম প্রকাশ ও বিকাশ লাভ করে।

গ্রীকদের উন্নতির বহুপূর্বেই ইজিয়ান সমুদ্রের অঞ্চলে, বিশেষ করে ক্রীট দ্বীপটিকে আশ্রয় করে এক উচ্চস্তরের সভ্যতা বিরাজ করত। একে

ইজিয়ান-সভ্যতা বলা হয়। এই সভ্যতা বহু পুরাতন যুগের বাবিলন, আসিরিয়া, মিশর প্রভৃতি পূর্বকালের সভ্যতার সমসাময়িক। এককালে ইজিয়ান-সভ্যতা দিগন্তব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে ও খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই সভ্যতার অনুরূপ একটি সভ্যতা এশিয়া-মাইনরের **ট্রয়** নগরীতেও বিকশিত হয়েছিল। ইজিয়ান-সভ্যতার শেষের যুগকে **মাইসিনিয়ান**-সভ্যতা বলে অভিহিত করা হয়—এর কেন্দ্র ছিল পেলোপোনিসাস বা দক্ষিণ গ্রীস।
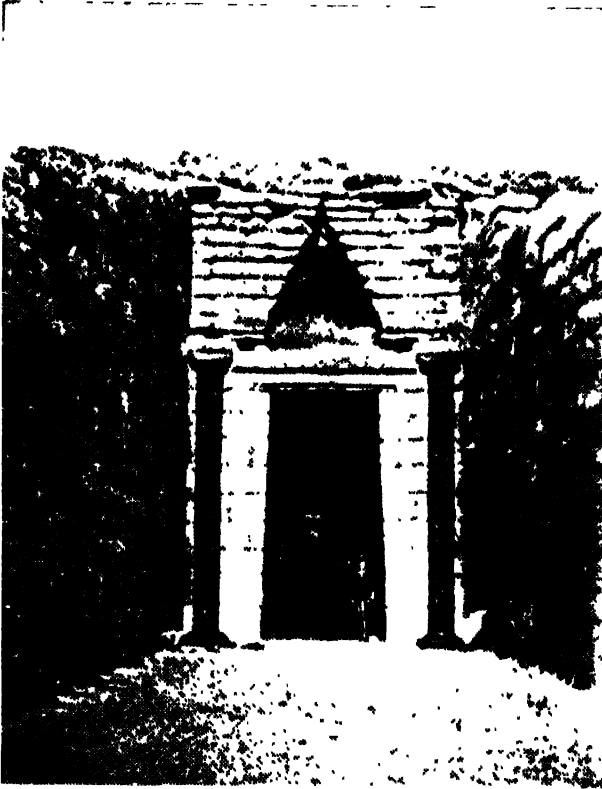
প্রাচীন ইজিয়ান-সভ্যতার একটি দালানের ধ্বংসাবশেষ

পরবর্তী যুগে গ্রীকেরা ইজিয়ান-শক্তির ক্ষমতা খর্ব করে এই উচ্চাঙ্গের সভ্যতাকে আপন করে নেয়। গ্রীক-সভ্যতা ইজিয়ান-সভ্যতার নিকট অনেকাংশে ঋণী।

প্রবাদ অনুযায়ী, গ্রীকেরা **হেলেন** নামে একজন পূর্বপুরুষের বংশধর বলে নিজেদের বলত **হেলেনীজ** ও নিজেদের দেশকে বলত **হেলাস**। গ্রীস ও গ্রীক নামটি পরে রোমানরা দিয়েছিল।

গ্রীসের প্রাচীন উপকথা ও কাহিনীকে আশ্রয় করে **হোমার** নামক এক প্রসিদ্ধ কবি **ইলিয়ড ও ওডিসি** নামে দুটি চমৎকার মহাকাব্যের সৃষ্টি করেন। ট্রয়-যুদ্ধই এই অমর লেখনীর বিষয়-বস্তু। এই মহাকাব্য দুটি পৌরাণিক যুগের গ্রীক-সভ্যতার নিখুঁত ছবি দিয়ে ঐতিহাসিকদের আদরের বস্তু হয়েছে।
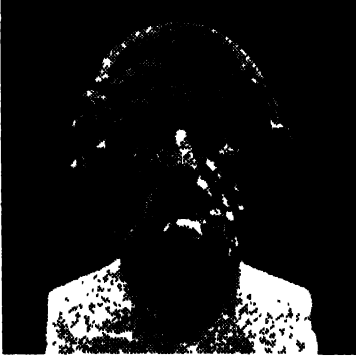
ইলিয়ড ও ওডিসি প্রণেতা হোমার

গ্রীস যদিও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল এবং সেখানে রাজনৈতিক একতা ছিল না, তথাপি গ্রীকেরা সংস্কৃতিগত একতাসূত্রে আবদ্ধ ছিল। এক রক্ত, এক ভাষা ও সাহিত্য, এক সামাজিক আচার-ব্যবহার, এক ধর্ম ও ধর্মসংঘ ও একত্র হয়ে খেলাধুলা, বিশেষ করে অলিম্পিক-ক্রীড়া—সবে মিলে গ্রীসের জাতীয় সংস্কৃতিকে একসূত্রে গেঁথে তুলেছিল। তবে এই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য রাষ্ট্রীয় ঐক্যবোধ জাগ্রত করতে পারে নি।

ঐতিহাসিক থিউকিডাইডিজ

নানা কারণে গ্রীকেরা উপনিবেশ বিস্তারে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। দুর্দমনীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, দুঃসাহসিকতা ও অর্থনৈতিক দুরবস্থা উপনিবেশ-প্রসারের অন্যতম কারণ। সমুদ্র-সাহচর্যও গ্রীক-প্রাণে উপনিবেশের প্রেরণা দিয়েছে। গ্রীকেরা সমুদ্র পার হয়ে বাণিজ্য করতে গিয়ে, নানা সুবিধার লোভে বিদেশেই বসবাস করেছে। এই উপনিবেশ-স্থাপনও গ্রীকজাতির মধ্যে এক ঐক্যবোধ জাগ্রত করেছিল।
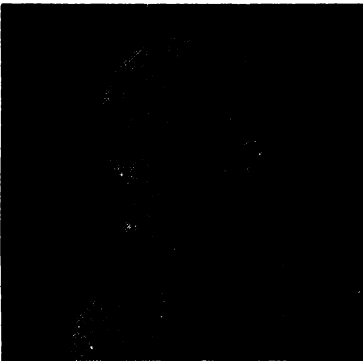
ইতিহাসের জনক হেরডোটাস

প্রাচীন গ্রীসের প্রধান প্রধান নগর-রাষ্ট্রের মধ্যে উত্তর-পূর্ব গ্রীসে এথেন্স, দক্ষিণ গ্রীসে স্পার্টা, করিন্থ, উত্তর গ্রীসে থিবস ও তারও বহু উত্তরে মাসিডন নগরের ইতিহাসই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রবাদ আছে যে, **লাইকারগাস** নামক একজন প্রসিদ্ধ আইন-প্রণেতা স্পার্টায় কতকগুলি নিয়মনিষ্ঠ সংস্কারের প্রবর্তন করেন। এই সংস্কারগুলিই স্পার্টার অভ্যুদয়ের কারণ।

স্পার্টান শিশু চিকিৎসকের শিশুদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষা

স্পার্টার বৈশিষ্ট্য ছিল কঠোর নিয়মানুবর্তিতা। প্রত্যেক স্পার্টান রাষ্ট্র কর্তৃক জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত নানা নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হত। রাষ্ট্রের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল অপরাজেয় সৈন্য সৃষ্টি করা। স্পার্টা ছিল একটি সৈন্য-শিবির।

সুদক্ষ সৈনিক প্রস্তুত করাই ছিল তার একমাত্র উদ্দেশ্য। নাগরিকদের শিক্ষা,

স্পার্টানদের অলিম্পিক-ক্রীড়া

বিবাহ এবং দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি সব-কিছুই কঠোর নিয়মে নিয়ন্ত্রিত

স্পার্টার একটি খোলা ভোজনশালা

ছিল। বিলাসিতা ছিল স্পার্টানদের পক্ষে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তাদের সরলতা প্রবাদে পরিণত হয়। দেশে যৎসামান্য লেখাপড়া ছাড়া অন্য শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। মেয়েদেরও বীর-জননী করে গড়ে তুলতে শরীর-চর্চা শিক্ষা দেওয়া হত। এই সামরিক শক্তির জোরে স্পার্টানগণ ক্রমে **পেলোপোনিসাস** বা দক্ষিণ গ্রীসে প্রধানতম শক্তি হয়ে উঠল।
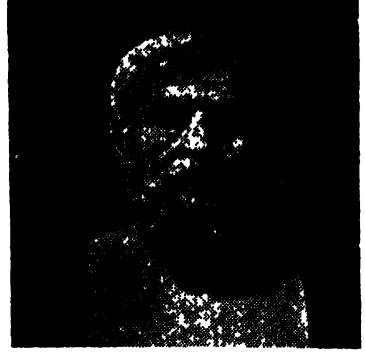
সোলন

গ্রীসের অধিকাংশ নগরীর মত **এথেন্সেও** পূর্বে রাজতন্ত্র ছিল এবং পরে সেখানে ক্রমান্বয়ে অভিজাত-তন্ত্র ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এথেন্সের সংস্কারকদের মধ্যে **সোলনের** নামই প্রথম উল্লেখযোগ্য। শাসনতন্ত্রের সংস্কার করে **সোলন** ইওরোপের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞদের মধ্যে অন্যতম বলে খ্যাতি লাভ করেছেন। তিনিই এথেন্সের গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেন। এরপর আর একজন আইন-প্রণেতা, **ক্লাইস্থিনিস** সোলনের সংস্কারের

রাজনীতিবিদ সোলনের শাসনতন্ত্রের সংস্কার

ভিত্তির উপর গণতন্ত্রের সৌধ নির্মাণ করেন। এই গণতন্ত্রের চরম বিকাশ হয় পরে **পেরিক্লিজের** (খ্রীঃ পূঃ ৪৯৫—৪২৯) সংস্কারে।

গ্রীকেরা যখন নগর-রাষ্ট্রে স্বাধীনতা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছিল, প্রাচ্যে তখন পারসিকেরা সম্রাট্ **কাইরাসের** নেতৃত্বে, পূর্বে **মিডিয়া** রাজ্য উচ্ছেদ

করে এবং পরে এশিয়া-মাইনরের উপকূলস্থিত **লিডিয়া** রাজ্য গ্রাস করে। পারসিক সম্রাট্ কাইরাস লিডিয়া-রাজ ক্রোসাসকে পরাস্ত করে লিডিয়া তো পেলেনই, তা ছাড়া লিডিয়ার অধীন এশিয়া-মাইনরের গ্রীক-রাষ্ট্রগুলিও দখলে আনলেন।

পেরিক্লিজ

পারসিক নৃপতিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন ডেরিয়াস বা **দারায়ুস**। তাঁর পিতার নাম ছিল হিস্টাস্পিস্। তিনি ৫২২ থেকে ৪৮৫ খ্রীঃ পূর্বাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ৫১৩ খ্রীঃ পূর্বাব্দে তিনি থ্রেস ও মাসিডোনিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান চালান এবং দুইটি স্থানই দখল করে পারস্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

তাঁর সময় এশিয়া-মাইনরের গ্রীক উপনিবেশবাসীদের মধ্যে এক ব্যাপক বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়। একে বলে **আইওনিয়ান বিদ্রোহ**।

পেরিক্লিজের জ্ঞানী ও গুণী সমাজ

এথেন্স প্রভৃতি গ্রীক নগরীগুলি এই বিদ্রোহে যোগদান করায়, রাজা দারায়ুস ভীষণ চটে যান। তাঁর রাগের বিশেষ কারণ, এথেন্সবাসীরা পারসিক সাম্রাজ্যের
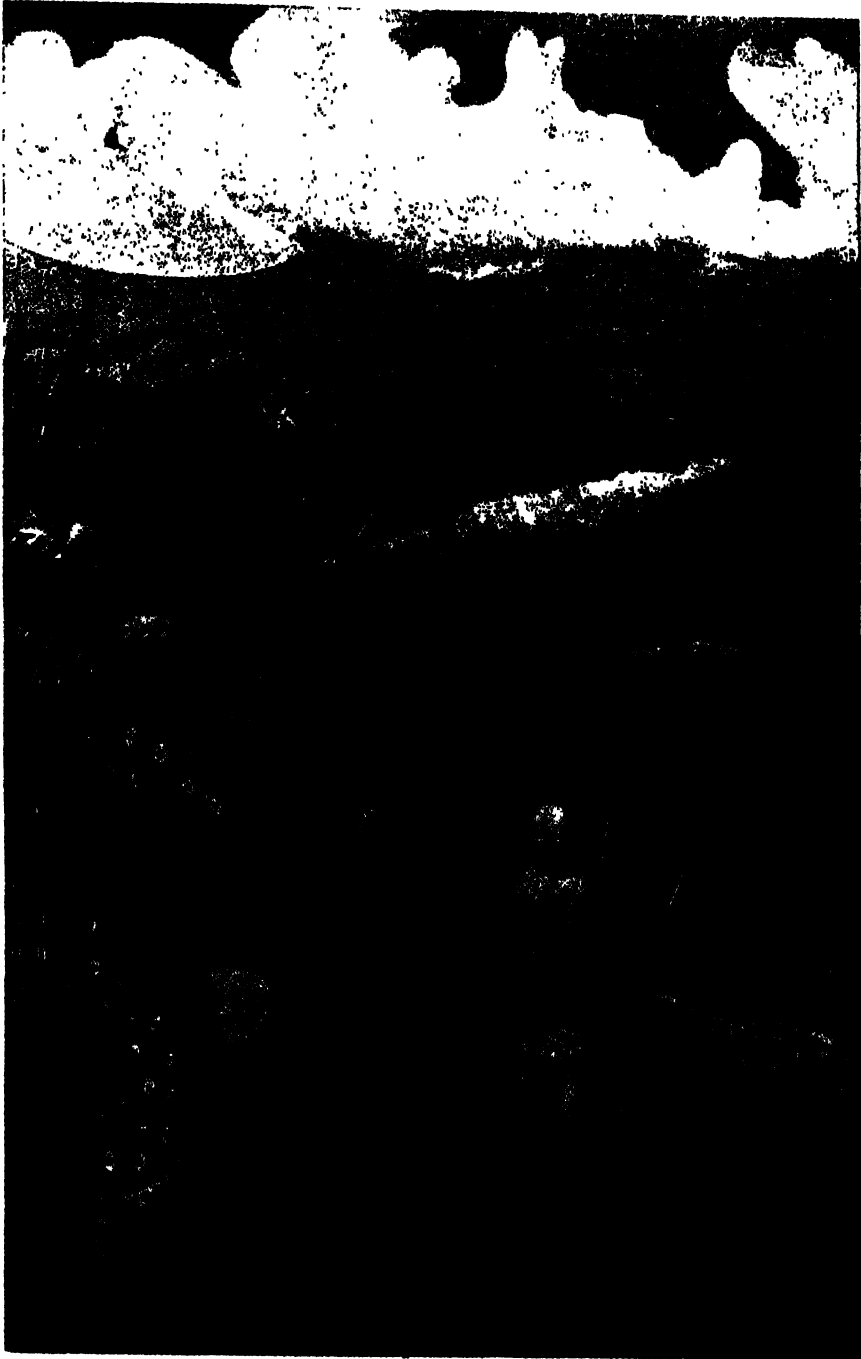
এথেন্সের কাছে এক পাহাড়ের উপরে মার্বেল পাথরের সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজা জেরাক্সেস কর্তৃক সালামিস নৌ যুদ্ধ পরিদর্শন

এশিয়া-মাইনর অঞ্চলের রাজধানী সারদিস নগরী পুড়িয়ে দিয়েছিল। দারায়ুস এথেন্সকে শাস্তি দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন এবং এ-থেকেই ম্যারাথন-যুদ্ধের উৎপত্তি হয়।

এথেন্সবাসিগণ কর্তৃক সারদিস নগরী অগ্নিদগ্ধ

ম্যারাথনের যুদ্ধ

৪৯২ খ্রীঃ পূর্বাব্দে গ্রীসের বিরুদ্ধে দারায়ুসের এক সামরিক অভিযান ব্যর্থ হয়। তারপর ডেটিস ও আর্টাফার্নেস নামে দুজন নূতন সেনাপতির অধীনে এক বিরাট সৈন্যদল পাঠানো হয়। উদ্দেশ্য এথেন্স জয় করা। ৪৯০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে

ম্যারাথন নামক স্থানে ঘোরতর যুদ্ধ হল। এবারও দারায়ুসের সৈন্যদল পরাজিত হল। এই যুদ্ধকে বলে **ম্যারাথনের যুদ্ধ**।

দারায়ুস ৬০০ জাহাজে করে প্রায় ৪০ হাজার সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন। গ্রীস হচ্ছে পাহাড়ে দেশ, তার তিন দিকে সমুদ্র। এথেন্সের ২২ মাইল উত্তর-পূর্বে **ম্যারাথন** নামে একটা জায়গা আছে। দারায়ুসের সৈন্যেরা এসে সেখানে ছাউনি পাতল।

এথেন্সের সৈন্য-সংখ্যা ছিল মাত্র ৯০০০; এই সৈন্যদলই **মিলটিয়াডিস** নামক সুকৌশলী নেতার অধীনে, দারায়ুসের ৪০ হাজার সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে অগ্রসর হল। পথে প্লেটিয়া শহর থেকেও এক হাজার সৈন্য এসে এদের সঙ্গে যোগ দিল। এই দশ হাজার সৈন্য ম্যারাথনের রণক্ষেত্রে অমিত-বিক্রমে পারসিক সৈন্যদের আক্রমণ করল।

ম্যারাথনের যুদ্ধ

গ্রীকরা যুদ্ধ করল তাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে, পারসিকদের অধীনতা-পাশ থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্যে; তারা জীবন-মরণ তুচ্ছ জ্ঞান করে যুদ্ধ করতে লাগল। গ্রীকদের প্রচণ্ড আক্রমণ পারসিক সৈন্যেরা সহ্য করতে পারল না। তারা পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়ে, কোনরকমে গিয়ে জাহাজে ওঠবার জন্যে সমুদ্রের তীর-অভিমুখে ছুটতে লাগল। গ্রীকরাও তাদের তাড়া করে বহু পারসিক সৈন্যকে হত্যা করল। যারা বাঁচল, তারা জাহাজে চড়ে পালিয়ে গেল।

থার্মোপলির যুদ্ধ

ম্যারাথনের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রাজা দারায়ুস ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন ও প্রতিজ্ঞা করলেন, তিনি নিজে যুদ্ধে গিয়ে এথেন্সের উপরে এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবেন। তিনি এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন কিন্তু মিশরে বিদ্রোহ বাধল। তার ফলে তাঁর পরিকল্পনা ব্যর্থ হল। আর তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা সম্ভব হল না। ৪৮৫ খ্রীঃ পূর্বাব্দে তিনি মারা গেলেন।

থার্মোপলির যুদ্ধ

দারায়ুসের ছেলে **জেরাক্সেস** সম্রাট্ হলেন (জেরাক্সেসের জন্ম ৫১৯ খ্রীঃ পূর্বাব্দে এবং মৃত্যু ৪৬৫ খ্রীঃ পূর্বাব্দে। তিনি ৪৮৫ থেকে ৪৬৫ খ্রীঃ পূর্বাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন)।

পিতার অপূর্ণ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে তিনি নিজে রওনা হলেন এথেন্স আক্রমণ করতে। হিরোডোটাসের বিবরণ পড়ে জানা যায়, তিনি নানাজাতিসমন্বিত এক বিরাট সৈন্যবাহিনী (সংখ্যায় প্রায় আড়াই লক্ষ) নিয়ে, থ্রেস ও মাসিডোনিয়ার ভিতর দিয়ে গ্রীসের উত্তরে **থার্মোপলি** গিরিবর্ত্মের সামনে এসে পৌঁছালেন।

সাত হাজার গ্রীক সৈন্য এই থার্মোপলির গিরিপথে জেরাক্সেসের বিপুল সৈন্যের জন্যে অপেক্ষা করছিল। এই সংবাদ পেয়ে, জেরাক্সেস অল্প কয়েকজন সৈন্য

পাঠিয়ে দিলেন এই সাত হাজার গ্রীক সৈন্যকে হারিয়ে দেওয়ার জন্যে। কিন্তু এরা এসে উলটে গ্রীকদের কাছে পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেল। জেরাক্সেস আবার একদল সৈন্য পাঠালেন। গ্রীকরা তাদেরও তাড়িয়ে দিল। তারপরে জেরাক্সেস পাঠালেন তাঁর নিজস্ব বাছাই-করা দলটিকে, কিন্তু তারাও মার খেয়ে পালিয়ে এল।

জেরাক্সেস ব্যাপার দেখে ভয়ানক ভয় পেলেন। ঐটুকু ছোট গিরিপথে বেশী সৈন্য নিয়ে ঢোকাও যায় না, আবার অল্প সৈন্য পাঠালেও গ্রীকরা তাদের হারিয়ে দেয়। জেরাক্সেস ৯০০ জাহাজ নিয়ে এসেছিলেন। গ্রীকদের ছিল মাত্র ৩০০ জাহাজ। জেরাক্সেস এই সব জাহাজে করে অন্য পথে এথেন্সের দিকে একদল সৈন্য পাঠাবার চেষ্টা করলেন। গ্রীকরা এতেও তাঁকে বাধা দিল এবং রাত্রিকালে এক ভীষণ ঝড়ে তাঁর অনেক জাহাজ ডুবে গেল। এমনি সময় এক বিশ্বাসঘাতক গ্রীক এসে জেরাক্সেসকে সংবাদ দিল যে, সে থার্মোপলি ছাড়া অন্য পথ দিয়ে পারসিক সৈন্যদের নিয়ে যেতে পারবে। জেরাক্সেস খুব খুশী হয়ে তখনই তার সঙ্গে একদল সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন। তারা ঝোপ-জঙ্গল পার হয়ে পিছন দিক্ থেকে ঘুরে এসে থার্মোপলিতে গ্রীকদের আক্রমণ করল।

পিছন থেকে এইভাবে আক্রান্ত হয়ে গ্রীকরা বুঝল আর উপায় নেই। গ্রীকনেতা স্পার্টার বীর নৃপতি **লিওনিডাস,** অধিকাংশ সৈন্য গ্রীস রক্ষাকল্পে পশ্চাতে পাঠিয়ে দিলেন। নিজে মাত্র তিনশত স্পার্টান সৈন্য নিয়ে, তিনি অপূর্ব বীরত্ব দেখিয়ে, অসংখ্য পারসিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। পারসিকদের প্রভূত সৈন্যক্ষয় হল। মুষ্টিমেয় স্পার্টান সৈনিক নিজেদের নিশ্চিত বিনাশ জেনেও নির্ভীকভাবে যুদ্ধ করে যেতে লাগল। লিওনিডাসের নেতৃত্বে অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করে প্রতিটি স্পার্টান সৈন্য নিহত হল। থার্মোপলির যুদ্ধে পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে গ্রীক জাহাজগুলো ছুটে গেল এথেন্সে। সেখান থেকে সমস্ত স্ত্রীলোক, শিশু ও বৃদ্ধদের তারা সরিয়ে দিল আশে-পাশের দ্বীপগুলোতে। থার্মোপলির যুদ্ধে লিওনিডাসের দুঃসাহসিক রণবীর্য ইতিহাসে অবিস্মরণীয় কাহিনী হয়ে আছে।

জেরাক্সেস তাঁর বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে এথেন্সে এসে পৌঁছালেন; দেখলেন, সমস্ত শহর অন্ধকার—একটি জনপ্রাণীও সেখানে নেই। শুধু শহরের মাঝখানে ছোট একটি পাহাড়ের উপর একটি মন্দির ছিল। সেখানে কয়েকজন গ্রীক সমবেত হয়ে জেরাক্সেসকে বাধা দিল। পারসিক সৈন্যরা এদের আক্রমণ করে সবাইকে নিষ্ঠুরভাবে নিহত করল। অত্যাচারী জেরাক্সেস এথেন্স শহর ধ্বংস করে ফেলবার হুকুম দিলেন।

এদিকে বেশির ভাগ গ্রীক যে দ্বীপটিতে চলে গিয়েছিল, তার নাম **সালামিস**। জেরাক্সেস এই দ্বীপের গ্রীকদের আক্রমণ করবার জন্যে তাঁর সমস্ত জাহাজ পাঠিয়ে দিলেন। গ্রীক জাহাজের সঙ্গে পারসিক জাহাজের ভীষণ নৌ-যুদ্ধ হল (৪৮০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ)। এই যুদ্ধে জয়ী হল গ্রীকেরা। এথেন্সের

সালামিসের জলযুদ্ধ

কাছে এক পাহাড়ের উপর মার্বেল-পাথরের সিংহাসনে বসে রাজা জেরাক্সেস স্বচক্ষে নিজের সাধের নৌ-সৈন্যদের পরাজয় দেখেছিলেন।

সালামিস-যুদ্ধের প্রধান কৃতিত্ব এথেন্সের জননায়ক **থিমিস্টোক্লিজের** (৫১৪—৪৪৯ খ্রীঃ পূর্বাব্দ) প্রাপ্য। তাঁর চাতুর্যের ফলেই, পারসিকদের বাধ্য হয়ে, সংকীর্ণ সালামিস-প্রণালীতে নৌ-যুদ্ধ করতে হয়। এইখানে যুদ্ধ করতে গিয়ে পারসিকদের মস্তবড় বিপর্যয় হয়েছিল। থিমিস্টোক্লিজ ছিলেন একজন নামজাদা রাজনীতিজ্ঞ। তাঁরই প্রতিভা ও কৌশলের বলে, এথেন্সের ভবিষ্যৎ নৌ-সাম্রাজ্যের বনিয়াদ স্থাপিত হয়।

জেরাক্সেস সালামিসের যুদ্ধে পারসিক সৈন্যদের পরাজয় দেখে, তাড়াতাড়ি সসৈন্যে এথেন্স ছেড়ে স্বদেশ অভিমুখে রওনা হলেন। তিনি আর কখনও গ্রীসে যেতে পারেন নি।

পারসিক সম্রাট্গণ বারবার চেষ্টা করেও ক্ষুদ্র গ্রীক রাষ্ট্রগুলির কোন ক্ষতি করতে পারলেন না, বরং উলটে তাঁরাই বাধা পেয়ে, আর গ্রীস আক্রমণের বা জয়ের আশা একেবারেই ছেড়ে দিলেন।

এর পর থেকে এথেন্সের সাম্রাজ্যের যুগ আরম্ভ হয়। "ডেলস সংঘ" নামে এক গ্রীক রাষ্ট্রসংঘের সুযোগ নিয়ে এথেন্স, প্রসিদ্ধ জননায়ক **পেরিক্লিজের** (৫৯০—৪২৯ খ্রীঃ পূর্বাব্দ) পরিচালনায়, এক বিস্তৃত নৌ-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে। এথেন্সের প্রতিপত্তি ইজিয়ান-সাগরের দ্বীপগুলি ও তার আশে-পাশের অঞ্চলগুলির উপর ছড়িয়ে পড়ে।
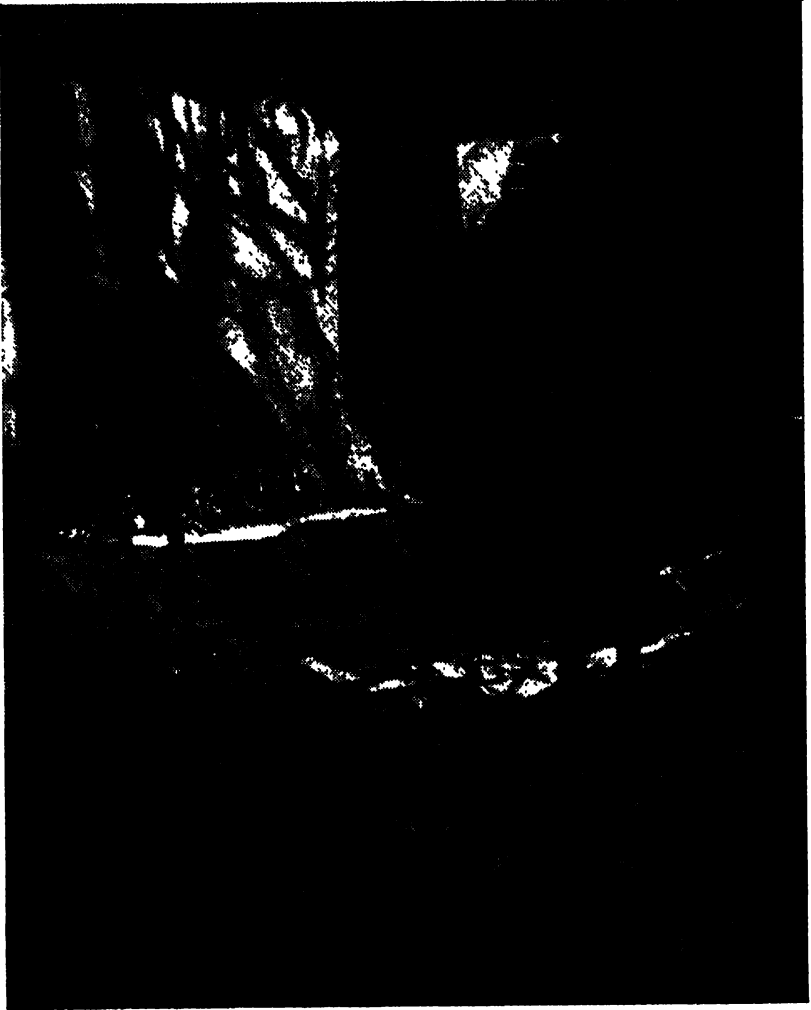
সিসিলিতে এথেনিয়ানদের দুর্দশা

এ সময়ে এথেন্স শক্তি, বাণিজ্য, শিল্প, সাহিত্য সমস্ত বিষয়ে গৌরবের উচ্চশিখরে ওঠে। পেরিক্লিজ গণতন্ত্রের পূর্ণবিকাশ করেন ও এথেন্স নগরীকে সুন্দর সুন্দর সৌধমালায় সুসজ্জিত করেন। যাবতীয় জ্ঞানী, গুণী তাঁর নিকট

উৎসাহ ও প্রেরণা পান। এই যুগকে **এথেন্সের স্বর্ণযুগ** বলা হয়। পেরিক্লিজের সাম্রাজ্যবাদ খুব উন্নত ধরনের ছিল। পেরিক্লিজের যুগের সঙ্গে ভারত-ইতিহাসের গুপ্তযুগের তুলনা করা হয়ে থাকে।

গ্রীকেরা ছিল খুব স্বাধীনতাপ্রিয়। এথেন্সের সাম্রাজ্য-বিস্তারে ও তার আক্রমণাত্মক নীতিতে অন্যান্য গ্রীকেরা, বিশেষ করে স্পার্টার অধিবাসীরা অত্যন্ত চটে গেল। তারা অনেকে মিলে এথেন্সের শক্তি খর্ব করবার জন্যে যুদ্ধ আরম্ভ করল। এই যুদ্ধ **পেলোপোনিসাসের যুদ্ধ** নামে বিখ্যাত এবং ইহা দীর্ঘকাল ধরে চলে। এই যুদ্ধে স্থলপথে স্পার্টা বিশেষ নৈপুণ্য দেখায় এবং এথেন্স সমুদ্রপথে খুব কৃতিত্ব দেখায়। অবশেষে এথেন্সের নেতা অলকিবিয়াডিসের উৎসাহে এক বিশাল নৌ-অভিযান সিসিলি দ্বীপে প্রেরণ করা হয়। স্পার্টা ও সিরাকিউজ নগরীর মিলিত প্রচেষ্টায়, এথেন্সবাসীর এই বিরাট অভিযান ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এর পর থেকেই এথেন্স-সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। **সিসিলি অভিযানের ব্যর্থতা**—এথেন্সের জাতীয় জীবনে পরম দুর্দৈবরূপে দেখা দিয়েছিল।

সক্রেটিস

এথেন্সে **সক্রেটিস** (৪৬৯—৩৯৯ খ্রীঃ পূর্বাব্দ) নামে একজন মহাপণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। সক্রেটিস ছিলেন খাটো, মোটা এবং অত্যন্ত সাদাসিধা লোক। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদও ছিল অতি সাধারণ। একটা মাত্র কোট তাঁর ছিল, সেটাই তিনি শীত-গ্রীষ্ম সব সময় গায়ে দিতেন। জুতা তো তিনি পায়েই দিতেন না।

সক্রেটিস

দিনের মধ্যে বেশির ভাগ সময়ই তিনি পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন এবং যাকে সামনে পেতেন তাকেই ধরে নতুন জ্ঞানের কথা শোনাতেন। এথেন্সের বড় বড় লোকেরা তাঁকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন এবং তাঁর কথা শুনতেন। সক্রেটিস ইচ্ছে করেই সেই পুরানো কোটটি পরে এই সব ভোজ-সভায় যেতেন। তিনি
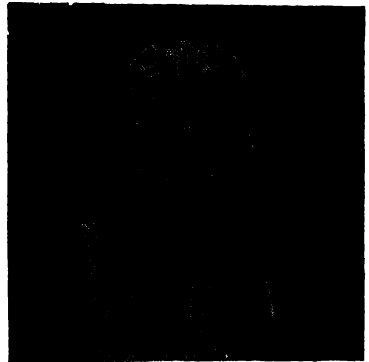
বলতেন, মানুষ বড় হয় জ্ঞানে, পোশাকের পারিপাট্য তার সত্যিকারের পরিচয় নয়।

সক্রেটিসকে একদল লোক সম্মান করত বটে, কিন্তু আর একদল তাঁর উপর ক্রমেই বিরূপ হয়ে উঠতে লাগল। সক্রেটিসের কথা তারা মোটেই বুঝতে পারত না। তাদের ধারণা হল, তিনি দেশের যুবকদের মাথা নষ্ট করছেন, তাদের মাথায় নানারকম রাষ্ট্র ও সমাজ-বিরুদ্ধ স্বাধীন নীতি ও ভুল ধারণা সব ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। তারা ঠিক করল, সক্রেটিসকে শাস্তি দিতে হবে এবং বিষপানে মৃত্যুই হচ্ছে তাঁর উপযুক্ত শাস্তি। সক্রেটিসকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হল। এক মাস কারাগারে বন্দী থাকবার পর

সক্রেটিসের বিষপান

তাঁকে বিষ পাঠিয়ে দেওয়া হল। সক্রেটিস হাসিমুখে সেই বিষ পান করে দেহত্যাগ করলেন।

সক্রেটিসের শিষ্য **প্লেটো** (৪২৭—৩৪৭ খ্রীঃ পূর্বাব্দ) এবং প্লেটোর শিষ্য **এরিস্টটল** (৩৮৪—৩২২ খ্রীঃ পূর্বাব্দ) আজও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলে সম্মান পেয়ে থাকেন।

এথেন্সের পতনের পর, কিছুদিনের জন্যে স্পার্টা, গ্রীসের শত্রু ইরানের সাহায্যে, নিজের প্রাধান্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল; কিন্তু তার

নিজের সংকীর্ণতা, প্রাদেশিকতা ও সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশগুলির প্রতি অত্যাচারের ফলে, স্পার্টা বেশীদিন তার প্রতিপত্তি বজায় রাখতে পারল না।

এর পর উত্তর গ্রীসে **থিবস** নগরী অল্পকালের জন্যে খুব বেশী শক্তিশালী হয়ে ওঠে। থিবসের নেতা **ইপামিনণ্ডাস** গ্রীসের একজন শ্রেষ্ঠ কৌশলী যোদ্ধা। তাঁর সামরিক প্রতিভার জোরে থিবসের সৈন্যদল দেশের পর দেশ জয় করতে লাগল। অন্যান্য গ্রীক রাষ্ট্র তো দূরের কথা, ইতিহাস-বিখ্যাত

থিবস-এ মাসিডনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ

স্পার্টার সেনাবাহিনীও যুদ্ধে ইপামিনণ্ডাসের সম্মুখীন হতে পারল না। এই সময় থিবস-সাম্রাজ্য গ্রীসে সবচেয়ে বেশী বিস্তৃত হয়। মহাবীর আলেকজাণ্ডারের পিতা মাসিডনের শক্তিশালী রাজা **ফিলিপ** (৩৮২—৩৩৬ খ্রীঃ পূর্বাব্দ) ইপামিনণ্ডাসের কাছে তাঁর রণকৌশলের শিক্ষা নিয়েছিলেন। এই রণ-কৌশলই

পরে আলেকজাণ্ডার অবলম্বন করেছিলেন। ইপামিনণ্ডাসের মৃত্যুর পর শীঘ্রই থিবস-সাম্রাজ্য ভেঙে গেল।

ইপামিনণ্ডাসের মৃত্যু

দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার

আগেই বলেছি, এথেন্স, স্পার্টা প্রভৃতির মত মাসিডন নামে একটি রাজ্য ছিল গ্রীসের উত্তর দিকে। দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের পিতা ফিলিপ ছিলেন এই মাসিডনের রাজা। রাজা ফিলিপই সর্বপ্রথম ছোট ছোট রাজ্যগুলিকে জয় করে, সমগ্র গ্রীসকে একটি মিলিত বড় রাজ্যে পরিণত করেন। ফিলিপের মৃত্যুর পর **আলেকজাণ্ডার** (৩৫৬—৩২৩ খ্রীঃ পূর্বাব্দ) গ্রীসের রাজা হন। তাঁর বয়স তখন মাত্র কুড়ি বৎসর। আলেকজাণ্ডার খুব ভাল করে যুদ্ধবিদ্যা শিখেছিলেন, তা ছাড়া অন্যান্য অনেক বিষয়েও তিনি জ্ঞান অর্জন করেছিলেন।

আলেকজাণ্ডার
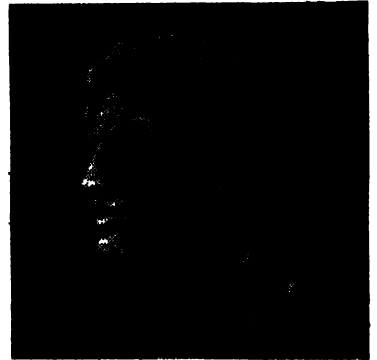
আলেকজাণ্ডার একবার এক দুষ্ট ঘোড়াকে শায়েস্তা করে সমবেত সকলকে

স্তম্ভিত করে দেন। রাজা ফিলিপ পুত্রের শিক্ষার ভার দিয়েছিলেন বিখ্যাত মনীষী এরিস্টটলের হাতে।

আলেকজাণ্ডারের ইচ্ছা ছিল সমগ্র পৃথিবী জয় করে গ্রীক-সভ্যতা তিনি দেশ-বিদেশের লোকদের শেখাবেন। এই উদ্দেশ্যে পরে তিনি এশিয়া ও

আলেকজাণ্ডার কর্তৃক দুষ্ট ঘোড়া শায়েস্তা

ইওরোপের মধ্যে একটা ভাবের আদান-প্রদান এবং মিলনের চেষ্টা করেছিলেন। ইরানের রাজা গ্রীস আক্রমণ করে তাদের অনেক ক্ষতি করেছিলেন; বিশেষতঃ এথেন্সের সুন্দর মন্দিরটি তারা পুড়িয়ে দেওয়ায় ইরানের উপর আলেকজাণ্ডারের ভীষণ রাগ ছিল। দিগ্বিজয় করতে বেরিয়ে তাই তিনি সবার আগে আক্রমণ করলেন ইরানকে।

প্রথম যুদ্ধেই আলেকজাণ্ডার জয়লাভ করলেন। পারসিক সৈন্যেরা

গ্রীকদের প্রচণ্ড আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করল। গ্রীকরা ইরানের তখনকার রাজধানী সুসা অভিমুখে অগ্রসর হতে লাগল।

বর্তমান ইজরেলের উত্তর দিকে একটা জায়গায় আবার পারসিকরা তাদের বাধা দিল। **তৃতীয় দারায়ুস** তখন ইরানের রাজা। তিনি স্বয়ং এই যুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করলেন। এই যুদ্ধেও পারসিকরা পরাজিত হল। সমস্ত সৈন্য ভয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করল। রাজা নিজেও ঘোড়ায় চড়ে পালিয়ে গেলেন। ছুটতে ছুটতে সৈন্যেরা গিয়ে থামল একেবারে বাবিলনে।

টায়ার নামক একটি শহরে পারসিকদের একটা বড় ঘাঁটি ছিল। এবার আলেকজাণ্ডার সেই শহরটি আক্রমণ করলেন। এই যুদ্ধ যখন চলছে সেই সময় রাজা তৃতীয় দারায়ুস, আলেকজাণ্ডারের কাছে প্রস্তাব করে পাঠালেন যে, তিনি যদি আর যুদ্ধ না করেন, তা হলে দারায়ুস ইরান-সাম্রাজ্যের অর্ধেক তাঁকে দিয়ে দেবেন। আলেকজাণ্ডার তাঁকে বলে পাঠালেন, "আমি ইরানের সবটাই যখন জয় করবার ক্ষমতা রাখি, তখন অর্ধেক নিয়ে সন্তুষ্ট হব কেন?"

টায়ারের যুদ্ধ জয়ের পর আলেকজাণ্ডার এলেন **জেরুজালেমে**। সেখানকার লোকেরা তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করল। তারপর তিনি গেলেন **মিশরে**। মিশর তখন ইরানের অধীন। পারসিকদের অত্যাচারে মিশরীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আলেকজাণ্ডারকে তারাও অভ্যর্থনা জানাল এবং তাঁকে মিশরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করে নিল।

তারপর আলেকজাণ্ডার রওনা হলেন **বাবিলনের** দিকে। রাজা তৃতীয় দারায়ুস তখনও বাবিলনেই রয়েছেন। তিনি আলেকজাণ্ডারের আগমন-বার্তা শুনে আবার যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন। টাইগ্রিস নদীর তীরে আবার ভীষণ যুদ্ধ হল। এবারও পারসিকরা হেরে গেল। **পার্সেপোলিস** তখন ইরানের একটি প্রসিদ্ধ শহর। এই শহরে রাজা প্রথম দারায়ুস ইন্দ্রপুরী-তুল্য একটি চমৎকার প্রাসাদ তৈরি করিয়েছিলেন। পার্সেপোলিসে পৌঁছে আলেকজাণ্ডার দারায়ুসের এই প্রাসাদে, নিজের হাতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে এথেন্সের মন্দির পুড়িয়ে দেবার শোধ নিলেন।

ইরান-জয়ের পর, আলেকজাণ্ডার **ভারতবর্ষে** এসে পৌঁছালেন। **পুরু** নামক একজন রাজা পঞ্চনদীর তীরে তাঁকে বাধা দিলেন। দুইশত হাতি নিয়ে পুরু যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু জয়লাভ করতে তিনি পারলেন না। পুরু বন্দী হলেন। বন্দী অবস্থায় তাঁকে গ্রীক সৈন্যেরা যখন আলেকজাণ্ডারের সামনে উপস্থিত করলে, আলেকজাণ্ডার তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,

"বন্দী, তুমি কিরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর?" পুরু নির্ভীক হৃদয়ে উত্তর দিলেন, "রাজার মত।" আলেকজাণ্ডার তাঁর এই সাহসে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে মুক্তি দিলেন এবং রাজ্যও ফিরিয়ে দিলেন। [অনেক ঐতিহাসিকের ধারণা, পুরুর কাছেই আলেকজাণ্ডার পরাজিত হন।]

এই যুদ্ধের পরে আলেকজাণ্ডার আরও অগ্রসর হতে চাইলেন; কিন্তু এবার তাঁর সৈন্যেরা আপত্তি জানাল। আলেকজাণ্ডার দেশে ফিরে যেতে রাজী হলেন; কিন্তু যে পথে এসেছিলেন সে পথে না গিয়ে, তিনি এক নতুন পথে রওনা হলেন মরুভূমির উপর দিয়ে। এই মরুভূমি অতিক্রম করবার সময় তাঁর অনেক সৈন্য মারা যায়। আলেকজাণ্ডার অবশেষে এসে পৌঁছালেন বাবিলনে। এখানে হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। বহু চিকিৎসাতেও কোন ফল হল না। মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে আলেকজাণ্ডার দেহত্যাগ করলেন।

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর বিজিত সাম্রাজ্য তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে গেল। মিশর, বাবিলন, এশিয়া-মাইনর, জেরুজালেম প্রভৃতি অঞ্চলগুলি আলাদা আলাদা ভাবে স্বাধীন হল। মাসিডন রাজ্যের প্রভাব অনেকটা বজায় রইল, কিন্তু গ্রীসের অপরাপর রাষ্ট্রগুলি ক্ষুদ্র ও শক্তিহীন হয়ে পড়ল।

তুরস্কের অধীনতা হতে মুক্তি

এর পর গ্রীসের পতনের যুগ আরম্ভ হয়। রোমের অভ্যুত্থানের সময় প্রথম গ্রীস বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদের জন্যে মাসিডনের অধীনে যায়। রোমানরা মাসিডনের ক্ষমতা খর্ব করে গ্রীক রাষ্ট্রগুলিকে স্বাধীনতা দিয়ে দেয়। গ্রীকদের তখন আর স্বাধীন জাতি হিসাবে বাস করবার যোগ্যতা ছিল না। রোমানরা অগ্রগতির পথে গ্রীসকেও তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। গ্রীকেরা পরাজিত হবার পরেও নিজেদের ভাবধারা ও সংস্কৃতি দ্বারা রোমানদের প্রভাবিত করে। পূর্ব-রোমক বা বাইজানটাইন সাম্রাজ্যে গ্রীক ধর্ম, রীতিনীতি ও সংস্কৃতি খুব বেশী ছড়িয়েছিল। অটোমান তুর্কীরা ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কনস্টান্টিনোপল জয় করবার পর শীঘ্রই গ্রীস তাদের অধীনে চলে যায়।

প্রায় চারশ' বছর তুর্কী-সাম্রাজ্যের অধীনে থেকেও গ্রীকরা কিন্তু তাদের নিজস্ব ভাষা, শিক্ষা-দীক্ষা এবং সভ্যতা কিছুই ভোলে নি। দেশকে স্বাধীন করবার ইচ্ছা গ্রীকদের বরাবরই ছিল।

ফরাসী-বিপ্লবের পর গ্রীকরাও তাদের দেশে বিপ্লব এনে তুর্কীদের তাড়িয়ে দেবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল। তুরস্ক এসময়ে দুর্বল ও পতনশীল। অবশেষে

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীস স্বাধীনতা ঘোষণা করল। এই বিপ্লবের নেতার নাম ছিল **আলেকজাণ্ডার হিপসিলানটি**। তাঁর পিতা ছিলেন গ্রীসে তুর্কীদের অধীন শাসনকর্তা।

এই বিপ্লব ঘোষণার পর সাত বছর ধরে তুর্কীদের সঙ্গে গ্রীকদের যুদ্ধ চলে। তুর্কীদের পক্ষে মিশর এসে যোগ দিয়েছিল। আর গ্রীকদের সঙ্গে সহানুভূতি দেখিয়েছিল রাশিয়া, ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স। সাত বৎসর যুদ্ধের পর, ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে, গ্রীসের স্বাধীনতা সবাই স্বীকার করে নিল। ইংলণ্ডের মহারানী ভিক্টোরিয়ার পরামর্শে গ্রীকরা ডেনমার্কের রাজকুমারকে এনে গ্রীসের সিংহাসনে বসাল। তাঁর নাম হল রাজা **প্রথম জর্জ**।

বিশ্বযুদ্ধের পর

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে গ্রীস মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধ করেছিল। এর দুবছর আগে তুরস্কের সঙ্গে যুদ্ধ করে গ্রীস সালোনিকা জয় করে নিয়েছিল। বিশ্বযুদ্ধের পর, গ্রীস একেবারে তুরস্কের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলের কাছে পর্যন্ত থ্রেস নামক প্রদেশের প্রায় সবটা পেয়ে গেল। এসিয়া-মাইনরের স্মার্না নামক স্থান এবং ইজিয়ান সাগরের কয়েকটি দ্বীপও সে পেল ; কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার মাত্র তিন বৎসর পর, গ্রীসের সঙ্গে তুরস্কের আবার একটা ভয়ানক যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে থ্রেসের পূর্বাংশ এবং স্মার্না গ্রীসের হাতছাড়া হয়ে যায়।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীসে প্রজাতন্ত্র প্রবর্তিত হয়। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় রাজতন্ত্র আরম্ভ হয়। রাজা হন **দ্বিতীয় জর্জ**।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে গ্রীস অনেকদিন নিরপেক্ষ ছিল। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইতালি তাকে আক্রমণ করে বসে। গ্রীকরা ইতালিয়ান সৈন্যদের উলটে তাড়া করে একেবারে আলবেনিয়ার মাঝামাঝি পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। এমনি সময় জার্মেনী এসে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল জার্মান সৈন্য যুগপৎ গ্রীস ও যুগোশ্লাভিয়া আক্রমণ করে। ইংরেজ সৈন্য তাদের সম্মুখীন হওয়ার জন্যে প্রস্তুতই ছিল। কিন্তু এপিরাস ও মাসিডনস্থিত গ্রীক ও ইংরেজবাহিনী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল।

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গ্রীস সম্পূর্ণভাবেই পদানত রইল জার্মেনীর। তার নগরে নগরে জার্মান সেনার ঘাঁটি বসল। রাজা ও মন্ত্রিসভা দেশ ছেড়ে পলায়ন করলেন। কাইরোতে হল মন্ত্রিসভার আশ্রয়-স্থান। সেখান থেকে তাঁরা মিত্র-শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চললেন।

গ্রীসের ভূতপূর্ব রাজা প্রথম পল

এদিকে গ্রীসের অভ্যন্তরে গেরিলা-যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগল দেশপ্রেমিকেরা। দুঃখের বিষয় বিভিন্ন গেরিলা-দলের ভিতর সৌহার্দ্য বা সমন্বয় ছিল না, কাজেই তারা জার্মানদের বিরুদ্ধে কিছুমাত্র অগ্রসর হতে পারল না। ১৯৪৪-এর শেষভাগে জার্মেনীতে হিটলারের বিপর্যয় শুরু হল, সেই কারণেই গ্রীসের জার্মান সৈন্যসমূহও দ্রুতগতি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে লাগল। এই সময়ে ইংরেজ বাহিনীও এসে সালোনিকা বন্দরে অবতরণ করল।

গ্রীসের নির্বাসিত মন্ত্রিসভা রাজধানী এথেন্সে প্রত্যাবর্তন করল। প্যাপেনড্রো তখন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু গ্রীসের বিভিন্ন সামরিক ও রাজনৈতিক দলসমূহের সহযোগিতা তিনি পেলেন না। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের পরামর্শ অনুসারে গ্রীসের রাজা গ্রীক ধর্মযাজকগণের প্রাইমেট আর্কবিশপ ড্যামাস্কিনোকে রাজপ্রতিনিধিপদে নিযুক্ত করলেন।

কিন্তু স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার পরও গ্রীসের

গ্রীসের রাজা দ্বিতীয় কনস্ট্যান্টাইন

ধলা

দীর্ঘদিন ধরেই চলল। শান্তি ও স্বস্তিতে গ্রীস নিজের কোন স্থায়ী উন্নতির ব্যবস্থা করতে পারল না।

রাজা জর্জ ১লা এপ্রিল, ১৯৪৭ খ্রীঃ মারা যান। তাঁর জায়গায় তাঁর ভ্রাতা প্রথম পল রাজা হন। তাঁর স্থলে তাঁর পুত্র দ্বিতীয় কনস্ট্যাণ্টাইন ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হয়েছেন। জর্জ পাপাদোপুলস গ্রীসের প্রধান মন্ত্রী।

গ্রীসের প্রধান মন্ত্রী জর্জ পাপাদোপুলস

গ্রীসের বর্তমান গবর্নমেণ্ট কম্যুনিস্ট-বিরোধী ও ইঙ্গ-মার্কিন মুখাপেক্ষী। আমেরিকা গ্রীক-সরকারকে প্রচুর সাহায্য করছে। ইওরোপের কম্যুনিস্ট-বিরোধী উত্তর অতলান্তিক চুক্তি-সংস্থার একজন সদস্য হচ্ছে গ্রীস।

দোদেকানিজ দ্বীপপুঞ্জ ইতালির দখলে ছিল। ৭ই মার্চ, ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীসের অধিকারে এসেছে। রোডস এখানকার রাজধানী।

ক্রীট গ্রীসের অধিকারভুক্ত সবচেয়ে বড় দ্বীপ (আয়তন ৩২৩৫ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৪,৮৩,২৫৮)। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ৩৫ হাজার নাৎসী বৈমানিক এই দ্বীপ অধিকার করে। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহা জার্মেনীর দখলে ছিল। এখন তা গ্রীসের অধীন।

গ্রীসের অধিবাসীরা বেশির ভাগ খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী। এর আয়তন ১,৩১,৯৪৪ বর্গ কিলোমিটার (৫০,৯৪২ বর্গ মাইল) ও লোকসংখ্যা ৪,৫১,০০০ (১৯৬২ খ্রীঃ)।

সাইপ্রাস

সাইপ্রাস ভূমধ্যসাগরের তৃতীয় বৃহত্তম দ্বীপ। ইহা ব্রিটিশের অধিকারে ছিল। ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই আগস্ট স্বাধীনতা লাভ করেছে। অধিবাসীদের পাঁচভাগের চারভাগ গ্রীক খ্রীস্টান, বাকি প্রায় সব তুর্কী মুসলমান। গ্রীক ও তুর্কী এখানকার সরকারী ভাষা।

এই রাষ্ট্রের সভাপতি আর্চবিশপ তৃতীয় মাকারিয়স।

এর রাজধানী নিকোসিয়া। আয়তন ৯,২৫১ বর্গ কিলোমিটার (৩৫৭২ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা ৬,১৪,০০০।

ইতালি

ইতালির প্রাচীন ইতিহাস বলতে রোম-সাম্রাজ্যের ইতিহাসই বুঝায়। বর্তমান ইতালি থেকে পুরাতন কালের রোমের ইতিহাস অনেক বেশী মূল্যবান্ ও বিখ্যাত। গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রগুলির মত রোমও গোড়ায় মাত্র একটি নগর-রাষ্ট্র ছিল। কিন্তু রোম তার নিজের শক্তি ও শৌর্য-বীর্যের বলে ক্রমে, প্রথমে সমস্ত ইতালি দেশ এবং পরে ইওরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়া, এই তিন মহাদেশের অন্তর্গত বিস্তৃত অঞ্চলের উপর নিজের আধিপত্য ও সাম্রাজ্য বিস্তার করে।

রোমের উত্থানের সময় গ্রীসদেশে রাজনৈতিক পতন ও বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হয়েছিল। রোমের অগ্রাভিযানের পথে গ্রীসকেও তার জয় করতে হয়েছিল। কিন্তু রোম নিজে পরাজিত গ্রীসের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে। গ্রীসের উন্নত সংস্কৃতি ও রোমের নিজের আইনানুবর্তিতার সংমিশ্রণে, রোমে একটি শ্রেষ্ঠ সভ্যতার সৃষ্টি হয়। কালক্রমে এই রোমক সভ্যতা ভূমধ্য-সাগরীয় অঞ্চলে ও পশ্চিম-ইওরোপে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হয়।

এই রোমক সভ্যতা, তার চরম উৎকর্ষের সময়, অপরাপর ইওরোপীয় দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে এবং বর্তমান ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলি অনেক বিষয়ে

প্রাচীন রোমের নিকট ঋণী। রোমই গ্রীক সভ্যতার ধারক ও প্রচারক। গ্রীক সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রের আলোক, প্রথমে রোমে ও পরে রোম-সাম্রাজ্য থেকেই অন্য সব ইওরোপীয় দেশগুলিতে প্রসারিত হয়। তা ছাড়া, রোমই ইওরোপে খ্রীষ্টধর্মের উৎস-স্থান ও প্রচার-কেন্দ্র। রোমের পোপই ইওরোপে খ্রীস্টান জগতের ধর্মগুরু।

রোম-ইতিহাসের প্রথম যুগকে 'রাজ-পব' বলে আখ্যা দেওয়া হয়। এই যুগের রাজাদের কাহিনী অনেকটা উপকথার মত, তবে এসময়ের প্রকৃত ইতিহাসও খানিকটা পাওয়া যায়। কথিত আছে, **রোমুলাস** ও **রেমাস** নামে দুই ভ্রাতা রোম নগরীর স্থাপয়িতা। রোমুলাস হন প্রথম রাজা।

রাজ-যুগের শাসকদের মধ্যে নৃপতি **সারভিয়াস টুলিয়াসের** নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি শান্তিপ্রিয় রাজা ছিলেন। তিনি ল্যাটিনদের সঙ্গে সন্ধি করে রোমের শক্তিবৃদ্ধি করেন। ত্রিশ-নগরী-সমন্বিত ল্যাটিন-লীগ গঠন তাঁরই কৃতিত্ব। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি এই যে, তিনি প্রজাসাধারণকে জন্মগত ভিত্তির পরিবর্তে ঐশ্বর্যগত ভিত্তিতে ভাগ করে সংঘবদ্ধ করেন। এইভাবে রোমান প্রজাদের প্রধান পরিষদ "**কমিশিয়া সেঞ্চুরিয়েটা**"র প্রবর্তন হয়।

রোমানরা মিশ্রিত জাতি। তাদের মধ্যে ল্যাটিন অংশই প্রধান; স্যাবাইন ও বৈদেশিক ইত্রাসকান জাতিও রোমান জাতির মধ্যে মিশে যায়। রাজার যুগে রোমের রাজ্যশাসন-বিধি উল্লেখযোগ্য ছিল। রাজাই ছিলেন রাষ্ট্রগুরু। তিনি যুদ্ধে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ ও ধর্মব্যাপারে দেশের প্রধান পুরোহিত ছিলেন। তবে রাজার ক্ষমতা স্বেচ্ছাচারী ছিল না। তাঁকে রাজকার্যে পরামর্শ দেবার জন্যে "**সেনেট**" বা একটি প্রবীণ-পরিষদ ছিল। জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ লোকেরাই এই সেনেটের সভ্য হতেন। এই সময় "**কমিশিয়া কিউরিয়েটা**" নামক রোমক নগরবাসিবৃন্দের এক পরিষদ ছিল। প্যাট্রিসিয়ানগণই এই পরিষদে প্রাধান্য লাভ করতেন।

তখনকার রোমের উচ্চশ্রেণীর লোকদের বলা হত **প্যাট্রিসিয়ান** এবং সুবিধা-সুযোগ-বঞ্চিত সাধারণ জনসমূহকে বলা হত **প্লিবিয়ান**। রাজা সারভিয়াস এই যুগে, কমিশিয়া সেঞ্চুরিয়েটা নামক যে পরিষদের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাতে ধনী প্লিবিয়ানদের কতকটা সুবিধা হয়। রাজ-যুগের শেষ রাজা **টারকুইন** অত্যাচারী ও গর্বিত ছিলেন। দেশের লোকেরা বিদ্রোহ

করে টারকুইনকে ৫১০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে রাজ্য থেকে দূর করে দেয় ও প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র স্থাপিত করে।

কমিশিয়া কিউরিয়েটা

সাধারণতন্ত্রের যুগ

সাধারণতন্ত্র-যুগের প্রথম দুইশত বৎসরের ইতিহাস প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ানদের পরস্পর সংঘর্ষের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। প্যাট্রিসিয়ানরা ছিল রোমের আদিম ল্যাটিন অধিবাসী। প্লিবিয়ানগণ গোড়ায় প্যাট্রিসিয়ানদের একান্ত অধীন ছিল, পরে তারা মুক্ত নাগরিকের অধিকার লাভ করেও বিশেষ কোন ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে নি। ক্রমে অনেক বিদেশী এসে রোমে বসবাস করে এই অধিকারহীন প্লিবিয়ান বা জনতার সংখ্যা বাড়ায়। প্লিবিয়ানদের অসংখ্য অভাব-অভিযোগ ছিল। এই অসুবিধা ও অসমতাসমূহ

অর্থনৈতিক, জমি-সংক্রান্ত, আইনগত, সামাজিক, ধর্মগত এবং রাজনৈতিক পর্যায়ে পড়ে।

ক্রমাগত প্রায় দুইশত বৎসরের সংগ্রামের ফলে প্লিবিয়ানগণের অসুবিধাগুলির প্রায় সব কিছুই অপসারিত হয়। বিবিধ আইনের সাহায্যে প্লিবিয়ানরা তাদের শক্তি-সুবিধা আহরণ করে। এই আইনগুলির মধ্যে "দ্বাদশ দফা আইন" বিশেষ প্রসিদ্ধ। ক্রমে প্লিবিয়ানরা রাষ্ট্রের **কনসাল** বা সর্বশ্রেষ্ঠ শাসনকর্তার পদেরও অধিকারী হয়। এই গৃহবিরোধের প্রকৃতিতে দেখা যায় যে, প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ানদের সংগ্রাম অতি শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সুসম্পন্ন হয়েছিল।

যখন রোমের ভিতরে দুই সম্প্রদায়ের নাগরিকদের মধ্যে সংঘর্ষ চলছিল, তখন বাইরের প্রতিবেশী-জাতি ও উপজাতিদের সঙ্গেও রোমানদের অনেক
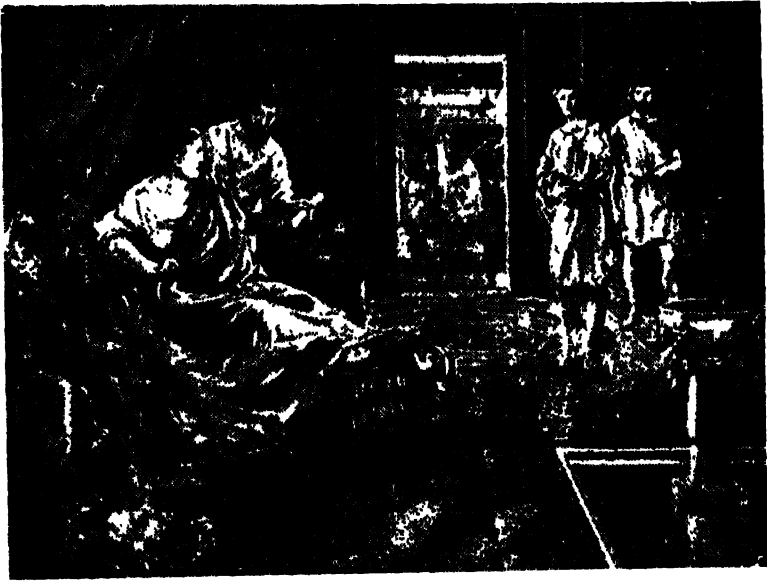
প্যাট্রিসিয়ান ও তার প্লিবিয়ান প্রজা

যুদ্ধ-বিগ্রহ করতে হয়। যে-সব জাতির সঙ্গে রোমের যুদ্ধ হয়েছিল, তাদের মধ্যে ভলসিয়ান, ইকুই, ইত্রাসকান ও গলগণ প্রধান। এই সকল যুদ্ধে রোমানদের প্রথমদিকে অনেক অসুবিধা ও বিপদ্ ঘটেছিল; কিন্তু পরে রোমানদের দেশপ্রেম, একতা ও অধ্যবসায়ের বলে তারা প্রতিবেশী-জাতিগণকে পরাভূত করে ও তাদের দেশে নিজেদের ক্ষমতা বিস্তৃত করে। এই সকল যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাসে অনেক রোমানের বীরত্ব, স্বার্থত্যাগ ও কর্তব্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। এই

বীরদের মধ্যে **সিনসিনেটাস, ক্যামিলাস, কোরিয়োলেনাস** এবং **হোরেসিওর** নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা চলে।

এর পর রোমানরা দুর্ধর্ষ পাহাড়ী জাতি স্যামনাইটদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল। এই যুদ্ধ দীর্ঘ অর্ধ-শতাব্দী ধরে চলে। শেষ পর্যন্ত যদিও স্যামনাইটরা হেরে যায়, তথাপি এই পরাক্রান্ত পার্বত্য দলদের পরাজিত করতে রোমানদের অপরিসীম ক্ষতি স্বীকার করতে হয়।

স্যামনাইটদের হারিয়ে দিয়ে, রোম যখন মধ্য-ইতালির অধীশ্বর হয় তখন দক্ষিণ-ইতালিতে, ক্ষমতাপন্ন গ্রীকনগর টারেণ্টামের সঙ্গে রোমানদের যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে এপিরাসের গ্রীক রণ-বীর **রাজা পাইরাস** টারেণ্টামকে

ভলসিয়ানদের সঙ্গে রোমানদের যুদ্ধ

সাহায্য করেন। কাজেই, রোমানগণ খুব বিপদে পড়ে। তবে পাইরাস প্রথম যুদ্ধগুলিতে জয়লাভ করলেও, রোমানদের সমর-নৈপুণ্য ও দুর্জয় সংকল্পের জন্যে তাঁকে ভীষণ বেগ পেতে হয়। তাঁর নিকট, এই নবজাগ্রত রোমক জাতির গর্ব খর্ব করা সুদূরপরাহত বলে মনে হল। তাঁর সন্ধি-প্রার্থনাও রোমান সিনেট অগ্রাহ্য করল।

টারেন্টামবাসীদের অক্ষমতার দরুন শেষ পর্যন্ত পাইরাসকে বেনিভেন্টাম যুদ্ধে পরাজিত হতে হল এবং তাঁর সেনাবাহিনী বিধ্বস্ত হল।

এরূপে, রোম সমগ্র ইতালির প্রভু হয়ে দাঁড়াল। রোমানদের এইসব যুদ্ধ-জয়ের প্রধান হেতু, তাদের অদম্য উৎসাহ, অসীম অধ্যবসায় ও ঐকান্তিক স্বদেশপ্রেম। রোমানগণ শুধু বড় যোদ্ধা ও দেশজয়ী ছিল না, রাজ্যগঠনেও তাদের বিশেষ পারদর্শিতা ছিল।

হানিবল

ইতালির অধীশ্বর হবার পর রোমানগণের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বেড়ে যায়। তখন ইতালির দক্ষিণ দিকে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে উত্তর-আফ্রিকাস্থিত প্রসিদ্ধ **কার্থেজ** নগরী প্রভুত্ব করত। এই কার্থেজ নগরী ছিল এশিয়াবাসী ফিনিশীয়দের একটি শ্রেষ্ঠ উপনিবেশ। এই সময় কার্থেজ তার নৌশক্তি ও বাণিজ্য-বলে এক বিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। ধন-সম্পত্তি, বাণিজ্য-

রোমান সেনেট কর্তৃক পাইরাসের সন্ধি-প্রার্থনা অগ্রাহ্য

সৌভাগ্য ও সমুদ্রের আধিপত্য লাভ করে কার্থেজ বিরাট শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সিসিলির পশ্চিমাংশও তখন কার্থেজের কুক্ষিগত ছিল।

রোম, এখন তার বিস্তৃতিলাভের পথে, কার্থেজের সঙ্গে অনিবার্যরূপে দীর্ঘ জীবন-মরণ সংগ্রামে আবদ্ধ হয়ে পড়ল। এই সময়ের কার্থেজের সঙ্গে রোমের তুলনা করতে গেলে, স্থূলদৃষ্টিতে, কার্থেজের বিস্তৃত সাম্রাজ্য, ধন-

সম্পত্তি এবং নৌ-শক্তি অনায়াসেই রোমকে ধ্বংস করতে পারত বলে মনে হয়। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে প্রণিধান করলে উভয়ের শক্তি-তারতম্য ধরা পড়ে।

কার্থেজের বাহ্যিক সমৃদ্ধি ও বলিষ্ঠতার অন্তরালে চরম দুর্বলতা প্রচ্ছন্ন ছিল। তবে কার্থেজে বার্কা-পরিবার নামে, এক বিখ্যাত যোদ্ধা-পরিবারের উদ্ভব হয়। এই পরিবারের বীরদের মধ্যে **হামিলকার** ও তাঁর পুত্র **হানিবলের** (২৪৭—১৮৩ খ্রীঃ পূর্বাব্দ) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই হানিবল সে-যুগের একজন শ্রেষ্ঠ সমরনায়ক। কার্থেজের সঙ্গে রোমের যে-সকল যুদ্ধ হয়েছিল, সেগুলিকে বলে **পিউনিক-যুদ্ধ**। এই পিউনিক-যুদ্ধাবলীর মধ্যে, হানিবলের সঙ্গে রোমের যুদ্ধই ইতিহাসে বিশেষ বিখ্যাত হয়ে আছে।

প্রথম পিউনিক-যুদ্ধ সিসিলি দেশ নিয়ে ঘটে। এই যুদ্ধে কার্থেজই পরাজিত হয়, তবে তার বিশেষ ক্ষতি হয় না। দ্বিতীয় পিউনিক-যুদ্ধের মত কঠিন সংগ্রাম রোমানদের আর কোন দিন করতে হয় নি। রোমানরা আর কখনও দ্বিতীয় পিউনিক-যুদ্ধের নায়ক হানিবলের মত প্রবল প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হয় নি।

হানিবল তাঁর পিতার শপথ পালন করবার জন্যে রোমানদের উপর প্রতিহিংসা নিতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। তিনি সুযোগমত অসম্ভব ক্ষিপ্রগতিতে, কার্থেজের নতুন ঘাঁটি স্পেন থেকে রওনা হয়ে বিষম বিপদের মধ্যে আল্পস্ পর্বত অতিক্রম করে সহসা উত্তর-ইতালি আক্রমণ করেন। তারপর তিনি পনের বৎসর ধরে ইতালি দেশের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত মথিত করে রোমানদের সঙ্গে ক্রমাগত ভীষণ যুদ্ধ করে যান।

রোমানগণ হানিবলের আকস্মিক দুর্বার আক্রমণে অত্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হয়। তারা একটার পর একটা যুদ্ধে কেবল হেরেই যেতে থাকে। টিসিনাস, ট্রিবিয়া, ট্রাসিমেন-হ্রদ ও **ক্যানির** যুদ্ধ কেবল রোমানগণের অপরিসীম বিপর্যয় ও গ্লানির কাহিনী। অন্যপক্ষে, হানিবল দেখান তাঁর অসাধারণ সামরিক প্রতিভা, কৌশল, ক্ষিপ্রগতি ও যুদ্ধজয় করার সামর্থ্য। হানিবলের খ্যাতি এত বৃদ্ধি পেল যে, দক্ষিণ-ইতালিতে রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ হল। রোমের চিরশত্রু স্যামনাইটগণ বিদ্রোহ করল। অধিকাংশ গ্রীক-নগর হানিবলের পক্ষে যোগ দিল। ক্যাপুয়া নগর বিদ্রোহ করল, তবে রোমের ল্যাটিন প্রজাগণ কিন্তু বিদ্রোহ করল না।

এর পর থেকে নানা কারণে রোমের অবস্থার উন্নতি হতে লাগল। ইতালি ব্যতীত স্পেন এবং সিসিলিতেও যুদ্ধ চলতে লাগল। হানিবল অবশ্য সিরাকিউস এবং মাসিডোনিয়ার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিলেন, কিন্তু এতে রোমের বাস্তবিক কোন ক্ষতি হল না। রোমান সেনাপতি মার্সেলাস

সিরাকিউস অধিকার করলেন। ইতালিতে বেনিভেণ্টামের যুদ্ধে হানিবল পরাজিত হলেন। ক্যাপুয়া পুনরায় রোমের পদানত হল।

স্পেনে **সিপিও** নামক এক প্রতিভাবান্ সেনাপতির নেতৃত্বে রোমানগণ সফলতা লাভ করল। কার্থেজ থেকে হানিবল বিশেষ কোন সাহায্য পেলেন না। স্পেন থেকে হানিবলের ভ্রাতা **হাসড্রুবল** সৈন্য-সামন্ত নিয়ে উত্তর-ইতালিতে এসেছিলেন, কিন্তু তিনিও মেটারাসের অতর্কিত যুদ্ধে, রোমানদের নিকট পরাজিত ও নিহত হলেন। তখন হানিবলের রোমজয়ের আর কোন আশাই রইল না।

অবশেষে সিপিও সিসিলি জয় করে আফ্রিকাতে অভিযান করলেন এবং কার্থেজের মূলশক্তির কেন্দ্রস্থলে, একটার পর একটা আঘাত হানতে লাগলেন।

ট্রাসিমেন-হ্রদের যুদ্ধ

কার্থেজের বিপদ্ দেখে চারদিকে প্রজাগণ বিদ্রোহ করে উঠল। হানিবল এতদিন দক্ষিণ-ইতালিতে প্রাধান্য বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন; কিন্তু কার্থেজের বিপন্ন অবস্থা দেখে, তাঁকে স্বদেশরক্ষার জন্যে অগ্রসর হতে হল। খ্রীঃ পূঃ ২০২ অব্দে ইতিহাস-বিখ্যাত **জামা'র যুদ্ধে** সিপিও হানিবলকে পরাজিত করলেন। কার্থেজ সন্ধি করতে বাধ্য হল। হানিবলের রোম জয়ের কল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। কার্থেজ রোমের করদ-রাষ্ট্রে পরিণত হল।

হানিবল অবশ্য এর পরও কার্থেজকে পুনর্গঠিত করে রোমের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের বাসনা পোষণ করেছিলেন। তিনি আবার ভবিষ্যৎ

সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন। রোম শঙ্কিত হয়ে কার্থেজের নিকট তাঁর আত্মসমর্পণের দাবি করল। হানিবল তখন পলায়ন করে সিরিয়া, ক্রীট, বিথনিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের রাজাদের কাছে গিয়ে, তাঁদের একের পর এক রোমের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে লাগলেন, কিন্তু রোমানগণ সর্বত্রই তাঁকে তাড়িয়ে ফিরতে থাকল। অবশেষে অসহায় হানিবল আত্মহত্যা করে অপমানের হাত থেকে মুক্তিলাভ করলেন।

এরপর রোমান-সাম্রাজ্যের দ্রুত প্রসারের পথে আর কোন কণ্টক রইল না। শীঘ্রই মাসিডোনিয়া, গ্রীস, সিরিয়া, মিশর, স্পেন এবং আরও অনেক

জামা'র যুদ্ধ

স্থানে রোমান-সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করল। কিছুদিন পরে গর্বিত, সাম্রাজ্য-মদমত্ত রোমানগণ, তৃতীয় পিউনিক-যুদ্ধে, অত্যন্ত অন্যায়রূপে কার্থেজ নগরীকে আক্রমণ করে ধ্বংস করে দিল।

রোমের সাম্রাজ্যের বৃদ্ধির মূলে, রোমের সিনেটের জ্ঞানবৃদ্ধ ও সু-অভিজ্ঞ সদস্যদের অনেকখানি হাত ছিল। তাঁদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, পারদর্শিতা ও স্বদেশ-প্রেমের বলেই রোমানগণ দেশের পর দেশ জয় করতে পেরেছিল। কিন্তু যখন সাম্রাজ্য-প্রসারণের ফলে, নানাদেশ থেকে রোমে ধন-সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য ছড়িয়ে পড়তে লাগল তখন সিনেট স্বার্থপরায়ণ, সংকীর্ণবুদ্ধি ও সমস্তক্ষমতাগ্রাসী হয়ে পড়ল। রোমে সিনেট সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠল।

এখন সে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে শক্তির অপব্যবহার করতে লাগল। রোমের শাসনতন্ত্র ক্রমে নামমাত্র সাধারণতন্ত্রে পরিণত হল। আসলে ইহা সিনেটের সদস্যদের অভিজাত-তন্ত্রে রূপান্তরিত হল।

শস্য-আইন ('করন্-ল')

খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধে রোমে নানারূপ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিয়েছিল। দ্বিতীয় পিউনিক-যুদ্ধের ফলে, রোমে কৃষিকার্যের অবনতি ঘটেছিল, চাষের জমি নষ্ট হয়েছিল—এবং গ্রাম হতে লোক শহরে আসতে আরম্ভ করল। সিসিলি ও মিশর হতে শস্য আমদানি করা হতে লাগল। রোমের অধিবাসিগণ কৃষিকার্যকে অবহেলা করতে শিখল।

রোমের নাগরিকগণ দাস-শ্রমের উপর নির্ভর করতে শিখল। লোকের আর্থিক দুর্গতি বৃদ্ধি পেল। রাষ্ট্রের সাধারণ জমিসমূহ বড়লোকেরা এমনভাবে নিজেদের ভিতর বিভক্ত করে নিয়েছিল যে, সাধারণ নাগরিকগণ তার কোন অংশই পেত না। ধনী ও দরিদ্রের রেষারেষি রাষ্ট্র-জীবনকে বিষাক্ত করে তুলেছিল।

এই তীব্র অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করলেন, **তাইবেরিয়াস** ও **গেইয়াস** নামক সম্ভ্রান্ত বংশজাত গ্রাকাস-ভ্রাতৃদ্বয়। তাইবেরিয়াস অর্থনৈতিক ও কৃষিসংক্রান্ত অ-ব্যবস্থাগুলির আমূল সংস্কার করতে চেষ্টা

স্লা ও মেরিয়াস

করেন আর গেইয়াস সিনেটের প্রভাব খর্ব করে অপরাপর ধনি-সম্প্রদায় ও জনসাধারণের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করতে সচেষ্ট হন। উভয় ভ্রাতাই তাঁদের যুগান্তকারী সংস্কার সম্পাদনে অনেকটা সমর্থ হয়েছিলেন; কিন্তু স্বার্থান্ধ সিনেটের উগ্র প্রতিহিংসার ফলে, তাঁরা দুজনেই নিহত হলেন। এই সময় থেকেই রোমে রাজনৈতিক দলাদলিতে হত্যা ও রক্তপাত শুরু হল।

এখন থেকে রোম-রাষ্ট্রের মধ্যে যে তীব্র দলাদলি আরম্ভ হল, তার ফলেই প্রজাতন্ত্রের পতন অনিবার্য হয়ে উঠল। রোমের এই অন্তর্বিরোধ ও ক্ষমতালোভী সিনেটের সদস্যদের স্বার্থান্ধতার জন্যে দেশে বিশেষ বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। তখন পরপর কয়েকজন শক্তিশালী সামরিক নেতার আবির্ভাব

হল। তাঁদের মধ্যে **মেরিয়াস, সুল্লা, পম্পে** এবং **জুলিয়াস সীজারের** নাম সমধিক প্রসিদ্ধ।

সুল্লা অভিজাত-বংশের সন্তান ছিলেন। সামরিক প্রতিভার পরিচয় দিয়ে তিনি রাষ্ট্রের প্রতিপত্তি অর্জন করেন। তিনি নানা যুদ্ধে অশেষ কৃতিত্ব দেখান, বিশেষ করে এশিয়া-মাইনরের পরাক্রান্ত নৃপতি **মিথ্রিডাটিসকে** (১৩২—৬৩ খ্রীঃ পূর্বাব্দ) পরাজিত করে তিনি যথেষ্ট গৌরবের অধিকারী হন। অকর্মণ্য সিনেট সুল্লাকে রাষ্ট্রনায়কের অটুট ক্ষমতায় বিভূষিত করে।

সুল্লার নীতি ছিল কঠোর ও নির্মম। তিনি প্রতিপক্ষ মেরিয়াসের দলের বহুলোককে হত্যা করান ; ফলে রোমে বিভিন্ন দলের মধ্যে হত্যা ও রক্তপাতের বন্যা বয়ে যেতে শুরু করল। সুল্লার অনেকগুলি সংস্কার প্রতিক্রিয়াশীল ছিল বলে তা শীঘ্রই উঠে গেল। সুল্লার পর রোমের রাজনীতিক্ষেত্রে পম্পে ও সীজারের প্রাধান্যের যুগ আরম্ভ হল।

জুলিয়াস সীজার (১০০—৪৪ খ্রীঃ পূর্বাব্দ)

শৌর্যে ও বীর্যে সীজারের মত লোক তখনকার দিনে বড় একটা ছিল না। জুলিয়াস সীজার ফ্রান্স জয় করেছিলেন এবং জার্মেনীরও কতকটা অংশ তিনি রোমান-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। তারপর তিনি ব্রিটেনকে যুদ্ধে হারিয়ে দেন। জুলিয়াস সীজার খ্রীঃ পূঃ ৫৫ ও ৫৪ অব্দে, পর পর দুবার ব্রিটেনে অভিযান করেছিলেন। সীজারের সময়ে, রোমে আর একজন খুব বড় যোদ্ধা ছিলেন, তাঁর নাম **পম্পে** (১০৬—৪৮ খ্রীঃ পূর্বাব্দ)।

জুলিয়াস সীজার

পম্পে দক্ষিণ-পূর্ব ইওরোপের এবং পশ্চিম-এশিয়ার অনেক স্থান জয় করেন।

তারপর সীজার এবং পম্পের মধ্যে কে বড় যোদ্ধা, তাই নিয়ে বিরোধ বাধে। দুজনেরই ইচ্ছা, সমগ্র রোমান-সাম্রাজ্য তাঁর একার ইচ্ছায় পরিচালিত হবে। এই নিয়ে সীজার এবং পম্পে দুজনের মধ্যে অনেক যুদ্ধ হয়। এই

পম্পের জেরুজালেম অধিকার

যুদ্ধে পম্পে পরাজিত হন। সীজার জয়লাভ করে সমগ্র রোমান সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধীশ্বর হয়ে রাজ্য-শাসন করতে থাকেন।

রোমে সীজারের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে

ব্রুটাস ও কেসিয়াসের নেতৃত্বে সীজারের হত্যাকাণ্ড

প্রজাতন্ত্রের অবসান হয়ে একনায়ক-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হল। সীজার অবশ্য রাজা উপাধি গ্রহণ করলেন না, তবে রাজার সকল ক্ষমতাই তিনি প্রয়োগ করতে আরম্ভ করলেন; কিন্তু তিনি স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতার অধিকারী হলেও তার অপব্যবহার করেন নি। নানাবিধ সংস্কার প্রবর্তন করে তিনি সুশাসনের পরিচয় দিয়েছেন।

সীজার ছিলেন প্রতিভাবান্ পুরুষ। তাঁর যাবতীয় কাজে একটা মৌলিকতা ও দূরদৃষ্টি লক্ষ্য করা যায়। তিনি বুঝেছিলেন, সিনেট স্বার্থান্বেষী ও অপদার্থ হয়ে পড়েছে ও সাধারণতন্ত্রের কাঠামোতে ঘুণ ধরেছে। তিনি দেখলেন যে, রোমান-সাম্রাজ্যকে রক্ষা ও উন্নত করতে হলে, সাধারণতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে, নিরঙ্কুশ একনায়ক-তন্ত্রের প্রবর্তন করা দরকার। তাই তিনি প্রকাশ্যে সাধারণতন্ত্র ভেঙে দেবার জন্যে উঠে-পড়ে লাগলেন। তিনি ছিলেন গণ-নেতা এবং সিনেট-বিরোধী।

দরিদ্রের দুঃখ লাঘবের জন্যে সীজার অশেষ চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর মন ছিল উদার ও শিক্ষিত। গল দেশ ও ব্রিটেনে অভিযানসমূহের যে ইতিবৃত্ত তিনি লিখে গেছেন, তা থেকে তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ক্যালেণ্ডারের সংস্কার করে তিনি সমগ্র মানবজাতির উপকার করে গেছেন। মোট কথা—যুদ্ধে, শাসনে, শিক্ষা-দীক্ষায় ও ব্যক্তিত্বের প্রখরতায় সীজার পৃথিবীর ইতিহাস-স্রষ্টাদের অন্যতম।

সীজার তাঁর জনপ্রিয়তা ও নিজের প্রতিভার জোরে রোমান সাম্রাজ্যের সর্বেসর্বা হয়েছিলেন। স্বার্থপর সিনেটের সদস্যগণ মোটেই তাঁকে পছন্দ করতেন না; শুধু ভয়ে, তাঁর নির্দেশ অনুসারে গোলামের মত চলতেন। একদল লোক সীজারের একনায়কত্বের জন্যে ভীষণ চটে গেল। তারা ভাবত যে, একনায়কত্বের অবসান করতে না পারলে সাধারণতন্ত্র ধ্বংস হবে এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তিরোহিত হবে। **ব্রুটাস** (৮৫—৪২ খ্রীঃ পূর্বাব্দ) এবং **কেসিয়াসের** নেতৃত্বে এই দল, ষড়যন্ত্র করে সীজারকে হত্যা করল। সীজারের হত্যা ছিল একটি চরম ভুল। এর ফলে রোমে অনিয়ম ও গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হল এবং অবশেষে নিয়তির মত দুর্বার গতিতে সাধারণতন্ত্র একেবারে বিনষ্ট হয়ে সাম্রাজ্য স্থাপিত হল।

সম্রাট্ অগস্টাস

সীজারের ভাগিনেয় **অক্টেভিয়াস** (৬৩ খ্রীঃ পূর্বাব্দ—১৪ খ্রীস্টাব্দ) "সম্রাট্-যুগে" রোমের প্রথম সম্রাট্। তিনি সম্রাট্ হয়ে 'অগস্টাস' উপাধি গ্রহণ করেন।

প্রাচীন যুগে রোমানগণ কর্তৃক বন্য বরাহ শিকার

বিখ্যাত যোদ্ধা **মার্ক এণ্টনি** বা **এণ্টোনিয়াস মার্কাস** (৮৩—৩০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ) অগস্টাসকে বঞ্চিত করে রোমের সিংহাসন দখল করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই এণ্টনিই মিশরের সুন্দরী **রানী ক্লিও-পেট্রার** (৬৯—৩০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ) রূপে মুগ্ধ হয়েছিলেন।
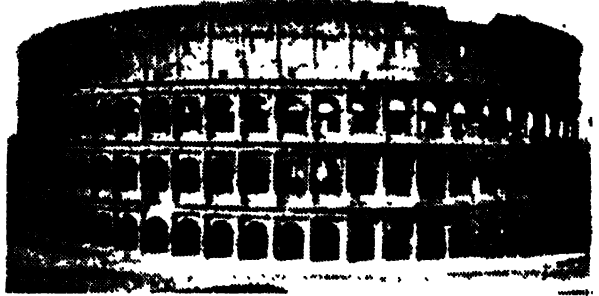
অ্যামফিথিয়েটার

সম্রাট্ অগস্টাসের আমলে রোমের অনেক উন্নতি হয়। রোম নগরীতে তিনি খুব সুন্দর শ্বেতপাথরের মন্দির, অট্টালিকা প্রভৃতি নির্মাণ করেন। ইওরোপ, এশিয়া এবং আফ্রিকার নানাস্থান থেকে অসংখ্য লোক রোমে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে আসত। তাদের জন্যে তিনি মার্বেল-পাথরে বাঁধানো ভালো ভালো বাজার তৈরি করে দেন।

রোমের লোকেরা খেলাধুলা খুব ভালবাসত। তাদের জন্যেও তিনি চমৎকার সব খেলার জায়গা তৈরি করে দেন। এইসব খেলার জায়গা বা অ্যামফিথিয়েটারে ষাঁড়ের লড়াই, সিংহের লড়াই, বাঘের লড়াই প্রভৃতি হত; তা'ছাড়া, মানুষের সঙ্গে ষাঁড়ের, সিংহের বা বাঘের লড়াইও হত। এইসব ছিল রোমানদের খুব প্রিয় খেলা। অগস্টাসের শাসন-পদ্ধতিকে সাধারণতন্ত্রের ছদ্মবেশে অবগুণ্ঠিত স্বেচ্ছাতন্ত্র বলা যেতে পারে।

দেশে ও বিদেশে অরাজকতা দূর করে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করা তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। অগস্টাস সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। তাঁর সময়ে ঐতিহাসিক **লিভি**, কবি **ভার্জিল** (৭০—১৯ খ্রীঃ পূর্বাব্দ), **হোরেস** (৬৫—৮ খ্রীঃ পূর্বাব্দ) এবং **ওভিড** (৪৩ খ্রীঃ পূর্বাব্দ—১৮ খ্রীস্টাব্দ) সাহিত্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেন। তাঁর আমলেই যীশুখ্রীস্ট অবতীর্ণ হন।

সম্রাট্ নীরো

নীরো (৩৭—৬৮ খ্রীঃ) ছিলেন সে যুগের একজন অত্যাচারী নৃশংস ও দুশ্চরিত্র সম্রাট্। তাঁর রাজত্বের প্রথম পাঁচ বছর একরকম ভালই কেটেছিল। নীরো ছোটবেলায় লেখাপড়া শিখেছিলেন **সেনেকা** নামক একজন শিক্ষকের কাছে। সেনেকা খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করবার পর নীরো সেনেকাকে তাঁর মন্ত্রী করেন। সেনেকার পরামর্শ যতদিন তিনি শুনেছেন, ততদিন তিনি ভালভাবেই রাজ্যশাসন করতে পেরেছেন।

সম্রাট্ নীরো

কিন্তু পাঁচ বছর রাজত্ব করার পর তাঁর মাথা গেল গরম হয়ে। তাঁর ধারণা হল যে, তাঁর মত বুদ্ধিমান্, খেলোয়াড়, সংগীতজ্ঞ এবং নৃত্যবিৎ সারা পৃথিবীতে আর কেউ নেই। সেনেকার উপদেশ তিনি অগ্রাহ্য করতে লাগলেন। তবুও সেনেকা তাঁকে সৎপথে চলতে পরামর্শ দিতেন। শেষে একদিন নীরো রেগে বৃদ্ধ সেনেকাকে হত্যা করবার আদেশ দেন। নীরোর মা ছিলেন মহীয়সী নারী। তিনিও ছেলেকে সৎপথে চালাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। নীরো মায়ের উপরেও এমন চটে গেলেন যে, মাকে পর্যন্ত তিনি হত্যা করলেন।

এরপর থেকে নীরোর অত্যাচারে সারাটা দেশ অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। একদিন এক ভীষণ আগুন লেগে রোমের প্রায় অর্ধেকটা পুড়ে যায়। সাত দিন ধরে এই আগুন জ্বলেছিল। কথিত আছে, এই ভয়ানক আগুনে যখন রোমের লোকজন হাহাকার করে ছুটে বেড়াচ্ছিল, নীরো সেই সময় মহানন্দে বাঁশি বাজাচ্ছিলেন।

নীরোর পরে **হাড্রিয়ান, এণ্টোনিনাস** এবং **মার্কাস অরেলিয়াস** নামক তিনজন সম্রাট্ রোমকে আবার সমৃদ্ধ করে তোলেন।

সম্রাট্ হাড্রিয়ান

নিত্য-নতুন দেশ জয় করবার আগ্রহ রোমানদের খুব বেশী ছিল। সম্রাট্ হাড্রিয়ান (৭৬—১৩৮ খ্রীস্টাব্দ) তাদের বোঝালেন যে, আর বেশী দেশ জয় করবার চেষ্টা না করে সাম্রাজ্যের লোকেরা যাতে সুখে-শান্তিতে থাকতে পারে, যাতে সব লোক সুবিচার পায়, কারও উপর যাতে কোন অন্যায় না হয়, সেই দিকে এবার লক্ষ্য রাখা উচিত। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের তিনি অনেক উন্নতি করেন এবং অনেক নতুন শহর তৈরি করে দেন। হাড্রিয়ানের রাজত্বে, রোমান সাম্রাজ্যের প্রজারা শান্তিতে বাস করতে পেরেছিল। তিনি ব্রিটেনে বহু রাস্তা, সামরিক ঘাঁটি ও প্রসিদ্ধ "হাড্রিয়ান প্রাকার" নির্মাণ করেছিলেন।

সম্রাট্ হাড্রিয়ান

সম্রাট্ এণ্টোনিনাস

হাড্রিয়ানের পর সম্রাট্ **এণ্টোনিনাস**ও (৮৬—১৬১ খ্রীস্টাব্দ) প্রজাদের খুব প্রিয় হয়েছিলেন। তিনি এত ভাল লোক ছিলেন যে, প্রজারা তাঁর নাম দিয়েছিল, 'ধার্মিক এণ্টোনিনাস'। বিচারে যারা অপরাধী সাব্যস্ত হত, তারাও যাতে দয়া পায়, তিনি সে ব্যবস্থা করে দেন। সাম্রাজ্যের যে-সব শহরের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না, তাদের তিনি অনেক টাকা দিয়ে সাহায্য করেন। তাঁর আমলে রোমে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হয়েছিল। সদাশয়তা ও মহানুভবতার দিক্ দিয়ে এণ্টোনিনাসকে ভারত-সম্রাট্ অশোকের সঙ্গে তুলনা করা হয়।

সম্রাট্ মার্কাস অরেলিয়াস

সম্রাট্ **মার্কাস অরেলিয়াস**ও (১২১—১৮০ খ্রীস্টাব্দ) এণ্টোনিনাসের মত খুব ধর্মভীরু লোক ছিলেন। তিনি বেশী শান্তিতে রাজত্ব করতে পারেন নি। তাঁকে সাম্রাজ্যের চারদিকে বিদ্রোহ দমন করতে হয়েছিল। সীমান্তে বিভিন্ন বর্বর জাতিও রোমক-সাম্রাজ্য আক্রমণ করেছিল। তাঁর সময় নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রজাগণের সুখ-সমৃদ্ধি বিনষ্ট করল। একটি মহামারীতে বহুলোক প্রাণ হারাল। দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্পে লোকের দুর্দশার অন্ত রইল না। রোমানগণ মনে করল, এইসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ দৈব-অভিশাপের ফল। তাই দেবতাকে তুষ্ট করবার জন্যে তারা খ্রীস্টানদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করল।

সম্রাট্ মার্কাস অরেলিয়াস

সম্রাট্ অরেলিয়াসকে অনেক যুদ্ধ করতে হয়। তবে নানাবিধ গোলযোগের মধ্যেও তিনি "মেডিটেশনস" বা "চিন্তালহরী" নামক একখানি পুস্তক রচনা করতে সময় পেয়েছিলেন। এতে তাঁর অন্তরের ভাবধারার পরিচয় পাওয়া যায়।

সম্রাট্ ডায়োক্লিসিয়ান

মার্কাস অরেলিয়াসের সময় থেকে খ্রীস্টান ও রোমানদের মধ্যে যে বিরোধ শুরু হয়েছিল, সেটা অনেকদিন ধরে চলেছিল। রোমানদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের অন্ত ছিল না, তার উপর জার্মান এবং পারসিকদের আক্রমণ। এই সময় সম্রাট্ **ডায়োক্লিসিয়ান** (২৪৫—৩১৩ খ্রীস্টাব্দ) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সাম্রাজ্যের নানাস্থানে ভ্রমণ করে আবার চারদিকে শৃঙ্খলা স্থাপনের চেষ্টা করতে লাগলেন। এ-বিষয়ে তাঁর চেষ্টা অনেকটা সফল হয়েছিল বটে, কিন্তু তাঁর একটা কাজে দেশে আবার ভীষণ গোলযোগ শুরু হল।

ডায়োক্লিসিয়ানের ধারণা হল যে, তাঁকে যারা পূজা করবে তারাই আসল রাজভক্ত, আর যারা তাঁকে পূজা করতে রাজী হবে না, বুঝতে হবে যে, তারা যে-কোন সময়ে তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করতে পারে। এই ধারণা মাথায় প্রবেশ

করবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁকে পূজা করবার আদেশ দিলেন। খ্রীস্টানরা ঈশ্বর ছাড়া কোন মানুষকে পূজা করতে রাজী নয় বলে সম্রাটের আদেশপালনে অস্বীকার করল। ডায়োক্লিসিয়ান এতে ভয়ানক চটে গেলেন এবং তাঁর আদেশে হাজার হাজার খ্রীস্টানকে হত্যা করা হল। এতেও কিন্তু খ্রীস্টানরা দমল না, তারা আরও উৎসাহের সঙ্গে খ্রীস্টধর্ম প্রচার করতে লাগল।

সম্রাট্ কনস্টানটাইন

ডায়োক্লিসিয়ানের কিছু পরে, **কনস্টানটাইন** (২৭২—৩৩৭ খ্রীস্টাব্দ) রোমের সিংহাসনে আরোহণ করলেন। তিনি বুঝলেন যে, রোমান সাম্রাজ্যের অধিকাংশ লোকই, খ্রীস্টানদের উপর অত্যাচারে এবং ডায়োক্লিসিয়ান-কর্তৃক অনুষ্ঠিত হত্যাকাণ্ডে দুঃখিত ও বিরক্ত হয়েছে। তিনি খ্রীস্টানদের অভয় দিয়ে

সিংহাসনারূঢ় সম্রাট্ কনস্টানটাইন

বললেন যে, আর কাউকে হত্যা করা হবে না। কনস্টানটাইন পরে নিজেও খ্রীস্টান হয়েছিলেন।

কৃষ্ণসাগরের তীরে তিনি সুন্দর **বাইজানটিয়াম** শহরে, রোম-সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তাঁর নামানুসারে ঐ শহরটির নাম হল **কনস্টান্টিনোপল**। ইওরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা জুড়ে রোমান সাম্রাজ্য যখন আকারে বিশাল হয়ে পড়ল, সম্রাট্দের পক্ষে তখন এক রোম শহর

থেকে, এই বিরাট সাম্রাজ্য সামলানো কঠিন হয়ে উঠল। সাম্রাজ্য-শাসনের সুবিধার জন্যে, তখন থেকে রোম হল পশ্চিমদিকের অর্ধেকটার রাজধানী, আর, কনস্টান্টিনোপল হল পূর্বদিকের রাজধানী। ধীরে ধীরে এই দুই দিকের দুই সাম্রাজ্য শাসনের ভার, দু'জন করে সম্রাটের উপর অর্পিত হতে লাগল। এইভাবে সংববদ্ধ ও কেন্দ্রীভূত রোমান সাম্রাজ্য দুই টুকরো হয়ে গেল।

রোমান সাম্রাজ্যের পতন

কনস্টানটাইনের পরে রোমে আর তেমন কোন শক্তিশালী লোক সিংহাসনে আরোহণ করেন নি। দুর্বল রাজাদের অধীনে, দুই ভাগে বিভক্ত সাম্রাজ্য আরও দুর্বল হতে লাগল। ওদিকে জার্মান জাতিরা ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠে রোমান সাম্রাজ্যের উত্তরদিকে আক্রমণ চালাতে লাগল। জার্মেনীতে তখন অনেক রকম জাতির লোকের বাস ছিল; তাদের মধ্যে **ফ্রাঙ্ক, ভ্যাণ্ডাল, গথ, ভিসিগথ, লম্বার্ড, অ্যাঙ্গল** এবং **স্যাক্সন** এই কয়টি উপজাতির লোক ছিল খুব দুর্ধর্ষ।

এদের মধ্যে ফ্রাঙ্করা ফ্রান্স জয় করল, ভ্যাণ্ডালরা স্পেন ও উত্তর-আফ্রিকা জয় করে নিল এবং অ্যাঙ্গল ও স্যাক্সনরা হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ইংলণ্ড অধিকার করে নিল। এইভাবে ফ্রান্স, স্পেন, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ইংলণ্ড এই কয়টি দেশ, রোমান সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত এক ইতালি ছাড়া রোমান সম্রাট্‌দের অধীনে আর কিছুই রইল না।

পতনোন্মুখ রোমান সাম্রাজ্যে, রোমের পোপেরা যথেষ্ট প্রভুত্ব করেছেন। খ্রীস্টানদের ধর্মগুরুকে বলা হয় **পোপ**। মধ্যযুগে রোমের পোপদের অসীম ক্ষমতা ছিল। তাঁরা অনুমতি না দিলে ইওরোপের কোন খ্রীষ্টান দেশের রাজা সিংহাসনে বসতে পেতেন না। ইওরোপের সর্বত্র অসংখ্য পাদ্রী পোপের মহিমা প্রচার করে বেড়াতেন।

রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংসের পর ইতালি

রোমান সাম্রাজ্য ভেঙে যাবার পর ইতালি অবশিষ্ট রইল বটে, কিন্তু তারও একতা নষ্ট হয়ে গেল। প্রভাবশালী সামন্ত জমিদারেরা ছোট ছোট রাজ্য গড়ে সেখানেই রাজত্ব করতে লাগলেন; কিন্তু ক্ষমতার লোভে তাঁদের নিজেদের মধ্যে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রায়ই লেগে থাকত।

মধ্যযুগে ইতালির রাজনৈতিক সংহতি নষ্ট হয়ে গেল বটে, কিন্তু অন্য-

ভাবে তার গৌরব বেড়ে উঠল। এই সময় কতকগুলি বিখ্যাত নগর-রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। এই নগরগুলি শিল্পে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, দর্শনে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে ইওরোপের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রণী হয়ে উঠল। মধ্যবিত্ত লোকদের উৎসাহেই এই নগরগুলি এতটা উন্নত হয়েছিল।

এদের মধ্যে **ভেনিস** নগরী আদ্রিয়াতিক সাগরের উপর একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্র-রাষ্ট্র ছিল। বিত্তবান্ লোকেরাই এখানে কর্তৃত্ব করত। নানারূপ সভ্যতা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে ভেনিস খুব বেশী উন্নতি লাভ করেছিল।

ধনী রোমানদের প্রমোদ-উদ্যান

ভারতবর্ষ এবং পূর্ব দেশগুলি হতে ভেনিসে দ্রব্যসম্ভার ও ঐশ্বর্য আসত—এবং সেখান থেকে আবার জিনিসগুলি পশ্চিম-ইওরোপে চালান দেওয়া হত। ভেনিসের একটি শক্তিশালী নৌ-বহর ছিল; সেইজন্য তাকে 'সমুদ্রের রানী' বলা হত।

অপরাপর নগরগুলির মধ্যে **ফ্লোরেন্স** ছিল খুব প্রসিদ্ধ। এখানে অনেক নামজাদা শিল্পীর আবির্ভাব হয়। **মেডিসি-পরিবারের** রাজত্বকাল ফ্লোরেন্সে খুব বিখ্যাত হয়ে আছে। অন্যান্য নগরের মধ্যে **জেনোয়া, মিলান** ও **নেপল্‌স্‌** খুব উন্নতি লাভ করেছিল।

'রেনেসাঁস' বা **'জ্ঞানের নবোন্মেষ'** ইতালিতেই প্রথম আরম্ভ হয়। এই

যুগের ইতালির কবি **দান্তে** (১২৬৫—১৩২১ খ্রীঃ), **পেত্রার্ক** (১৩০৪—১৩৭৪ খ্রীঃ), শিল্পী **লিয়োনার্দো দা ভিঞ্চি** (১৪৫২—১৫১৯ খ্রীঃ), **মাইকেলঅ্যাঞ্জেলো** (১৪৭৫—১৫৬৪ খ্রীঃ) এবং **র‍্যাফেল** (১৪৮৩—১৫২০ খ্রীঃ) পৃথিবীতে অমর হয়ে আছেন। সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ইতালির নগরগুলি যদিও পূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছিল, কিন্তু ঐ দেশের রাজনৈতিক একতা বহুদিন পর্যন্ত একেবারেই ছিল না। স্পেন, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি ইতালির নানা অঞ্চলে প্রভুত্ব করত।

ইতালির সব লোকের কিন্তু ভাষা এক ; ধর্ম, আচার-ব্যবহার, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং ইতিহাসও এক। এই রকম একটি দেশের লোকেরা বেশীদিন বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে না। তাই ফরাসী বীর **নেপোলিয়ন** এসে ইতালি জয় করে যখন সমগ্র ইতালিকে সংঘবদ্ধ করে তোলবার চেষ্টা করলেন, তখন তাঁর সে প্রয়াস ব্যর্থ হল না। ইতালির উত্তর-দেশগুলি নেপোলিয়নের অধীনে সহজেই এক হয়ে গেল। নেপোলিয়নের ব্যবস্থা ও নীতি ভবিষ্যতে ইতালির ঐক্যের পথ সুগম করল।

নেপোলিয়নের আগমন

নেপোলিয়ন ইতালি জয় করে তার উত্তর দিকের ছোট ছোট রাজ্যগুলিকে একত্র করে ইতালিতে একতার সৃষ্টি করেন। ফ্রান্সের জন্যে তিনি যে আইন ও শাসনপদ্ধতি তৈরি করেছিলেন, ইতালিতেও সেইগুলি প্রবর্তন করেন। ইতালি ফরাসী সাম্রাজ্যের অধীন হল বটে, কিন্তু একদেশ এবং একজাতি হিসাবে সংঘবদ্ধ হওয়ার সুবিধাটাও সে এবার বুঝতে পারল। তবে এই একতা বেশীদিন টিকল না। নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য ভেঙে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ইতালিও আবার আগের মত টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

ভিয়েনা-কংগ্রেস

১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে ভিয়েনায় ইওরোপের বড় বড় রাজনীতিবিদগণ অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার **মেটারনিকের** নেতৃত্বে একটা কংগ্রেস আহ্বান করেন। ছোট ও দুর্বল দেশগুলিকে নিয়ে কি করা হবে, তাও ছিল এই কংগ্রেসের আলোচনার বিষয়। ইতালি বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল, ভিয়েনা-কংগ্রেসে তার পক্ষে দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলবার মত লোক একজনও পাওয়া গেল না।

অস্ট্রিয়া ছিল তখনকার দিনে একটি বড় ও দুর্ধর্ষ দেশ। বরাবরই তার

ইতালির দিকে নেকনজর ছিল—নিজের সীমান্তের কাছাকাছি ইতালির যে-সব স্থান ছিল, সেগুলোকে সে গায়ের জোরে নিজের অন্তর্ভুক্ত করে রাখতে চাইত। তা ছাড়া, ইতালি যাতে শক্তিশালী হয়ে উঠতে না পারে, সেদিকেও তার বিলক্ষণ নজর ছিল। অস্ট্রিয়া বুঝেছিল যে, ইতালিকে বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল করে রাখতে পারলেই, সে নিজে দক্ষিণ-সীমান্ত সম্পর্কে নিরাপদ্ থাকতে পারবে। ভিয়েনা-কংগ্রেসে তাই ঠিক হল যে, **ভেনিসিয়া** ও **মিলান** নামক রাজ্য দুটি এবং অন্যান্য কয়েকটি রাজ্য অস্ট্রিয়ার হাতে থাকবে, অবশিষ্ট রাজ্যগুলির মধ্যে মাত্র তিনটি ইতালিয়ান রাজবংশের লোকেদের হাতে দেওয়া হল, অন্যগুলোকে বিদেশী রাজাদের অধীনে তুলে দেওয়া হল।

নেপোলিয়নের অধীনে একবার এক হয়ে ইতালিয়ানরা সংঘবদ্ধতার সুবিধা বুঝতে পেরেছিল। ভিয়েনা-কংগ্রেসের পর আবার তারা সংঘবদ্ধ হবার চেস্টা করতে লাগল।

কাভুর

মাৎসিনি (১৮০৫—১৮৭২ খ্রীঃ), **গ্যারিবল্ডি** (১৮০৭—১৮৮২ খ্রীঃ) এবং **কাভুরের** (১৮১০—১৮৬১ খ্রীঃ) অভ্যুদয় ইতালিকে একতার পূর্ণ পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে গেল। মাৎসিনির প্রেরণা, গ্যারিবল্ডির সংগ্রাম-কুশলতা এবং কাভুরের কূটনৈতিক চাল—এই তিনের সমন্বয়ে ইতালির জাতীয় জীবনে নব-জাগরণের দিন এল।
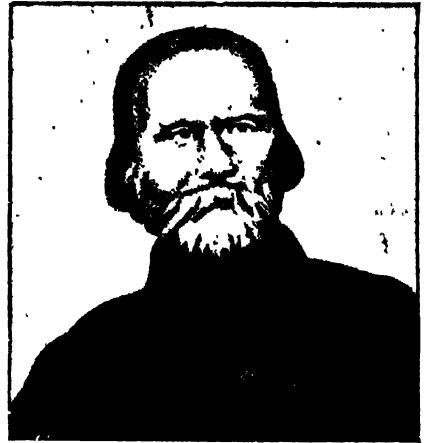
গ্যারিবল্ডি

কাভুর ছিলেক ইতালির অন্তর্ভুক্ত সবচেয়ে বড় রাজ্য সার্দিনিয়া-পিতমোঁতের প্রধান-মন্ত্রী। তিনি দেখলেন যে, এই রাজ্যটিকে কেন্দ্র করেই ধীরে ধীরে অন্য টুকরো রাজ্যগুলোকে একত্র করে ঐক্যবদ্ধ ইতালি গড়ে তুলতে হবে। এই সঙ্গে তিনি এটাও বুঝতে পারলেন যে, ইতালির সংঘবদ্ধ হবার চেষ্টাকে অস্ট্রিয়া কিছুতেই ভাল চোখে

দেখবে না, এবং তাকে বাধা দেবার জন্যে সব রকমে চেষ্টা করবে। কাজেই সবার আগে অস্ট্রিয়াকে জব্দ করে দুর্বল করে ফেলা দরকার। কাজটা কঠিন এবং একা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় বুঝতে পেরে, তিনি ফ্রান্সকে হাত করবার জন্যে চেষ্টা করলেন।

কাভুর

ফ্রান্স ও ইংলণ্ড ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার সঙ্গে যখন ক্রিমিয়ার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল, তিনি গিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন এই উদ্দেশ্যে যে, ফ্রান্সকে এইভাবে সাহায্য করে তিনি তাকে সার্দিনিয়া-পিদমোঁতের কাছে ঋণী করে রাখবেন এবং প্রতিদানে অস্ট্রিয়াকে জব্দ করবার সময় ফ্রান্সের সাহায্য চাইবেন। ঠিক তাই হল; চার বৎসর পরে ফ্রান্সের সাহায্যে কাভুর অস্ট্রিয়াকে উত্তর-ইতালি থেকে বিতাড়িত করবার জন্যে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন।

মাৎসিনি

ফরাসী সম্রাট্ তৃতীয় নেপোলিয়নের (১৮০৮—১৮৭৩ খ্রীঃ) কূটনৈতিক চালের জন্যে কিন্তু তাঁর সবটা উদ্দেশ্য সফল হল না। অস্ট্রিয়া এই যুদ্ধে হেরে যাচ্ছিল দেখেও, তৃতীয় নেপোলিয়ন কাভুরকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করেই হঠাৎ অস্ট্রিয়ার সঙ্গে সন্ধি করে বসলেন। কাভুর অস্ট্রিয়ার কবল থেকে শুধু লম্বার্ডি উদ্ধার করে নিতে পারলেন।

একদেশ ইতালি

এইভাবে একটা ধাক্কা খাওয়াতে ইতালিকে একজাতি, একদেশে পরিণত করবার আন্দোলন খুব জোরের সঙ্গে আরম্ভ হয়ে গেল। মাৎসিনির অগ্নিময়ী বাণী সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে লাগল। গ্যারিবল্ডির নেতৃত্বে নেপ্‌ল্‌স্ এবং সিসিলিতে বিদ্রোহ হল। গ্যারিবল্ডির অনুগত হাজার 'রেড শার্ট' নামধারী সৈন্যদল সিসিলিতে অসামান্য বীরত্ব দেখাল। ফরাসী বুর্বন-বংশের

রাজারা এই দু'টি রাজ্যে রাজত্ব করছিলেন, তাঁরা আর সেখানে টিকে থাকতে পারলেন না। গ্যারিবল্ডির কাছে তাড়া খেয়ে তাঁরা পলায়ন করলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই ইতালির সব কয়টি রাজ্য একসঙ্গে মিলিত হল এবং সার্দিনিয়া-পিদমোঁত-লম্বার্ডির রাজা ভিক্টর ইমানুয়েলকে (দ্বিতীয়) (১৮২০—১৮৭৮ খ্রীঃ) ইতালির সমস্ত লোক রাজা বলে মেনে নিল। বাকী রয়ে গেল শুধু অস্ট্রিয়া-কবলিত ভেনিসিয়া। কিন্তু তাকেও বেশীদিন ইতালির বাইরে থাকতে হল না।

ইতালিয়ানরা বুঝেছিল যে, একা তাদের পক্ষে অস্ট্রিয়ার কাছ থেকে ভেনিসিয়া কেড়ে নেওয়া সম্ভব নয়, তাই তারা নজর রাখল কখন অস্ট্রিয়া অন্য দেশের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে বিব্রত হয়। বছর কয়েকের মধ্যেই সে সুযোগও মিলে গেল। বিসমার্কের নেতৃত্বে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রাসিয়া অস্ট্রিয়াকে আক্রমণ করে যখন নাজেহাল করে তুলছিল, ঠিক সেই সুযোগে ইতালিয়ানরা আর সময় নষ্ট না করে এগিয়ে এসে ভেনিস দখল করে নিল। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ও প্রাসিয়ার মধ্যে যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে, ইতালিয়ানরা রোমও দখল করে নিয়ে সমগ্র ইতালিকে এক ঐক্যবদ্ধ রাজ্যে পরিণত করল। কাভুর তখন পরলোকে, তাঁর জীবনের সাধনার এই পূর্ণ-পরিণতি তিনি দেখে যেতে পারেন নি।

রাজনীতিতে বিশৃঙ্খলা

কাভুর তাঁর জীবনে একটা মাত্র ভুল করে গিয়েছিলেন। তিনি দেশে আধুনিক রাজনীতি প্রবর্তন করলেন বটে, কিন্তু সংঘবদ্ধ একটা দল গড়ে

কনস্টান্টিনোপলে সুদৃশ্য হর্ম্যরাজি

তোলার চেষ্টা তিনি করেন নি। বর্তমান যুগে রাজনীতিতে দল অবশ্য-প্রয়োজনীয়। এই দলের সততা ও শক্তির উপরেই সমস্ত দেশের উন্নতি-

অবনতি নির্ভর করে। কাভুরের প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ, তাই তাঁকে কেন্দ্র করে বহু লোক একত্র হতেন, কিন্তু তাকে একটা সুগঠিত দল বলা চলে না।

কাভুরের মৃত্যুর পর ইতালির একতা আর নষ্ট হল না বটে, কিন্তু তার রাজনীতিতে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ইতালির রাজনৈতিক জীবনে এই যে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়েছিল, ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনির অভ্যুদয় পর্যন্ত তা' দূর হয় নি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান

এই সময়ের মধ্যে যে-সব প্রধানমন্ত্রী দেশ শাসন করেছেন, তাঁদের ভিতর একমাত্র **জিওলিতির** নামই উল্লেখযোগ্য। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ইতালির প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। সেই সময়েই ইতালিতে একটা **সমাজতান্ত্রিক দল** গড়ে উঠেছিল। এই দলের উদ্দেশ্য ছিল দেশের বড় বড় সমস্ত কল-কারখানা, রেলওয়ে, স্টীমার প্রভৃতি গবর্নমেণ্টের হাতে নিয়ে আসা এবং এমন সব আইন-কানুন তৈরি করা, যার ফলে দেশের কোন লোক খুব বেশী ধনীও হতে পারবে না, আবার খুব গরিব হয়েও থাকবে না।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইতালিয়ান গবর্নমেণ্ট মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেবার প্রস্তাব করবার পর, এই সমাজতান্ত্রিক দল তার বিরুদ্ধে আপত্তি জানাল। গবর্নমেণ্ট সে আপত্তি শুনলেন না; তাঁদের আশা ছিল যে মিত্রশক্তির দলে থাকলে যুদ্ধ-শেষে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গারীকে ঠেঙ্গিয়ে, বেশ কিছু শাঁসালো রকম জায়গা আদায় করে নেওয়া যাবে। কাজেই ইতালিয়ান গবর্নমেণ্ট, ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিলেন। কিন্তু ইতালিয়ান সৈন্যরা যুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারল না। মিত্রশক্তি তাদের বীরত্বে মুগ্ধ তো হলই না, বরং উলটে যুদ্ধের খরচের চাপে, ইতালিতেই ভয়ানক আর্থিক দুরবস্থা দেখা দিল।

ভার্সাইয়ের শান্তি বৈঠকেও ইতালির ভাগ্যে **ত্রিপোলির মরুভূমি** ছাড়া আর কিছু জুটল না। সে আশা করেছিল যে, ফিউম বন্দর, ডালমেসিয়ার উপকূল এবং আলবেনিয়া—এই কটা জায়গা সে পাবে, কিন্তু তার সে আশা পূর্ণ হল না। এই খবর দেশে পৌঁছাবার পর লোকে গবর্নমেণ্টের উপর ভয়ানক ক্ষেপে গেল, সমাজতান্ত্রিক দল প্রবল হয়ে উঠতে লাগল।

ফ্যাসিস্ট দল গঠন

বেনিটো মুসোলিনী (১৮৮৩—১৯৪৫ খ্রীঃ) ছিলেন সমাজতান্ত্রিক দলের নেতা। যুদ্ধে যোগদানের প্রশ্ন নিয়ে দলের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হয়ে যায়। তিনি এই সমাজতান্ত্রিক দল ত্যাগ করেন এবং যুদ্ধে চলে যান। যুদ্ধে যাবার আগে পর্যন্ত তিনি 'আভান্তি' নামক একটি খবরের কাগজের সম্পাদকের কাজ করেন। যুদ্ধের পর, এই মুসোলিনী দেশে সমাজতন্ত্রবাদীদের সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে উঠলেন। তিনি যুদ্ধফেরত সৈনিকদের নিয়ে ২৩শে মার্চ, ১৯১৯ খ্রীঃ একটা শক্তিশালী দল গড়ে তুললেন। এরই নাম **ফ্যাসিস্ট** দল।

সমাজতান্ত্রিক দল তাদের আদর্শ প্রচার করতে গিয়ে এত বেশী বাড়াবাড়ি করে তুলেছিল যে, দেশের বহু লোক তাদের বিরুদ্ধে মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ট দলে যোগ দিতে আরম্ভ করল। কালো-শার্ট-পরিহিত এই ফ্যাসিস্ট দলের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক দলের প্রায় রোজই রাস্তায় ঘাটে মারামারি হত।

ফ্যাসিস্ট-দল সমাজতান্ত্রিক দলের আদর্শ খানিকটা গ্রহণ করল বটে, কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তি ঠিক থাকবে, রাষ্ট্রও বজায় থাকবে, দেশে ধনী ও গরিব থাকবে, সবই তারা মেনে নিল। শুধু ধনী যাতে গরিবের উপর অত্যাচার করতে না পারে, মালিক যাতে শ্রমিককে পিষে না মারতে পারে, তার জন্যে কড়া কড়া সব ব্যবস্থা হল। ফ্যাসিস্ট পরিকল্পনা ইতালিয়ানদের খুব মনঃপূত হল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

১৯২২ খ্রীস্টাব্দে, মুসোলিনী দেখলেন যে, এবার গবর্নমেণ্ট হস্তগত করবার মত ক্ষমতা তাঁর দলের হয়েছে। তিনি গবর্নমেণ্টকে চরম পত্র দিয়ে রোম অভিমুখে অভিযান করলেন। **এই ফ্যাসিস্ট অভিযানের** খবর পেয়েই তখনকার দুর্বল গবর্নমেণ্ট ভয় পেয়ে পদত্যাগ করলেন—বিনা বাধায় মুসোলিনী প্রধান-মন্ত্রীর গদীতে আরোহণ করলেন। পার্লামেণ্টের কাছে তিনি ডিক্টেটরের অধিকার চাইলেন। পার্লামেণ্ট তাঁর প্রার্থিত ক্ষমতা তাঁর হাতে তুলে দিলেন, ফলে তিনি ইতালির **সর্বময় প্রভু** হয়ে বসলেন।

এই ক্ষমতা হাতে পেয়েই মুসোলিনী বহু সরকারী কর্মচারীকে পদচ্যুত করে সেই সব পদে, ফ্যাসিস্ট-দলের লোক নিযুক্ত করতে আরম্ভ করলেন।

সমাজতান্ত্রিক দলের উপরে তিনি সব চেয়ে বেশী খাপ্পা ছিলেন; তাদের সমস্ত সংঘ, সমস্ত সংবাদপত্র তিনি নির্বিচারে বন্ধ করে দিলেন।

মুসোলিনীর আমলে ইতালির আর্থিক উন্নতি যথেষ্ট হয়, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। ইতালিয়ান গবর্নমেণ্ট একটা সংঘবদ্ধ সুগঠিত দলের দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় তার শক্তিও অনেক বেড়ে যায়। ফ্যাসিস্ট ইতালির সাম্রাজ্য-বিস্তারের আকাঙ্ক্ষাও খুব বেশী ছিল। ভার্সাই-সন্ধিতে পাওয়া ত্রিপোলি এবং ইতালিয়ান সোমালিল্যাণ্ড নিয়ে সে সন্তুষ্ট হল না। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সে ইথিওপিয়া আক্রমণ করে ও আফ্রিকার এই বিরাট দেশটিকে জয় করে নেয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইতালি যোগ দিয়েছিল জার্মেনীর পক্ষে। ফ্রান্স, জার্মেনীর হাতে প্রায় পরাজিত হবার পর, সে তাকে পিছন থেকে আক্রমণ করে বসে।

ইতালি যুদ্ধ **ঘোষণা** করবার পরই, ফরাসী সরকারের তরফ থেকে এল সন্ধির আবেদন এবং কি শর্তে সন্ধি করা যেতে পারে, তারই আলোচনার জন্যে **হিটলার ও মুসোলিনী** মিলিত হলেন মিউনিক শহরে। জার্মেনীর সঙ্গে ফরাসীর যুদ্ধ-বিরতি-চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর, রোম নগরে ইতালির সঙ্গেও ফ্রান্সকে এক সন্ধি করতে হয়। ফরাসী সীমান্তের নিকটবর্তী আল্পস পর্বতে ফরাসীদের যে সব দুর্গ ও ঘাঁটি ছিল, তা ইতালিয়দের হাতে সমর্পণ করতে হল।

ইতালি এখন শত্রু-পর্যায়ভুক্ত হওয়ায় ভূমধ্যসাগরে ইংরেজ-অবরোধ প্রবল হয়ে উঠল। মাল্টা দ্বীপের পূর্বদিকে ইংরেজ নৌ-শক্তির সম্মুখীন হয়ে ইতালির নৌ-বহর পর্যুদস্ত হল।

কিন্তু ইতালিয়রা নিশ্চেষ্ট ছিল না। তারা সমরসাজে অবতীর্ণ হল আফ্রিকার প্রদেশে প্রদেশে। তারা ব্রিটিশ সোমালিল্যাণ্ডের উপর আক্রমণ চালিয়ে ইংরেজ সৈন্যকে বহিষ্কৃত করে দিল সে-দেশ থেকে। লিবিয়াতেও যুদ্ধ চলল। এখানে ইংরেজরা প্রথমটা জয়ী হলেও শেষ পর্যন্ত তাদের অপসৃত হতে হল। তারপর ইতালিয় সৈন্য মিশরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সোলম নগর অধিকার করল।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর জার্মেনী, ইতালি ও জাপান এই অক্ষশক্তিত্রয়ের ভিতর, **দশ বৎসরের জন্যে** এক চুক্তি সম্পাদিত হল।

অক্টোবর মাসে আলবেনিয়া-সীমান্ত পার হয়ে ইতালিয় সৈন্য **গ্রীস আক্রমণ** করল। গ্রীকেরা দৃঢ়প্রযত্নে আত্মরক্ষা করতে লাগল।

গ্রীকেরা সমগ্র সীমান্তরেখা ধরে অগ্রসর হতে লাগল। সার্দিনিয়ার অদূরবর্তী সমুদ্রে নৌ-যুদ্ধ সংঘটিত হল এবং তাতে কতকগুলি ইতালিয় জাহাজ বিনষ্ট হল। ইতালির সমস্ত নগর ও বন্দরের উপর ব্রিটিশ বিমান ক্রমাগত হানা দিতে থাকল। এদিকে আফ্রিকার যুদ্ধেও ইতালি কোনমতেই আর

মুসোলিনী

নিজের প্রাধান্য রক্ষা করতে পারল না। তবে গ্রীসের যুদ্ধের গতি ফিরিয়ে দিল জার্মান সৈন্য এসে। হিটলার ইতালিয়দের সাহায্যের জন্যে বাহিনী প্রেরণ করতে বাধ্য হলেন।

আবিসিনিয়ার যুদ্ধে ইংরেজসেনার হস্তে ভীষণভাবে পরাজিত হয়ে ইতালিয়রা ফিরে এল। সেখানে নির্বাসিত সম্রাট্ হাইলে সেলাসী পাঁচ বৎসর পরে আবার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন।

ইতালি আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, ইতালিয় জনসাধারণ মুসোলিনীর বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। তাদের চাপে পড়ে মুসোলিনীকে কর্তৃত্ব ত্যাগ করতে হল। মার্শাল বাদোগলিও নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করে মুসোলিনীকে বন্দী করে রাখলেন এবং জার্মেনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।

এদিকে ইংরেজ অষ্টম বাহিনী এসে ইতালির মূল ভূখণ্ডে অবতরণ করল। তাদের অগ্রগতিকে বাধা দেবার কোন উপায় না দেখে ইতালিয়ান গবর্নমেণ্ট আত্মসমর্পণ করল (৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩)। ইতালিয় নৌবাহিনীও আত্মসমর্পণ করল মাল্টাতে।

কিন্তু ইতালিয় ভূখণ্ডের অধিকাংশেই তখন প্রবল জার্মান সেনার ঘাঁটি রয়েছে। মুসোলিনীর আমন্ত্রণে তারা এসেছিল ইতালি রক্ষার জন্যে। এখন সেই সব সৈন্যের সঙ্গে ইংরেজবাহিনীর ক্রমাগত যুদ্ধ চলল। নেপল্‌স্, স্যালার্নো, পম্পিয়াই প্রভৃতি শহর একে একে ইংরেজবাহিনীর করায়ত্ত হল।

ইতিমধ্যে ইতালিতে একটি জাতীয় আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল। তারা "ইতালিয় পার্টিজান" নামে একটি জাতীয় বাহিনীও সংগঠন করেছিল। উত্তর-ইতালি দেখতে দেখতে এদেরই অধিকারে এল। মিত্রশক্তি যখন উত্তর-ইতালিতে এসে পৌঁছাল, তখন সবিস্ময়ে তারা দেখলে, ঐ "ইতালিয় পার্টিজান" দলই সেখানে দৃঢ়ভাবে অধিকার প্রতিষ্ঠা করে বসে আছে।

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে এপ্রিল, মুসোলিনী সুইজার্ল্যাণ্ডে পলায়ন করতে উদ্যত হয়েছিলেন। ঐ জাতীয় বাহিনীর লোক তাঁকে ধরে এবং গুলি করে ও পুড়িয়ে মারে। মুসোলিনীর সহকারী, মার্শাল গ্রাসিয়ানিকেও তারাই বন্দী করে মার্কিন সৈন্যের হাতে সমর্পণ করে।

১৯৪৫-এর মে মাসে, ইতালিতে অবস্থিত জার্মান সৈন্য বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করল। ডিসেম্বর মাস থেকে মিত্রশক্তির সৈন্যবাহিনীগুলি ইতালি থেকে একে একে অপসৃত হতে থাকল। ইতালিয়গণ শেষদিকে, জার্মেনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে হিটলার ও মুসোলিনীর বিরোধিতা করেছিল বলেই মিত্রশক্তির কাছ থেকে সদয় ব্যবহার পেল।

ইতালির রাজা **ভিক্টর ইম্যানুয়েল** সিংহাসন ত্যাগ করলেন। ইতালিতে ১০ই জুন, ১৯৪৬ খ্রীঃ প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হল। ইম্যানুয়েলের পুত্র **হাম্বার্ট ২য়** নাম নিয়ে রাজা হয়েছিলেন। তিনি সিংহাসন ত্যাগ করলেন। প্রধানমন্ত্রী গ্যাসপেরি শাসনতন্ত্রের প্রধান হলেন। ইম্যানুয়েল ঈজিপ্টে চলে গেলেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। **এনরিকো ডি নিকোলা** প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন।

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের এক সাধারণ নির্বাচনে "খ্রীস্টান গণতান্ত্রিক দল" ইতালির শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। তোগলিয়াতির নেতৃত্বে কম্যুনিস্ট-পরিচালিত "পপুলার ফ্রন্ট দল" অল্প ভোটে হেরে যায়। ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে সাধারণ নির্বাচনের ফলে সিনর পেলা মন্ত্রিসভা গঠন করেন। খ্রীষ্টান ডেমোক্রাট দলের অ্যান্টোনিও সেগনি ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারি প্রধান মন্ত্রী হন। জি সারাগাত বর্তমানে ইতালির প্রেসিডেন্ট এবং অ্যালডো মোরো প্রধান মন্ত্রী।

বর্তমান ইতালিয়ান গবর্নমেণ্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব-পুষ্ট। ইতালির কম্যুনিস্ট পার্টি বেশ শক্তিশালী। এম. এস. আই. নামে এক ফ্যাসিস্ট আন্দোলনও ইতালিতে দেখা দিয়েছে।

ইতালির আফ্রিকাস্থিত উপনিবেশগুলির নাম লিবিয়া, ইরিত্রিয়া এবং সোমালিল্যাণ্ড; এদের মধ্যে লিবিয়া ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীন হয়েছে; ইরিত্রিয়া ইথিওপিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এবং সোমালিল্যাণ্ড ১৯৬০ খ্রীঃ স্বাধীন হয়েছে।

ইতালি উত্তর-অতলান্তিক চুক্তি-সংস্থার সদস্য এবং ইওরোপীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় যোগদান করেছে।

ত্রিয়েস্ত নিয়ে যুগোস্লাভিয়ার সঙ্গে ইতালির যে মনোমালিন্য চলছিল বর্তমানে অনেকাংশে তার নিষ্পত্তি হয়েছে। ৫ই অক্টোবর ১৯৫৪ খ্রীঃ ইতালির সঙ্গে যুগোস্লাভিয়ার এক চুক্তি হয়েছে। তার ফলে ইতালি ত্রিয়েস্তের উত্তর ভাগ ও ত্রিয়েস্ত বন্দরের অধিকার লাভ করেছে (আয়তন ৯০ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা ৩,০০,০০০)। যুগোস্লাভিয়া ২০০ বর্গমাইল স্থানের অধিকার পেয়েছে (লোকসংখ্যা ৭৩,৫০০)।

ইতালির অধিকাংশ অধিবাসী রোমান ক্যাথলিক। এর আয়তন ৩০১২২৩'৯৮ বর্গ কিলোমিটার (১,১৬,২৮০ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ৫,৩৬,৩৯,০০০।

প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের আমলে জার্মেনীতে অনেক দুর্ধর্স, স্বাধীনচেতা জাতির পরিচয় পাওয়া যায়। বিখ্যাত রোমান সেনাপতি জুলিয়াস সীজার তাঁর অভিযানকালে, গল দেশের পূর্বে রাইন নদীর সন্নিকটে অর্ধসভ্য জার্মানগণের সংস্পর্শে আসেন। ফ্রাঙ্ক, স্যাক্সন, গথ, ভিসিগথ প্রভৃতি জাতিরা এরূপ দুঃসাহসিক যোদ্ধা ছিল যে, সীজারও তাদের অনেককে পরাভূত করতে পারেন নি।

ট্যাসিটাস প্রমুখ রোমান ঐতিহাসিকদের লেখা থেকে পাওয়া যায় যে, জার্মানরা তখন অশিক্ষিত বর্বর ছিল বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে বীরত্ব, স্বাধীনতাপ্রিয়তা ও স্বায়ত্তশাসনবোধ খুব প্রখর ছিল।

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ফ্রাঙ্ক, লম্বার্ড, ভ্যাণ্ডাল, অস্ট্রোগথ প্রভৃতি টিউটন বা জার্মান জাতি পশ্চিম-ইওরোপ ও উত্তর-আফ্রিকায় অনেক আলাদা রাজ্যের পত্তন করে। এই সময় থেকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইওরোপে এক বিশৃঙ্খলার যুগ চলে। তারপরে অষ্টম শতাব্দীর শেষের দিকে ফ্রান্সের বিখ্যাত সম্রাট্ **শার্লামেন** (৭৪২—৮১৪ খ্রীঃ) এসে একচ্ছত্র কেন্দ্রগত সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি ইতিহাসে ফ্রান্সের সম্রাট্ হলেও জাতিতে জার্মানই ছিলেন।

মধ্যযুগে ইওরোপের নানাদেশে যখন কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তি শিথিল হয়ে পড়ে, তখন জার্মেনীতে বহু দুর্দান্ত সামন্ত-রাজার অভ্যুত্থান হয়। তাঁরা রাজাকে

এবং "পবিত্র রোমক সম্রাট্"কে মানতেন না—এবং এর পর থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত জার্মেনীতে এই সামন্তশ্রেণী এবং ছোট ছোট শাসকগণই কর্তৃত্ব করেন। ফলে ইওরোপের পশ্চিম দেশগুলির মত জার্মেনীতে একটা রাজনৈতিক ঐক্যবোধ গড়তে বাধা পায়। সমস্ত জার্মেনী এক রাষ্ট্রের অধীন হয়েছে মাত্র উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে, বিসমার্কের আমলে।

মধ্যযুগে প্রসিদ্ধ সম্রাট্ শার্লামেনের অনুকরণে, জার্মান সম্রাট্গণই

মার্টিন লুথার

"পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের" অধীশ্বর বলে পরিচিত হন। জার্মেনীর নৃপতিগণ রোমান-সম্রাট্ হবার উচ্চাভিলাষ ও আলেয়ার পিছনে ঘুরে, নিজের দেশ জার্মেনীর ঐক্যের দিকে মনোযোগ দিতে পারেন নি। ইতালিতেও তাঁরা নিজেদের প্রতিপত্তি বজায় রাখবার জন্যে জাতীয় ঐক্যবোধের প্রতিকূলতা করেছেন। ফলে জার্মান সম্রাট্গণেরও সমস্যার অবধি ছিল না এবং জার্মেনী ও ইতালিকেও, অনেক শতাব্দী পর্যন্ত ঐক্যহীন, বহুধা-বিভক্ত দেশরূপেই কাটাতে হয়েছে।

শার্লামেনের মৃত্যুর অনতিকাল পরে যখন তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য ভেঙে যায়, তখন থেকেই মোটামুটি ফ্রান্স, জার্মেনী, ইতালি প্রভৃতি আলাদা আলাদা দেশের উৎপত্তি হয়। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে সম্রাট্ **'ওটো দি গ্রেট'ই** (৯১২—৯৭৩ খ্রীঃ) প্রথম জার্মানদের অনেকটা এক জাতিতে পরিণত করেন। ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের যুগে জার্মেনীতে অনেক সাহসী যোদ্ধা বা নাইটের উল্লেখ পাওয়া যায়। একদল টিউটন বা জার্মান নাইট সন্ন্যাসী-শ্রেণীই পূর্ব-প্রাসিয়া রাষ্ট্রের পত্তন করেন। পরে জার্মেনীর ব্রাণ্ডেনবুর্গ-রাষ্ট্র এই পূর্ব-প্রাসিয়া থেকেই প্রাসিয়া রাজ্য নাম লাভ করে। ইওরোপে **রেনেসাঁস** বা বিদ্যার নবোন্মেষের সময় যখন ধর্মসংস্কার আন্দোলনের উদ্ভব হয়, তখন জার্মেনীতে ধর্ম-প্রতিবাদকারী-দের মধ্যে **মার্টিন লুথারই** (১৪৮৩—১৫৪৬ খ্রীঃ) ছিলেন সকলের প্রধান। এই আন্দোলন জার্মেনীতে খুবই ব্যাপক হয়েছিল এবং দেশের বিভিন্ন রাজ্যের প্রায় অর্ধেক সামন্ত-শাসকবৃন্দ **প্রোটেস্টাণ্ট** ধর্ম গ্রহণ করেন, আর অর্ধেক প্রাচীনপন্থী **রোমান ক্যাথলিক** থেকে যান।

এরপর থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত, জার্মেনীতে বিভিন্ন প্রোটেস্টাণ্ট ও ক্যাথলিক ধর্মপন্থীদের মধ্যে ভীষণ কলহ, বিরোধ ও যুদ্ধ চলতে থাকে। এতে দেশে শুধু অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলাই দেখা দেয়। এই ধর্মসংক্রান্ত কলহের ভীষণ পরিণতি হয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে **"ত্রিশ বৎসরব্যাপী যুদ্ধে"** (১৬১৮—১৬৪৮ খ্রীঃ)। এই যুদ্ধে জার্মেনীর ভয়াবহ ক্ষতি হয়েছিল।

এই যুদ্ধ প্রথম জার্মেনীর বোহেমিয়া রাজ্যে সূত্রপাত হয় এবং আস্তে আস্তে সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়ে। জার্মেনীর আভ্যন্তরীণ অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে ক্রমে ডেনমার্ক, সুইডেন, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি শক্তি নিজেদের স্বার্থসাধনের জন্যে এই যুদ্ধে যোগদান করে। বিদেশী শক্তিদের স্বার্থপর রাজনীতির ফলে, এই ত্রিশ-বৎসরের যুদ্ধ অনিবার্যভাবে চলতে থাকে অথচ জার্মানদের আর এর উপর কোন হাত ছিল না। ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে **ওয়েস্টফেলিয়ার সন্ধি** দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান হয়। এই যুদ্ধের ফলে ফ্রান্স ও সুইডেনের সাম্রাজ্য-প্রসারতা শুরু হয়, আর সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় জার্মেনী। তার কৃষি-শিল্প ধ্বংস হয় এবং দেশের মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদ আরও তীব্রভাবে বৃদ্ধি পায়। তিন শতের উপর ছোট-বড় সামন্তরাজ—যাঁর যাঁর রাজ্যে একরূপ স্বাধীনভাবেই বিরাজ করতে থাকেন। ত্রিশ বর্ষব্যাপী যুদ্ধের ফলে জার্মান দেশের অখণ্ডতা সুদূরপরাহত স্বপ্নে পরিণত হয়।

জার্মেনীর খণ্ডরাজ্যগুলির মধ্যে প্রধান ছিল **ব্রাণ্ডেনবুর্গ ; হোহেনজোলান**

রাজবংশ এখানে রাজত্ব করতেন। জার্মেনীর অন্তর্ভুক্ত সব কয়টি রাজ্য ও জমিদারীর মধ্যে এই ব্রাণ্ডেনবুর্গই হয়ে ওঠে সবচেয়ে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধিশালী। এই ছোট রাজ্যটি আকারে ও শক্তিতে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে, **গ্রেট ইলেক্টর**-এর শাসনকালে বেশ পরাক্রান্ত হয়ে ওঠে। পূর্ব-প্রাসিয়ায় হোহেনজোলার্ন রাজবংশের একটি শাখা ছিল। কালক্রমে ব্রাণ্ডেনবুর্গ যখন শক্তিমান্ রাজ্যে পরিণত হয়, তখন এর নাম হয় **প্রাসিয়া**।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, প্রসিদ্ধ **ফ্রেডারিক দি গ্রেট** (১৭১২—১৭৮৬ খ্রীঃ) প্রাসিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ক্রমাগত সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে

'ত্রিশ বৎসরব্যাপী যুদ্ধে'র পরিসমাপ্তি

অস্ট্রিয়ার কাছ থেকে সাইলিসিয়া প্রদেশটি কেড়ে নিয়ে, ফ্রেডারিক প্রাসিয়ার আয়তন আরও অনেক বাড়িয়ে ফেলেন। পোল্যাণ্ড ভাগ করে 'পশ্চিম-প্রাসিয়া'ও তিনি অধিকার করেন। ফ্রেডারিক প্রাসিয়ার সামরিক শক্তি-বৃদ্ধির দিকে খুব মনোযোগ দিয়েছিলেন। তাঁর আমলে সেখানকার লোকসংখ্যা দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছিল এবং প্রাসিয়ার সামরিক শক্তি, আশেপাশের দেশগুলির কাছে রীতিমত ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফ্রেডারিক ৪৬ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন এবং তাঁর রাজত্বে প্রাসিয়ার সর্বতোমুখী উন্নতি হয়েছিল। তাঁর

গৌরবপূর্ণ রাজ্য-চালনার ফলস্বরূপ, প্রাসিয়া একটি ছোট রাজ্য হতে ইওরোপের প্রথমশ্রেণীর শক্তিগুলির পর্যায়ভুক্ত হয়। জার্মেনীর ভবিষ্যৎ শ্রেষ্ঠতার পথ ফ্রেডারিকই তৈরি করে গিয়েছিলেন।

গ্রেট ইলেক্টর

নেপোলিয়নের জার্মেনী জয়

ফ্রেডারিকের মৃত্যুর পর তাঁর স্থান পূর্ণ করবার মত শক্তিশালী দূরদর্শী লোক জার্মেনীতে কেউ ছিলেন না। দুর্বলচিত্ত সব লোকদের হাতে গবর্নমেণ্ট গিয়ে পড়ল। শক্তিমান্ অধিনায়কের অভাবে সৈন্যদলের বিশেষ অবনতি হতে লাগল।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট যখন দুর্বারগতিতে দেশ-বিদেশ জয় করে বেড়াচ্ছেন, তখন তিনি দেখলেন, জার্মেনী জয় করবার এই সুযোগ। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রাসিয়া আক্রমণ করলেন এবং বিখ্যাত **জেনার যুদ্ধে** জয়লাভ করে বার্লিন নগরী অধিকার করলেন। নেপোলিয়নের হুকুমে, তাঁরই সমস্ত শর্তে রাজী হয়ে প্রাসিয়া সন্ধি করল। জার্মেনীতে অস্ট্রিয়ার হ্যাপসবুর্গ-সম্রাট্দের "পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যে"র যেটুকু চিহ্ন তখনো বাকী ছিল, নেপোলিয়ন তা'ও নিঃশেষে মুছে দিলেন এবং প্রাসিয়ার প্রায় অর্ধেক তিনি কেড়ে নিলেন।

ফ্রেডারিক দি গ্রেট

কিন্তু জার্মেনী জয় করেও তিনি তার সবচেয়ে বড় উপকার করলেন এই হিসাবে যে, জার্মেনীর রাইন নদীর পার্শ্ববর্তী অনেক ছোট ছোট রাজ্য ও জমিদারিগুলোকে এক করে দিলেন তিনি—তার নাম হল **রাইন কনফেডারেশন**। ছোট ছোট কতকগুলো রাজ্য, নিজেদের ঘরোয়া স্বাধীনতা সম্পূর্ণ বজায় রেখে দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি এবং অর্থনীতির বড় বড় সমস্যাগুলি সম্বন্ধে যখন একমত হয়, তখন তাকে বলে 'কনফেড়ারেশন' গঠন করা।

নেপোলিয়নের প্রাসিয়া-জয়ের পর প্রাসিয়ার লোকদের ভিতর এক নবজাগরণ ও জাতীয়তার সঞ্চার হয়। নেপোলিয়ন হুকুম দিয়েছিলেন যে, তিনি জার্মান সৈন্যদলের জন্যে যে সংখ্যা ঠিক করে দেবেন তার বেশী সৈন্য রাখা চলবে না। পরাজিত প্রাসিয়া দেখল, এই হুকুম অমান্য করে লাভ নেই; তা করতে গেলে নেপোলিয়নের সঙ্গে আবার যুদ্ধ করতে হয় এবং যুদ্ধ করতে গেলে তারা পেরে উঠবে না। অথচ দেশের সৈন্য না বাড়ালে ভবিষ্যতে কোনদিন নেপোলিয়নকে তাড়াবার উপায়ও আর হবে না। কাজেই তারা ঠিক করল যে, দেশের সমস্ত সবল, সুস্থদেহ যুবককে সামরিক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেই নেপোলিয়নের এই আদেশকে ফাঁকি দিতে হবে। দেশের সমস্ত যুবক যদি যুদ্ধবিদ্যা শিখে রাখে, তা হলে সুযোগ পেলেই, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সৈন্যদল গড়ে তোলা কঠিন হবে না।

নেপোলিয়ন যে কনফেডারেশন তৈরি করে দিয়েছিলেন, তার কল্যাণে

জার্মানরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি ছেড়ে সমস্ত লোক নিজেদের এক জার্মান জাতি বলে ভাবতে শিখল। জাতি হিসাবে সংঘবদ্ধ হয়ে থাকা যে নিজেদের সুবিধা ও স্বার্থের জন্যেই দরকার, তাও তারা বুঝতে পারল। রাইন কনফেডারেশন জার্মেনীর পরবর্তী ঐক্যের পথের সূচনা করে দিয়েছিল। ওয়াটার্লুর যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয়ে ডিউক অব ওয়েলিংটনের সঙ্গে প্রাসিয়ার সৈন্যগণ একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিল।

বিসমার্কের অভ্যুদয়

ওয়াটার্লুর যুদ্ধে, নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর, প্রাসিয়া তার হৃত অংশ ফিরে পেল বটে, কিন্তু দেশে তখন কোন শক্তি-শালী রাজা বা নেতা না থাকায়, প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে নিজেদের ভিতর ঝগড়া চলল। অস্ট্রিয়ার হ্যাপসবুর্গ-বংশীয় সম্রাট্ তখন জার্মেনীতে আধিপত্য করতেন।

পরিণত বয়সে ফ্রেডারিক দি গ্রেট

নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধের সময়, প্রাসিয়া ও জার্মেনীতে যে জাতীয়তার জাগরণ হয়েছিল, তাতে করে দেশে একটা ঐক্যের চেষ্টা এসেছিল, তা আগেই বলা হয়েছে। ফ্রান্সের বিপ্লব জার্মেনী-তেও তুমুল সাড়া তুলেছিল। কিন্তু অস্ট্রিয়ার প্রধান নেতা মেটারনিকের পীড়নমূলক নীতির জন্যে, জার্মেনীতে জাতীয় ঐক্য-আন্দোলন সার্থক হতে পারল না। আর এক কারণ, এ সময়ে

প্রাসিয়াতে বিচক্ষণ, জবরদস্ত রাজনীতিজ্ঞ বিসমার্কের অভ্যুদয়। বিসমার্ক গণতন্ত্রবিরোধী ছিলেন। তিনি জার্মেনীকে ঐক্যবদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন, কিন্তু গণমতের ভিত্তিতে নয়। তিনি সংকল্প করেন, প্রাসিয়াকে শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করতে এবং প্রাসিয়ার নেতৃত্বে, জার্মেনীকে একদেশ করবার জন্যে। তিনি দেখলেন, অস্ট্রিয়াকে জার্মান কনফেডারেশন থেকে বিতাড়িত করতে না পারলে জার্মেনী এক মিলিত দেশ হতে পারে না।

বিসমার্ক

বিসমার্ক বুঝলেন যে, অস্ট্রিয়াকে যুদ্ধ না করে জার্মেনী থেকে তাড়ানো যাবে না। কিন্তু অস্ট্রিয়া তখন ছিল খুব শক্তিশালী দেশ। এত শক্তিমান্ একটা দেশকে যুদ্ধ করে হঠাতে হলে যে ক্ষমতা দরকার, জার্মেনীর তা ছিল না। তাই প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞ কাউন্ট বিসমার্ক এই সমস্যা সমাধানের জন্যে এগিয়ে এলেন।

১৮৬২ খ্রীন্টাব্দে বিসমার্ক প্রাসিয়ার প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি রাজাকে বুঝিয়ে দেন যে, পার্লামেণ্ট ভেঙে না দিলে কোন কিছুই করা যাবে না; যুদ্ধ করে অস্ট্রিয়াকে তাড়াতে হলে এবং প্রাসিয়ার নেতৃত্বে, বিরাট জার্মান-সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে হলে গোপনে এমন অনেক কাজ করতে হবে যা প্রকাশ্যে

জানাজানি হয়ে গেলে ভয়ানক ক্ষতি হবে। অথচ পার্লামেণ্ট বজায় থাকলে তার সদস্যেরা কথায় কথায় কৈফিয়ত চাইবেন এবং সব কাজ পণ্ড করবেন। তার চেয়ে পার্লামেণ্ট ভেঙে দিয়ে নিজেরা একমনে কাজ করা ভাল। রাজাও তাই বুঝলেন এবং পার্লামেণ্ট ভেঙে দিলেন।

এরপর, চার বৎসর বিসমার্ক অপ্রতিহত প্রতাপে দেশ শাসন করে প্রাসিয়াকে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে প্রস্তুত করে নিলেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কূটনৈতিক চালের জোরে অস্ট্রিয়াকে ঠকিয়ে দিয়ে, ডেনমার্কের কাছ থেকে স্লেজউইগ ও হলস্টিন—দুটো সামন্ত রাজ্য কেড়ে নিলেন। এই দুই রাজ্য নিয়েই আবার তাঁর সঙ্গে অস্ট্রিয়ার ঝগড়া বেধে গেল এবং তা থেকেই অস্ট্রিয়ার সঙ্গে প্রাসিয়ার যুদ্ধ।

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম

১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে **অস্ট্রিয়া আক্রমণ** করে বিসমার্ক ক্ষিপ্রগতিতে তাকে পরাজিত করলেন। অস্ট্রিয়ার কাছ থেকে কোন প্রদেশ তিনি কেড়ে নিলেন না, শুধু তাকে জার্মান কনফেডারেশন থেকে তাড়িয়ে দিলেন। জার্মান-সাম্রাজ্যের আয়তন-বৃদ্ধির চেয়ে, জার্মান জাতির মধ্যে ঐক্যপ্রতিষ্ঠাই ছিল বিসমার্কের প্রধান লক্ষ্য। অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করে তিনি জার্মেনীর উত্তরভাগের রাজ্যগুলিকে প্রাসিয়ার অধীনে সংঘবদ্ধ করে উত্তর-জার্মান যুক্তরাষ্ট্র গঠন করলেন।

জার্মেনীর ঐক্য-প্রতিষ্ঠার এই আয়োজন দেখে, ফ্রান্সের সম্রাট্ তৃতীয় নেপোলিয়ন (১৮০৮—১৮৭৩ খ্রীঃ) ভয়ানক ভয় পেলেন। তিনি ভ্রান্ত নীতির বশে প্রাসিয়ার অভিযানকে সময়মত বাধা দেন নি। এখন তিনি দেখলেন যে, জার্মেনী একটি শক্তিশালী দেশে পরিণত হলে ফ্রান্সের মহাবিপদ্; কারণ সুযোগ পেলেই সে ফ্রান্সকে নাজেহাল করে তুলতে পারবে। তাই জার্মেনীর জাতীয়

ঐক্য-প্রতিষ্ঠায় নেপোলিয়ন তলে তলে নানাভাবে বাধা দিতে লাগলেন। কিন্তু তিনি তাঁর নীতিতে শুধু ভুল করতে লাগলেন, কিছুই সুবিধা করতে পারলেন না। এদিকে বিসমার্ক বুঝেছিলেন যে, ফ্রান্সকে পরাজিত করতে না পারলে সম্পূর্ণ জার্মেনীকে একদেশে পরিণত করা কোনদিনই সম্ভব হবে না। সেইভাবে স্থিরচিত্তে তিনি নিজের কূটনীতিতে অগ্রসর হতে লাগলেন।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে বিসমার্ক সম্রাট্ তৃতীয় নেপোলিয়নকে চালে হারিয়ে দিয়ে **ফ্রান্স আক্রমণ** করেন। **সিডানের যুদ্ধে** ফ্রান্সের ভীষণ পরাজয় হল। বিসমার্ক ফ্রান্সের সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী দুটো প্রদেশ,—**আলসেস** ও **লোরেন** কেড়ে নিলেন এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের নামে, বহু কোটি টাকা তার কাছ থেকে আদায় করলেন। এই টাকায় জার্মেনী তার শিল্প-বাণিজ্যের অনেক উন্নতি করে নিল। ১৮ই জানুয়ারি, ১৮৭১ খ্রীঃ প্রাসিয়ার রাজা **প্রথম উইলিয়ম** (১৭৯৭—১৮৮৮ খ্রীঃ) সমস্ত সম্মিলিত জার্মান দেশের প্রথম সম্রাট্ হলেন। এতকাল পরে জার্মেনী **এক ঐক্যবদ্ধ দেশে** পরিণত হল।

বিসমার্কের কূটবুদ্ধি

বিসমার্কের কূটবুদ্ধি ছিল অসাধারণ। দেশকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন, দেশই ছিল তাঁর ধ্যান, ধারণা ও ধর্ম। এইজন্যে তিনি গায়ের জোরে কোন কোন কাজ করলেও শেষ পর্যন্ত তার ফল ভালই হত; কারণ এই সব কাজ করবার সময় তাঁর একমাত্র লক্ষ্য থাকত দেশের উন্নতি। রাজা প্রথম উইলিয়ম বিসমার্কের এই নীতি বুঝতেন, তাই তিনি তাঁকে কোনদিন কোন কাজে বাধা দেন নি।

বিসমার্ক কখনও অদৃষ্টের উপর নির্ভর করতেন না, শান্ত, সমাহিত চিত্তে, দূরদর্শিতার সঙ্গে প্রত্যেকটি সমস্যাকে তিনি বিচার করতেন এবং তার সমাধানের জন্যে সর্বরকমে প্রস্তুত হতেন। তাঁর সামরিক নীতি ছিল একসঙ্গে একটার বেশী যুদ্ধ কখনও করবেন না। এই নীতি অনুসরণ করেই তিনি অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স ও ডেনমার্ককে একসঙ্গে আক্রমণ করেন নি, তিনবারে তিনটা যুদ্ধে, তিনজনকে হারিয়ে দিয়েছেন। অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করবার সময় ফ্রান্সকে খুশী রেখেছেন, আবার ফ্রান্সকে ঠেঙাবার সময় অস্ট্রিয়াকে হাত করেছেন। রাশিয়া ও ইংলণ্ডের সঙ্গে তিনি সব সময় ভাব রেখে চলতেন এবং দেখাতেন যেন এরা তাঁর মস্ত বড় বন্ধু, তিনি বিপদে পড়লেই অমনি তারা ছুটে আসবে। জার্মেনীর শত্রুরা এতে অনেকটা ঠাণ্ডা থাকত।

১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে প্রথম উইলিয়ম মারা গেলে, **কাইজার** হলেন, তাঁর বড় ছেলে **ফ্রেডারিক**। কিন্তু ফ্রেডারিক তখন ভয়ানক অসুস্থ ছিলেন, কয়েক মাস পরেই তাঁর মৃত্যু হল। তাঁর পুত্র **দ্বিতীয় উইলিয়ম** (১৮৫৯—১৯৪১ খ্রীঃ) তখন রাজা হলেন।

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম

দ্বিতীয় উইলিয়মের বয়স তখন বেশী ছিল না, তা ছাড়া তিনি দাম্ভিক, ভাবপ্রবণ এবং অত্যন্ত জেদী প্রকৃতির লোক ছিলেন। বিসমার্কের সঙ্গে প্রথম থেকেই তাঁর খিটিমিটি বেধে গেল। বিসমার্ক বেশীদিন তাঁর প্রধানমন্ত্রীরূপে টিকতে পারলেন না, দুই বৎসর পরেই তাঁকে বিদায় নিতে হল। উদ্ধত-প্রকৃতির কাইজার বিসমার্কের একাধিপত্য বরদাস্ত করতে পারলেন না। বিসমার্কও কারও হুকুম মানতে অভ্যস্ত ছিলেন না। নীতিতেও দুইজন বিভিন্ন-পন্থী। জার্মেনী যখন এক অখণ্ড শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত হয়, তখন বিসমার্ক আর তার অধিকতর প্রসারের পক্ষপাতী থাকলেন না। তিনি বুঝেছিলেন, জার্মান-সাম্রাজ্য আরও বাড়াতে গেলে ইওরোপের প্রবল শক্তিদের শত্রুতা বরণ করতে হবে।

কাইজার বিসমার্ককে প্রধানমন্ত্রিত্ব হতে সরিয়ে দিলেন
(ড্রপিং দি পাইলট, ১৮৯০ খ্রীঃ)

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম ছিলেন অস্থির কল্পনাবিলাসী ও দুরন্ত

উচ্চাশাপরায়ণ। তিনি জার্মেনীকে দুর্জয় শক্তিতে উন্নীত করে বিশ্বজয়ের স্বপ্নে মেতে উঠলেন। প্রবীণ রাজনীতিবিদ বিসমার্ক যখন দেখলেন, অস্থিরমতি, তরুণ কাইজারকে কিছুতেই তাঁর নিজের মতে আনতে পারবেন না, তখন তিনি বাধ্য হয়ে প্রধানমন্ত্রিত্ব থেকে বিদায় নিলেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যের কর্তৃত্ব থেকে বিসমার্কের এই বিদায় নেওয়ার ঘটনাটি ইতিহাসে **"ড্রপিং দি পাইলট"** নামে বিখ্যাত হয়ে আছে।

বিসমার্কের তৈরী জার্মেনী ক্রমে, সামরিক শক্তি ও অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধিতে ইওরোপে কেন, সমগ্র পৃথিবীতে একটি প্রধান শক্তিশালী দেশে পরিণত হল। কাইজার তীব্রগতিতে ও ব্যাপকরূপে বৈজ্ঞানিক সমরাস্ত্র বাড়াতে আরম্ভ করলেন, এবং সমস্ত পৃথিবীর উপর আধিপত্য স্থাপনের স্বপ্ন পর্যন্ত দেখতে আরম্ভ করেন। শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রেও জার্মেনী ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং আমেরিকার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠল। আগে ইংলণ্ড জার্মেনীর অগ্রগতিতে নিরপেক্ষ ছিল, কিন্তু কাইজার যখন বিরাট নৌশক্তি-বৃদ্ধির পরিকল্পনায় হাত দিলেন, তখন ইংলণ্ডও জার্মেনীর বিরুদ্ধে ফ্রান্স ও রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হল। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মের সময় জার্মেনীর সবল অভ্যুদয় ইওরোপের অনেক দেশই সুনজরে দেখল না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

১৮৭১ থেকে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে 'সশস্ত্র নিরপেক্ষতার যুগ' বলা হয়। এই সময়, বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে, পরস্পর অবিশ্বাস ও সন্দেহ পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে যুদ্ধের কালো মেঘ, ভয়াল ভ্রূকুটি নিয়ে ঘনিয়ে ওঠে, কিন্তু তা কোনপ্রকারে ঠেকানো হয়। অবশেষে সার্বিয়ায়, **অস্ট্রিয়ার যুবরাজের হত্যাকাণ্ড** উপলক্ষ্য করে পৃথিবীজোড়া এক বিরাট যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা অগস্ট এই যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নবেম্বর শেষ হয়। এই যুদ্ধে জার্মেনীর পক্ষে ছিল তিনটি মাত্র দেশ—অস্ট্রিয়া-হাঙ্গারী, তুরস্ক ও বুলগেরিয়া, আর বিপক্ষে যুদ্ধ করেছিল তেইশটি দেশ। এ ছাড়া আমেরিকাও শেষের দিকে এসে মিত্রপক্ষে যোগ দিয়েছিল। দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের অবসানে জার্মেনী পরাজিত হয় এবং ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৮শে জুন, ফ্রান্সের **ভার্সাই** নগরীতে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর

বিশ্বযুদ্ধের শেষে পরাজিত দেশগুলি থেকে অনেক জায়গা কেড়ে নিয়ে বিজয়ী দেশগুলোর মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয় এবং ইওরোপের মানচিত্র নতুন করে আঁকা হয়। চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, এস্থোনিয়া, ফিনল্যাণ্ড এবং আলবেনিয়া—এই কয়েকটি **নতুন দেশের সৃষ্টি** হয়। পোলাণ্ডকে আলাদা দেশ করে দেওয়া হয় এবং জার্মেনীর **ডানজিগ** বন্দরকে একটি স্বাধীন শহরে পরিণত করে পোলাণ্ডকে সেই বন্দর মারফত বৈদেশিক বাণিজ্য চালাবার অনুমতি দেওয়া হয়। ডানজিগে পৌছাবার
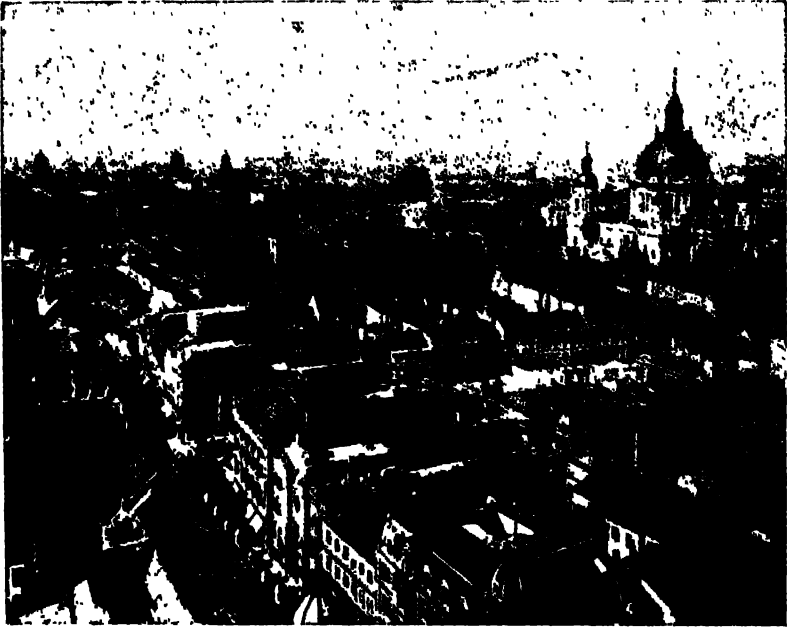
বার্লিন নগরীর দৃশ্য

জন্যে তাকে জার্মেনীর খানিকটা অংশও ছেড়ে দেওয়া হয়। এটাই **পোলিশ করিডর** নামে বিখ্যাত এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার প্রত্যক্ষ কারণ। হাঙ্গারীকে অস্ট্রিয়া থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়। জার্মেনীর সমস্ত উপনিবেশ কেড়ে নেওয়া হয়। এ ছাড়া যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ, জার্মেনীর কাছে একটা মোটা রকমের টাকা দাবি করা হয়। বার্ষিক কিস্তিতে তা পরিশোধ করে চললে, ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দের আগে সে টাকা শোধ হবার সম্ভাবনা ছিল না।

জার্মেনীর অন্তর্বিপ্লব

জার্মেনী রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে জিতেছিল, ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধেও সে হারে নি। তবুও তাকে ভার্সাই সন্ধিতে ইংরেজ, ফ্রান্স ও আমেরিকার নির্দেশমত শর্তে রাজী হতে হয়েছিল; তার কারণ, জার্মেনীর **অন্তর্বিপ্লব।** ব্রিটিশ অবরোধের ফলে জার্মেনীতে খাবার জিনিসের ভয়ানক অভাব ঘটে এবং তার জন্যে দেশে অশান্তি দেখা দেয়। জার্মেনীর আর একটা মস্ত অসুবিধা ছিল এই যে, তার দেশের সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য, সংবাদপত্র প্রভৃতি ছিল **ইহুদীদের হাতে।** বড় বড় সরকারী চাকরিও অনেকগুলি তারা দখল করে বসেছিল। যুদ্ধের সুযোগে ইহুদীরা কোটি কোটি টাকা রোজগার করে এবং যুদ্ধের শেষের দিকে, জার্মেনী হেরে যাবে এই ভয়ে, তারা বহু টাকা বিদেশে পাঠিয়ে দেবার চেষ্টা করতে থাকে; ফলে দেশের অর্থনীতিক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

কাইজার এই সব অনাচার ও অসুবিধা দূর করতে পারলেন না। ক্রমে ক্রমে স্থল-সৈন্য, নৌ-সৈন্য এবং কারখানার শ্রমিকেরা ক্ষেপে উঠতে লাগল। পার্লামেন্টেও ভয়ানক গোলযোগ দেখা দিল। সমাজতান্ত্রিক সদস্যরা যুদ্ধের খরচ মঞ্জুর করতে রাজী হলেন না। অবশেষে ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর **উইলহেল্‌ম্‌সহাভেন** নৌ-বহরের সৈন্যেরা **বিদ্রোহ** ঘোষণা করল। দেখতে দেখতে বিদ্রোহের আগুন কীল, হামবুর্গ, ব্রিমেন, বার্লিন প্রভৃতি বড় বড় শহরে ছড়িয়ে পড়ল। ব্যাডনের প্রিন্স ম্যাক্স তখন চ্যান্সেলার, তিনি কাইজারকে **সিংহাসন ত্যাগ** করবার পরামর্শ দিলেন। কাইজারও তাই করলেন। সমাজ-তান্ত্রিক নেতা **এবার্ট** (১৮৭১—১৯২৫ খ্রীঃ) জার্মেনীর **প্রথম রাষ্ট্রপতি** হলেন (১৯১৯ খ্রীঃ)।

সমাজতন্ত্রবাদীদের মধ্যে **কার্ল লিবকেনেক্ট** এবং **রোজা লুক্সেমবুর্গের** একটা দল ছিল। এবার্ট রাষ্ট্রপতি হবার পর, এই দলের সঙ্গে তাঁর গোলমাল বেধে গেল। এবার্ট বুঝেছিলেন জার্মেনীর পরাজয় আসন্ন, তাই তিনি চাইলেন যুদ্ধ-বিরতির আগেই একটা প্রজাতন্ত্র গবর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করতে এই আশায় যে, কাইজারের জার্মেনীর বিরুদ্ধে মিত্রশক্তি যতটা কঠোর মনোভাব অবলম্বন করতে পারবে, প্রজাতান্ত্রিক জার্মেনীর বিরুদ্ধে তা পারবে না। এবার্ট দলে ভারী ছিলেন। তিনি সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করে জাতীয় পরিষদ্ আহ্বান করা এবং প্রজাতন্ত্রের শাসনবিধি প্রণয়ন করা দরকার বলে মনে করলেন।

লিবকেনেক্টের দল বুঝেছিলেন যে, এই যুদ্ধের প্রকৃত কারণ হচ্ছে ধনী ব্যবসায়ীদের দুর্জয় লোভ। এক একটি দেশের বড় বড় বণিকেরা একজোট হয়ে অপর দেশের ব্যবসায়ীদের, বিশ্বের ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে হটাবার জন্যে যে তীব্র প্রতিযোগিতা চালিয়েছিলেন, যুদ্ধ তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। দেশের প্রতি ধনী ব্যবসায়ীদের বিন্দুমাত্র মায়া থাকে না, গরিবের কথা একটিবারের জন্যেও ভাবে না; তাদের একমাত্র লক্ষ্যই থাকে নিজেদের বিপুল অর্থ আরও বেশী করে বাড়ানো। লিবকেনেক্ট বললেন যে, এই পাপ দূর করতে হলে ধনীদের উচ্ছেদ করতে হবে। তাদের সমস্ত সম্পত্তি, কল-কারখানা প্রভৃতি কেড়ে নিতে হবে— এবং তা করতে গেলে সাধারণ নির্বাচনে নামলে চলবে না, **কম্যুনিস্ট ডিক্টেটরশিপ** প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ৬ই জানুয়ারি, লিবকেনেক্ট জার্মান গবর্নমেণ্ট হস্তগত

কাইজার-দম্পতি সেনাপতিদের পরিদর্শন করছেন

করবার উদ্দেশ্যে, বার্লিনের কয়েকটি সরকারী অফিস এবং সংবাদপত্র-আফিস জোর করে দখল করলেন। এবার্টের গবর্নমেণ্ট লিবকেনেক্ট এবং রোজা লুক্সেমবুর্গকে **গ্রেফতার** করবার আদেশ দিলেন। পুলিস তাঁদের শুধু যে গ্রেফতার করল তাই নয়, জেলে নিয়ে যাবার পথে তাঁদের দুজনকেই হত্যা করল।

নতুন শাসনতন্ত্র

এই সব ভয়ানক গোলযোগ ও অন্তর্বিপ্লবের মধ্যেও সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেল। ফেব্রুয়ারি মাসে ওয়েইমার নামক শহরে জার্মান প্রজাতন্ত্রের শাসনবিধি, প্রজাদের দ্বারা নির্বাচিত জাতীয় পরিষদে গৃহীত হল। স্থির হল যে, ১৮ বছরের বেশী বয়সের স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই ভোট দেবার অধিকার

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আক্রান্ত জলযান

থাকবে। তাদের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে পার্লামেণ্টের প্রতিনিধিসভা গঠিত হবে। জার্মান ভাষায় এই প্রতিনিধিসভাকে বলে **রাইকস্ট্যাগ।** সাত বৎসরের জন্যে একজন **রাষ্ট্রপতি** নির্বাচিত হবেন এবং তিনি রাইকস্ট্যাগের প্রতি দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভার পরামর্শে চলবেন। প্রধানমন্ত্রীকে বলা হবে **চ্যান্সেলার।** সাধারণ অবস্থায় রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রীদের পরামর্শ মানতেই হবে, কিন্তু দেশে কোন প্রবল বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে তিনি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে নিজে অর্ডিনান্স জারি করে দেশ শাসন করতে পারবেন।

রাইকস্ট্যাগ ছাড়া জার্মান রাষ্ট্রগুলোর প্রতিনিধি নিয়ে একটা **রাইকরাট** থাকবে। তাঁদের হাতে কার্যকরী ক্ষমতা কিছুই থাকবে না; তাঁরা শুধু রাইকস্ট্যাগ যাতে কোন অন্যায় আইন পাস না করে বসে, সে-দিকে লক্ষ্য রাখবেন। **রাইকস্ট্যাগ** আর **রাইকরাট**—এই দুটি হল জার্মান পার্লামেণ্টের দুই অংশ।

ভার্সাই-সন্ধির পর

ভার্সাই-সন্ধি জার্মান জাতির উপর বিধি-নিষেধের এবং যুদ্ধের দেনা-শোধের বহু কঠোরতা আরোপ করেছিল। জার্মানরা সেটা সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করল; কিন্তু তাকে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না তাদের। ক্ষতিপূরণ আদায় করবার জন্যে মিত্রশক্তির তরফ থেকে বিধিমত চেষ্টা হতে লাগল। জার্মানীর ভাল ভাল জায়গা, আলসেস-লোরেন, সাইলিসিয়া প্রভৃতি হাতছাড়া হওয়ায় তার লোহা এবং কয়লার খনিগুলি বেরিয়ে গেল। উপনিবেশগুলিও সব কেড়ে নেওয়া হল। দেশের **সম্পদ্** অনেক **কমে গেল,** কিন্তু **ক্ষতিপূরণের বিরাট দাবি** উঠল।

জার্মান গবর্নমেণ্ট ঘর গুছিয়ে নেবার জন্যে তিন বৎসর সময় চাইল। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী **লয়েড জর্জের** ইচ্ছা ছিল সময় দেবার, কিন্তু ফরাসী প্রধানমন্ত্রী **পঁয়কারে** কিছুতেই রাজী হলেন না। জার্মানরা সন্ধিশর্ত অনুসারে কয়লা ও লোহা দিতে দেরি করছে এই অজুহাতে পঁয়কারে, জার্মেনীর খনিপ্রধান অঞ্চল **রূঢ়** দখল করে নিলেন। জার্মেনীর সমস্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অচল হয়ে উঠবার উপক্রম হল। ট্রেনগুলো পর্যন্ত সময়মত চলত না। ভার্সাই-সন্ধির শর্ত কড়ায়-গণ্ডায় জার্মেনীর ঘাড়ে চাপাবার যত চেষ্টা হতে লাগল, সন্ধির উপর তার জনসাধারণ ততই বেশি করে চটতে আরম্ভ করল।

লোকার্নো-চুক্তি

ইংলণ্ড এবং আমেরিকা বুঝল যে, এ ভাবে টাকা আদায় হবে না। জার্মেনীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে গেলে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে—এবং সেজন্যে তাকে তার শিল্প-বাণিজ্য স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে

নাৎসী প্রধানগণ

আনবার সুযোগও দিতে হবে। জার্মেনীর অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার জন্যে, **চার্লস ডজ** নামক একজন বড় ব্যাঙ্কারের সভাপতিত্বে এক কমিটি নিযুক্ত করা হল। **ডজ-কমিটি**ও এই কথাই বললেন যে, জার্মেনীকে তার শিল্প-বাণিজ্য পুনরুদ্ধারের সুযোগ না দিলে ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় হবে

না। জার্মেনীকে টাকা ধার দেবার জন্যে, কমিটি মিত্রশক্তিকে অনুরোধ করলেন। তদনুসারে ইংরেজ এবং আমেরিকানরা জার্মেনীকে অনেক টাকা ধার দিল।

হের স্ট্রেসম্যান (১৮৭৮—১৯২৯ খ্রীঃ) তখন জার্মেনীর চ্যান্সেলার, তিনি এবার ঘর গুছাবার দিকে মন দিলেন। ইতিমধ্যে ফরাসী সাধারণ-নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী পঁয়কারে হেরে গিয়েছিলেন। তাঁর স্থানে যাঁরা ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী হলেন, তাঁরা জার্মেনীর গলায় পা দিয়ে টাকা আদায় করার চেয়ে তার জাতীয় জীবনের পুনর্গঠনে সাহায্য করে আস্তে আস্তে টাকাটা কিস্তিবন্দি হিসাবে আদায় করাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করলেন।

১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে **লোকার্নো** শহরে এক চুক্তি হল যে, ফ্রান্স এবং জার্মেনী দু পক্ষেই ভার্সাই-সন্ধিতে তাদের যে সীমান্ত ঠিক করে দেওয়া হয়েছে, তাই মেনে নেবে এবং এ বিষয়ে আর ঝগড়া করবে না। জার্মেনী আলসেস-লোরেনের উপর কোন দাবি রাখবে না এবং ফ্রান্সও জার্মেনীর রাইন-অঞ্চল (রাইনল্যাণ্ড) দখল করবার চেষ্টা করবে না। ইংরেজ প্রতিশ্রুতি দিল যে, ফ্রান্স যদি গায়ে পড়ে রাইন-অঞ্চল কেড়ে নেবার জন্যে জার্মেনীকে আক্রমণ করে, তাহলে সে জার্মেনীকে সাহায্য করবে; আর জার্মেনী ফ্রান্সকে আক্রমণ করলে সে ফ্রান্সের পক্ষ অবলম্বন করবে। লোকার্নো-চুক্তিতে কিন্তু একটা ফাঁক রয়ে গেল; পোলিশ-করিডর সম্বন্ধে কোন পাকাপাকি ব্যবস্থা মেনে নিতে জার্মেনী কিছুতেই রাজী হল না।

লোকার্নো-চুক্তির পর জার্মেনী একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। আমেরিকা ও ইংলণ্ড হতে টাকা ধার করে এনে সে তার লোহা, রাসায়নিক ও ইলেকট্রিক কারখানাগুলোকে আবার আগের মত বিরাট করে জাঁকিয়ে তুলল। বিজ্ঞান-শিক্ষায় জার্মেনী বরাবরই যথেষ্ট অগ্রসর। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিতে গিয়ে দেশের কয়লা কম পড়ে গেছে দেখে, জার্মেনী বিদ্যুৎ উৎপাদন করে সে অভাব পুষিয়ে নিতে লাগল। জার্মান জাতির বিশেষত্ব এই যে, তাদের শৃঙ্খলা এবং জাতীয়মর্যাদাবোধ খুব প্রবল; দেশের মঙ্গল এবং দেশের প্রতি কর্তব্য-বোধের জন্যে তারা যে কোন অসুবিধা, যে কোন বিপদ্ হাসিমুখে বরণ করতে সর্বদা প্রস্তুত। এই কারণেই ডজ-কমিটির সুপারিশের পর তারা যেটুকু সুযোগ পেয়েছিল, তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগল।

ভার্সাই-সন্ধির বিরুদ্ধে অসন্তোষ

ভার্সাই-সন্ধির বিরুদ্ধে জার্মানদের অসন্তোষ কিন্তু কিছুতেই দূর হল না। দেশের সাধারণ অবস্থা একটু ভালোর দিকে গেলেও তার ফল যে স্থায়ী হবে না, এটা সবাই বুঝতে পারল—কারণ ক্ষতিপূরণের জন্যে অনেক টাকা

ভন হিণ্ডেনবুর্গ

বিদেশে বেরিয়ে যাচ্ছিল। জার্মেনীতে নানারকম দল গড়ে উঠতে লাগল, তার মধ্যে **ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট** দল একটি। এই দলকেই বলা হয় **নাৎসী** দল।

১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে সাতটি লোক নিয়ে মিউনিকের এক বিয়ারের আড্ডায় এই দলের সৃষ্টি হয়। **হিটলার** (১৮৮৯—১৯৪৫ খ্রীঃ) ছিলেন তার নেতা। দশ

বছরের মধ্যেই এর সদস্য-সংখ্যা হয়ে গেল ১,৭৮,০০০। যুদ্ধের ফলে জার্মেনীর মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সবচেয়ে বেশী, তারা তাদের অবস্থার উন্নতি করবার আশা দিয়ে এত লোক দলে যোগাড় করে। দলের সদস্যদের প্রতিজ্ঞা ছিল তিনটি—(১) ভার্সাই-সন্ধি বাতিল করব; (২) ইহুদীদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেব এবং (৩) উপনিবেশগুলো ফিরিয়ে আনব। নাৎসীদলের মত সুগঠিত সংঘবদ্ধ দল পৃথিবীতে খুব কমই সৃষ্টি হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি **হিণ্ডেনবুর্গের** (১৮৪৭—১৯৩৪ খ্রীঃ) দ্বিতীয়বার নির্বাচনের সময়, নাৎসী নেতা হিটলার তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হেরে গেলেন। তারপর থেকে তিনি চ্যান্সেলার হবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন। অবশেষে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি হিণ্ডেনবুর্গ, হের হিটলারকে **জার্মেনীর চ্যান্সেলার** নিযুক্ত করেন।

হিটলারের অভ্যুদয়

চ্যান্সেলার হবার পরই হিটলার, ইহুদীদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবার আয়োজন আরম্ভ করলেন। তারপর একটি একটি করে তিনি ভার্সাই-সন্ধির শর্তগুলোকে অমান্য করতে লাগলেন। ভার্সাই-সন্ধি অনুসারে জার্মেনীর সৈন্য-সংখ্যা এক লক্ষের বেশী হবার উপায় ছিল না; হিটলার এই এক লক্ষ সৈন্যকে এমনভাবে সুশিক্ষিত এবং এমন-সব আধুনিক মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত করলেন যে, এদের মধ্যে যে কোন ৫০০ জন এক একটা যুদ্ধ জয় করে আসতে পারে।

এ ছাড়া দেশে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা প্রবর্তন করে তিনি প্রত্যেক যুবককে যুদ্ধবিদ্যা শেখালেন। যুবকদের কষ্টসহিষ্ণু করবার জন্যে তিনি নিয়ম করেছিলেন যে, প্রতি শনিবার স্কুল-কলেজ ছুটির পর প্রত্যেক ছাত্র একটা ছোট তাঁবু, ছোট বিছানা এবং কিছু খাবার নিয়ে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে পড়বে। শনিবার সারা বিকাল হেঁটে যেখানে সন্ধ্যা হবে, সেইখানে তাঁবুটি খাটিয়ে শুয়ে পড়বে। পরদিন ভোরে আবার হাঁটা শুরু করবে এবং সারাদিন হাঁটবে। সন্ধ্যাবেলা কাছাকাছি যেখানে ট্রেন পাবে সেখানেই ট্রেন ধরবে এবং বাড়ি ফিরে আসবে। দল বেঁধেই হোক আর একাই হোক, প্রায় প্রত্যেক যুবক এই নিয়ম পালন করত। হিটলারের আমলে জার্মেনীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এমন হয়েছিল যে, দেশে একজন লোকও বেকার ছিল না; প্রত্যেকে কাজ করবার এবং টাকা রোজগারেরসু যোগ পেত।

হিটলার দেশে বহুসংখ্যক এরোপ্লেন, মোটরকার, জাহাজ প্রভৃতির কারখানা গড়ে তুললেন। এই সব কারখানায় অসংখ্য লোক কাজ পায়। জার্মেনীতে লক্ষ লক্ষ মাইল পাকা রাস্তা নির্মাণ আরম্ভ হয়, এতেও অনেক লোকের
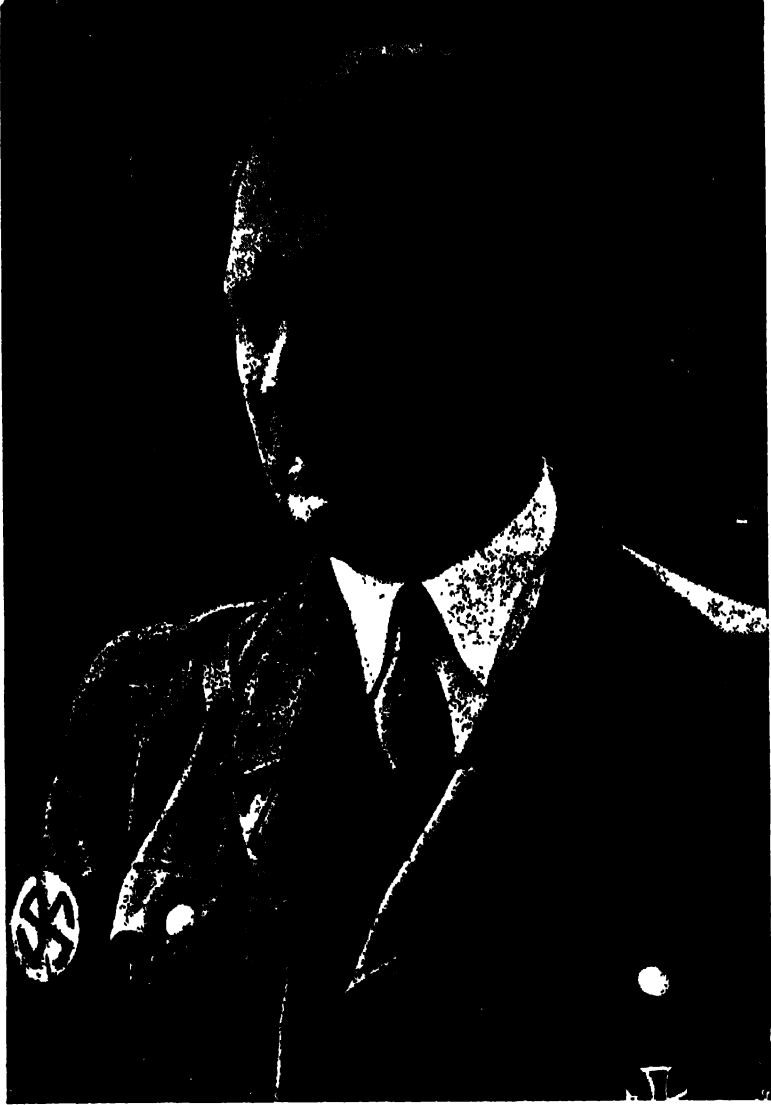
হিটলার

কাজ জোটে। তা ছাড়া, জার্মেনীতে রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধ, কাগজ, খেলনা প্রভৃতি নানারকম নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসের বড় বড় কারখানা সৃষ্টি হয়। এই সব কারখানায়ও অসংখ্য লোক কাজ পায়। শিল্পবিদ্যা শিখে, কোন লোক

নিজে ছোটখাট কারখানা করতে চাইলে, সে সুযোগও সে পেত। জার্মান-ব্যাঙ্কগুলো তাদের টাকা দিয়ে সাহায্য করত। এই রকম ব্যবস্থার ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুঃখ দূর হয়ে গিয়েছিল।

হিটলারের নতুন নিয়মে দেশে খুব ধনী কেউ ছিল না, খুব গরিবেরও কিছু না করে থাকবার উপায় ছিল না; সকলেই সচ্ছলভাবে জীবনযাত্রা চালাবার সুযোগ পেয়েছিল। রাষ্ট্রপতি হিণ্ডেনবুর্গের মৃত্যুর পরের দিন (৩রা অগস্ট, ১৯৩৪ খ্রীঃ) হিটলার নিজেই রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলার হয়ে **ফুরার** উপাধি গ্রহণ করলেন।

দেশকে একবার সংঘবদ্ধ করে নিয়ে হিটলার ধুয়া তুললেন যে, জার্মেনীর বাইরে যত জার্মান আছে, সবাইকে দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে। এজন্যে জায়গাও বেশী দরকার, কাজেই ইওরোপের জার্মানপ্রধান অঞ্চলগুলো জার্মেনীর ভিতর ঢুকিয়ে নিতে হবে।

অস্ট্রিয়াকে তিনি জার্মেনীর অন্তর্ভুক্ত করলেন (১৯৩৮ খ্রীঃ); **মিউনিক-চুক্তির** (১৯৩৮ খ্রীঃ) পর চেকোস্লোভাকিয়ার সুদেতানল্যাণ্ডকেও তিনি জার্মেনীর ভিতর ঢুকিয়ে নিলেন। তারপর ঝগড়া বাধল পোলিশ-করিডর নিয়ে।

ভার্সাই-সন্ধির আগে এই জায়গাটা জার্মেনীর ছিল, এখানকার লোকেরাও প্রায় সকলেই জার্মান। পোলাণ্ডকে বালটিক সমুদ্রে যাবার সুযোগ দেবার জন্যে ভার্সাই-সন্ধিতে এটা পোলাণ্ডকে দিয়ে দেওয়া হয়। হিটলার দাবি করলেন যে, **পোলিশ-করিডর** তাঁকে ফিরিয়ে দিতে হবে। পোলাণ্ড এতে রাজী হল না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর। বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হল সেই দিনে। জার্মান-বাহিনী পোলাণ্ড আক্রমণ করল।

ডানজিগ নগরী পোলাণ্ডের সীমার ভিতর অবস্থিত হলেও চিরদিনই স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ভোগ করে এসেছে। এর লোকসংখ্যার অধিকাংশই জার্মান, এবং স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারেও এই জার্মানদের প্রভুত্ব ছিল চিরদিনই অটুট। পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পূর্বে জার্মান গবর্নমেণ্টেরই অনুবর্তী থাকতে হত ডানজিগকে, কিন্তু ভার্সাই-সন্ধিতে এর পররাষ্ট্রীয় নীতি নিয়ন্ত্রণের ভার পড়ে পোলাণ্ডের উপরে। এ ব্যবস্থা ডানজিগের জার্মান জনগণ কোনদিনই প্রসন্ন অন্তঃকরণে গ্রহণ করতে পারে নি। কাজেই হিটলারের অভ্যুদয়ের

সঙ্গে সঙ্গেই তারা আশা করতে শুরু করেছিল যে, অচিরেই তারা পোলাণ্ডের কবলমুক্ত হয়ে আবার জার্মান রাষ্ট্রের সঙ্গে পুনর্মিলিত হতে পারবে।

১লা সেপ্টেম্বর জার্মান সেনার প্রথম সক্রিয়তা **ডানজিগে** প্রকট হল। ঐ দিনই ডানজিগের নাৎসী নেতা আলবার্ট ফোরস্টার ঘোষণা করলেন যে—

হিটলারের যুদ্ধ ঘোষণা

"আমাদের বিশ বৎসরের আশা আজ সফল হয়েছে। ডানজিগ আজ আবার মহান্ জার্মান রাষ্ট্রের সঙ্গে মিলিত হল।"

ডানজিগের পার্শ্ববর্তী সংকীর্ণ পোমোজ বা পোমেরেনিয়া প্রদেশ চিরদিনই জার্মান-ভাষাভাষী লোকের বাসভূমি। ভার্সাই-সন্ধিতে এই প্রদেশটিকে

পোলাণ্ডের হাতে সমর্পণ করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল—চারিদিকে পররাষ্ট্রীয় ভূভাগ-বেষ্টিত পোলাণ্ডকে সমুদ্রতীরে পৌঁছোবার একটুখানি পথপ্রদান। তদনুযায়ী এই প্রদেশটিকে নতুন নাম দেওয়া হয়েছিল—**"পোলিশ-করিডর"** বা "পোলদের রাস্তা"। এই করিডরেরও অধিকাংশ অধিবাসী ছিল জার্মান, এবং হিটলারের অভ্যুদয়ে তাদেরও আনন্দ কম হয় নি। জার্মান সেনা করিডরে প্রবেশ করা মাত্র সেখানকার জার্মান অধিবাসীরা তাদের সাদরে অভ্যর্থনা করে নিল।

২রা সেপ্টেম্বরই পোলাণ্ডের রাজধানী **ওয়ারশ** নগরে জার্মান বিমান থেকে ছয়বার বোমা নিক্ষিপ্ত হল। তুমুল যুদ্ধ চলল জার্মান-পোল সীমান্তে। ব্রিটেন পূর্বাপর মুক্তকণ্ঠেই বলে এসেছিল যে, পোলাণ্ডের উপর জার্মেনীর কোন অত্যাচারই সে নীরবে সহ্য করবে না। এখন বাধ্য হয়েই (৩রা সেপ্টেম্বর) ব্রিটেনকে জার্মেনীর বিরুদ্ধে **যুদ্ধ ঘোষণা করতে হল।** ফ্রান্সও ব্রিটেনের সঙ্গে যোগ দিল, কারণ জার্মেনীর শক্তি অত্যধিক বৃদ্ধি পেলে সেটা সর্বদাই ফ্রান্সের আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ব্রিটিশ কমনওয়েলথ-ভুক্ত অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ডও যুদ্ধ ঘোষণা করল জার্মেনীর বিরুদ্ধে।

পোলাণ্ডের সমৃদ্ধিশালী বন্দর জিডনিয়া অধিকার করে জার্মানরা এবার ওয়ারশর দিকে ধাবিত হল। এই সময়ে একান্ত আকস্মিকভাবে, সোভিয়েট-রাশিয়ার সৈন্যবাহিনী এসে প্রবেশ করল পোলাণ্ডের অপর সীমান্তে। ইতিপূর্বে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে জার্মেনীর সঙ্গে রাশিয়ার একটা সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল। কিন্তু জার্মেনীর সাহায্যের জন্যেই রাশিয়া এসে যুদ্ধে অবতীর্ণ হল,—এটা মনে করলে ভুল করা হবে। পোলাণ্ডের কোন কোন অংশ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে অনেকদিন রাশিয়াব অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেইগুলি পুনরুদ্ধার করবার জন্যেই রাশিয়ার এই সমরোদ্যম।

দুই দিকে দুটি প্রবল শক্তি কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে **পোলাণ্ডের** আর আত্মরক্ষার কোন আশা রইল না। ২৭শে সেপ্টেম্বর ওয়ারশ নগরী **আত্মসমর্পণ** করতে বাধ্য হল। স্বাধীন রাষ্ট্র-হিসাবে পোলাণ্ডের আর অস্তিত্ব রইল না। রাশিয়া ও জার্মেনী—এই দুই বিজয়ী দেশ পোলাণ্ডকে বিভক্ত করে নিল নিজেদের ভিতর। পোলাণ্ডের নির্বাসিত দেশ-নায়কেরা প্যারিস নগরীতে গিয়ে নতুন পোল-গবর্নমেণ্ট গঠন করলেন।

অতঃপর হিটলার পশ্চিম-সীমান্তের দিকে অখণ্ড মনোযোগ দেবার সুযোগ পেলেন। তাঁর বিমান-বাহিনী ইংলণ্ডে, স্কটলণ্ডে ও ফ্রান্সে বোমাবর্ষণ করতে লাগল।

সমুদ্রে ব্রিটিশ আধিপত্য চিরদিনই বর্তমান। ইংরেজের অপরাজেয় নৌ-শক্তির জন্যেই নেপোলিয়ন ও কাইজারের মত দিগ্বিজয়ীরাও একদিন ইংলণ্ড আক্রমণ করতে সমর্থ হন নি। এই নৌ-শক্তিকে পঙ্গু করে দেবার জন্যে হিটলার গড়ে তুলেছিলেন অসংখ্য **ইউ-বোট**। এদের আক্রমণে ইংরেজ নৌ-বাহিনীর ক্ষতিও হয়েছিল মারাত্মক। কিন্তু ইউ-বোট-বিধ্বংসী মারণাস্ত্র আবিষ্কার করতেও ইংরেজদের বিলম্ব হয় নি।

ইংরেজরা যে মারণাস্ত্র আবিষ্কার করেছিল, তার নাম **ডেপথ-চার্জ** বা জল-বোমা। ময়লা ফেলার ডাস্ট-বিন যেন এক একটা, অবশ্য দুই মুখ বন্ধ। এর ভিতর সাংঘাতিক বিস্ফোরক সব পদার্থ থাকে। জাহাজ থেকে সমুদ্রের ভিতর ফেলে দেওয়া হয় এই ডেপথ-চার্জ। নামতে নামতে ফেটে যায় এগুলি। জলের তলায় যদি ডুবো-জাহাজ থাকে, তবে তা সাংঘাতিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এর আঘাতে।

ব্রিটেনের নৌ-শক্তিই হিটলারের বিশ্ববিজয় অভিযানের প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। জার্মেনীর চারদিকে এক দুর্ভেদ্য লৌহ-বেস্টনী রচনা করল ইংরেজ রণতরী। জার্মেনীর আমদানী ও রপ্তানী-বাণিজ্য একেবারেই বন্ধ হল। খাদ্য, বস্ত্র, লৌহ, রাসায়নিক উপকরণ—জীবনধারণ ও যুদ্ধপরিচালনায় অবশ্য-প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি বস্তুরই অভাব পরিলক্ষিত হতে লাগল জার্মেনীতে। নবাধিকৃত চেকোস্লোভাকিয়া, বোহেমিয়া বা পোলাণ্ড থেকে উল্লেখযোগ্য কোন সাহায্যই পেল না জার্মেনী।

এই সময় থেকেই ওলন্দাজ সীমান্তে জার্মান সেনা সক্রিয় হয়ে উঠল। ওলন্দাজ সরকার ইতিপূর্বেই তাঁদের পূর্ব-সীমান্তের অনেকটা স্থানকে অবরুদ্ধ অঞ্চল বলে ঘোষণা করেছিলেন। **বেলজিয়মের রাজা** লিওপোল্ড ও **হল্যাণ্ডের রানী** উইলহেলমিনা মিলিতভাবে চেস্টা করছিলেন ইওরোপে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে; কিন্তু তাঁদের নিজেদের রাজ্যই এখন বিপন্ন হয়ে উঠল দেখে তাঁরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করলেন যে, তাঁরা যথাসাধ্য জার্মান আক্রমণ প্রতিরোধ করবেন।

হল্যাণ্ডের উপর জার্মান আক্রমণ আসন্ন বলেই মনে হতে লাগল। হিটলারের উদ্দেশ্য—হল্যাণ্ডের ভিতর দিয়ে ফ্রান্সের অভ্যন্তরভাগে প্রবিষ্ট হওয়া। ফ্রান্সের পূর্বসীমান্তে দুর্ভেদ্য **ম্যাজিনো-লাইন** অবস্থিত, ঐ সুরক্ষিত অঞ্চলের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হওয়ার চেস্টা করা হিটলারের অভিপ্রেত ছিল না। হল্যাণ্ডের পথ সুগম ও অরক্ষিত, তা ছাড়া হল্যাণ্ড অধিকার করতে পারলে তার পশ্চিম উপকূল থেকে ইংলণ্ড আক্রমণ করারও সুবিধা অনেক।

কিন্তু ওলন্দাজেরা কখনই নিজেদের দেশকে অরক্ষিত বলে বিবেচনা করে নি। ফ্রান্সের ম্যাজিনো-লাইন বা জার্মেনীর **সিগফ্রিড-লাইনের** মত অভেদ্য দুর্গশ্রেণী তাদের দেশে নেই বটে, কিন্তু তাদের আছে অনতিক্রম্য "ওয়াটার-লাইন" বা জলবেষ্টনী। হল্যাণ্ড দেশ অতি নীচু জায়গা। অনেক

বিমান আক্রমণ

জায়গাতেই বাঁধ দিয়ে সমুদ্রের জল আটকে রাখতে হয়। সেই বাঁধ খুলে দিলে দেখতে দেখতে সারা দেশটা সমুদ্রে পরিণত হয়ে যেতে পারে,—যার ভিতর সৈন্য-চলাচল হবে একেবারে অসম্ভব। এই ওয়াটার-লাইনের ভরসাতেই ওলন্দাজেরা হিটলারের রক্ত-চক্ষুকে উপেক্ষা করতে সাহসী হয়েছিল।

৯ই এপ্রিল (১৯৪০ খ্রীঃ) জার্মেনী আক্রমণ করল **নরওয়ে** এবং **ডেনমার্ক**কে। ডেনমার্ক সঙ্গে সঙ্গেই আত্মসমর্পণ করল, কিন্তু নরওয়ে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হল বিমান ও নৌ-বহর নিয়ে। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট সকল রকম সম্ভাব্য উপায়ে নরওয়েকে সাহায্য করবার জন্যে প্রতিশ্রুতি দিলেন। নার্ভিকের সন্নিকটে জার্মান ও ব্রিটিশ নৌ-বহরের তুমুল যুদ্ধ হল। এখানে জার্মানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল, তথাপি যুদ্ধে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হল বেশী।

কিন্তু শেষরক্ষা করা মিত্রশক্তির পক্ষে সম্ভব হল না। তার কারণ, সমগ্র পশ্চিম-ইওরোপে তাঁদের যুদ্ধ করতে হচ্ছিল। ফ্রান্স, বেলজিয়ম ও হল্যাণ্ডে নাৎসী-আক্রমণ আসন্ন বলে অনুমিত হচ্ছিল। কাজেই প্রয়োজনের অনুরূপ অস্ত্রবল নরওয়েতে প্রেরণ করা ইংলণ্ডের পক্ষে সম্ভব হল না। নরওয়ে অচিরেই জার্মেনীর পদানত হল।

নরওয়েতে মিত্রশক্তির পরাজয়ে ইংলণ্ডে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। চেম্বারলেন-মন্ত্রিসভার উপর দেশের লোক আগে হতেই বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। এবারে পার্লামেণ্ট মহাসভার অধিবেশনে প্রকাশ্যে বিরূপ সমালোচনা হল গবর্ন-মেণ্টের—অগত্যা **চেম্বারলেন পদত্যাগ** করলেন। তার স্থলে **প্রধানমন্ত্রী** হলেন **উইনস্টন চার্চিল।**

১০ই জুন (১৯৪০ খ্রীঃ) তারিখে চার্চিল তার নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। এদিকে হিটলার যুদ্ধ ঘোষণা করলেন হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম ও লুক্সেমবুর্গের বিরুদ্ধে। সরাসরি ফ্রান্সের ভিতর প্রবেশের চেষ্টা করার অপেক্ষা এই দেশগুলিকে আগে কবলিত করা যুক্তিসংগত বিবেচনা করলেন হিটলার। তাই এই নিরপেক্ষ দেশত্রয়ের উপর আক্রমণ।

ওলন্দাজেরা আটচল্লিশ ঘণ্টাকাল জার্মান সেনার গতিরোধ করেছিল ইসেল নদীর তীরে; কিন্তু এবারে তারা পশ্চাদপসরণ করে সমস্ত খালের মুখ খুলে দিল চারিদিকে। প্রবল বেগে সমুদ্র-জল এসে সমগ্র হল্যাণ্ডকে ডুবিয়ে দিল শত্রুসৈন্যের অনতিক্রমণীয় করে।

মিউজ নদীর তীরে যে বেলজিয়ান বাহিনী ছিল, তারা পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হল। ওলন্দাজ-রাজপরিবার **লণ্ডনে পলায়ন** করলেন।

রটারড্যাম শত্রুহস্তে পতিত হল। তখন অগত্যা যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য হলেন ওলন্দাজ-সরকার। তাদের গবর্নমেণ্টও স্থানান্তরিত হল লণ্ডনে।

মিউজ নদী পার হয়ে জার্মানরা ফরাসী সৈন্য-ব্যূহের ভিতর প্রবিষ্ট হল। দি হেগ, আমস্টার্ডাম এবং অন্যান্য নগরী জার্মান-কবলিত হল।

ফ্রান্সের সীমান্তে আততায়ীকে সমাগত দেখে ফরাসী জনসাধারণ সর্বাধিনায়ক গামেলাঁর উপর আস্থা হারিয়ে ফেলল। গামেলাঁর স্থলে **জেনারেল ওয়েগা** অভিষিক্ত হলেন প্রধান সেনাপতির পদে।

বেলজিয়মের রাজা লিওপোল্ড যুদ্ধ-বিরতির আদেশ দিলেন। মিত্রশক্তি দ্রুতবেগে সমুদ্রতীরের দিকে ধাবিত হল; কারণ, তখন তারা তিন দিকেই শত্রু-কর্তৃক অবরুদ্ধ। **লর্ড গর্ট** তিন লক্ষ তেত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে পলায়নের পথ পাচ্ছেন না। সমুদ্রপথে যদি অপসৃত হতে না পারেন তিনি, তবে সমগ্র ইংরেজ অভিযাত্রী-বাহিনী সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে।

ডানকার্ক বন্দর থেকে অভিযাত্রী-বাহিনী জাহাজে করে পার হতে লাগল ইংলিশ চ্যানেল। ইংরেজ সেনার অপসরণ সমাপ্ত হল দীর্ঘ ছয় দিনে। সমস্ত সমরসম্ভার পশ্চাতে পড়ে রইল,—এবং সেগুলি শেষ পর্যন্ত জার্মানদের করায়ত্ত হল।

১০ই জুন তারিখে ইতালি হঠাৎ যুদ্ধ ঘোষণা করল ফ্রান্স ও ব্রিটেনের বিরুদ্ধে। ওদিকে নরওয়েতে যে ছোটখাট যুদ্ধ তখনও চলছিল, তার অবসান করে দিয়ে মিত্রশক্তি একেবারে সরে এলেন সেখান থেকে। নরওয়ের রাজ-পরিবার আশ্রয় নিলেন এসে লণ্ডনে।

ডিভিসনের উপর ডিভিসন জার্মান ট্যাঙ্ক-বাহিনী, সীন নদীর বিভিন্ন সেতুপথ দিয়ে অগ্রসর হল প্যারিস অভিমুখে। অবশেষে ১৪ই জুন (১৯৪০ খ্রীঃ) সর্ব-প্রথম জার্মান সেনাদল প্যারিসে প্রবেশ করল। ওদিকে ভার্দুন দুর্গও অধিকৃত হল। ম্যাজিনো-লাইনও অতিক্রম করল জার্মানরা। ১৬ই জুন রেনো-মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হল, **মার্শাল পেতাঁ্যা** নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করলেন।

নতুন মন্ত্রিসভা সবপ্রথমেই যুদ্ধ-বিরতির আদেশ দিলেন ও জার্মানদের কাছে সন্ধিভিক্ষা করে দূত পাঠালেন। মিউনিক নগরে হিটলার ও মুসোলিনী মিলিত হলেন ফ্রান্সের প্রার্থনা সম্বন্ধে বিবেচনা করার জন্যে।

কম্পিয়েনের অরণ্যে জার্মান ও ফরাসী প্রতিনিধিদল একত্র হলেন সন্ধি-শর্ত আলোচনা করবার জন্যে। এইখানেই ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান ও ফরাসী মিলিত হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে। যে রেলগাড়ির ভিতর সেবার সন্ধি-পত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল, এবারেও হল সেই গাড়িরই ভিতর। সেবারের অপমানের পরিপূর্ণ প্রতিশোধ নিল এবার জার্মেনী।

এদিকে রোম নগরে ইতালির সঙ্গে পৃথক্ যুদ্ধ-বিরতি-পত্র স্বাক্ষর করল ফ্রান্স। ২৫শে জুন যুদ্ধ বন্ধ হল ফ্রান্সে। পেতাঁ্যা-গবর্নমেণ্ট **ভিচীতে** গিয়ে

রাজধানী স্থাপন করলেন। তাঁদের অধীনে ফ্রান্সের সামান্য অংশই রইল। প্যারিস শহরসহ ফ্রান্সের প্রধান প্রধান প্রদেশগুলি জার্মেনীর অধিকারভুক্ত হল। ভিচীতেও পেতাঁ-গবর্নমেণ্ট সম্পূর্ণভাবে জার্মেনীর তাঁবেদার হয়ে অধিষ্ঠান করতে লাগলেন। ইংলণ্ডের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলেন পেতাঁ।

ফ্রান্সের যুদ্ধ শেষ হল এই ভাবে। সমগ্র ইওরোপে হিটলার অপরাজেয় দিগ্বিজয়ী বলে সম্মানিত হলেন। সমগ্র জার্মেনী উৎসব-মুখর হয়ে উঠল। হিটলার এবার **ব্রিটেন জয়ে** যত্নবান্ হলেন। ঝাঁকে ঝাঁকে বোমারু বিমান নিশিদিন হানা দিতে লাগল ইংলণ্ডের বিভিন্ন অংশে। পোর্টল্যাণ্ড, ওয়েমাউথ, লণ্ডনের বেলুন-বেষ্টনী অঞ্চল, কেণ্ট-উপকূল—সর্বত্রই বিমান-আক্রমণ হতে লাগল। ইংরেজ বিমান-বহরও নিষ্ক্রিয় ছিল না। উভয় পক্ষেই শত শত বিমান নষ্ট হতে লাগল। টেমস নদীর মোহানায় ও ডোভারে **প্রচণ্ড বিমান-যুদ্ধ** হয়ে গেল। ইংরেজ বিমানবহর বার্লিন পর্যন্ত গিয়েও আক্রমণ চালাতে লাগল মাঝে মাঝে। ২৭শে সেপ্টেম্বর জার্মেনী, ইতালি ও জাপান দশ বৎসরের জন্যে **সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ** হল।

ইতালি গ্রীস আক্রমণ করে নিজেই বিপন্ন হয়ে পড়েছিল এদিকে। উপরন্তু যুগোস্লাভিয়া মিত্রশক্তির পক্ষে যোগ দিয়েছিল। এই উভয় কারণে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল তারিখে, জার্মান-বাহিনী যুগপৎ যুগোস্লাভিয়া ও গ্রীস আক্রমণ করল। ১৭ই এপ্রিল যুগোস্লাভিয়া আত্মসমর্পণ করল, ২২শে এপ্রিল ইংরেজ সেনা গ্রীস ত্যাগ করতে শুরু করল।

এদিকে **ক্রীট** দ্বীপে অবতরণ করে ভীষণ যুদ্ধের পর ক্রীট অধিকার করে নিল জার্মানরা। ভূমধ্যসাগরস্থ অন্যান্য ইংরেজ ঘাঁটিও একে একে আক্রমণ করতে লাগল তারা।

আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে ইংরেজ সেনা সাফল্যলাভ করলেও **সোলম** নগর আবার অধিকার করে নিল জার্মানরা। **তোব্রুকের** উপরও তারা অনবরত আক্রমণ চালাতে থাকল।

২২শে জুন (১৯৪১ খ্রীঃ) জার্মেনী **রাশিয়া আক্রমণ** করল। পূর্ব-প্রাসিয়া, পোলাণ্ড ও রুমানিয়ার ভিতর দিয়ে জার্মেনীর বিভিন্ন সৈন্যদল প্রবেশ করল রাশিয়ার অভ্যন্তরে। পোল-সীমান্ত অতিক্রম করে তারা ব্রেস্টলিটভস্ক, কার্ডনাম ও ভিলনা অধিকার করল। লিথুয়ানিয়াতেও জার্মানরা অগ্রসর হতে লাগল। ল্যাটভিয়াতে ডুইনস্ক নগরও তারা ভীষণ যুদ্ধের পরে অধিকার করে নিল।

নরওয়ে থেকে নতুন জার্মান সেনা এসে মারমানস্ক্ আক্রমণ করল। তারপর জার্মানরা অগ্রসর হল **লেনিনগ্রাডের দিকে।**

লেনিনগ্রাডের পথে ভীষণ প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হল জার্মান সেনাকে। **মস্কো নগরে বোমাবর্ষণ** করল জার্মানরা।

বিশ্বযুদ্ধের একটি দৃশ্য

১লা সেপ্টেম্বর **মার্শাল টিমোশেঙ্কোর** নেতৃত্বে রুশ-বাহিনী পালটা আক্রমণ চালাল গোমেল-অঞ্চলে। লেনিনগ্রাডের আশে-পাশে তীব্র যুদ্ধ চলল। **মার্শাল ভোরোশিলভ** পরিচালনা করছিলেন লেনিনগ্রাডের যুদ্ধ। ঝাঁকে ঝাঁকে জার্মান বোমারু-বিমান হানা দিতে লাগল লেনিনগ্রাডে। ১৯শে সেপ্টেম্বর জার্মান সেনা কীভ নগরে প্রবেশ করল। কীভের পূর্বদিকেই রুশ-সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ল।

ক্রিমিয়াতে জার্মান প্যারাশুট-বাহিনী অবতীর্ণ হল। সেখানে চলল ভীষণ যুদ্ধ। আজব-সাগরের উত্তরে রুশ-প্রতিরোধ প্রবল হয়ে উঠল। ইউক্রেনেও রুশ-সৈন্যের অবস্থার উন্নতি দৃষ্ট হল। এদিকে মস্কো অভিমুখে সাঁড়াশি-অভিযান চালাল জার্মানরা।

রুশ-বাহিনীর পরিচালক-মণ্ডলীর ভিতর গুরুতর অদল-বদল ঘটল। উত্তর-অঞ্চলের অধিনায়কত্ব অর্পিত হল মার্শাল জুকভের উপর। দক্ষিণ-অঞ্চলে

রইলেন টিমোশেঙ্কো। জার্মানরা খার্কভ অধিকার করল। সমগ্র ক্রিমিয়া ও ইউক্রেনে চলল তাদের অব্যাহত অগ্রগতি।

এদিকে **লিবিয়াতে** চলেছে প্রবল যুদ্ধ। রোমেল-চালিত ট্যাঙ্ক-বাহিনার ভীষণ যুদ্ধ হল ইংরেজ সেনার সঙ্গে।

২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে রোস্টভে প্রবেশ করল জার্মানরা। এদিকে মিশর সীমান্ত পার হয়ে জার্মান ট্যাঙ্ক-বাহিনী পশ্চিম দিক্ ঘুরে ইংরেজ সেনার পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করল।

৯ই ডিসেম্বর (১৯৪১) **চীন** জার্মেনীর বিরুদ্ধে **যুদ্ধ ঘোষণা** করল। ১১ই জার্মেনী ও ইতালি একসাথে যুদ্ধ ঘোষণা করল মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে।

১৬ই ডিসেম্বর পূর্ব-রণাঙ্গনে জার্মানরা পশ্চাদপসরণ আরম্ভ করল।

জার্মান ষোড়শবাহিনী রুশ-সৈন্যের দ্বারা স্টারায়া-রাশাতে পরিবেষ্টিত হল। তারপর প্রায় চার মাস কাল রুশ বা জার্মান কোন পক্ষই, বিশেষ অগ্রসর হতে পারল না কোনদিকে।

লিবিয়াতে চলেছিল তুমুল যুদ্ধ। নাইটসব্রিজে ইংরেজ সেনা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ল। তোব্রুকও অধিকার করল জার্মানরা।

ওদিকে রাশিয়ার যুদ্ধে **সিবাস্টোপোলে** ভীষণ আক্রমণ চালাল জার্মানরা। ক্রমশঃ অগ্রসর হয়ে তারা স্টালিনগ্রাডের নিকট পৌঁছাল—মার্শাল টিমোশেঙ্কো পশ্চাৎপদ হয়ে **ডন** নদীর অপর পারে ঘাঁটি স্থাপন করলেন। ওদিকে **লেনিনগ্রাড** এবং এদিকে **স্টালিনগ্রাডে** তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হল। জার্মানরা ক্রমশঃ কৃষ্ণসাগরের তীরে উপনীত হল।

আফ্রিকার যুদ্ধে ব্রিটিশ অস্টম-বাহিনীর আক্রমণে জার্মান ঘাটিসমূহ বিপন্ন হতে লাগল।

৩রা নভেম্বর স্টালিনগ্রাডের উপর জার্মানদের **পাঁচ পাঁচবার আক্রমণ ব্যর্থ হল।** এর পর থেকে ক্রমাগতই নিষ্ফল হতে লাগল তাদের সমস্ত প্রয়াস। স্টালিনগ্রাডের অভ্যন্তরে যে-দুটি স্থানে তারা ঘাঁটি বসিয়েছিল, সেখান থেকেও তারা বহিষ্কৃত হল।

ওদিকে মিশরেও জার্মানদের আর উল্লেখযোগ্য বাহিনী কিছুই রইল না।

ভিচী-গবর্নমেণ্টের অধিকৃত ফরাসীদেশের ভূখণ্ড এবং ফরাসী উপনিবেশগুলি আবার ইংরেজ অধিকারে চলে গেল।

ককেশাস অঞ্চলে জার্মানরা ভয়ানক রকম পরাস্ত হল। ডন নদীর মধ্যভাগে রুশ-সৈন্য অগ্রগামী হতে লাগল, জার্মানরা ক্রমশঃ হটতে লাগল।

১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের গোড়া থেকেই রুশ-রণাঙ্গনে জার্মান সেনার **ভাগ্যবিপর্যয়** আরম্ভ হল। স্টালিনগ্রাডের শিল্পাঞ্চলে যেখানে যত জার্মান ঘাঁটি ছিল, একে একে রুশ-সেনার কবলে পতিত হতে লাগল। জার্মানরা লেলিনগ্রাডের অবরোধ তুলতে বাধ্য হল, তারা স্টালিনগ্রাডের অবরোধও তুলে সরে এল।

স্টালিনগ্রাডে ষষ্ঠ জার্মান-বাহিনী (৩,৩০,০০০ সৈন্য) একেবারে **ধ্বংস** হয়ে গেল। জার্মানদের খার্কভ হারাতে হল।

টিউনিসিয়াতে জেবেল, টিউনিস, বিজার্তা, জেদিদা—সবই জার্মেনীর হস্তচ্যুত হল, অবশেষে টিউনিসিয়ার উত্তর-পূর্বাংশ **বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ** করল।

উত্তর-ইতালির ভেরোনাতে হিটলার ও মুসোলিনীর সাক্ষাৎ হল ১৯শে জুলাই। এদিকে ইতালির জনসাধারণ মুসোলিনীর উপর বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। ইংরেজ-বাহিনী ইতালি আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে, ইতালির জনসাধারণ **মুসোলিনীকে পদত্যাগে** বাধ্য করল (২৫শে জুলাই)। **মার্শাল বাদোগলিও** নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। জার্মেনীর প্ররোচনাতেই ইতালি যুদ্ধে নামতে বাধ্য হয়েছিল, এই ধারণায় নতুন ইতালিয় গবর্নমেণ্ট জার্মেনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল ১৩ই অক্টোবর।

ইউক্রেনী সেনার আক্রমণে জার্মান-বাহিনীকে ক্রমশঃ পশ্চাদপসরণ করতে হচ্ছিল জার্মেনীর দিকে। দুর্বার বেগে বিভিন্ন দিক্ দিয়ে **অগ্রসর হয়ে এল লালফৌজ,** নীপার নদীর বাঁকে দশ ডিভিসন জার্মান সেনাকে পরিবেষ্টিত ও নিশ্চিহ্ন করল তারা। রুশ-সৈন্য ক্রমশঃ নীস্টার নদীর তীরে উপস্থিত হল, জার্মানরা পশ্চাৎপদ হতে হতে হাঙ্গারী-সীমান্তে এসে দাঁড়াল, তখন হাঙ্গারীতে প্রবেশ করে সেই দেশে ঘাঁটি স্থাপন করতে সচেষ্ট হল তারা।

৪৫,০০০ হাজার জার্মান স্কালাতে রুশ-সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ল। ইয়াল্টা ও বালাক্লাভা রুশ-অধিকারে এসে গেল।

ইতালিতে ক্যাসিনো মিত্রশক্তির অধিকৃত হল, রোমও পতিত হল তাদের হস্তে। রুমানিয়াতে রুশ-সেনা জার্মান-বাহিনীকে বহিস্কৃত করল।

২০শে জুলাই **হিটলারকে হত্যা** করবার একটা **চেষ্টা** হয়, কিন্তু হিটলার রক্ষা পেয়ে যান।

মিত্রশক্তি ফ্রান্সের বিভিন্ন দিক্ দিয়ে দুর্বার গতিতে অগ্রসর হতে লাগল। নগরের পর নগর জার্মানদের অধিকার থেকে মুক্ত হতে লাগল, অবশেষে প্যারিস ত্যাগ করতেও বাধ্য হল জার্মানরা। হিটলারের আজ্ঞাবহ **ভিচী-গবর্নমেণ্টের**

পতন হল। জেনারেল দ্য'গল ফ্রান্সে ফিরে এসে নতুন **জাতীয় গবর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা** করলেন। ২৩শে অক্টোবর (১৯৪৪) তারিখে ঐ গবর্নমেণ্ট ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি সমস্ত দেশের গবর্নমেণ্ট কর্তৃক স্বীকৃত হল।

এদিকে ইংরেজ, মার্কিন, ফরাসী ও কানাডিয়ান বাহিনীগুলি বিভিন্ন পথে জার্মেনীর দিকে অগ্রসর হল। জার্মান সেনা ক্রমাগত পরাজিত হতে হতে রাইন নদী পার হয়ে গেল। সিগ্‌ফ্রিড-লাইনও বিচূর্ণ হল। মার্কিনদের প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম এবং নবম-বাহিনী প্রবেশ করল জার্মেনীর অভ্যন্তরে। ওদিকে জার্মেনীর পূর্ব-সীমান্তে রুশ-বাহিনী অগ্রসর হতে লাগল বার্লিনের দিকে। তাদের বাধা দেওয়ার আর কোন সামর্থ্যই রইল না হিটলারের। গ্রীস, ইতালি, নেদারল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতি দূরবর্তী স্থানে যত জার্মান সৈন্য ছিল, তারা অতি দ্রুত ফিরে আসতে লাগল জার্মেনীতে। ওডার নদীর তীরে রুশ-সেনাকে বাধা দেবার জন্যে **শেষ চেষ্টা করলেন হিটলার**; কিন্তু তাতেও অক্ষম হয়ে ভগ্নোদ্যম হয়ে পড়লেন তিনি।

২৯শে এপ্রিল (১৯৪৫ খ্রীঃ) তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন, এবং **আত্মহত্যা** করেন। তাঁর মৃতদেহ চ্যান্সেলারী-ভবনের ভিতরেই দাহ করা হয়। রুশ-সেনা তখন বার্লিনের প্রায় অর্ধাংশ অধিকার করে বসে আছে। হিটলারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই **অ্যাডমিরাল ডোয়েনিৎস** তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন রাষ্ট্রনায়ক-রূপে। তাঁর প্রথম চেষ্টাই হল মিত্রশক্তির সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করা। ৮ই মে তারিখে বার্লিনের কার্ল্‌স্‌হার্স্ট পল্লীতে এক বিদ্যালয়-ভবনে, জার্মেনী **বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ** করে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করল। মিত্রপক্ষে রুশ-সেনাপতি **মার্শাল জুকভ** এবং **এয়ার-মার্শাল টেডার** স্বাক্ষর করেন এই চুক্তিতে। জার্মানপক্ষে স্বাক্ষর করেন **ফিল্ড-মার্শাল কাইটেল** এবং আরও দুজন সেনাপতি। অ্যাডমিরাল ডোয়েনিৎসকে গবর্নমেণ্ট পরিচালনার সুযোগ দেওয়াই হল না। আত্মসমর্পণের অব্যবহিত পরেই তাঁকে বন্দী করা হল।

বার্লিনসহ সমগ্র জার্মান-রাষ্ট্রের শাসনভার সম্মিলিত রুশ, মার্কিন, ইংরেজ ও ফরাসী-বাহিনী গ্রহণ করল। সমগ্র জার্মেনীকে চারি ভাগে বিভক্ত করে এক একটি অংশকে, এক এক শক্তির শাসনের অধীনে ছেড়ে দেওয়া হল। **বার্লিন শহরকেও চার ভাগে** ভাগ করে ইংরেজ, ফরাসী ও মার্কিন পক্ষ থেকে **জেনারেল আইসেনহাওয়ারকে** প্রধান শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হল। রুশ পক্ষে শাসনকর্তা রইলেন **মার্শাল জুকভ।**

হিটলারের সহকারী নাৎসী-নেতৃগণ যুদ্ধাপরাধী-রূপে **নিউরেমবার্গ-বিচারালয়** কর্তৃক কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হলেন। কারও প্রাণদণ্ড হল, কারও বা হল দীর্ঘকালের জন্যে কারাদণ্ড (১৯৪৬ খ্রীঃ)।

যা হক, জার্মেনীর শাসন-ব্যাপার নিয়ে ক্রমশঃ রুশ-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অন্য তিন শক্তির মতভেদ ঘটে। এই বিরোধ এত তীব্রভাবে বেড়ে চলে যে, ক্রমে মিত্রশক্তি চতুষ্টয়ের শাসন-ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে।

পশ্চিম-জার্মেনী

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড এবং ফরাসী-অংশকে মিলিত করে সংযুক্ত পশ্চিম-জার্মেনী রাষ্ট্র গঠন করা হয়। এই
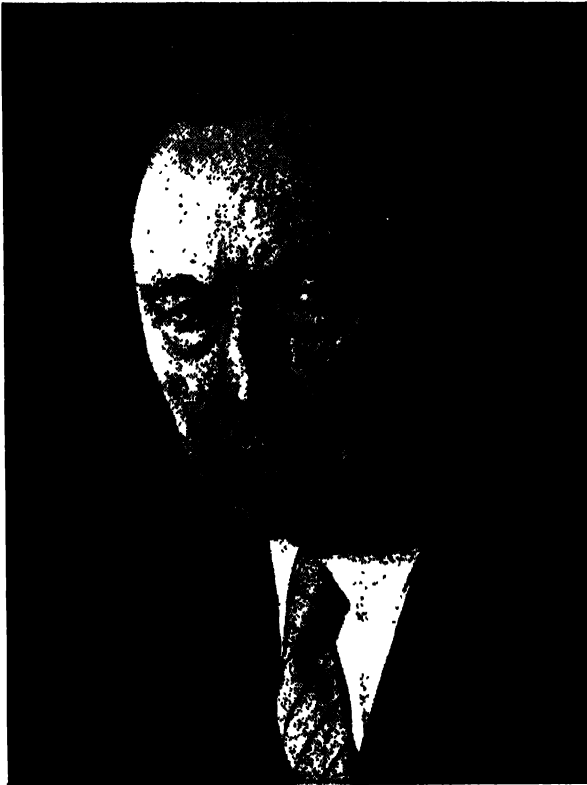
পশ্চিম-জার্মেনীর ভূতপূর্ব ফেডারেল চ্যান্সেলার ডাঃ অ্যাডেন্যুয়র

রাষ্ট্রের চ্যান্সেলার বা রাষ্ট্রনায়কের পদে নির্বাচিত হন **ডাঃ কনরাড অ্যাডেন্যুর**। **বন্** নগরী এই রাষ্ট্রের রাজধানী। ২২শে অক্টোবর, ১৯৫৭ খ্রীঃ,

পশ্চিম-জার্মেনীতে এক সাধারণ নির্বাচনে ডাঃ অ্যাডেন্যুর জয়লাভ করে পুনরায় চ্যান্সেলার-পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দেও তিনি চ্যান্সেলার হন। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ লুডউইগ এরহার্ড চ্যান্সেলার হন। এখন ডাঃ কুর্ট গেওর্গ কিসিংগার চ্যান্সেলার।

পশ্চিম-জার্মেনীর ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট: ডাঃ হাইনরিক লিউয়েবকে
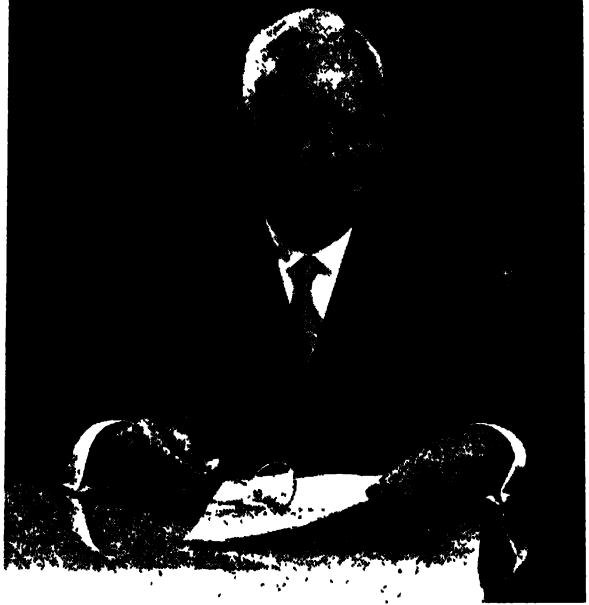
১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর থিয়োডোর হয়েস প্রথম সভাপতি হন। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুলাই হাইনরিক লিউয়েবকে সভাপতি হন। এখন ডাঃ গুস্তাফ হাইনেমান সভাপতি।

বনে পশ্চিম-জার্মেনীর ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট হয়েসের সঙ্গে ভারতের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল

পশ্চিম-জার্মেনী কম্যুনিস্ট-বিরোধী রাষ্ট্র। এখানে ধর্মীয় স্বাধীনতা পুরাপুরি বর্তমান। পশ্চিম বার্লিন ও সার সমেত এর আয়তন ২,৪৮,৫৪৬ বর্গ কিলোমিটার (৯৫,২৬৩ বর্গ মাইল) এবং লোক-সংখ্যা ৫,৯৭,৯২,৯০০।

সার বর্তমানে সংযুক্ত পশ্চিম-জার্মেনীর অংশ।

হেলিগোল্যাণ্ডও পশ্চিম-জার্মেনীকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে (১লা মার্চ, ১৯৫২ খ্রীঃ)।

বার্লিন দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে। পশ্চিম ভাগ পশ্চিম-জার্মেনীর অন্তর্গত এবং পূর্ব ভাগ পূর্ব-জার্মেনীর অন্তর্গত। পূর্ব-জার্মেনীর কম্যুনিস্ট-প্রভাবিত শাসনের

পশ্চিম-জার্মেনীর ফেড্যারেল চ্যান্সেলার কুর্ট গেওর্গ কিসিংগার

প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ৪০ লক্ষাধিক লোক পশ্চিম-জার্মেনীতে চলে এসেছে। পূর্ব-বার্লিন থেকেও ক্রমাগত লোক পশ্চিম-বার্লিনে চলে এসেছে। জার্মানদের এইভাবে পশ্চিম-জার্মেনীতে গমনে বাধা দেবার জন্যে রাশিয়ার নির্দেশে পূর্ব-বার্লিনের সীমান্ত বন্ধ করা হয়েছে। বার্লিন সমস্যা ক্রমশঃ গুরুতর আকার

ধারণ করছে। সোভিয়েট রাশিয়ার অনমনীয় মনোভাব এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য শক্তিবর্গের সেই মনোভাবের দৃঢ় প্রতিরোধের সংকল্প কখনও কখনও যুদ্ধকালীন অবস্থার পরিবেশ সৃষ্টি করছে।

পূর্ব-জার্মেনী

রাশিয়ার অঞ্চল নিয়ে গড়ে উঠেছে পূর্ব-জার্মান রাষ্ট্র (৭ই অক্টোবর, ১৯৪৯ খ্রীঃ)। অবশ্য পূর্ব-জার্মেনীর প্রকৃত নাম, 'জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র'। পূর্ব-জার্মান রাষ্ট্রের রাজধানী (পূর্ব) বার্লিন। প্রধানমন্ত্রী উইলি স্টফ।

১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ সোভিয়েট রাশিয়া পূর্ব-জার্মেনীকে পুরাপুরি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করলেও নিজ প্রভাবাধীন করে রেখেছে। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবেও দেখা যায়, পূর্ব-জার্মেনীতে রাশিয়া ৪ লক্ষ সশস্ত্র সেনা মোতায়েন রেখেছে।

বিদ্যালয় থেকে ধর্মীয় শিক্ষা তুলে দেওয়া হয়েছে। শুধু গির্জায় ধর্ম-পালন করা চলে।

পূর্ব-জার্মেনীর আয়তন ১,০৮,১৭৪ বর্গ কিলোমিটার (৪১,৭২২ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ১,৭০,৭৯,৬৫৪ (১৯৬৬ খ্রীঃ)। কম্যুনিস্ট প্রভাব থেকে মুক্ত হবার জন্যে লক্ষ লক্ষ লোক পশ্চিম-জার্মেনীতে পালিয়ে যাচ্ছে।

পশ্চিম-জার্মেনীর সঙ্গে ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। পূর্ব-জার্মেনীর সঙ্গেও ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। সমস্ত জার্মেনীকে এক মিলিত রাষ্ট্রে পরিণত করবার জন্যে বিভিন্ন পক্ষ থেকে প্রস্তাব শোনা যাচ্ছে, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে আদর্শগত পার্থক্যের জন্যে জার্মেনীর সমস্যার কোন আশু সমাধান পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

রোমক যুগে ফ্রান্সদেশ **গল** নামে পরিচিত ছিল। প্রসিদ্ধ রোমানবীর জুলিয়াস সীজারের আমল হতে বহুদিন পর্যন্ত রোম-সাম্রাজ্যের অধীন থাকা সত্ত্বেও, এই দেশ কখনও শান্তভাবে বৈদেশিক প্রভুদের পদানত হয়ে থাকে নি।

রোমের পতনের পর গলদেশ স্বতন্ত্র হয়ে গেল। তখন জার্মানরা পশ্চিম-ইওরোপের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে, জার্মান ফ্রাঙ্কজাতি বিশিষ্ট **মেরোভিঞ্জি**-বংশের একজন নায়ক **ক্লোভিস,** গলের অধিকাংশ সীমানার উপর আধিপত্য করতেন। তাঁর বিশাল রাজ্য, অস্ট্রেসিয়া ও নিউসট্রিয়া অর্থাৎ মোটামুটিভাবে যথাক্রমে বর্তমান জার্মেনী ও ফ্রান্স এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। পূর্বভাগে টিউটন সভ্যতার প্রাধান্য আর পশ্চিম-ভাগে ক্রমে রোমক-সভ্যতার প্রভাব বেড়ে 'ওঠে। ফ্রাঙ্কজাতি থেকে পরবর্তী কালে **ফ্রান্স** নামের উৎপত্তি। ক্লোভিস প্যারিসকে প্রথম রাজার বাসস্থান করে প্যারিস নগরীর ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ উন্মুক্ত করেন।

ফ্রাঙ্কদের রাজ্যের দুই অংশ, অস্ট্রেসিয়া ও নিউসট্রিয়ার মধ্যে গোড়া থেকেই একটা বৈরীভাব গড়ে ওঠে। এ থেকেই পরে জার্মান ও ফরাসী

জাতির মধ্যে চিরকালের মত বিরোধের সূত্রপাত হয়। ক্রমে **অস্ট্রেসিয়ার** দুর্গস্বামীরা মেরোভিঞ্জি-রাজাদের ক্ষমতা খর্ব করে নিজেরাই সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। এই দুর্গস্বামীদের ভিতর **চার্লস মার্টেলের** নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে, দক্ষিণ-ফ্রান্সের টুরস্ রণক্ষেত্রে, স্পেনের আরবদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করে পশ্চিম-ইওরোপকে ইসলামশক্তির আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। চার্লস মার্টেল যে-বংশের লোক তাকে বলে **কার্লোভিঞ্জি**-বংশ। এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাটের নাম মহামতি চার্লস অথবা **শার্লামেন** (৭৪২—৮১৪ খ্রীঃ)। রোমক-সাম্রাজ্যের অবনতির পর যে দীর্ঘ বিশৃঙ্খলার যুগ চলেছিল শার্লামেনই সেখানে আনেন শান্তি, শৃঙ্খলা ও সংঘবদ্ধতা।

শার্লামেন একজন শক্তিশালী যোদ্ধা ছিলেন। তিনি সমগ্র দেশকে

শার্লামেনের রাজ্যাভিষেক

নিজের ছত্রচ্ছায়ার তলে আনয়ন করে দেশের অবিসংবাদী নৃপতি হয়ে বসলেন। তাঁর সৈন্যবল এত দুর্দমনীয় হয়ে উঠেছিল যে, তিনি দিগ্বিজয়-যাত্রায় উৎসাহী হয়ে উঠলেন। অতঃপর পশ্চিম-ইওরোপের বহু ভূখণ্ড তিনি জয় করে নিলেন। অর্ধেক ইওরোপ তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়। তখন রোমের পোপ, ৮০০ খ্রীষ্টাব্দে, তাঁকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে অভিষিক্ত করলেন "পবিত্র

কৃষক বালিকা জোয়ান অব আর্ক

রোমক-সাম্রাজ্যের" সম্রাট্-পদে। কার্লোভিঞ্জি-বংশের নরপতিরা ছিলেন টিউটন জাতিভুক্ত। তাঁরা গলের উন্নতি বিধান করেন ও বর্তমান ফ্রান্স ও জার্মেনী রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন।

শার্লামেনের মৃত্যুর পর, তাঁর বংশধরদের মধ্যে কলহ-বিবাদ ও উত্তরাঞ্চল থেকে দুর্মদ দিনেমার ও নর্মান জাতিদিগের ইওরোপের বিভিন্ন স্থানে জোর আক্রমণের ফলে শীঘ্রই কার্লোভিঞ্জি-সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন ধরল। এর পরে **ক্যাপেট**-বংশের এক কাউণ্ট, **হিউগ ক্যাপেটের** ৯৮৭ খ্রীস্টাব্দে ফরাসী সিংহাসনে উপবেশনের সময় থেকেই, স্বাধীন রাজ্য হিসাবে ফ্রান্সের অভ্যুদয় হল। হিউগ ক্যাপেটের রাজত্বেই **প্যারিস** ফ্রান্সের রাজধানীতে পরিণত হয়। ক্যাপেট-রাজবংশের আর দুজন শ্রেষ্ঠ নৃপতি **ফিলিপ অগস্টাস** ও **নবম লুই** (১২১৪—১২৭০ খ্রীঃ)। তাঁদের সময় সামন্ত-জমিদারদের ক্ষমতা হ্রাস করা হয় এবং ফ্রান্স ইওরোপে একটি সম্মানজনক রাজ্যের আসন লাভ করে। ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধগুলি ফ্রান্সের শক্তিবৃদ্ধিতে খুব সাহায্য করে। ক্যাপেট-বংশের রাজত্বের পর, ১৩২৮ খ্রীস্টাব্দে ষষ্ঠ ফিলিপ **ভ্যালয়**-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

ভ্যালয়-বংশের রাজত্বের কালে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে **"শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ"** নামে দীর্ঘকালস্থায়ী এক যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে প্রথমে ইংলণ্ড জয়লাভ করতে থাকে। তখন ফ্রান্সের খুব দুর্দশা উপস্থিত হয়েছিল। পরে ফরাসী কৃষক-বালিকা, **জোয়ান অব আর্কের** (১৪১২—১৪৩১ খ্রীঃ) অলৌকিক উৎসাহ ও প্রেরণায়, এবং ফরাসীদের মধ্যে জাতীয়তাভাবের জাগরণের ফলে, শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সই জয়লাভ করে।

এর পর থেকে ফ্রান্সে রাজারা বিশেষ করে বিচক্ষণ ও শক্তিমান্ **একাদশ লুই** ও **অষ্টম চার্লস** জমিদারদের দুর্দান্ত ক্ষমতা খর্ব করে কেন্দ্রীভূত, শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ শাসন প্রতিষ্ঠা করতে আরম্ভ করেন। অষ্টম চার্লস প্রথম বিচ্ছিন্ন ইতালিতে আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করেন। ভ্যালয়-বংশের পর **বুরবন**-রাজবংশের স্থাপয়িতা **চতুর্থ হেনরি** রাজনীতিজ্ঞতা ও যোগ্যতার জন্যে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। চতুর্থ হেনরির পর রাজা হন **ত্রয়োদশ লুই** (১৬০১—১৬৪৩ খ্রীঃ)। এই রাজারই প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ **রিসল্যু** (১৫৮৫—১৬৪২ খ্রীঃ)। রিসল্যুর সময় হতেই ফ্রান্সের সবদিকে উন্নতি শুরু হয়। এই উন্নতি ও রাজ্যের প্রসারতার পূর্ণবিকাশ হয় **চতুর্দশ লুই**-এর (১৬৩৮—১৭১৫ খ্রীঃ) রাজত্বকালে।

চতুর্দশ লুই

চতুর্দশ লুই খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী নৃপতি ছিলেন এবং আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করে রাজ্যের আয়তন অনেক বাড়িয়েছিলেন। **ভার্সাই নগরীতে** ছিল তাঁর রাজ-

জোয়ান অব আর্কের অরলিয়ন্স অধিকার

প্রাসাদ। এই অতুলনীয় প্রাসাদ একদিকে যেমন ছিল বিলাস ও আড়ম্বরের লীলা-নিকেতন, অপরদিকে আবার ইহা ছিল তখন সমস্ত ইওরোপের জ্ঞান, বিদ্যা ও শিল্প-সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল। চতুর্দশ লুই ছিলেন যেমন যোগ্যতাসম্পন্ন

তেমনি স্বেচ্ছাতন্ত্রপরায়ণ। তিনি রাজ্যের যাবতীয় ক্ষমতা অটুটভাবে নিজের হস্তগত করেন এবং জনসাধারণের অধিকার সম্পূর্ণরূপে বিলোপ করেন।

তাঁর সারা রাজত্বকাল ধরে যুদ্ধের ফলে, জনসাধারণের অর্থনৈতিক দৈন্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। রাজা ও ব্যারনেরা বিলাসের সাগরে যখন সন্তরণ দিচ্ছিলেন, তখন কৃষক ও শ্রমিকদের কারও একটু রুটিও জুটছিল না। চতুর্দশ লুই 'রাজসূর্য' বা 'মহান্ ভূপতি' আখ্যায় ভূষিত হতেন। তাঁর প্রতিভা ও অনলস শ্রমশীলতার জন্যে প্রজারা তাঁর প্রতি অনুরক্তই ছিল, তবে তাঁর শাসনপ্রণালীর কেন্দ্রমুখিতার জন্যে গবর্নমেণ্টের পিছনে জনগণের কোন সমর্থন ছিল না। তাঁর বৈদেশিক আক্রমণ-নীতির বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের রাজা **তৃতীয় উইলিয়ম** (১৬৫০—১৭০২ খ্রীঃ) একজন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ভবিষ্যতে ফরাসী-বিপ্লবের জন্যে, চতুর্দশ লুইয়ের নিরঙ্কুশ রাজতান্ত্রিকতা পরোক্ষ-ভাবে দায়ী।

চতুর্দশ লুইয়ের মৃত্যুর পর ১৭১৫ খ্রীস্টাব্দে **পঞ্চদশ লুই** (১৭১০—১৭৭৪ খ্রীঃ) রাজা হন। তাঁর রাজত্বকালে ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সমস্ত ব্যাপারে পতন, বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় প্রকট হয়ে উঠতে থাকে। এসময় দেশের লোকেরা, বিশেষ করে **তৃতীয় শ্রেণীর** অর্থাৎ কৃষক, মজতুর ও মধ্যবিত্তদের আর্থিক দুর্গতি ক্রমেই বাড়তে থাকে। বৈদেশিক নীতিতে 'সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে' ইংলণ্ড ও প্রাসিয়ার কাছে ফ্রান্সের ঘোরতর পরাজয় হয়। দেশে অসন্তোষ ব্যাপকভাবে ছড়াতে থাকে এবং রাজতন্ত্রের সম্মান নষ্ট হতে আরম্ভ করে।

পঞ্চদশ লুইয়ের সময়ে প্রজাদের দুর্গতি চরমভাবে বেড়ে উঠতে থাকে। করাত-গুঁড়ো মেশানো ঘাসের রুটি খেতে হত তখন দরিদ্র প্রজাদের। এইরকম একদা দেখতে পেয়ে রাজা কিছুক্ষণ হঠাৎ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তারপরে সে দুশ্চিন্তা কাটিয়ে উঠে বলেছিলেন, "থাকগে! আমার দিন এই ভাবেই কেটে যাবে, তার পরে প্রলয় আসে তো আসুক!"

ফরাসী-বিপ্লব

প্রলয় অবশেষে এলই। পঞ্চদশ লুইয়ের পরে রাজা হলেন **ষোড়শ লুই** (১৭৫৪—১৭৯৩ খ্রীঃ)। তিনি তখন যুবক মাত্র। তিনি লোক খারাপ ছিলেন না। তিনি অভিজাতবর্গের অবৈধ অধিকারভোগের কতকটা সংকোচন করতে চেষ্টা করেন এবং দরিদ্র প্রজার দুরবস্থার উপশমের জন্যে যত্নবান্ হন। কিন্তু তিনি দুর্বলচিত্ত ছিলেন ও তাঁর নীতিতে আস্থা-স্থাপন করা যেত না, তাই তিনি

দেশের সমস্যাকীর্ণ অচল অবস্থার কোনই সমাধান করতে পারলেন না। ঘটনা-চক্রে পঞ্চদশ লুইয়ের দুর্নীতি, ভোগবিলাস ও পাপাচারের প্রায়শ্চিত্ত করতে হল হতভাগ্য ষোড়শ লুইয়ের।

ষোড়শ লুইয়ের সিংহাসনে আরোহণের অব্যবহিত পরেই দেশে বিদ্রোহের সূচনা দেখা দিল। **রুশো** (১৭১২—১৭৭৮ খ্রীঃ), **ভলটেয়ার** (১৬৯৪—১৭৭৮ খ্রীঃ), প্রভৃতি মনীষী লেখক, জ্বলন্ত ভাষায় যে-সব মতবাদ তাঁদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তাতেই অনুপ্রাণিত হয়ে উঠল দেশের নিপীড়িত জনসাধারণ। এই দার্শনিক লেখকগণ **সাম্য, মৈত্রী** ও **স্বাধীনতার** বাণী প্রচার করেছিলেন। **মিরাবো** (১৭৪৯—১৭৯১ খ্রীঃ) নামে এক নেতা এসে জনগণকে সংঘবদ্ধ করে তুললেন। কিন্তু তাঁর নিয়মতান্ত্রিক চেষ্টা সত্ত্বেও, বিপ্লব যখন ভেঙে পড়ল তখন তা বাঁধনহারা গতিতে অনিয়মের পথে ছুটে চলল। শীঘ্রই যত্রতত্র ছোটখাট দাঙ্গা

রাজনীতিজ্ঞ রিসল্যুর সভা

ঘটতে লাগল। অবশেষে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে, প্যারিসের উন্মত্ত অধিবাসীরা রাজ-কারাদুর্গ **ব্যাস্টিল** অধিকার করে সেখানে আবদ্ধ রাজবন্দীদের মুক্ত করে দিল।

এইভাবে ফ্রান্সে ইতিহাস-বিখ্যাত **ফরাসী-বিপ্লব** আরম্ভ হল।

এই ধ্বংসকারী বিপ্লব কয়েকটি বৎসর ধরে ফ্রান্সে ঝড় বইয়ে দিল। **জেকোবিন পার্টির** ড্যানটন (১৭৫৯—১৭৯৪ খ্রীঃ), ম্যারাট (১৭৪৩—১৭৯৩ খ্রীঃ), **রোবসপিয়ার** (১৭৫৮—১৭৯৪ খ্রীঃ) প্রভৃতি এই বিপ্লবের উগ্র নেতা ছিলেন।

বিপ্লবীরা শুধু জেলখানা ভেঙেই ক্ষান্ত হল না। তারা রাজবংশের

হাত থেকে রাজ্যশাসন-ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে, জনসাধারণের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা তুলে দিল। বিপ্লবীদের উগ্রতা বেড়েই চলল। তারা ইওরোপের দেশে-দেশে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করল। অস্ট্রিয়া, প্রাসিয়া প্রভৃতি শক্তিগণ ফ্রান্সের বিপক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। তখন বিপ্লবীরা মরিয়া হয়ে উঠে, দেশের অভ্যন্তরে বিপক্ষবাদীদের নির্মমভাবে হত্যা করতে লাগল। বিপ্লবের ঝটিকাবর্তে রাজা ষোড়শ লুই ও অসংখ্য জমিদার কুখ্যাত গিলোটিন-যন্ত্রের নীচে মাথা রেখে প্রাণ দিলেন। তারপরে শুরু হল বিপ্লবের তাণ্ডবলীলা ও বিভীষিকার রাজত্ব।

ফরাসী-বিপ্লবে জমিদারি-প্রথা লুপ্ত হয়ে গেল। বড় বড় ধনী পাদ্রীদের

যুদ্ধক্ষেত্রে চতুর্দশ লুই

সমস্ত সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হল। উপাধি গ্রহণ করে মানুষে মানুষে ভেদ-সৃষ্টির যে নিয়ম প্রচলিত ছিল, তা বন্ধ করে দেওয়া হল।

ফরাসী-বিপ্লব শুধু যে ফ্রান্সের অসংখ্য প্রজাকে মুক্তির সন্ধান দিল তাই নয়, পৃথিবীর অগণিত জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা ও কল্যাণের পথও এই বিপ্লবই সূচিত করল।

বিপ্লবের অন্যতম নেতা রোবসপিয়ারের সততা ও দেশপ্রীতি ছিল সন্দেহাতীত; কিন্তু তিনি সারা ফ্রান্সে যে বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিলেন, তার প্রতিক্রিয়া শীঘ্রই দেখা দিল। শেষ পর্যন্ত তিনিও নিহত হন।

নেপোলিয়ন বোনাপার্টের অভ্যুদয়

বিপ্লবের এই ভাঙ্গনের পরে এল গড়নের পালা। রাজতন্ত্র উচ্ছেদ হল বটে, কিন্তু দেশের প্রজাতন্ত্র কি রকম হবে, রাজনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থা কি ভাবে তৈরি করলে তা দেশের সকলের পক্ষে সমান কল্যাণজনক হবে, বিপ্লবী নায়কেরা সে-সম্বন্ধে একমত হতে পারলেন না।

অনেক রকম শাসন-বিধি রচিত হল, কিন্তু কোনটিই দেশের সব লোকের মনের মত হল না। শেষ পর্যন্ত ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ বিপ্লবের দশ বৎসর পরে, ফরাসীরা বিজয়ী যোদ্ধা **নেপোলিয়ন বোনাপার্টকে** (১৭৬৯—১৮২১ খ্রীঃ) প্রজাতন্ত্রের প্রথম কনসাল বা নেতা বলে মেনে নিল এবং তাঁরই হাতে দেশ-শাসনের সকল ক্ষমতা তুলে দিল।

পঞ্চদশ লুই

ফরাসী-বিপ্লবের সঙ্গে নেপোলিয়নের কোন যোগ ছিল না; তিনি ফ্রান্সের রাজনীতিতে যোগ দেন বিপ্লবের পরে। কিন্তু অল্প-দিনের মধ্যে তিনি দেশের শ্রদ্ধার পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হয়ে ওঠেন। নেপোলিয়নের দ্রুত প্রভাববৃদ্ধির কারণ এই যে, তিনি ইতালি ও ইওরোপের অন্যান্য স্থানে অস্ট্রিয়া, প্রাসিয়া প্রভৃতি শক্তির বিরুদ্ধে, একটার পর একটা যুদ্ধে অসামান্য কৃতিত্ব লাভ করেন। ফরাসী-বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ, দৃপ্ত সৈনিকদের সহযোগে, তিনি দেশের পর দেশ মথিত, পর্যুদস্ত করে ফরাসীদের মনে আনলেন বিজয়গৌরবের উদ্দীপনা এবং নিজে হলেন ফ্রান্সের অবিসংবাদী নায়ক। তখন নেপোলিয়ন দেশকে দৃঢ়ভাবে গঠনের দিকে মনোযোগ দিলেন।

দেশের সব লোকে মিলে-মিশে দেশ শাসন করতে পারবে নেপোলিয়ন এ-কথা বিশ্বাস করতেন না। তাঁর ধারণা ছিল যে, আইন-তৈরির সময় প্রজা-প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ করা ভাল, তাদের হাতে কিছু ক্ষমতাও দেওয়া চলে, কিন্তু রাজ্যশাসনের আসল ক্ষমতা থাকা উচিত অল্প কয়েক জনের হাতে।

দেশের নেতৃত্ব হাতে নিয়েই নেপোলিয়ন তাঁর এই ধারণা অনুসারে নতুন রাজ্যশাসন-বিধি জাহির করলেন। এতেও তিনি সন্তুষ্ট হলেন না, কয়েক বৎসরের মধ্যেই, ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দে, তিনি নিজেকে সম্রাট্ বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু নেপোলিয়নের রাজত্বে এবং আগেকার বুরবন-বংশের রাজাদের রাজত্বের মধ্যে তফাত রইল অনেকখানি। আগেকার রাজাদের আমলে আইন-কানুন বলে কিছু ছিল না। নেপোলিয়ন সমস্ত দেশের জন্যে **এক রকম আইন** তৈরি করে দিলেন। নেপোলিয়নের তৈরী সেই আইনগুলো এত ভাল হয়েছিল যে, সামান্য অদল-বদল করে আজকের ফ্রান্সেও সেই সব আইনই চলছে।

নেপোলিয়নকে কেবল একজন বিখ্যাত যোদ্ধা বলে মনে করলে ভুল করা হবে, তাঁর মত **দূরদর্শী** ও **বুদ্ধিমান্** শাসনকর্তা পৃথিবীতে খুব কমই জন্মগ্রহণ করেছেন। সাহস ও শক্তি ছিল তাঁর দুর্জয়। নেপোলিয়নের তরবারি, বুদ্ধি ও জ্ঞানের কাছে ফ্রান্স অনেকখানি ঋণী।

নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য বিস্তার

নেপোলিয়ন দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর পার হয়ে মিশর পর্যন্ত এবং পূর্বে রাশিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত ফরাসী-সাম্রাজ্যের পরিধি বাড়িয়ে দিয়ে, ফ্রান্সকে জগতের **শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিরূপে** পরিচিত করেছিলেন। নেপোলিয়নের অগণিত যুদ্ধের মধ্যে, অস্ট্রিয়া-সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে **অস্টারলিজের** যুদ্ধ ও ১৮০৬ খ্রীস্টাব্দে প্রাসিয়ার বিপক্ষে **জেনা**-র যুদ্ধ বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই সংকটময় দীর্ঘ যুদ্ধের কালে ইংলণ্ড তার নৌশক্তির জোরে দেশকে বিশ্বজয়ী নেপোলিয়নের গ্রাস থেকে রক্ষা করেছিল। বিখ্যাত নৌ-বীর **নেলসনের** রণকৌশলে ইংলণ্ড ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে **ট্রাফালগার** নৌযুদ্ধে ফরাসী রণতরীবহরকে ভীষণভাবে পরাভূত করে। স্থলশক্তিতে নেপোলিয়ন অজেয় থেকে যান। ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ইওরোপে তাঁর ক্ষমতা ছিল অপ্রতিহত।

১৮০৮ খ্রীস্টাব্দে নেপোলিয়ন তাঁর ভাই জোসেফ বোনাপার্টকে জোর করে স্পেনের সিংহাসনে বসান। এতে স্পেনবাসীদের মধ্যে আক্রমণকারীর

বিরুদ্ধে একটা প্রবল জাতীয়-জাগরণের উন্মেষ দেখা দেয়। তারপর চলে ফরাসীদের সঙ্গে স্পানিশদের আপ্রাণ দীর্ঘ সংগ্রাম। এই যুদ্ধ **পেনিনসুলার যুদ্ধ** নামে খ্যাত। ইংলণ্ডের সুযোগ্য সেনানায়ক আর্থার ওয়েলেসলি (পরবর্তী **ডিউক অব ওয়েলিংটন**) এই যুদ্ধে একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করেন। পেনিনসুলার যুদ্ধে নেপোলিয়নের পতনের সূত্রপাত হয়। তারপর ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযানেই তাঁর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

মস্কো গিয়ে নেপোলিয়ন মহা বিপদে পড়েন। রাশিয়ানরা নেপোলিয়নের সামনে থেকে প্রাণপণ শক্তিতে ছুটে পালাতে থাকে এবং পালাবার সময় বাড়িঘর ক্ষেত-খামার সবকিছু জ্বালিয়ে দিয়ে চলে যায়।

ষোড়শ লুই

তখনকার দিনে তো আজকের মত সর্বত্র রেলগাড়ি ছিল না, কাজেই বাইরে থেকে খাবার এনে সৈন্যদলকে খাওয়াবারও উপায় ছিল না। এদিকে শীতকাল এসে পড়ল। রাশিয়ার শীত অতি প্রচণ্ড। নেপোলিয়ন বুঝতে পারলেন, সেই শীতে অনাহারে ও শীতবস্ত্রের অভাবে সৈন্যদলের অবস্থা সঙ্গিন হয়ে উঠবে। এমনি সময় মস্কোর কাছাকাছি এসে তিনি দূরে রুশ-সম্রাটের সৈন্যদল দেখতে পেলেন। তখন বিকেল হয়ে এসেছে, নেপোলিয়ন ভাবলেন, পরদিন সকালে তিনি রাশিয়ার সৈন্যদলকে আক্রমণ করবেন।

ফরাসী-বাহিনীকে শিবির সন্নিবেশ করতে দেখে রুশ-সম্রাট্ বা জার মনে মনে হাসলেন! তিনি বুঝলেন, রাশিয়ার কুয়াশা যে কি পদার্থ, নেপোলিয়ন তা জানেন না।

রুশ-সম্রাটের ধারণাই সত্য হল, সেদিন সন্ধ্যায় যে কুয়াশা আরম্ভ হল পরদিন অনেক বেলাতেও নেপোলিয়ন দেখলেন যে, সে কুয়াশার ঘোর আর কাটে না। সে কুয়াশা এমন ভয়ানক যে, দশ হাত দূরের জিনিসও দেখতে পাওয়া যায় না, যুদ্ধ করা তো দূরের কথা! বিকেলের দিকে কুয়াশা যখন কাটল, রুশ-সৈন্যদলের তখন চিহ্নমাত্র নেই!

নেপোলিয়ন রুশ-সম্রাটের ফন্দিটা বুঝতে পারলেন। রাশিয়া আকারে

রাজ-কারাদুর্গ ব্যাস্টিল দখল

অতি প্রকাণ্ড দেশ। এত বড় দেশে রুশ-সম্রাটের পিছনে তাড়া করে যাওয়া অসম্ভব—নেপোলিয়ন তাও বুঝতে পারলেন। তা ছাড়া, শীতে তাঁর সৈন্যদল অবশ হয়ে উঠেছিল। এই সব দেখে তিনি তাদের দেশে ফিরিবার হুকুম দিলেন। এই প্রত্যাবর্তনের পথে শীতে ও তুষারের পীড়নে নেপোলিয়নের বহু সৈন্য মারা যায়।

ওয়াটার্লুর যুদ্ধ

ইংরেজের সঙ্গে ফরাসীদের এই সময় ভয়ানক শত্রুতা চলছিল। ইতিপূর্বে নেপোলিয়ন ইওরোপের সব কয়টি দেশকে এক-জোট করে ব্রিটেনকে ব্যবসায়-বাণিজ্যে **বয়কট করে** জব্দ করবার জন্যে চেষ্টা আরম্ভ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত কিন্তু এতে বেশী ক্ষতি হল তাঁরই।

নেপোলিয়নের অপরিমিত উচ্চাকাঙ্ক্ষাই তাঁর পতনের অন্যতম কারণ।

তাঁর বিশ্বজয়ের উন্মাদ-কল্পনায় উদ্ব্যস্ত হয়ে প্রতিপক্ষ-শক্তিগুলি অবিরাম তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করে যেতে লাগল। অবশেষে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে বেলজিয়মের অন্তর্গত **ওয়াটার্লুর যুদ্ধক্ষেত্রে** নেপোলিয়ন, ইংরেজ সেনাপতি **ডিউক অব**

রোবসপিয়ারের বিচার

ওয়েলিংটনের:হাতে পরাজিত হয়ে বন্দী হলেন। বন্দী নেপোলিয়নকে আটকে রাখা হল আটলান্টিক মহাসাগরের বুকে—**সেণ্ট হেলেনা** নামক দ্বীপে। সেখানেই তাঁর শেষ নিঃশ্বাস মহাশূন্যে মিলিয়ে যায়।

অষ্টাদশ লুইয়ের শাসন

ওয়াটার্লুর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নেপোলিয়নের গড়ে-তোলা সাম্রাজ্য ভেঙে গেল। পুনরায় আগেকার বুরবন-রাজবংশের **অষ্টাদশ লুই** রাজা হলেন। নতুন রাজা ভাল করেই বুঝলেন যে, প্রজাদের ক্ষেপিয়ে রাজত্ব করা আর চলবে না। তিনি তাই কতকটা ইংলণ্ডের গণতান্ত্রিক শাসনবিধির অনুকরণে ফরাসী শাসন-তন্ত্র তৈরি করলেন।

রাজা অষ্টাদশ লুইএর পর নতুন রাজা হলেন **দশম চার্লস**। তিনি এমন একটি প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রিসভা তৈরি করলেন যে, প্রজারা বিরক্ত হয়ে উঠল। জনসাধারণের সভা দাবি করল যে, এই মন্ত্রীদের সরিয়ে

দিয়ে তাঁদের জায়গায় অন্য ভাল লোক নিযুক্ত করা হোক। কিন্তু জবরদস্ত রাজা কোন কথাই শুনলেন না, পুরানো মন্ত্রীদেরই কাজে বহাল রাখলেন। ছয় বৎসর এইভাবে বিরোধ চলবার পর, প্রজারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠল।

নেপোলিয়ন

আবার একটা ছোটখাট বিপ্লব হয়ে গেল। এই বিপ্লবকে বলা হয়, ১৮৩০এর **"জুলাই বিপ্লব"**। বুরবন-বংশের শেষ রাজা, দশম চার্লস **সিংহাসন ত্যাগ** করতে বাধ্য হলেন।

লুই ফিলিপের শাসন

ফরাসীরা বুরবন-বংশের উপরে ভয়ানক চটে গিয়েছিল। তারা এবার অর্লিয়ন্স-বংশের **লুই ফিলিপকে** এনে সিংহাসনে বসাল।

ফ্রান্সের লোকদের ধারণা হয়েছিল যে, দেশ এখনও প্রজাতন্ত্রের উপযুক্ত হয় নি; রাজা থাকা ভাল, কিন্তু রাজা যাতে প্রজাদের মনের ভাব এবং ইচ্ছা বুঝে সেই অনুসারে চলতে পারেন, তার ব্যবস্থা করা দরকার। প্রজারা দেখেছিল যে, বুরবন-বংশের রাজারা কিছুতেই তাঁদের অহংকার এবং জিদ ছাড়তে পারেন না, দেশের লোকের প্রতিনিধিদের পরামর্শে চলতে তাঁরা যেন কুণ্ঠিত হন! এই জন্যেই ফরাসীরা, দশম চার্লসের সিংহাসন-ত্যাগের পর লুই

নেপোলিয়নের বার্লিন প্রবেশ

ফিলিপকে ডেকে আনল এবং তাঁকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিল যে, দেশের লোকের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পরামর্শ না নিয়ে কোন কাজ তিনি করতে পারবেন না।

এই ব্যবস্থার ফলও ভাল হল না। ফ্রান্সে দলাদলিটা একটু বেশী। কে মন্ত্রী হবেন এই নিয়ে দলের নেতাদের মধ্যে ঝগড়া লেগেই থাকত। যাঁরা মন্ত্রী হবেন, তাঁরাও কাজ করবার সময় পেতেন না। পার্লামেন্টে যখন যে-সব দল থাকত, সে-সব দলের নেতাদের মন জোগাতেই তাঁদের সমস্ত সময় কেটে

যেত। কাজেই রাজ্যশাসন-ব্যাপারে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে লাগল। লুই ফিলিপের যোগ্যতাও ছিল না, তাই তিনি তাঁদের সামলাতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত প্যারিসে আবার **বিপ্লবের আগুন** জ্বলে উঠল। ফিলিপ **সিংহাসন ত্যাগ** করে বাঁচলেন। সেটা ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ। এই বিপ্লবের প্রভাবে ইওরোপের নানা রাজ্যে প্রবল বিপ্লব ও বিদ্রোহের আন্দোলন জেগে উঠেছিল।

লুই নেপোলিয়নের শাসন

ফরাসীরা এবার রাজতন্ত্রের উপরেই ক্ষেপে গিয়ে ঠিক করল যে কাউকেই আর রাজা করবার দরকার নেই। আবার সেই প্রথম বিপ্লবের পরের প্রজাতন্ত্রের

মিত্রশক্তি কর্তৃক এল্‌বা দ্বীপে নির্বাসিত হবার পর হঠাৎ সেখান হতে পালিয়ে নেপোলিয়নের ফ্রান্সে আগমন

মত শাসন-বিধিই তৈরি করা যাক। তাই ঠিক হল যে, ফ্রান্সে আর **রাজা থাকবে না।**

শাসন-বিধি তো ঠিক হল, কিন্তু গোলমাল বেধে গেল রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে। সম্রাট্ নেপোলিয়নের ভ্রাতুষ্পুত্র **লুই নেপোলিয়ন** তখন ফ্রান্স থেকে নির্বাসিত হয়ে ইংলণ্ডে দিন কাটাচ্ছিলেন, শেষ পর্যন্ত তাঁকে রাষ্ট্রপতি করাই ঠিক হল এবং বিপুল ভোটের জোরে তিনি নির্বাচিত হয়ে গেলেন।

লুই নেপোলিয়ন কিন্তু সোজা লোক ছিলেন না। রাষ্ট্রপতি হয়ে তিনি সন্তুষ্ট হলেন না। সম্রাট্ হবার বাসনা তাঁর মনে খুব প্রবল হয়ে উঠতে লাগল। তিন বৎসর তিনি চুপচাপ কাটিয়ে গেলেন এবং এই সময়ের মধ্যে চেষ্টা করে সৈন্যদলটিকে হাত করে নিলেন।

চতুর্থ বৎসরে তাঁর রাষ্ট্রপতিত্বের মেয়াদ যখন শেষ হয়ে আসবার কথা, তখন হঠাৎ একদিন ভোরবেলা তিনি তাঁর বিরোধী দলগুলির সমস্ত নেতাকে গ্রেফতার করলেন এবং ঘোষণা করলেন যে, আরও দশ বৎসর তিনি রাষ্ট্রপতি থাকবেন। এই চাল দেবার বছর খানেক পরেই তিনি সোজাসুজি **নিজেকে সম্রাট্** বলে ঘোষণা করলেন (১৮৫২ খ্রীঃ)।

এখন তিনি সম্রাট্ **"তৃতীয় নেপোলিয়ন"** (১৮০৮—১৮৭৩ খ্রীঃ) উপাধি গ্রহণ করলেন। তিনি সৈন্যদল, পাদরী, ব্যবসায়ী এবং জনসাধারণ—সকলের সঙ্গেই ভাব রেখে চলতেন; সকলকেই কিছু সুবিধা করে দিতেন। তাঁর আমলে ফ্রান্সের আর্থিক অবস্থাও অনেক ভাল হয়েছিল। তৃতীয় নেপোলিয়ন সক্রিয় বৈদেশিক নীতিদ্বারা আবার কিছুদিনের জন্যে ফ্রান্সের প্রতিপত্তি বাড়িয়েছিলেন। ফ্রান্স ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের সঙ্গে যোগদান করেছিল। কিন্তু তৃতীয় নেপোলিয়ন পররাষ্ট্র-নীতিতে পদে পদে ভুলও করতে লাগলেন। অবশেষে তাঁর পতন হল,—বিসমার্কের চালে প্রাসিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে নেমে।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রাসিয়া আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধ **ফ্রাঙ্কো-প্রাসিয়ান যুদ্ধ** নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিনি জার্মানদের হাতে বন্দী হলেন। যুদ্ধ-শেষে জার্মানরা তাঁকে মুক্ত করে দিল বটে, কিন্তু দেশে আর তিনি ফিরতে পারলেন না। ভগ্নহৃদয়ে তিনি ইংলণ্ডে চলে গেলেন এবং সেখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হলেন।

প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

তৃতীয় নেপোলিয়ন ফ্রাঙ্কো-প্রাসিয়ান যুদ্ধে জার্মানদের হাতে **বন্দী** হয়েছেন, এই খবর প্যারিসে পৌঁছামাত্র, সেখানে আবার রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ এবং প্রজাতন্ত্রের ঘোষণা করা হল। প্যারিসে জাতীয় পরিষদ্ গঠিত হল এবং জার্মানদের সঙ্গে দর-কষাকষি করে তাদের ফ্রান্স থেকে বিদায় করবার ভার পড়ল এডলফ্ থিয়েরের উপর। ফ্রান্সের লোহার খনি, আলসাস এবং

লোরেন, এই দুটি প্রদেশ জার্মেনীকে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং পাঁচ বৎসরে নগদ পঞ্চাশ কোটি সোনার ফ্রাঙ্ক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, এই শর্তে জার্মানরা ফ্রান্স ছেড়ে চলে গেল। তিন বৎসরের মধ্যেই ফ্রান্স এই সমস্ত টাকা দিয়ে দিল।

ফ্রাঙ্কো-প্রাসিয়ান যুদ্ধের পর পাঁচ বৎসর দেশে কোন্ ধরনের শাসনতন্ত্র প্রচলন করা হবে তাই নিয়ে ঝগড়া চলল। শেষ পর্যন্ত ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে **তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের শাসন-বিধি** তৈরী হল। স্থির হল যে, দেশের পার্লামেণ্টের মধ্যে প্রধান এবং দূরদর্শী লোকদের নিয়ে একটা সিনেট থাকবে, আর প্রজাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা প্রতিনিধি-পরিষদ্ থাকবে। সাত বৎসরের জন্যে প্রজাদের ভোটে একজন করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন এবং তাঁকে পরামর্শ দেবার জন্যে একটা মন্ত্রিসভা থাকবে। রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ করতে পারবেন না এবং মন্ত্রিসভা পার্লামেণ্টের কাছে দায়ী থাকবেন।

রাজা অষ্টাদশ লুই

এই শাসন-বিধি অনুসারেই ফ্রান্স ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত চলে এসেছে। এই সময়ের মধ্যে ফ্রান্সের ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিশিল্প সব-কিছুরই যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে, জার্মানদের কাছ থেকে তার আলসাস এবং লোরেন সে আবার উদ্ধার করেও নিয়েছিল। ফ্রান্সের লোহার কারখানা, কাপড়ের কল, কয়লার খনি এবং পশমের কলগুলো সবই প্রায় এই আলসাস-লোরেন অঞ্চলে গড়ে উঠেছে। ফ্রান্সের রাস্তাগুলি খুব চমৎকার, প্যারিস থেকে অসংখ্য পাকা রাস্তা, সোজাভাবে দিকে দিকে বেরিয়ে গিয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

ভার্সাই-সন্ধির শর্তাবলী উপেক্ষা করে জার্মেনী ক্রমশঃ শক্তিসঞ্চয় করতে আরম্ভ করল যখন, তখনই ইংলণ্ড ও ফ্রান্স সমভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল। অবশেষে হিটলারের **পোলাণ্ড আক্রমণ** শুরু হওয়ামাত্রই ইংরেজ ও ফরাসী শক্তি একযোগে যুদ্ধ ঘোষণা করল জার্মেনীর বিরুদ্ধে।

ফ্রান্স বা ইংলণ্ড যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠবার পূর্বেই জার্মেনী কর্তৃক **পোলাণ্ড ধ্বংস** হয়ে গেল এবং অপমানজনক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হল। ফরাসী বাহিনী যখন অবশেষে সুসজ্জিত হয়ে ইংরেজ-সেনার সাহায্যে জার্মেনী আক্রমণের মত অবস্থায় উপনীত হল, তখন জার্মেনীও পূর্ব-সীমান্তের যুদ্ধ-বিগ্রহ মিটিয়ে ফেলে পশ্চিম-সীমান্তের দিকে অখণ্ড মনোযোগ দেবার সুযোগ পেয়েছে।

জার্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হিসাবে, ইতিপূর্বেই ফরাসী দেশের পূর্বদিকে এক দুর্ভেদ্য দুর্গশ্রেণী নির্মিত হয়েছিল,—এর নাম **ম্যাজিনো-লাইন**। এই দুর্গগুলির অধিকাংশই ভূগর্ভে নির্মিত হয়েছিল, কাজেই মাটির উপর থেকে কিছুই বুঝবার উপায় ছিল না যে, পায়ের তলায় কী বিরাট মারণ-যজ্ঞের আয়োজন হয়ে রয়েছে।

ম্যাজিনো-লাইন ভেদ করবার চেষ্টা যে জার্মেনী করবে না, এ বিষয়ে ফরাসীরা নিঃসন্দেহ ছিল। ফ্রান্স আক্রমণ করতে হলে একমাত্র জার্মেনীর উপায় হল উত্তরে, বেলজিয়মের ভিতর দিয়ে বা দক্ষিণে, সুইজারল্যাণ্ডের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হওয়া। কিন্তু সে দুটি হল নিরপেক্ষ দেশ; ওদের নিরপেক্ষতা যাতে ক্ষুণ্ন হতে পারে এমন কাজ জার্মেনী কখনই করতে পারে না; করলে সেটা আন্তর্জাতিক আইনে অপরাধ বলে গণ্য তো হবেই, উপরন্তু ঐ দেশ দুটিও, সঙ্গে সঙ্গেই জার্মেনীর শত্রু-পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়বে।

কাজেই ফ্রান্সের মনে হল যে, তার নিজের তরফ থেকে আক্রান্ত হবার আশঙ্কা কিছুই নেই। সে নিশ্চিন্ত মনে, জার্মেনীর ভিতরে সৈন্য-চালনায় প্রবৃত্ত হল।

ম্যাজিনো-লাইনের মুখোমুখি জার্মেনীরও এক দুর্ভেদ্য দুর্গশ্রেণী ছিল, তার নাম **সিগফ্রিড-লাইন**। এই দুর্গশ্রেণীর দিকে অভিযান করল ফরাসীরা।

এক মাসের ভিতর উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ-বিগ্রহ কোথাও হল না। সেপ্টেম্বরের

শেষ দিকে, ফরাসী সৈন্য জার্মান সীমান্তের একাংশ অধিকার করে বসল। ইংলণ্ড থেকে অভিযাত্রী-সৈনিকেরা দলে দলে এসে পৌঁছাতে লাগল ফ্রান্সে। **আমেরিকা** থেকেও সামরিক সাজসজ্জা ও উপকরণ আসতে লাগল প্রভূত পরিমাণে।

সমুদ্রপথেও **ফরাসী নৌ-শক্তি** নিষ্ক্রিয় ছিল না। কিন্তু জার্মেনীর ইউ-বোটের আক্রমণে প্রথম প্রথম বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছিল ফরাসীদের। সমুদ্রপথে জার্মেনীর মাল-চলাচল রুদ্ধ করবার জন্যে বহু ফরাসী জাহাজ নিযুক্ত ছিল। ফরাসী নৌ-সেনার প্রধান সেনাপতি হলেন অ্যাডমিরাল দার্লা।

লুই নেপোলিয়ন

যুদ্ধের প্রারম্ভ থেকে **মসিয়েঁ দালাদিয়ের** ছিলেন ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ও যুদ্ধমন্ত্রী। এই সময়ে তিনি পদত্যাগ করলেন। **মসিয়েঁ রেনো** হলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর অনুরোধে দালাদিয়ের পূর্ববৎ যুদ্ধমন্ত্রী-পদে কাজ করে যেতে রাজী হলেন। তখন প্রধান সেনাপতি-পদে **গামেলাঁ** এবং সহকারী সেনাপতি পদে **জর্জেস** অধিষ্ঠিত রয়েছেন, কিন্তু জনমত ক্রমশঃ গামেলাঁর প্রতিকূলে যেতে শুরু করেছে।
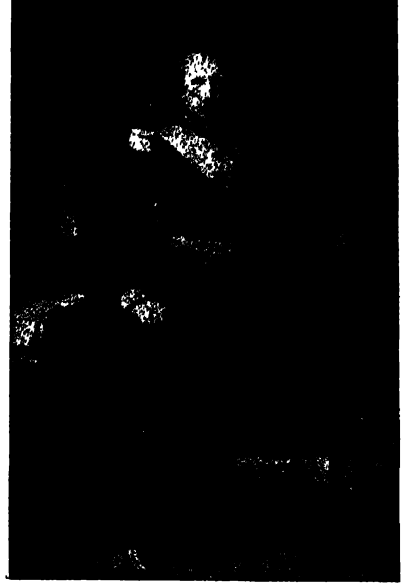
কূটনীতিজ্ঞদের সমস্ত আশ্বাস ও আশাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দিয়ে, ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের ১০ই মে তারিখে, জার্মান সেনা হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম ও লাক্সেমবুর্গ আক্রমণ করল। অমনি ফ্রান্সে আরম্ভ হল তার বিপুল প্রতিক্রিয়া।

বেলজিয়ম বা হলাণ্ড যে জার্মেনীর দিগ্বিজয়ী বাহিনীকে বাধা দিতে সমর্থ হবে না এবং বেলজিয়মের ভিতর দিয়ে, জার্মান-আক্রমণ যে ফ্রান্সের উপর এসে পড়বে অচিরেই, সে বিষয়ে আর কারও সন্দেহ রইল না। তখনই ফ্রান্স থেকে ফরাসী সেনা ও ইংরেজ অভিযাত্রী-বাহিনীর কিয়দংশ ছুটে এল হল্যাণ্ড বেলজিয়ম রক্ষার জন্যে।

তুষার, তুষার, তুষার।···এরই ভিতর দিয়ে হাজার হাজার ফরাসী সৈন্য
—রাশিয়া অভিযানের ফলে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে নেপোলিয়নের
ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন

কিন্তু ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে **হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম** যেমন নিঃশেষে আত্মাহুতি দিয়েছিল জার্মেনীর ধ্বংসযজ্ঞে, এবারে তারা আর তা করল না। কিছু দিন যুদ্ধের পরেই তারা **আত্মসমর্পণ** করে আত্মরক্ষা করল। এতে তাদের নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল ইংরেজ ও ফরাসীরা, কিন্তু ঐ দুটি দেশ অল্পের উপর দিয়ে রক্ষা পেয়ে গেল।

১০ই জুন **ইতালি** অকারণেই ফ্রান্সের বিরুদ্ধে **যুদ্ধ ঘোষণা** করল। ১১ই, জার্মান সেনা সীন নদী পার হয়ে ফরাসী দেশে প্রবেশ করল। তারপর একের পর এক ফরাসী নগরগুলির পতন ঘটতে থাকল শত্রুর হাতে। ফরাসীরা বীরের জাতি বটে, কিন্তু জার্মানদের মত রণ-নৈপুণ্য ছিল না তাদের। কাজেই তারা ক্রমশঃ পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হল।

১৬ই জুন তারিখে **মার্শাল পেতঁ্যা** নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেই সন্ধি প্রার্থনা করলেন জার্মেনীর কাছে। **কম্পিয়েনের** অরণ্যের এক রেলগাড়ির কামরার ভিতরে **সন্ধিপত্র** স্বাক্ষরিত হল। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানেও ঠিক এই স্থানেই, এই গাড়ির ভিতরে বসেই, যুদ্ধ-বিরতি পত্র স্বাক্ষর করেছিল জার্মান ও ফরাসীরা। সেবারে ফরাসীরা ছিল বিজয়ী, এবারে তারা বিজিত। ২৪শে জুন রোম নগরে ইতালির সঙ্গেও ফ্রান্সের যুদ্ধ-বিরতি স্বাক্ষরিত হল।

ফরাসী গবর্নমেণ্ট, ফ্রান্সদেশের অধিকাংশ জার্মান বাহিনীর হাতে সমর্পণ করে **ভিচীতে** অপসৃত হল। সেখানেও জার্মেনীর তাঁবেদার হিসাবেই অবস্থান করতে লাগল তারা।

ইংরেজেরা প্রস্তাব করেছিল যে, ফরাসী গবর্নমেণ্ট ফ্রান্স ত্যাগ করে উপনিবেশ থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যাক। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স—এই দুই দেশকে একত্র মিলিয়ে একটি যুক্তরাজ্য গঠনের প্রস্তাবও করেছিলেন চার্চিল; কিন্তু কোন কথাই পেতঁ্যার মনঃপূত হয় নি। পরে এর জন্যে তিনি নিন্দিত ও কারারুদ্ধ হয়েছিলেন।

অপরদিকে অন্যতম শক্তিশালী ফরাসী নেতা **জেনারেল দ্য'গল** ইংলণ্ডে গিয়ে নির্বাসিত ফরাসীদের সংঘবদ্ধ করলেন জার্মেনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে।

ভিচীতে অধিষ্ঠিত হয়ে **পেতঁ্যা-গবর্নমেণ্ট** সর্বপ্রকারে হিটলারের আনুগত্য করতে লাগলেন। ব্রিটিশ্ গবর্নমেণ্ট কিন্তু ফরাসী নৌ-বাহিনীকে করায়ত্ত করে নেওয়ার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে শুরু করল। যে-সব ফরাসী রণতরী মিত্রশক্তির কোন বন্দরে ছিল, তাদের আর বেরুতে দেওয়া হল না।

যারা বাইরে ছিল, তাদের আক্রমণ করে ধ্বংস করে দেওয়া হল। আলেকজান্দ্রিয়া, ওরান প্রভৃতি বন্দরে অনেক ফরাসী-জাহাজ এইভাবে বিনষ্ট হল। তবুও কিছুসংখ্যক ফরাসী রণতরী জার্মানদের হস্তগত হল।

তারপর উত্তর-আফ্রিকার তখনকার ফরাসী উপনিবেশ মরক্কো, তিউনিশিয়া প্রভৃতি ইংরেজ ও মার্কিন বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হল। ভিচী-সরকারের আধিপত্য নির্মূল করা হল এ-সব উপনিবেশ থেকে। জেনারেল হিরো জাতীয়তাবাদী ফ্রান্সের প্রতিনিধিরূপে সেখানে শাসনকার্য পরিচালনা করতে লাগলেন। তারপর তিনি অবসর গ্রহণ করলেন দ্য'গলের সঙ্গে মতদ্বৈধ ঘটায়।

১৯৪৫এর মার্চ মাসে, পশ্চিম-ইওরোপে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হল। ইংরেজ ও মার্কিন বাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে, দ্য'গল-পরিচালিত জাতীয়তাবাদী ফরাসীগণও এসে ফ্রান্সে অবতরণ করল। ভিচী-গবর্নমেণ্ট তাদের সম্মুখে দাঁড়াতেই পারল না।

জেনারেল দ্য'গল স্বাধীন ফ্রান্সের নতুন গবর্নমেণ্ট নিযুক্ত করলেন। ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের অনুমোদন অচিরেই লাভ করল এই গবর্নমেণ্ট। বার্লিনের পতনের পর, সমগ্র **জার্মান-রাষ্ট্র চারিভাগে** বিভক্ত করে তার এক ভাগ ফ্রান্সের হাতে সমর্পণ করা হল। জার্মেনীর শাসন-ব্যাপারে ফ্রান্স মিত্র-শক্তির তুল্য অংশীদার হল।

মার্শাল পেতাঁ্যাকে দেশদ্রোহ-অপরাধে কারাদণ্ডে **দণ্ডিত** করা হল। জেনারেল দ্য'গল (জন্ম ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের ২২শে নভেম্বর) ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দের ৭ই নভেম্বর থেকে ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তারপর ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত অন্ততঃ কুড়ি জন প্রধানমন্ত্রী হন। এইরূপ অবস্থার অবসানকল্পে দেশবাসী ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন দ্য'গলকে প্রধানমন্ত্রী করে।

জেনারেল দ্য'গল ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর ফরাসী সাধারণতন্ত্রের সভাপতি হন। প্রধানমন্ত্রী হন মাইকেল ডেবার। ফ্রান্স **উত্তর অতলান্তিক চুক্তি সংস্থা** ও **ইওরোপীয় পরিষদের** সদস্য। নানাভাবে পর্যুদস্ত হবার ফলে, জার্মেনীর পুনঃজাগরণ সম্বন্ধে ফ্রান্সের একটা স্বাভাবিক ভীতি আছে। কিন্তু মার্কিন-রাষ্ট্রের অনুরোধে ও চাপে পশ্চিম-জার্মেনীর পুনরায় সামরিক অভ্যুত্থানে ফরাসীরা সম্মতি দান করেছে। বৈদেশিক ব্যাপারে রাশিয়ার প্রতিপক্ষ ইঙ্গ-মার্কিন চক্রের সঙ্গে ফ্রান্স যোগদান করেছে।

সুদূর প্রাচ্যে ফরাসীর যে সাম্রাজ্য ছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পরে তাতে বহুদিন ধরে ঘোরতর বিপ্লব চলে। ইন্দোচীনে **ভিয়েৎনাম** (উত্তর ও দক্ষিণ) রাষ্ট্র গঠিত হয়।

ভারতবর্ষে পাঁচটি ক্ষুদ্র স্থান ফরাসী অধিকারে ছিল। বর্তমানে সেগুলি ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফ্রান্সের আজ সবচেয়ে বড় সমস্যা হল উত্তর আফ্রিকার আলজেরিয়া উপনিবেশকে নিয়ে। আলজেরিয়ায় ফরাসীদের বিশেষ স্বার্থ আছে। সেজন্যে আলজেরিয়াকে ফ্রান্স স্বাধীনতা দিতে চায় না। কিন্তু

প্রেসিডেন্ট দ্য'গল

আলজেরিয়াবাসীরা তাদের জন্মভূমিকে শৃঙ্খল-পাশ থেকে মুক্ত করবার জন্যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চালিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জুলাই আলজেরিয়া স্বাধীনতা লাভ করেছে।

আফ্রিকায় অবস্থিত ফ্রান্সের নানা উপনিবেশ এবং অন্যান্য স্থানের উপনিবেশের দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। বর্তমানে জর্জেস পঁপিদু প্রধানমন্ত্রী।

ফ্রান্সের অধিবাসীদের অধিকাংশই খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী। ফ্রান্সের আয়তন ৫,৫১,৬০১ বর্গ কিলোমিটার (২,১২,৯১৯ বর্গ মাইল) এবং লোকসংখ্যা ৫,০১,০০,০০০ (১৯৬৮)।

রাশিয়া

রাশিয়া পৃথিবীর মধ্যে আকারে সবচেয়ে বড় দেশ। ইওরোপ এবং এশিয়া, এই দুইটি মহাদেশের অনেকখানি জায়গা রাশিয়া দখল করে রেখেছে। আয়তনে দেশটি সারা পৃথিবীর স্থলভাগের এক ষষ্ঠাংশ। রাশিয়ার অধিবাসীদের সবাই কিন্তু এক জাতির লোক নয়। ইংলণ্ডের সব লোক যেমন ইংরেজ, ফ্রান্সের যেমন ফরাসী, জার্মেনীর যেমন জার্মান, রাশিয়ার সব লোক তেমন রাশিয়ান নয়। এখানে রাশিয়ান ছাড়া পোল, তাতার, মঙ্গোলিয়ান প্রভৃতি অনেক জাতির লোক বাস করে। এশিয়ার উত্তরে রাশিয়ার যে অংশ অবস্থিত, তাকে বলে সাইবিরিয়া; এখানে প্রায় সারাটি বছরই শীত থাকে, শীতকালে তো বরফে একেবারে সবটা দেশ ঢেকে যায়। ইওরোপে রাশিয়ার যে-অংশ আছে, সেখানেও প্রচণ্ড শীত পড়ে।

রাশিয়া ইওরোপীয় দেশ হলেও বহু শতাব্দী পর্যন্ত তার পশ্চিম-ইওরোপের সভ্য দেশগুলির সঙ্গে কোন সংস্পর্শ ছিল না। রাশিয়া অনুন্নত, অশিক্ষিত ও পশ্চাৎপদ দেশ ছিল।

উত্তরদেশীয় সুইডেনবাসী **রুরিক** নামক এক দুঃসাহসিক অভিযাত্রী, দলবলসহ, প্রায় ৮৫০ খ্রীস্টাব্দে, ফিনল্যাণ্ড উপসাগরের সন্নিকটে, রাশিয়া রাজ্যের প্রথম পত্তন করেন। স্কানডিনেভিয় ঔপনিবেশিকদের 'রশ্' নাম থেকে এই দেশের রাশিয়া নামের উৎপত্তি। উত্তর দেশাগত বিজেতারা

ক্রমে বিজিত স্লাভজাতিদের সঙ্গে, সভ্যতা ও রীতিনীতিতে এক হয়ে মিশে যায়। রুরিকের বংশধরগণ আশে-পাশের দেশ জয় করতে করতে, উত্তর-পশ্চিম দিকস্থ স্লাভজাতিদের প্রায় সকলকে তাঁদের ক্রম-প্রসারমান রাজ্যের অধীনে নিয়ে আসেন।

রুরিকের বংশের একজন নৃপতি **ভ্লাদিমির** যেমন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, তেমনি আইন-প্রণেতা ছিলেন। রাশিয়ার ইতিহাসে তিনি ইংলণ্ডের আলফ্রেড ও জার্মেনীর অটো দি গ্রেটের ন্যায় বিখ্যাত হয়ে আছেন। ৯৮৮ খ্রীস্টাব্দে ভ্লাদিমির

চেঙ্গিস খাঁর আক্রমণ

ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তখন থেকেই রাশিয়া গ্রীক-খ্রীস্টধর্ম পন্থার প্রধান সাহায্যকারী হয়ে ওঠে।

একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হতে রাশিয়া রাজ্যের শাসনে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই গোলযোগ অবস্থার সুযোগ নিয়ে, দুর্বারগতি মঙ্গোলজাতি, চেঙ্গিস খাঁর ও তাঁর বংশধরদের দুরন্ত নেতৃত্বে, পূর্ব-ইওরোপ ও রাশিয়ায় ঘন ঘন হানা দিতে আরম্ভ করে। ইতিমধ্যে মঙ্গোলেরা মধ্য-এশিয়ায় বিরাট শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। শীঘ্রই রাশিয়া তাদের অধিকারে চলে যায়।

রাশিয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামিগণ, এর পর প্রায় আড়াইশো বছর পর্যন্ত, পশ্চিম মঙ্গোল-সাম্রাজ্যের অধিপতির বশ্যতা স্বীকার করে তাঁকে কর দান করেন। এই দুর্দৈবের জন্যে স্লাভজাতিদের জাতীয়তাবোধ জেগে উঠতে বহু বিলম্ব হল।

অবশেষে মঙ্গোল-সাম্রাজ্যে দুর্বলতা দেখা দিলে, ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে মস্কোর শক্তিশালী সামন্ত-জমিদার, **আইভান দি গ্রেট** (১৪৪০—১৫০৫ খ্রীঃ) মঙ্গোল-দিগকে করপ্রদানে অস্বীকার করেন। আইভানকেই রাশিয়ার প্রথম স্বাধীন নৃপতি বলা চলে। তাঁর পৌত্র **আইভান দি টেরিব্‌ল্‌** (১৫৩০—১৫৮৪ খ্রীঃ) খুব নিষ্ঠুর রাজা ছিলেন। তিনিই প্রথম রাশিয়ার "জার" বা সম্রাট্‌ উপাধি গ্রহণ করেন।

মস্কোর রাজশক্তি স্বাধীন হলেও তাঁদের সময়ে শিক্ষা-দীক্ষা বা শাসন-প্রণালীর কোন উন্নতি হয় নি। রাশিয়ার আইন-কানুন তখনও অনেকটা পুরাতন মঙ্গোল প্রথাতেই চলতে থাকে। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত, পশ্চিম-ইওরোপে রাশিয়ার কোন নাম বা প্রতিপত্তি ছিল না।

আইভান দি টেরিব্‌ল্‌

রোমানফ্‌-রাজবংশের **পিটার দি গ্রেট** (১৬৭২—১৭২৫ খ্রীঃ) ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার জার হন। তাঁর সময় থেকেই রাশিয়া একটি প্রধান ইওরোপীয় রাষ্ট্রে পরিণত হয়। তিনিই সর্বপ্রথম রাশিয়ার লোকদের ইওরোপীয় সভ্যতা শেখাবার চেষ্টা করেন। তিনি খুব বুদ্ধিমান রাজ-নীতিবিদ্‌ ছিলেন। পিটার স্থির করেন যে, পশ্চিম-ইওরোপের উন্নত দেশগুলির সঙ্গে রাশিয়াকে যুক্ত করবেন এবং দেশের অশিক্ষিত কুসংস্কারপূর্ণ রীতি-নীতি রহিত করে ইওরোপীয় সভ্যতা ও রীতি-নীতি সারা দেশে প্রবর্তন করবেন। পিটার রাশিয়ার সমস্ত সনাতনী ব্যবস্থার আমূল সংস্কারে বদ্ধপরিকর হলেন।

রাশিয়ানদের মধ্যে পর্দা-প্রথা খুব কড়া রকমের ছিল, মেয়েদের পক্ষে বাইরে যাওয়া অত্যন্ত নিন্দনীয় অপরাধ বলে গণ্য হত। রাশিয়ানরা লেখাপড়া শিখতে চাইত না, দেশ ভ্রমণ করে জ্ঞান সঞ্চয় করাতেও তাদের মহা আপত্তি ছিল। তারা লম্বা লম্বা দাড়ি রাখত, তাদের বেশভূষাও ছিল কদর্য।

পিটার এই সব কুপ্রথা দূর করে রাশিয়ানদের সভ্য করবার দিকে মনোযোগ দিলেন। দাড়ি না কামালে তাঁর দরবারে কারও যোগ দেবার অধিকার ছিল না।

রাশিয়া—
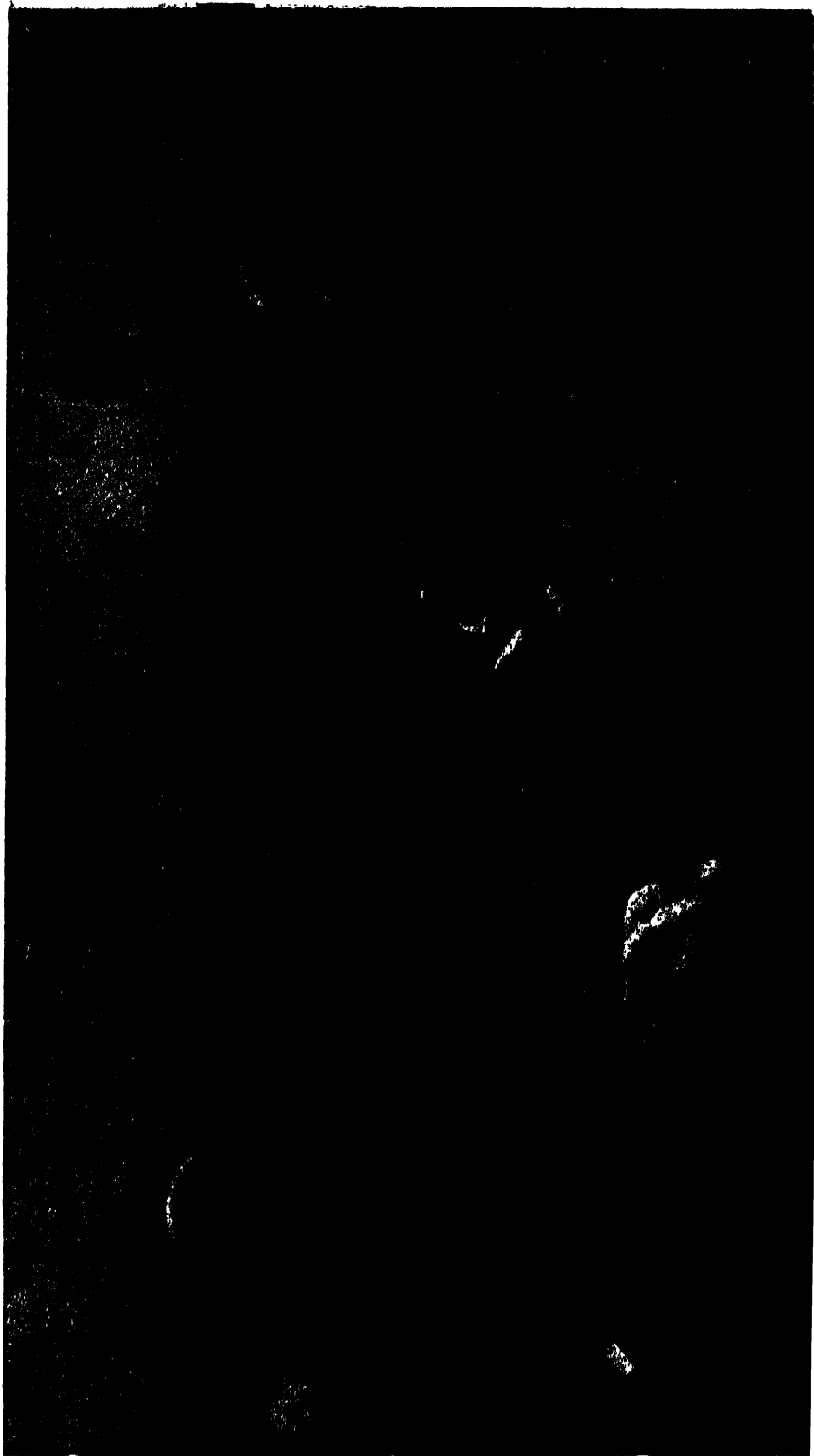
দেশের মধ্যে যাঁরা বড় বড় লোক বলে পরিচিত, পিটার তাঁদের দাড়ি কামাতে, দেশ ভ্রমণ করতে এবং লেখাপড়া শিখতে বাধ্য করলেন। রাজপ্রাসাদে কোন উৎসব হলে তিনি তাতে মেয়েদের নিমন্ত্রণ করতেন। তাঁর রানী এই রকম একটি প্রকাশ্য উৎসবে যোগ দিতে অস্বীকার করেছিলেন বলে পিটার রানীকে ছোট একটা ঘরের মধ্যে অনেকদিন ধরে বন্ধ করে রেখে দেন।

পিটার দি গ্রেট নিষ্ঠুর রাজা ছিলেন। কর্তব্য বলে যা তিনি বুঝতেন, তাকে কাজে পরিণত করবার জন্যে তিনি কোন বাধাই মানতেন না। সমাজ-সংস্কার কাজে তাঁকে কেউ বাধা দিলে তিনি তাকে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। তিনি খুব উদ্যমী ও উৎসাহী ছিলেন। তিনি নিজে শিক্ষালাভ ও অভিজ্ঞতার জন্যে প্রাসিয়া, হ্যানোভার, হল্যাণ্ড, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে ছদ্মবেশে বেড়িয়েছিলেন। তিনি ঐ সব দেশে যে সকল উন্নত বিধান-প্রণালী লক্ষ্য করেছিলেন, সেগুলি ব্যাপকভাবে রাশিয়ায় প্রবর্তিত করেন। তিনি রাশিয়ার পশ্চিমভাগে, বালটিক সাগরের নিকটে **সেণ্ট পিটার্সবুর্গ** (বর্তমান লেনিনগ্রাড) নগরে তাঁর নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। এই নগর যেন পশ্চিম-ইওরোপের সঙ্গে রাশিয়ার বাতায়ন-পথ হল। প্রাসিয়ার মত রাশিয়ায়ও ফরাসীভাষা দরবারের ভাষা হল।

বৈদেশিক নীতিতে পিটার সুইডেনের ক্ষমতা খর্ব করে বালটিক অঞ্চলে রাশিয়ার আধিপত্য বিস্তার করেন আর দক্ষিণে তুরস্ক-সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বলকান অঞ্চলে অগ্রসর-নীতির সূত্রপাত করেন।

প্রথম শাসন-সংস্কার

পিটার দি গ্রেটের আমল থেকে রাশিয়ানরা লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করল, দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনও একটু একটু করে দেখা দিতে লাগল। রাশিয়ায় কৃষকেরা ছিল জমিদারের দাস, এই দাসপ্রথা দূর করবার দাবি ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠতে লাগল। রাজারা প্রজাদের এই সব দাবিতে কান দিতেন না। তাঁরা নিজেদের ইচ্ছামত দেশ শাসন করতেন। পিটারের মৃত্যুর কিছুকাল পরে একজন নামজাদা জারিনা বা **সম্রাজ্ঞী** রাশিয়ার সিংহাসনে বসেন। তাঁর নাম, **ক্যাথারিন দি গ্রেট** (১৭২৯—১৭৯৬ খ্রীঃ)।

ক্যাথারিন ছিলেন জার্মান মহিলা। তিনি যেমন সুদক্ষ, শক্তিমতী, তেমনি নিষ্ঠুর ও ক্রূর শাসক ছিলেন। ভার্সাই রাজদরবারের ফরাসী সংস্কৃতির

অনুকরণে, তিনি তাঁর দরবারে সভ্যতার ও আদব-কায়দার প্রচলন করেছিলেন। আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র-নীতিতে তিনি পিটারের অসমাপ্ত কার্য সম্পূর্ণ করতে ব্রতী হয়েছিলেন। অস্ট্রিয়া এবং প্রাসিয়ার সহযোগে পোল্যাণ্ডকে বার বার বিভাগ করে এবং তুরস্কের বিরুদ্ধে ক্রমাগত যুদ্ধ করে তিনি রাশিয়ার সাম্রাজ্য অনেক বেশী বাড়িয়ে তোলেন।

কিন্তু পিটার বা ক্যাথারিনের শক্তিশালী রাজত্বে কৃষকদের কোনই উপকার হল না। ক্যাথারিনের পরবর্তী জারদের আমলেও দেশের জনসাধারণের দাসত্ব কঠোরভাবেই চলতে লাগল।

ক্যাথারিনের পর, জার **প্রথম আলেকজাণ্ডারের** রাজত্বকালে রাশিয়ার সঙ্গে নেপোলিয়নের যুদ্ধ হয়। রাশিয়াতে "মস্কো অভিযানে" নেপোলিয়নের বাহিনীর বিরাট বিপর্যয় ঘটেছিল। রাশিয়ার সম্রাটদের তুরস্কের বিরুদ্ধে বলকান-অঞ্চলে অগ্রসর-নীতির ফলে **প্রাচ্য-সমস্যার** উদ্ভব হয় এবং এর থেকেই ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি **ক্রিমিয়ার যুদ্ধ** (১৮৫৩—১৮৫৬ খ্রীঃ) হয়। এই যুদ্ধে রাশিয়া ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের কাছে হেরে যায়। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের পর রাশিয়ার লোকের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। তখন জার **দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার** (১৮১৮—১৮৮১ খ্রীঃ) দেশে কিছু কিছু সংস্কারের প্রবর্তন করেন।

পিটার দি গ্রেট

জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের আমলে কৃষকদের অবস্থারও একটু উন্নতি দেখা গেল। তিনি দাসপ্রথা তুলে দেন। তিনি দুকোটি ত্রিশ লক্ষ দাসকে মুক্তিদান করেন। দাসপ্রথা উঠে যাবার পর, রাশিয়ার কৃষকেরা সর্বপ্রথম জমির ফসল নিজেদের ইচ্ছানুসারে ভোগ করবার অধিকার পেল।

জার আলেকজাণ্ডার প্রজাদের আর্থিক অবস্থা একটু ভাল করে দিলেও, দেশশাসন ব্যাপারে তাদের হাত দিতে দেন নি। জেলা-বোর্ড গঠন করে গ্রামের রাস্তাঘাট তৈরি, স্কুল চালানো প্রভৃতি ক্ষমতা তাদের তিনি দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু দেশের পার্লামেণ্ট গঠন করে আইন তৈরির অধিকার তিনি তাদের হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করেন। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই ব্যবস্থাতেই রাশিয়ার শাসনকার্য চলতে লাগল।

রুশ-জাপান যুদ্ধ

চীনদেশের উত্তর-পূর্ব অংশে মাঞ্চুরিয়া এবং তার দক্ষিণে কোরিয়া অবস্থিত। এই দুইটি জায়গার উপর রাশিয়ার যেমন নজর ছিল, জাপানেরও
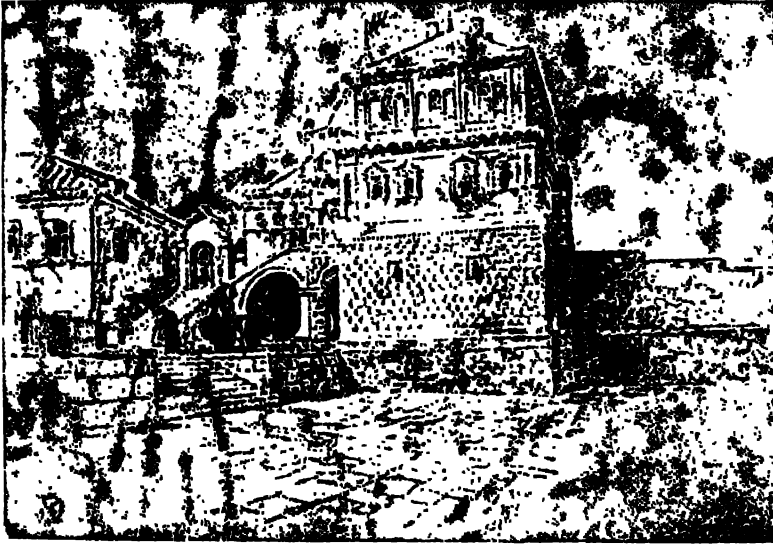
জারের প্রাসাদ

তেমনি ছিল। রাশিয়া এবং জাপান দুপক্ষই, ঐ দুটি জায়গাকে নিজের অধীনে আনবার জন্যে চেস্টা করতে লাগল। এই নিয়ে দুপক্ষে বিরোধ আরম্ভ হল। এই বিরোধ ক্রমে চরমে উঠে দুই দেশে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে এই **রুশ-জাপান যুদ্ধ** আরম্ভ হয়।

এশিয়ার কোন দেশ যে যুদ্ধে ইওরোপের কোন দেশকে পরাজিত করতে পারে, রুশ-জাপান যুদ্ধের আগে পৃথিবীতে কেউই তা বিশ্বাস করত না। এই যুদ্ধে জাপান জয়লাভ করে এবং ইওরোপ ও আমেরিকার লোকেরা বুঝতে পারে যে, এশিয়াকে আর অবহেলা করা চলবে না।

যুদ্ধ আরম্ভ হবার সময় মাঞ্চুরিয়ার বন্দর পোর্ট আর্থারে এবং সাইবিরিয়ার বন্দর ভ্লাডিভস্টকে রাশিয়ার দুটো বড় বড় নৌবহর ছিল। এক একটা নৌবহরে অনেকগুলো করে যুদ্ধ-জাহাজ থাকে। জাপান পোর্ট আর্থার বন্দরের চারটি জাহাজ ডুবিয়ে দিল এবং অন্যগুলোকে এমন ভাবে সেখানে কোণঠাসা করে রেখে দিল যে, তাদের আর ঘাঁটি ছেড়ে বেরোবার উপায় রইল না। ভ্লাডিভস্টকের রাশিয়ান নৌশক্তিকেও জাপান হারিয়ে দিল। ওদিকে স্থলযুদ্ধেও জাপানী সৈন্যেরা রাশিয়ানদের ঠেলে পিছনে হটিয়ে নিয়ে চলল।

জাপানী **জেনারেল নোগি** পোর্ট আর্থার বন্দর ঘিরে ফেললেন। রাশিয়ান **জেনারেল কুরোপাট-কিন** (১৮৪৮—১৯২১ খ্রীঃ) পোর্ট আর্থার, জাপানীদের হাত থেকে উদ্ধার করবার জন্যে চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুই করতে পারলেন না। সাত মাস অব-রোধের পর, পোর্ট আর্থার দুর্গের রাশিয়ান সৈন্যেরা আত্মসমর্পণ করল।

রাশিয়ান রমণীদের পুরান যুগের পোশাক

রাশিয়ানরা জাপানীদের কাছে জলে এবং স্থলে—দুইরকম যুদ্ধেই হারতে লাগল। দ্বিতীয় নিকোলাস (১৮৬৮—১৯১৮ খ্রীঃ) তখন রাশিয়ার জার। তিনি বালটিক সমুদ্র থেকে অনেক যুদ্ধ-জাহাজ ভ্লাডিভস্টকের দিকে পাঠিয়ে দিলেন। জাপানী সেনাপতি **এডমিরাল টোগো** এই সংবাদ পেয়ে তাদের আক্রমণ করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইলেন।

বালটিক সমুদ্র থেকে জাহাজ আসতে হলে, তাদের ইওরোপ ঘুরে ভূমধ্য-সাগরের মধ্য দিয়ে আসতে হবে। কাজেই টোগো প্রস্তুত হবার অনেক সময় পেলেন। অবশেষে, এই নৌবহর জাপানের কাছাকাছি এসে পৌঁছাবার পর, টোগো রাশিয়ার বাইশটি জাহাজ ডুবিয়ে দিলেন এবং ছয়টিকে দখল করলেন।

রাশিয়া এই পরাজয়ে দস্তুরমত দমে গেল। দেশেও নানা রকম অশান্তি দেখা দিল।

যুদ্ধক্ষেত্রে পিটার দি গ্রেট

থিওডোর রুজভেল্ট তখন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি। তিনি আমেরিকার পরবর্তী রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের পিতামহ। রুজভেল্ট রাশিয়ার জার এবং জাপানের মিকাডো দুজনকেই সন্ধি করবার জন্যে অনুরোধ করলেন। তাঁরা দুজনেই সে অনুরোধ রক্ষা করে সন্ধি করলেন। সেদিন থেকে পৃথিবীর সব দেশ বুঝে নিল যে, জাপানকে ছোট্ট দ্বীপ বলে আর অবহেলা করা চলবে না।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব

রাশিয়ায় **নিহিলিস্ট দল** নামে একটি শক্তিমান্ বিপ্লবী দল গড়ে উঠেছিল। জারের অনেক কর্মচারী তাদের হাতে নিহত হয়েছিলেন। এমন কি, জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকে, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ এই নিহিলিস্ট দল কর্তৃক সেণ্ট পিটার্সবুর্গে তাঁর গাড়ির তলায় নিক্ষিপ্ত বোমার আঘাতে প্রাণত্যাগ করতে হয়েছিল। নিহিলিস্ট দলের উদ্দেশ্য ছিল, জারের রাজত্বের উচ্ছেদ করে দেশে প্রজাদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা তুলে দেওয়া। দ্বিতীয় আলেক-জাণ্ডারের মৃত্যুর পর, এই দলের উপর এমন ভীষণ অত্যাচার চলতে থাকে যে, তারা একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।

রাশিয়ায় **সমাজতান্ত্রিক দল** নামে আরও একটা বিপ্লবী দল গড়ে উঠেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, পৃথিবীর সব দেশের ধনীদের হাত থেকে
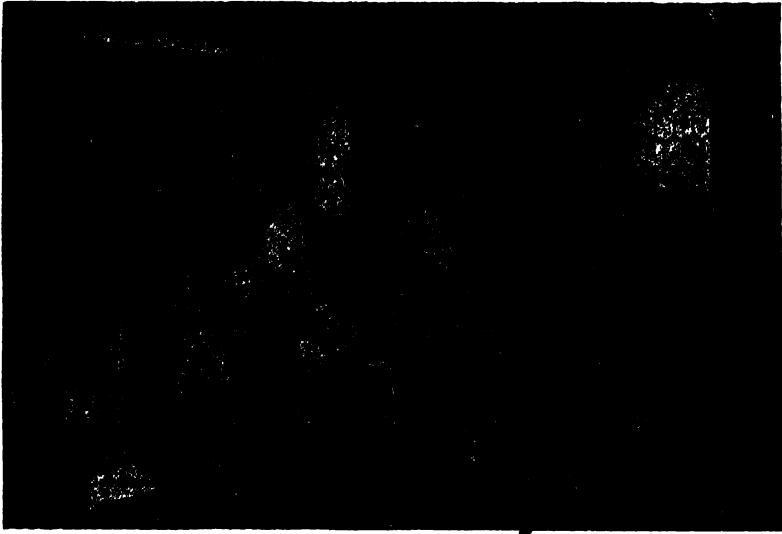
রাশিয়ান বিবাহ-উৎসব (সপ্তম শতাব্দী)

দেশ-শাসনের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে কৃষক ও শ্রমিকদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা। দেশের কোন লোক খুব বড় ধনী হতে পারবে না, একজন লোকও গরিব থাকবে না, সকলেই উপার্জন করবার, লেখাপড়া শেখবার এবং সুখে-শান্তিতে বাস করবার সুযোগ পাবে, এই ছিল তাদের লক্ষ্য। দেশের ও সমাজের সব লোকের সুবিধা-অসুবিধার কথা তারা চিন্তা করত বলে তাদের বলা হত সমাজতন্ত্রবাদী, আর তাদের দলের নাম হল সমাজতান্ত্রিক দল।

নিজেদের এইসব মতবাদ প্রচার আরম্ভ করতেই জার এই দলকে কঠোর ভাবে দমন করবার হুকুম দিলেন। রাশিয়ার পুলিস বড় সাংঘাতিক ছিল; তাদের ভয়ে দেশের লোক সন্ত্রস্ত থাকত। সমাজতন্ত্রবাদীরা সভা করতে পারত না, বক্তৃতা দিতে পারত না, এমন কি পুস্তিকা ছাপিয়ে যে বিলি করবে তারও উপায় ছিল না। পুলিস একবার টের পেলেই তৎক্ষণাৎ গ্রেফতার করে সাইবিরিয়ায় নির্বাসনে পাঠিয়ে দিত। বিচারের বালাইও বড় একটা ছিল না।

এতেও কিন্তু তারা দমল না। গোপনে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে সভা হতে লাগল। গুপ্ত ছাপাখানায় পুস্তিকা প্রভৃতি ছাপিয়ে, গোপনে সে-সব বিলি করাও চলতে থাকল। দু-চারজন যারা ধরা পড়ে যেত, তাদের আর কোন অব্যাহতি ছিল না; হয় ফাঁসি-কাঠে ঝুলতে হত, না হলে সাইবিরিয়ায় নির্বাসনে যেতে হত।

জারিনা ক্যাথারিন দি গ্রেট

এই সমাজতান্ত্রিক দলের নেতা ছিলেন তিন জন—সব চেয়ে বড় নেতা **লেনিন** (১৮৭০—১৯২৪ খ্রীঃ)। তাঁর পরে ছিলেন **ট্রটস্কী** (১৮৭৯—১৯৪০ খ্রীঃ) এবং **স্টালিন** (১৮৭৯—১৯৫৩ খ্রীঃ)। লেনিন একবার ধরা পড়ে তিন বছরের জন্যে সাইবিরিয়ায় নির্বাসিত হলেন। সেখান থেকে তিনি রাশিয়ার বাইরে চলে গেলেন, কারণ তাঁর আবার ধরা পড়বার সম্ভাবনা ছিল। ট্রটস্কীর বয়স যখন মাত্র আঠারো বৎসর, তখন ওডেসা নামক শহরে একটা শ্রমিক দল গঠনের অভিযোগে, তাঁকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হয়। স্টালিনের প্রায় বারোবার জেল হয় এবং বারোবারই তিনি জেল থেকে পালিয়ে যান। অবশেষে তাঁকে চার বছরের জন্যে সাইবিরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে এই তিনজনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় একটা বড় রকমের বিপ্লব হয়। দ্বিতীয় নিকোলাস তখন রাশিয়ার জার। ট্রটস্কী শ্রমিকদের সাহায্যে সেণ্ট পিটার্সবুর্গ শহর দখল করলেন। সেণ্ট পিটার্সবুর্গের পরে নাম হয় পেট্রোগ্রাড, আবার এই পেট্রোগ্রাডেরই আজকাল নাম হয়েছে লেনিনগ্রাড। বর্তমান রাশিয়ার রাজধানী হল মস্কো, তখন রাজধানী ছিল সেণ্ট পিটার্সবুর্গ। শ্রমিকরা মস্কো শহরটিকেও দখল করবার চেষ্টা করে, কিন্তু সফল হল না।

এই সব বিদ্রোহে ক্ষেপে উঠে জার ভীষণ অত্যাচার শুরু করে দিলেন।

নেপোলিয়নের মস্কো থেকে প্রত্যাবর্তন

বিপ্লবীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের এই বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে গেল। এই বিপ্লবই **প্রথম বলশেভিক বিপ্লব** বলে পরিচিত।

এই বিপ্লবের দুবছর আগে, সমাজতান্ত্রিক দলে দুটো ভাগ হয়ে গিয়েছিল। একদলে বেশী লোক ছিল, আর একদলে ছিল কম লোক। যে দলে বেশী লোক ছিল, তাকে বলা হত **'বলশেভিক'** অর্থাৎ অধিকাংশ লোকের দল, আর যে দলে কম লোক ছিল, তার নাম হল **'মেনশেভিক'**। মেনশেভিক কথাটির মানে অল্পসংখ্যক লোক। এই বলশেভিক দলেরই নেতা ছিলেন লেনিন।

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের ২২শে জানুয়ারি, রবিবার, সেণ্ট পিটার্সবুর্গে একটা ভীষণ ঘটনা ঘটে। রুশ-জাপান যুদ্ধের পর দেশের চারিদিকে একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল; গরিব লোকদের আহার্যদ্রব্য সংগ্রহ করা পর্যন্ত কঠিন হয়ে উঠেছিল। এই অবস্থার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে **পদারী গ্যাপন** নামক একজন ধর্মযাজক, কয়েক হাজার লোক নিয়ে শোভাযাত্রা করে জার নিকোলাসের কাছে দেশের দুঃখ জানাবার জন্যে যান। এই শোভাযাত্রীদের মধ্যে পুরুষ, নারী ও বালক-বালিকা সব রকম লোকই ছিল। তাদের কারও হাতে কোন রকম অস্ত্র-শস্ত্র ছিল না।

এই শোভাযাত্রা জারের প্রাসাদের কাছে এসে পৌঁছামাত্র কসাক সৈন্যেরা

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ

তাদের চাবুক মেরে ছত্রভঙ্গ করবার চেষ্টা করে। লোকেরা সেই মার খেয়েও সেখান থেকে যখন নড়ল না, তখন তাদের উপর নিষ্ঠুর ভাবে গুলি চলল। শত শত লোক মারা গেল, হাজার হাজার লোক আহত হল, সমস্ত রাজপথ রক্তে লাল হয়ে গেল। এই ভয়াবহ কাণ্ডের পর বিপ্লবী দল আরও ক্ষেপে গেল। চারিদিকে শুরু হল ধর্মঘট।

ডুমা গঠন

জার দেখলেন মহা বিপদ্। এই প্রবল অসন্তোষ এবং বিপ্লব শান্ত করতে হলে দেশের প্রজাদের রাজনৈতিক দাবি অন্তত: খানিকটা মেনে নিতেই হবে। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দেই জার ঘোষণা করলেন যে, একটি রাশিয়ান পার্লামেণ্ট গঠিত হবে, তাকে বলা হবে **ডুমা**।

ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের মত রাশিয়ান ডুমাতেও দুইটি সভা থাকবে। তার একটিতে দেশের বড়লোক, জমিদার প্রভৃতির প্রতিনিধিরা থাকবেন, আর একটিতে থাকবেন দেশের প্রজাদের নির্বাচিত প্রতিনিধির দল। দেশের সামরিক এবং বৈদেশিক বিভাগের উপর ডুমার কোন কর্তৃত্ব থাকবে না। দেশের সাধারণ সব আইন পাস করবার সময় জার এই ডুমার সম্মতি গ্রহণ করবেন। কিন্তু এই বন্দোবস্ত সফল হল না—প্রজা এবং রাজা দুজনেরই দোষে। এত বেশী ক্ষমতা হঠাৎ হাতে পেয়ে প্রজাদের মাথা গোলমাল হবার উপক্রম হল; এদিকে জার নিজেও প্রজাদের বিশ্বাস করতে পারলেন না।

প্রজাদের মধ্যে নানা দল হয়ে গেল। একদল এই শাসন-সংস্কারকেও ভুয়া বলে ক্ষেপে উঠল। তারা দাবি করল যে, জারের যাঁরা মন্ত্রী থাকবেন তাঁদের সব কাজের জন্যে ডুমার কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে, সব কথা ডুমার সদস্যদের জানাতে হবে। তা ছাড়া, তারা রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবি করল। নিহিলিস্ট-দলের হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মী ও নেতা তখন কারাগারে বন্দী ছিলেন। জার এই দুইটি দাবির একটিও মেনে নিতে রাজী হলেন না। দুইটি অধিবেশনের পরই এই ডুমা ভেঙে গেল।

জার ভাবলেন যে, প্রজাদের হাতে এত বেশী ক্ষমতা দিলেই গোলযোগ হবে। তাই তিনি আবার নতুন আইন জারি করে আর একটা ডুমা গঠন করলেন। এই ডুমার ক্ষমতা আগেকার চাইতে তিনি অনেক কমিয়ে দিলেন। এমন ভাবে তিনি ডুমা গঠনের বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন যে, সেটা যেন দেশের সাধারণ প্রজাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে না পড়ে জমিদার এবং বড়লোকদের মুঠোর ভিতর সীমাবদ্ধ থাকে।

১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে তৃতীয় ডুমা গঠিত হল। পাঁচ বছর পর আবার সেই নিয়মেই চতুর্থ ডুমার অধিবেশন হল। ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত এই ভাবেই রাশিয়ার শাসনকার্য চলতে লাগল।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব

১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে ইওরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন আরম্ভ হয়ে গেল, রাশিয়া তখন দূরে থাকতে পারল না। সে এসে যোগ দিল ইংরেজের পক্ষে। জার্মেনী রাশিয়াকে আক্রমণ করে তাকে যখন প্রায় কাবু করে ফেলবার উপক্রম করল, রাশিয়ানদের মধ্যে তখন ভীষণ অসন্তোষ দেখা দিল।

১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে, সেণ্ট পিটার্সবুর্গে এক **বিরাট ধর্মঘট** হল, তিন দিনের মধ্যে ধর্মঘটী শ্রমিকদের সংখ্যা আড়াই লক্ষ হয়ে দাঁড়াল। ধর্মঘটীরা রাজধানীর পথে পথে শোভাযাত্রা করে বেড়াতে লাগল। জার তাদের শায়েস্তা করবার জন্যে রাশিয়ার দুর্ধর্ষ কসাক-সৈন্য পাঠালেন। জারের অধীনে সৈন্যদের খাটুনি ছিল অনেক বেশী, তা ছাড়া মাইনেও তারা রীতিমত পেত না। সৈন্যেরা জারের বিরুদ্ধে মনে মনে খুব অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিল, তারা উল্টে ধর্মঘটীদের সঙ্গেই এসে যোগ দিল। জার আরও সৈন্য পাঠালেন, তারাও এসে ধর্মঘটীদের সঙ্গে একত্র হয়ে দেশের থানাগুলো দখল করতে লাগল।

জার নিকোলাস তখন রাজধানীর বাইরে ছিলেন, তিনি নিজে রাজধানীতে ফিরে এসে দেখলেন, শহরে ঢোকবার উপায় নেই। ধর্মঘটী বিদ্রোহীরা সমস্ত পথ-ঘাট, রেল-স্টেশন প্রভৃতি আগলে রয়েছে। জারের গবর্নমেণ্ট অচল হয়ে উঠল।

রাশিয়ায় তখন যাঁরা নেতা ছিলেন, তাঁরা এত বড় বিপ্লব সামলাতে পারলেন না। দেশের নেতৃত্ব গিয়ে পড়তে লাগল মেনশেভিকদের হাতে। মেনশেভিকরা ছিলেন বড়লোক, বিপ্লব তাঁরা চাইতেন না। কাজেই বিপ্লবের নেতৃত্ব তাঁদের হাতে পড়বার মানে হচ্ছে বিপ্লবের অবসান।

লেনিন তখন সুইজারল্যাণ্ডের জুরিক শহরে নির্বাসিত জীবন যাপন করছেন। তিনি এই খবর পেয়ে রাশিয়ায় রওনা হলেন। সমাজতন্ত্রবাদী বিপ্লবীরা তাঁকে পেয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। উপযুক্ত নেতার অভাবে তাদের সব কাজ, সমস্ত স্বার্থত্যাগ ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিল। দেশের সমাজতন্ত্রবাদীদের প্রবল শত্রু ছিল যে-সব মেনশেভিক ধনী ও জমিদার, গবর্নমেণ্ট তখন তাদের হাতের মধ্যে চলে গিয়েছে। **কেরেনস্কী** নামক একজন বড় উকিল ও বাগ্মী এই গবর্নমেণ্টের নেতা হয়ে বসলেন।

লেনিন এই সব ব্যাপার দেখে, সকলের আগে, নিজের দল গুছিয়ে নিলেন

অস্ত্রশস্ত্র, গোলা-বারুদ, বোমা এবং লোকজন যোগাড় করে তিনি প্রস্তুত হতে লাগলেন। অবশেষে সব আয়োজন সম্পূর্ণ হবার পর, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর, আসল **বলশেভিক বিপ্লব** আরম্ভ হল। একদিনের মধ্যেই রাজধানী সেণ্ট পিটার্সবুর্গ তাঁরা দখল করে নিলেন।

কেরেনস্কী

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা রাশিয়ার বিখ্যাত পিটার ও পল দুর্গের সৈন্যেরা বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দিল। লেনিনকে গ্রেফতার করবার জন্যে যে সৈন্যদল পাঠানো হয়েছিল, তারাই উলটে বিপ্লবীদের হাতে গ্রেফতার হয়ে বন্দী হল। রাজপ্রাসাদে সন্ধ্যা-বেলা কেরেনস্কী-মন্ত্রিসভার বৈঠক চলেছে। শুধু এই প্রাসাদটিই তখন বিপ্লবীদের হাতে আসা বাকী ছিল।

রাত্রিবেলাই তারা প্রাসাদ ঘিরে ফেলল। তারপর পিছন দিকের একটা দরজা খোলা পেয়েই হুড়মুড় করে হাজার হাজার লোক প্রাসাদের ভিতর ঢুকে পড়ল। মন্ত্রীরা কে কোথায় যে পলায়ন করলেন, তার কোন খোঁজই পাওয়া গেল না! সেই রাত্রির মধ্যে, রাজধানীর একটা জায়গাও আর বিপ্লবীদের হাতে আসা বাকী রইল না। প্রায় বিনা রক্তপাতেই এত বড় বিরাট একটা ব্যাপার ঘটে গেল।

বিপ্লব শুধু রাজধানীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না; মস্কো এবং অন্যান্য শহরেও ছড়িয়ে পড়ল। মস্কোতে জারের সৈন্যেরা বিপ্লবীদের বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারল না। বিপ্লবীরা একে একে রাশিয়ার সমস্ত শহর দখল করে নিল।

লেনিন ইতিমধ্যেই ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে, দেশের সমস্ত জমি হচ্ছে কৃষকদের। কাজেই কৃষকেরা জমিদার-বাড়ি সব লুঠপাট করে, গ্রামের সমস্ত জমি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল। কৃষকদের এইভাবে তুষ্ট করা যতটা সহজ হল, শহরের শ্রমিকদের বেলায় কিন্তু তা হল না। যুদ্ধের জন্যে সমস্ত জিনিসের দাম বেড়ে গিয়েছে, খাবার পাওয়া কঠিন হয়ে উঠেছে।

বিপ্লবীরা অনেক চেষ্টা করে খাবার জিনিস, কাপড়-চোপড় প্রভৃতি শ্রমিকদের দেওয়ার বন্দোবস্ত করলেন।

এবার লেনিন যুদ্ধ বন্ধ করবার দিকে মন দিলেন। জার্মেনীর সঙ্গে সন্ধি করবার জন্যে তিনি পাঠিয়ে দিলেন **ট্রটস্কীকে**। রাশিয়ায় ব্রেস্ট-লিটভস্ক নামে একটা শহর ছিল, সেখানে জার্মেনীর কয়েকজন সেনাপতির সঙ্গে ট্রটস্কী দেখা করলেন। রাশিয়াকে কায়দায় পেয়ে, জার্মেনী এমন সব কড়া কড়া শর্তের কথা তুলল যে, বলশেভিকরা সে সব শুনে দস্তুরমত চটে গেল।

লেনিন কিন্তু ট্রটস্কীকে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি যেন যে কোন শর্তে সন্ধি-পত্রে সই করে আসেন। লেনিন জানতেন যে, জার্মেনী যতই বড় বড় কথা বলুক না কেন, যুদ্ধের শেষে সন্ধির শর্ত মানতে রাশিয়াকে বাধ্য করবার ক্ষমতা তার থাকবে না। অথচ যুদ্ধ বন্ধ করে দেশে শান্তি স্থাপনের দিকে মন দেওয়া রাশিয়ার পক্ষে একান্ত দরকার।

জার্মেনীর সঙ্গে রাশিয়া সন্ধি করার পর, ইংরেজ ও ফরাসীরা গেল তার উপর ভীষণ চটে। রাশিয়ানরা এতদিন ইংরেজ ও ফরাসীদের পক্ষে যুদ্ধ করে এসেছে; এখন তারা হঠাৎ সরে দাঁড়ালে, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পক্ষে, জার্মেনীর সঙ্গে যুদ্ধ করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। বলশেভিকদের শক্তিপ্রতিষ্ঠাও ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক দেশগুলি সহ্য করতে পারছিল না। এইজন্যে তারা রাশিয়ার মধ্যে একদলকে হাত করে তাদের দিয়ে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে **গৃহযুদ্ধ** বাধিয়ে দিল।

ট্রটস্কী চার লক্ষ লাল-ফৌজ নিয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলেন। এই যুদ্ধে ট্রটস্কীই জয়লাভ করলেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বিপ্লব আরম্ভ হওয়ার পর রাশিয়ায় যে গোলযোগ চলছিল, তার অবসান হল ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে। সমাজতন্ত্রবাদী বলশেভিকদল সম্পূর্ণরূপে জয়ী হল।

একদল বলশেভিক ঠিক করেছিল যে, ভবিষ্যতে কোনদিন যাতে জারবংশের কোন লোক এসে রাশিয়ার সিংহাসন দাবি করতে না পারে তার ব্যবস্থা তারা করবে। এই উদ্দেশ্যে, বিপ্লবের গোলমালের মধ্যেই, তারা জার দ্বিতীয় নিকোলাসকে সপরিবারে ও সবংশে গুলি করে **হত্যা করেছিল** (১৬ই জুলাই, ১৯১৮ খ্রীঃ)।

লেনিন

বিপ্লবের অবসানের পর ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রাশিয়ায় এক নতুন ধরনের গবর্নমেণ্ট গঠিত হল, লেনিন হলেন তার প্রধান নেতা। এই গবর্নমেণ্টের

নাম হল **সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট**। এদের মূলনীতি হল এই যে, দেশে বড়লোক বা গরিব লোক একজনও থাকতে পারবে না, কোন লোক পৈতৃক সম্পত্তির উপর বসে খেতে পাবে না, সবাইকে খেটে খেতে হবে। কৃষকদের এবং শ্রমিকদের প্রতিনিধি নিয়ে শহরে শহরে এক-একটি সমিতি গঠিত হল, তার নাম হল **সোভিয়েট**। কৃষকদের সোভিয়েট আর শ্রমিকদের সোভিয়েট আলাদা। এই সব সোভিয়েটের প্রতিনিধি দ্বারা রাশিয়ার গবর্নমেণ্ট গঠিত হয় বলে তার নাম সোভিয়েট গবর্নমেণ্ট।

লেনিন

১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে **লেনিনের মৃত্যু** হল। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত বিপ্লবী নেতা জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের নামের সঙ্গে লেনিনের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের ৯ই এপ্রিল, রাশিয়ার এক ভদ্র পরিবারে লেনিনের জন্ম হয়। লেনিন তাঁর ছদ্মনাম। তাঁর আসল নাম হচ্ছে **ভ্লাডিমির ইলিচ উলিয়ানভ**।

লেনিন যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তখন জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকে হত্যা করবার এক ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে। লেনিনের দাদা এই ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেফতার হন এবং তাঁর ফাঁসি হয়। এই ঘটনায় লেনিনের মন জারের গবর্নমেণ্টের উপর বিষাক্ত হয়ে ওঠে, তিনি এসে বিপ্লবী দলে যোগ দেন।

একুশ বছর বয়সে আইন পাস করে তিনি ওকালতি আরম্ভ করলেন।

কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর উপর জারের পুলিসের কড়া নজর পড়ল। সাতাশ বছর বয়সে তিনি তিন বৎসরের জন্যে সাইবিরিয়ায় নির্বাসিত হলেন। সাইবিরিয়া থেকে মুক্তিলাভ করেই তিনি সুইজারল্যাণ্ডে চলে গেলেন এবং ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের বিপ্লব পর্যন্ত, অধিকাংশ সময় সেখানেই রইলেন। মাঝখানে একবার ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের বিপ্লবের সময়, কিছুদিনের জন্যে, তিনি রাশিয়ায় পদার্পণ করেছিলেন।

লেনিন **'ইস্‌ক্রা'** নাম দিয়ে একখানি পত্রিকা বার করতেন, এই পত্রিকা রাশিয়ার বিপ্লবীদের নতুন পথের সন্ধান দিত। 'ইস্‌ক্রা' রাশিয়ান শব্দ, এর মানে হচ্ছে, আগুনের স্ফুলিঙ্গ। লেনিন অনেক বই লিখে গিয়েছেন।

অমায়িক ও ভদ্র ব্যবহারের জন্যে লেনিনকে সবাই শ্রদ্ধা করত, কিন্তু তবুও তাঁর শত্রু ছিল। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে এই রকম একজন তাঁকে গুলি করে, গুলিটা তাঁর ঘাড়ে লাগে। তিনি প্রাণে বেঁচে গেলেন বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে সেরে উঠতে পারলেন না। তবুও এই অসুস্থ দেহ নিয়েই, তিনি আরও ছয় বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁর শরীরের ডানদিকে পক্ষাঘাত হয়ে কথা বলবার শক্তি লুপ্ত হয়ে গেল। পর বৎসর ২১শে জানুয়ারি তিনি ইহধাম ত্যাগ করে চলে গেলেন।

লেনিনের মৃত্যুর পর তাঁর স্থান কে গ্রহণ করবে, তাই নিয়ে গোলযোগ পাকিয়ে উঠতে লাগল। লেনিনের পর আর চারজন নেতাকে দেশের লোক চিনত—তাঁদের নাম **ট্রটস্কী, স্টালিন, জিনোভিফ** (১৮৮৩—১৯৩৬ খ্রীঃ) এবং **কামেনেভ**। তাঁদের মধ্যে ট্রটস্কী ছিলেন খাঁটী বিপ্লবী এবং স্পষ্টবক্তা লোক। তাঁর মত ছিল এই যে, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে বিপ্লব না বাধাতে পারলে, ধনীদের অত্যাচার থেকে কৃষক এবং শ্রমিকেরা মুক্তিলাভ করতে পারবে না।

স্টালিন, জিনোভিফ এবং কামেনেভ—এই তিন জনের মত ছিল অন্য রকম। তাঁদের ধারণা ছিল যে, আগে নিজেদের দেশটিকে ভাল করে গুছিয়ে নিয়ে শক্তিসঞ্চয় করতে না পারলে, পৃথিবীর অন্য সব দেশে বিপ্লব বাধানো সম্ভব নয়। লেনিনের মৃত্যুর সময় ট্রটস্কী অসুস্থ ছিলেন। এই সুযোগে জিনোভিফ, কামেনেভ এবং স্টালিন গবর্নমেণ্ট দখল করে বসলেন।

এই তিন জনের মধ্যে স্টালিন ছিলেন বিশেষ শক্তিশালী। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি কল-কৌশল ও বিচক্ষণতার দ্বারা গবর্নমেণ্টের সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে জিনোভিফ এবং কামেনেভকে পিছনে ফেলে দিলেন। তারপর তিনি ট্রটস্কীকে দল থেকে তাড়িয়ে দিলেন। ট্রটস্কী বুঝলেন যে, রাশিয়ায় আর

থাকা চলে না, তা হলে হয়ত কোনদিন স্টালিনের লোকের হাতে তাঁকে প্রাণ হারাতে হবে।

রাশিয়ায় এক মধ্যবিত্ত ইহুদী-পরিবারে ট্রটস্কীর জন্ম হয়। ছাত্রজীবন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে, তিনি বিপ্লবী দলে জড়িয়ে পড়েন এবং সাইবিরিয়ায় নির্বাসিত হন। ট্রটস্কী তাঁর ছদ্মনাম, তাঁর আসল নাম **লিওন ডেভিডোভিচ ব্রনস্টিন**। সাইবিরিয়ায় নির্বাসনে থাকবার সময় তিনি লুকিয়ে, লেনিনের সম্পাদিত কাগজ 'ইস্ক্রা' আনিয়ে পড়তেন। তিন বছর সাইবিরিয়ায় কাটাবার পর ট্রটস্কী এই ছদ্মনামে, একটা **ভুয়া ছাড়পত্র** যোগাড় করে ইংলণ্ডে পলায়ন করেন। সেই থেকে তাঁর নাম হয়ে যায় ট্রটস্কী।

লিওন ট্রটস্কী

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের বিপ্লবে তিনি এসে যোগ দেন, এবং ধরা পড়ে আবার সাইবিরিয়ায় নির্বাসিত হন। সাইবিরিয়ায় পৌঁছানোর অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আবার পলায়ন করলেন। এবার তিনি গেলেন ভিয়েনায়। সেখান থেকে তিনি জার্মেনী এবং রাশিয়ার বড় বড় সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখে টাকা রোজগার করতেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁকে অনেকবার বিপদে পড়তে হয়েছিল। জার্মেনীতে তিনি আট মাস জেল খাটলেন; ফ্রান্স থেকেও নির্বাসিত হলেন। তারপর তিনি গেলেন আমেরিকায়, সেখানে তাঁকে ভয়ানক **অর্থকষ্টে** দিন কাটাতে হয়েছিল। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে রুশ-বিপ্লবের সংবাদ পেয়ে তিনি রাশিয়ায় রওনা হলেন। ইংরেজ গবর্নমেণ্ট পথে তাঁকে গ্রেফতার করল, কিন্তু পরে ছেড়ে দিল।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবে লেনিনের সহকারীরূপে ট্রটস্কী অসামান্য শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। **বক্তৃতা** দেবার তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, ট্রটস্কীর বক্তৃতা আরম্ভ হলেই হাজার হাজার লোক মন্ত্রমুগ্ধের মত তা শুনত।

সংগঠনক্ষমতাও তাঁর যথেষ্ট ছিল, তাঁর হাতে-গড়া লাল-ফৌজ রাশিয়ায় যে বীরত্ব দেখিয়েছে, সচরাচর তা অন্যত্র দেখতে পাওয়া যায় না।

লেনিনের মৃত্যুর পর, তাঁর ভাগ্য-বিপর্যয় আরম্ভ হল। স্টালিন তাঁকে দল থেকে তাড়িয়ে দেবার পর, সপরিবারে তিনি দেশ হতে দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কোন দেশই তাঁকে বেশীদিনের জন্যে স্থান দিতে সাহস পেত না। প্রাণের ভয়ে তাঁকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হত। অবশেষে মেক্সিকো দেশে তিনি আশ্রয় পেলেন; কিন্তু গুপ্তঘাতকের দল তাঁকে সেখানেও অনুসরণ করে গেল। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে একদিন এক যুবক তাঁর সঙ্গে আলোচনা করবার ছলে তাঁর ঘরে প্রবেশ করে। সেই যুবকের অতর্কিত **হাতুড়ির আঘাতে** ট্রটস্কী নিহত হন।

রাশিয়ার সর্বময় কর্তা স্টালিন ছিলেন জর্জিয়া প্রদেশের এক মুচির ছেলে। ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে তাঁর জন্ম। অল্প বয়সেই তিনি লেনিনের অনুরক্ত হন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। স্টালিন কথা বলতেন খুব কম। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তিনি লেনিনের প্রতিটি আদেশ পালন করতেন। লেনিন এবং ট্রটস্কী যেমন ছদ্মনাম, স্টালিনও তেমনি তাঁর আসল নাম নয়। স্টালিন অর্থ হচ্ছে, 'ইস্পাতের তৈরী মানুষ'। লেনিন এই নামটি তাঁকে দিয়েছিলেন। স্টালিনের আসল নাম **যোসিফ ভিসারিওনোভিচ জুগুসভিলি।** স্টালিনের কাজ করবার শক্তি ছিল অসাধারণ। রাশিয়ার গবর্নমেণ্টের সমস্ত ক্ষমতাই তাঁর হাতের ভিতর ছিল। স্টালিন রাশিয়ার কলকারখানা, রাস্তাঘাট প্রভৃতির উন্নতির জন্যে এবং দেশের লোকের অবস্থা ভাল করবার জন্যে কয়েকটি **পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা** করেন।

১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে এই পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হয়। এই অনুসারে যে-সব কাজ করবার কথা ছিল, চার বৎসরের মধ্যেই তা শেষ হয়ে যায়। এর পরে স্টালিনের নির্দেশে, আবার একটা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তৈরি করা হয় এবং এতে কৃষকদের অবস্থার উন্নতির দিকে বেশী মনোযোগ দেওয়া হয়। এই দ্বিতীয় পরিকল্পনাও সফল হয়।

এই সব পরিকল্পনা অনুসারে এবং আরও নানাভাবে স্টালিন রাশিয়ার লোকদের এত কাজ দিয়েছেন যে, সেখানে আজ একজন লোকও **বেকার বসে নেই।** রাশিয়ার প্রত্যেকটি লোক কাজ পায়, খেতে পায় এবং লেখা-পড়া শেখবার সুযোগ পায়। মার্শাল স্টালিন দীর্ঘকাল রাশিয়ার কর্ণধার থেকে ১৯৫৩, ৫ই মার্চ তারিখে দেহত্যাগ করেছেন। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার

সংগঠনে তিনি যে বিরাট সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন বিপ্লবী-রূপে স্টালিনের
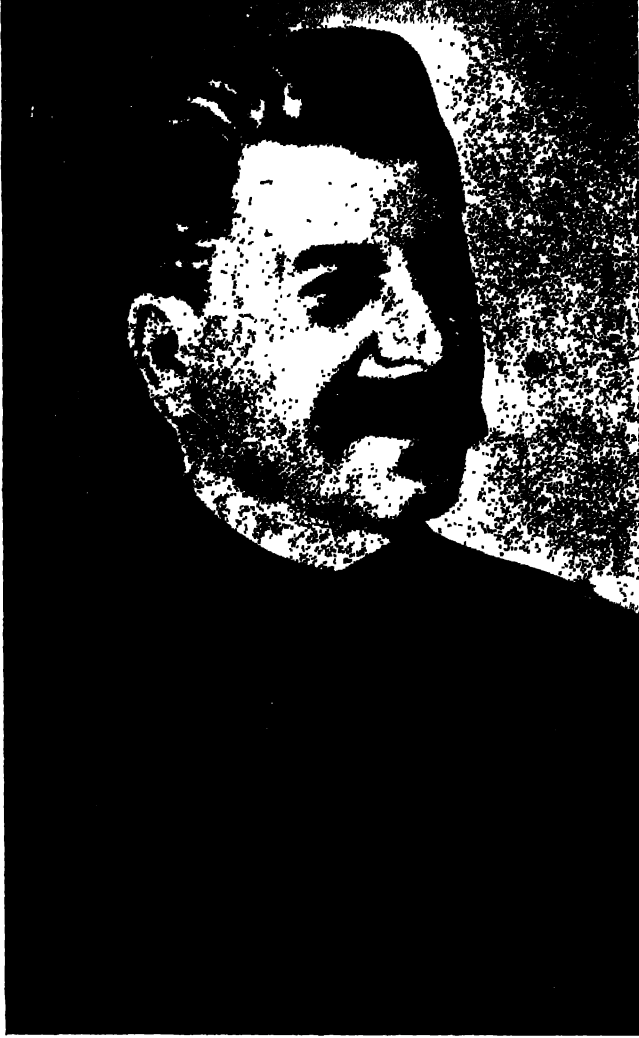
স্টালিন

তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। প্রধানতঃ তাঁর নীতি ও প্রেরণার বলেই রাশিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে গৌরবের সঙ্গে বিজয়ী হতে পেরেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে অগস্ট, স্টালিন ও হিটলার এক **অনাক্রমণ-সন্ধি-পত্রে আবদ্ধ** হন। এই সন্ধিপত্রে সই করেন জার্মেনীর পক্ষ থেকে রিবেনট্রপ ও

রাশিয়ার পক্ষ থেকে মলোটভ। হিটলার ভেবেছিলেন, রাশিয়ার সঙ্গে তাঁর এই মৈত্রীচুক্তির ফলে, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ ভয়ানক ভয় পেয়ে যাবে এবং তাঁর দিগ্বিজয়ে বাধা দিতে সাহস করবে না। বস্তুতঃ কিন্তু সে-রকম কিছু ঘটল না। ১লা সেপ্টেম্বর হিটলার পোলাণ্ড আক্রমণ করবার সঙ্গে সঙ্গেই, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জার্মেনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণ করল।

হিটলার **পোলাণ্ড আক্রমণ** করার সঙ্গে সঙ্গেই স্টালিন বলতে শুরু

স্কি-পরিহিত রুশ পদাতিক সৈন্য

করলেন যে, পোলাণ্ডের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, সুতরাং পোলাণ্ডের সীমানার মধ্যে অবস্থিত রাশিয়ানদের রক্ষার জন্যে তাঁর হস্তক্ষেপ অনিবার্য। শীঘ্রই রাশিয়ান সেনা প্রবেশ করল পোলাণ্ডে।

তিন সপ্তাহ পর্যন্ত পোলাণ্ড বীরবিক্রমে যুদ্ধ করতে থাকল—একদিকে রাশিয়া, অন্যদিকে জার্মেনীর সঙ্গে। কিন্তু এ ভাবে দুটি পরাক্রান্ত দেশের সঙ্গে, দীর্ঘদিন লড়াই করা পোলাণ্ডের মত ক্ষুদ্র দেশের পক্ষে সম্ভব হল না। অবশেষে পোলাণ্ডের রাজধানী **ওয়ার্স-র পতন** হল। বেইলীস্টক নগরে সমবেত হয়ে জার্মান ও রাশিয়ান সমর-নায়কেরা, নিজেদের ভিতর ভাগ করে নিলেন দুর্ভাগ্য পোলাণ্ডকে।

অতঃপর স্টালিনের মনোযোগ আকৃষ্ট হল **ফিনল্যাণ্ডের দিকে**। এই ক্ষুদ্র দেশটি পূর্বে রাশিয়ারই অধীন ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-কালে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে এ স্বাধীনতা লাভ করে। এখানে এক শক্তিশালী সাধারণতন্ত্রী সরকার
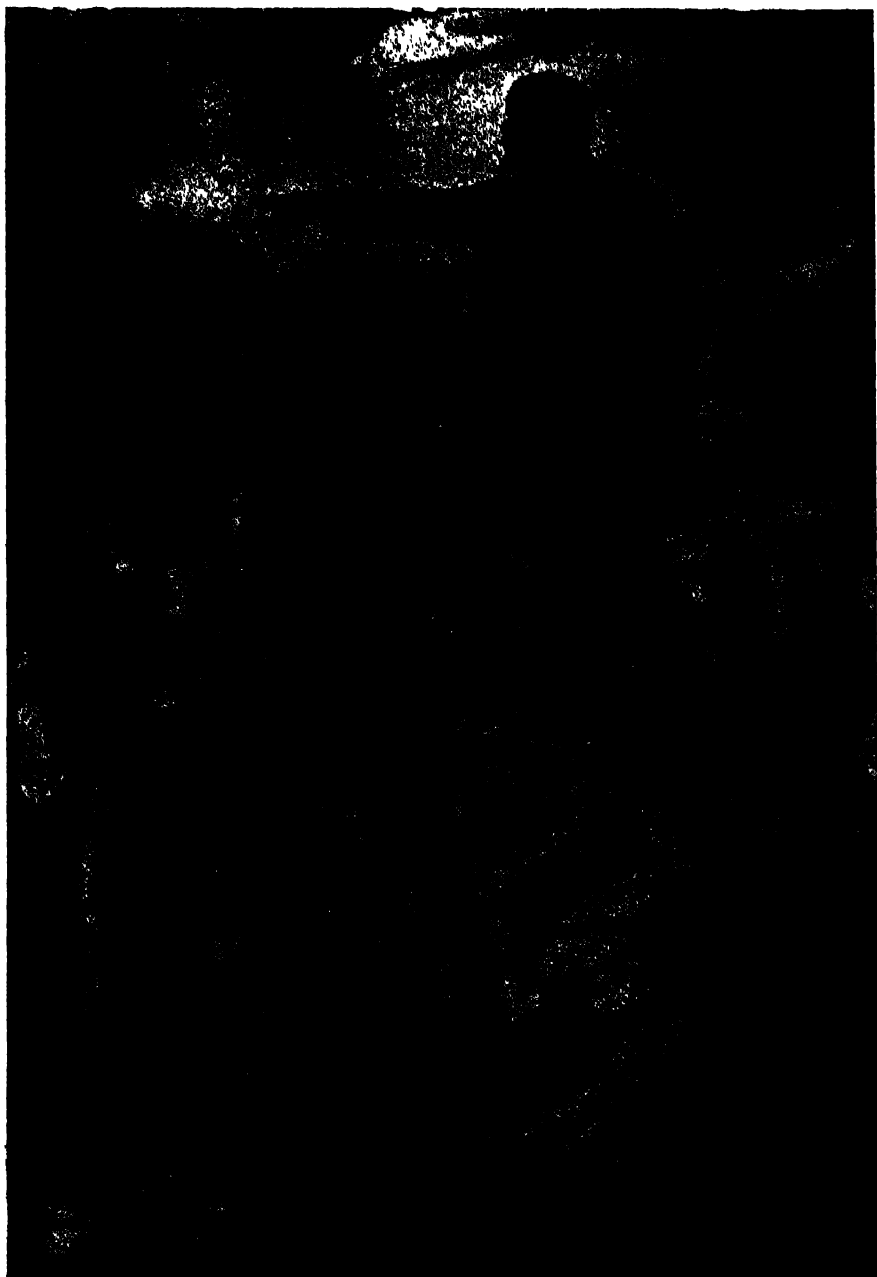
নব্য রাশিয়ার স্রষ্টা লেনিনের প্রস্তরমূর্তি—বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জার্মান সৈন্যগণ বহু চেষ্টা করেও রুশ গেরিলা বাহিনীর বাধার ফলে এ মূর্তি ভাঙতে পারে নি

প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাশিয়া ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরের প্রথমেই তার কাছে কতকগুলি দাবি করে পাঠাল।

কিন্তু ফিনল্যাণ্ড রাশিয়ার সব দাবি মানতে রাজী হল না। অবশেষে যুদ্ধ ঘোষণা না করেই ৩০শে নবেম্বর তারিখে রাশিয়ান সেনা ফিনল্যাণ্ডের উপর গোলাবর্ষণ শুরু করল। কিন্তু ক্ষুদ্র দেশ হলেও ফিনল্যাণ্ডকে জয় করা রাশিয়ার পক্ষে খুব সহজসাধ্য হল না।

ফিনল্যাণ্ড মেরুমণ্ডলের ঠিক নীচেই অবস্থিত। শীত এখানে প্রচণ্ড, তাতে রুশ-ফিন যুদ্ধ বেধেছিল আবার শীতকালেই। বরফের ভিতর দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে হত সৈনিকদের, যুদ্ধ করতে করতে হাত পা জমে বরফ হয়ে যেত। চলাচলের প্রধান যান ছিল স্লেজ। স্কি অবলম্বনে বরফের উপর দ্রুতবেগে যাতায়াত করত ফিন সৈন্যরা। রুশ সৈনিকেরাও যথেষ্ট স্কি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার ব্যবহারে ওরা সুদক্ষ ছিল না।

এই ভীষণ যুদ্ধে, ফিনল্যাণ্ড কোন দেশের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য কোন সাহায্যই পায় নি। দুই-চারিজন ভলাণ্টিয়ার হয়ত সুইডেন থেকে এসেছে, বা স্লেজ টানবার কুকুর দু-দশটা। তা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই নয়।

অতঃপর **ক্যারেলিয়ান যোজকে** যুদ্ধ আরম্ভ হল প্রচণ্ডভাবে। এই-খানেই অবস্থিত ফিনদের দুর্ভেদ্যতম রক্ষাব্যূহ—**ম্যানারহাইম লাইন।** দীর্ঘদিন ধরে রুশদের সমস্ত আক্রমণ এই ব্যূহে প্রতিহত হয়ে ব্যর্থ হতে থাকল। অবশেষে একদিন কিন্তু এই ব্যূহের অভ্যন্তরভাগে রুশ সৈন্য প্রবেশ করতে পারল। তখন ফিনল্যাণ্ডের সাহসী সৈনিকেরা বুঝতে পারল, আর যুদ্ধ করাতে অনর্থক প্রাণ-ক্ষয় ছাড়া লাভ কিছু হবে না। ১৩ই মার্চ তারিখে, রাশিয়ার সমস্ত দাবি মেনে নিয়ে তারা **সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর** করল। বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড ছেড়ে দিতে হল রুশদের হাতে।

ফিনল্যাণ্ড-যুদ্ধে জয়লাভের পর, দীর্ঘ সাড়ে তিন মাস রাশিয়া ইওরোপীয় যুদ্ধের সঙ্গে কার্যতঃ কোন সংস্রবই রাখে নি। নিজের শক্তিবৃদ্ধির দিকেই সে দিয়েছিল অখণ্ড মনোযোগ। অকস্মাৎ ২৭শে জুন, চব্বিশ ঘণ্টার এক চরম-পত্র দিয়ে, সে দাবি করল যে, **রুমানিয়ার** দুটি প্রদেশ তৎক্ষণাৎ রাশিয়াকে দিয়ে দিতে হবে। এ প্রদেশ দুটি হল **বেসারাবিয়া** ও **উত্তর-বুকোভিনা।** বলা বাহুল্য, প্রবল-পরাক্রান্ত রাশিয়ার দাবি উপেক্ষা করা ক্ষুদ্র রুমানিয়ার পক্ষে সম্ভব হল না। সে ২৮শে জুন তারিখেই উক্ত প্রদেশ দুটি রাশিয়ার হাতে সমর্পণ করল।

বেসারাবিয়া ও উত্তর-বুকোভিনা অধিকার করে নেওয়ার পরে আবার কিছুদিন একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে রইল রাশিয়া। অকস্মাৎ বিজয়-গর্বে উন্মত্ত হিটলার একদিন **রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা** করে বসলেন।

১৯৪১, ২২শে জুন, জার্মান সেনা আক্রমণ করল রুশ-সীমান্ত। বিভিন্ন পথ দিয়ে লেনিনগ্রাডের অভিমুখে তারা ধাবমান হল। ক্রমশঃ জার্মান বাহিনী দুর্বার গতিতে লেনিনগ্রাডের নিকটবর্তী হল।

জার্মান-সৈন্য রাশিয়া আক্রমণ করার ফলে, ইংরেজ ও রাশিয়ার ভিতর মৈত্রীবন্ধনের সূত্রপাত হল। এই দুই শক্তির সহযোগিতা রুশ-রণক্ষেত্রে যতটা না হোক, মধ্যপ্রাচ্যে সুস্পস্ট হয়ে উঠল প্রথমেই। ইরানের উত্তর দিক্ দিয়ে রুশ সৈন্য, এবং দক্ষিণ দিক্ দিয়ে ইংরেজ-বাহিনী, যুগপৎ প্রবেশ করল ঐ দেশের ভিতর। ইরান মন্ত্রিসভার পতন হল। রুশ ও ইংরেজ সেনা মিলিত হল কাজভিনে।

কীভ ও **ওডেসা** জার্মান কবলে পতিত হল। ক্রিমিয়ায় জার্মান প্যারাস্যুট-বাহিনী অবতরণ করল। যুদ্ধের গতি ফিরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে, রুশ-বাহিনীর পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হল। **মার্শাল টিমোশেঙ্কোর** হাতে রইল দক্ষিণ-অঞ্চলের সেনাবাহিনী পরিচালনার ভার। উত্তর অঞ্চলের অধিনায়কত্ব ন্যস্ত হল মার্শাল জুকভের উপর।

৩রা জুলাই, ১৯৪২ **সিবাস্টোপোল ত্যাগ** করতে হল রুশ সৈন্যকে। জার্মান আক্রমণে **স্টালিনগ্রাড বিপন্ন** হল। ডন নদীর কূলে পশ্চাৎপদ হল রুশ সৈন্য। ভোরোশিলভগ্রাড হস্তচ্যুত হল তাদের। রোস্টভ-অঞ্চল থেকে অপসৃত হল তারা। জার্মানরা বোমা বর্ষণ করল স্টালিনগ্রাডে। টিমোশেঙ্কো স্টালিনগ্রাড রক্ষার জন্যে ছুটে এলেন।

৮ই অগস্ট মাইকপের তৈলকূপে আগুন জ্বালিয়ে দিল রুশেরা যাতে ঐ সব কূপ জার্মান হস্তে পতিত না হয়। ১১ই অগস্ট চার্চিল এসে সাক্ষাৎ করলেন স্টালিনের সঙ্গে। ২৪শে তিনি ফিরে গেলেন ইংলণ্ডে।

মস্কো, স্টালিনগ্রাড ও **লেনিনগ্রাড**—তিন দিকেই প্রচণ্ড যুদ্ধ চলতে থাকল।

সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে, ডন ও ভল্গার মধ্যবর্তী অঞ্চলে রুশ সৈন্য অগ্রসর হতে সমর্থ হল। স্টালিনগ্রাডে জার্মান আক্রমণ প্রবলতর হয়ে উঠল। রুশেরাও প্রাণপণ করে সে আক্রমণ প্রতিরোধ করতে লাগল। ককেশাস-অঞ্চলে নলচিক পরিত্যাগ করে গেল রুশ সেনা। দীর্ঘদিন ক্রমাগত

তীব্র আক্রমণ করেও জার্মানরা কোন স্থায়ী সুবিধা লাভ করতে পারল না স্টালিনগ্রাডে। ক্রমে তারা একটু একটু করে বিতাড়িত হতে লাগল ঐ স্থান থেকে। অবশেষে স্টালিনগ্রাডের **পথে পথে হাতাহাতি যুদ্ধ** চলল রুশ ও জার্মান সৈন্যে। ককেশাসের এক যুদ্ধে জার্মান সেনা ভয়ানকভাবে পরাজিত হল।

এর পর থেকে স্টালিনগ্রাড-অঞ্চলে **রুশ সৈন্যই অগ্রগামী** হতে লাগল। ডন পার হল তারা আবার। তিন ডিভিসন জার্মান সৈন্য বন্দী হল রুশদের হাতে। অবরুদ্ধ স্টালিনগ্রাডের চারিদিকের জার্মান-বেষ্টনী ক্রমশঃ ভেঙে পড়তে লাগল। ককেশাসের অনেকটা অঞ্চল পুনরধিকার করল রুশেরা।

১৯৪২, ২৫শে নবেম্বর স্টালিনগ্রাডের অবরোধ তুলে, জার্মান সেনা পশ্চাদ্‌গমন করতে বাধ্য হল। এই থেকে রুশ-জার্মান যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল এবং জার্মেনীর পতনের সূত্রপাত হল।

১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি তারিখেই কালমাক-সাধারণতন্ত্রের রাজধানী **এলিস্টা** রুশ অধিকারে এল। স্টালিনগ্রাডের শিল্পাঞ্চলও হল **শত্রুমুক্ত**। ১৮ই জানুয়ারি লেনিনগ্রাডের অবরোধও উঠিয়ে নিতে বাধ্য হল জার্মান সেনা। চূড়ান্তভাবে স্টালিনগ্রাড অবরোধের অবসান হল ২৭শে জানুয়ারি। স্টালিন-গ্রাডে জার্মান ষষ্ঠবাহিনী একেবারে ধ্বংস হল, এর সৈন্য-সংখ্যা গোড়ার দিকে ছিল ৩,৩০,০০০। একটার পর একটা স্থান পুনরায় অধিকার করে **রোস্টভে** ভীষণ আক্রমণ চালাল রুশেরা। রোস্টভ ও ভোরোশিলভগ্রাড দখল করে ইউক্রেনের রাজধানী খার্কভও হস্তগত করল তারা।

মস্কোতে রুশ, ইংরেজ ও মার্কিন পররাষ্ট্র-সচিবদের এক যুক্ত-বৈঠক বসল। শীঘ্রই **কীভ দখল** করল লাল-ফৌজ। ইউক্রেনী রুশ-বাহিনী দুর্বারগতিতে অগ্রসর হয়ে চলল, অবশেষে গোমেল পুনরধিকার করল তারা ২৬শে নবেম্বর। তেহারানে স্টালিন সম্মিলিত হলেন রুজভেল্ট ও চার্চিলের সঙ্গে।

লেনিনগ্রাড-অঞ্চলে প্রতি-আক্রমণ চালাল এবার লাল-ফৌজ। নভোগোরড পুনরধিকৃত হল। নীপার নদীর বাঁকে দশ ডিভিসন জার্মান সেনাকে পরিবেস্টন করে বসল রুশ-বাহিনী। জার্মানরা অচিরে বিধ্বস্ত হয়ে গেল।

১৯৪৪, ১৫ই মার্চ বাগ নদী পার হয়ে ১৯শে তারিখে নীস্টার-তীরে উপনীত হল রুশ সৈন্য। জার্মানরা তাড়া খেয়ে প্রবেশ করল হাঙ্গেরীর ভিতর। ক্রিমিয়ার অন্তঃপাতী ইয়াল্টা ও বালাক্লাভা রুশ সেনার হাতে পতিত হল। তুমুল সংগ্রামে **সিবাস্টোপোল অধিকার** করল লাল-ফৌজেরা। বুদাপেস্ট

থেকে যে-সব জার্মান ও হাঙ্গেরীয় সৈন্য জার্মেনীর দিকে পালাবার চেষ্টা করছিল, তাদের পথ রুদ্ধ করে দণ্ডায়মান হল রুশ-সৈন্য। বার্লিনের অভিমুখে রুশ-অগ্রগতিতে বাধা দেওয়ার কোন উপায়ই আর রইল না হিটলারের।

১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি ডানজিগ-উপসাগরে পৌঁছাল রুশ-

ম্যালেনকভ

বাহিনী। সাইলেসিয়ার অন্তর্গত হিণ্ডেনবুর্গ অধিকার করে ওডার নদীর তীরে উপনীত হল তারা। এখানে হিটলার তাঁর শেষ রক্ষাব্যূহ রচনা করে অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু রুশ সেনার ওডার পার হওয়া রোধ করতে পারলেন না তিনি। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তারিখে **ইয়াল্টাতে** স্টালিন, রুজভেল্ট ও চার্চিলের

সাক্ষাৎকার হল। ১৬ই তারিখে, মার্শাল কোনিয়েভ এসে মিলিত হলেন **মার্শাল জুকভের** (জন্ম ১৮৯৫ খ্রীঃ) সঙ্গে, সাইলেসিয়াতে।

এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে লাল-ফৌজ বার্লিনের উপকণ্ঠে উপস্থিত হল। ২৯শে এপ্রিল **হিটলার** আত্মহত্যা করলেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে অ্যাডমিরাল **ডোয়েনিৎস** সন্ধি প্রার্থনা করলেন জুকভের কাছে। জার্মেনীর আত্মসমর্পণ-চুক্তি স্বাক্ষরিত হল ৮ই মে, বার্লিনের কার্লহর্স্ট নামক পল্লীতে। রুশ-সরকারের পক্ষ থেকে মার্শাল জুকভ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন।

যুদ্ধ-বিরতির পর, জার্মান-রাষ্ট্র ও বার্লিন নগরীর শাসনভার সম্মিলিত ভাবে রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স—এই চতুঃশক্তির করায়ত্ত হল। মার্শাল জুকভ প্রথম রুশ সামরিক শাসনকর্তার পদ গ্রহণ করলেন।

জার্মেনীর শাসন-ব্যবস্থা নিয়ে অচিরেই মতদ্বৈধ উপস্থিত হল রাশিয়া ও অন্যান্য মিত্রশক্তির ভিতরে। সে মতদ্বৈধের মীমাংসা এখনও হয় নি। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার প্রভাবাধীন জার্মেনীর তিন অংশ নিয়ে, এখন পশ্চিম-জার্মেনী রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে। এই রাষ্ট্রের প্রধান কেন্দ্র হয়েছে বন নগরী। রাশিয়ার নির্দেশে পূর্ব জার্মেনীতে আলাদা কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর প্রধান কেন্দ্র হয়েছে (পূর্ব) বার্লিন।

জার্মেনীর পতনের পরে বিশ্বযুদ্ধের ইওরোপীয় পর্ব শেষ হয়ে গেল। তখন বাকী রইল জাপানের যুদ্ধ। ৮ই অগস্ট রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে **মাঞ্চুরিয়া** অধিকার করে নিল এবং ক্রমশঃ মূল জাপানী ভূখণ্ডের দিকে এগিয়ে গেল। অ্যাটম বোমায় **হিরোসিমা** ও **নাগাসাকি** বিধ্বস্ত করল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সঙ্গে সঙ্গেই জাপান বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করল মিত্রশক্তির কাছে। জেনারেল ম্যাকআর্থার মিত্রশক্তির পক্ষ থেকে জাপানের সামরিক শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন।

এদিকে চীনের গৃহযুদ্ধে কম্যুনিস্ট মতবাদে প্রভাবিত জনগণ **চিয়াং কাইসেক** পরিচালিত **কুয়োমিনটাং গবর্নমেণ্টকে** পরাজিত করল। কম্যুনিস্ট-নেতা **মাও সে তুং** তারপর চীনে নতুন গবর্নমেণ্ট স্থাপিত করলেন। তাঁর প্রধান মিত্র হল রাশিয়া।

রাশিয়ার নাম এখন **সোভিয়েট রাশিয়া**। রাশিয়ার সর্বোচ্চ আইন-সভার নাম **সুপ্রীম সোভিয়েট**। এই সভা দুই কক্ষে বিভক্ত। সর্বশ্রেষ্ঠ শাসনকর্তৃত্ব রয়েছে এক মন্ত্রিমণ্ডলীর হাতে। শাসনযন্ত্র কম্যুনিস্ট

দলের প্রভাবাধীন, তারা প্রতিনিয়ত দেশকে প্রকৃত কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বলে দাবি করে।

বর্তমান রাশিয়া

১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দের ৫ই মার্চ স্টালিনের মৃত্যুর পর তাঁর পদে বৃত হন মঃ **ম্যালেনকভ।** কিন্তু তিনি ঐ পদে বেশী দিন অধিষ্ঠিত থাকেন নি। তাঁর পর রাশিয়ার মন্ত্রী-পরিষদের সভাপতি হলেন মঃ **বুলগানিন।** স্টালিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় যে সকল অবাঞ্ছনীয় ব্যাপার সংঘটিত হয়েছিল, বুলগানিন ও সোভিয়েট কম্যুনিস্ট দলের প্রথম সম্পাদক মঃ **ক্রুশ্চেভ** (জন্ম ১৮৯৪ খ্রীঃ) সেগুলি দূর করতে কৃতসংকল্প হন। এজন্যে প্রকাশ্যে স্টালিনের বহু নীতির সমালোচনাও করতে হয়েছে তাঁদের। তাঁদের প্রচারের ফলে স্টালিনের মর্মরমূর্তিও জনসাধারণ ভেঙে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক সদিচ্ছা প্রদর্শনের জন্যে তাঁরা ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে 'কমিনফর্ম'ও ভেঙে দিয়েছেন। বর্তমানে রাশিয়ায় স্টালিন-বিরোধী মনোভাব তীব্র আকার ধারণ করেছে। প্রধানতঃ ক্রুশ্চেভের নির্দেশে স্টালিনের শবাধার অপসারিত করে অন্যত্র রাখা হয়েছে।

বুলগানিন

যাতে কম্যুনিস্ট মতবাদ সমস্ত দেশে প্রচলিত হয় এই ধারণার বশবর্তী হয়ে রাশিয়ার নেতারা পূর্বে তাঁদের নীতি পরিচালনা করতেন। কিন্তু বর্তমানে তাঁদের সে ধারণার পরিবর্তন হয়েছে বলে তাঁরা ঘোষণা করেছেন। এখন রাশিয়া সহ-অস্তিত্বের নীতিতে বিশ্বাসী। আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনের জন্যে রাশিয়া চেষ্টা করে চলেছে।

মাঝে মাঝে রাশিয়ার উচ্চতম নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রবল মতবিরোধ দেখা যায়। এই মতবিরোধের ফলে ম্যালেনকভ প্রভৃতি নেতারা নেতৃত্ব পদ থেকে বহিষ্কৃত হন।

বেরিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি জুকভ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হন। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে অক্টোবর মার্শাল ম্যালিনোভ্‌স্কি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

ক্রুশ্চেভ ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে মার্চ প্রধানমন্ত্রী হন। **ব্রেঝেনেভ** হন সোভিয়েট রাষ্ট্রের সভাপতি।

বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি নিকেলায়েভিচ **কোসিগিন** (জন্ম ১৯০৪ খ্রীঃ লেনিনগ্রাডে)। নিকোলাই পদগর্নি প্রেসিডেন্ট।

ক্রুশ্চেভ

রাশিয়া পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গারীতে জনমত অগ্রাহ্য করে অমানুষিক সামরিক শক্তির পরিচয় দিয়েছে। হাঙ্গারীতে যে ভাবে সোভিয়েট সৈন্য জুকভের নেতৃত্বে সহস্র সহস্র নরনারীকে নিহত করেছে, তার তুলনা মেলা ভার। এজন্যে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের লোকের দ্বারা সে নিন্দিত হয়েছে।

রাশিয়া ক্রমাগত নানাভাবে পৃথিবীর নানা দেশকে নিজের আওতায় আনবার জন্যে চেষ্টা করে চলেছে। এই কারণে আইসেনহাওয়ার 'সোভিয়েট সাম্রাজ্যবাদ' কথাটি বলেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট **কেনেডি** সোভিয়েটের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দৃঢ় মনোভাব দেখিয়েছিলেন। চেকোশ্লোভাকিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চলতে চেয়েছিল। কিন্তু সে দেশেও রাশিয়া সৈন্যদল মোতায়েন রেখেছে।

ভারতের সহিত রাশিয়ার বর্তমান সম্পর্ক খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একমাত্র রাশিয়াই কাশ্মীর ও গোয়া সমস্যার ব্যাপারে ভারতকে সমর্থন করে চলেছে। কিন্তু চীন ভারত সীমান্ত অতিক্রম করলে তাকে বাধা দেয় নি।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক আদর্শের বিভিন্নতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া দুই প্রবল প্রতিপক্ষ। লাওস, ইরান, কিউবা, ইজরেল, ফরমোজা, লেবানন, ঈজিপ্ট, তুরস্ক, জার্মেনী প্রভৃতি দেশের ব্যাপার নিয়ে প্রায়ই সোভিয়েটের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতভেদ দেখা দেয়।

রকেট বিজ্ঞানে রাশিয়ার অগ্রগতি বিস্ময়কর। ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর

রাশিয়াব ভূতপূর্ব সভাপতি ব্রেঝেনেভ

পৃথিবীর মহাকাশে কৃত্রিম চাঁদ সৃষ্টি করে রুশ বিজ্ঞানীরা যে অসাধারণ বৈজ্ঞানিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, রাশিয়ার ইতিহাসে—তথা সমগ্র সভ্য জগতের ইতিহাসে তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। রাশিয়া কয়েকটি কৃত্রিম চাঁদ মহাকাশে নিক্ষেপ করেছে, সূর্যের উপগ্রহ সৃষ্টি করেছে, চাঁদের বিপরীত দিকের আলোকচিত্র গ্রহণ করেছে, চাঁদে রকেট পাঠিয়েছে। প্রথমে গাগারিন ও পরে টিটভ

ও অন্যান্য কয়েকজনকে পৃথিবীর চারিদিকে রকেটে ঘোরানোর ব্যাপারে রাশিয়া এক অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। পারমাণবিক বোমা নির্মাণ ও তার বিস্ফোরণ ব্যাপারে রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা অভূতপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সারা বিশ্বের অনুরোধ উপেক্ষা করে রাশিয়া প্রায় ৭৫ মেগাটন পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে (১৯৬১ খ্রীঃ)। সোভিয়েট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে দেশে ধর্মাচরণের স্বাধীনতা ছিল না। এখন ক্রমশঃ ব্যক্তিগত ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকৃত হচ্ছে। খ্রীস্টধর্মাবলম্বীই এখানে সংখ্যায় বেশী, তারপরেই মুসলমান। ইহুদী এবং বৌদ্ধও আছে।

পনেরটি স্বাধীন সোভিয়েট সমাজতন্ত্রী সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র নিয়ে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র—(১) রাশিয়ান সোভিয়েট ফেডার‍্যাল সোসিয়ালিস্ট রিপাবলিক (রাজধানী—মস্কো), (২) উক্রেইন (রাজধানী—কিয়েভ), (৩) কাজাখস্তান (রাজধানী—আলমা-আটা), (৪) উজবেকিস্তান (রাজধানী—তাসখন্দ), (৫) বেলোরাশিয়া (রাজধানী—মিন্‌স্ক্), (৬) জর্জিয়া (রাজধানী—ৎবিলিসি), (৭) আজেরবাইজান (রাজধানী—বাকু), (৮) মোলডাভিয়া (রাজধানী—কিশিনেভ), (৯) লিথুয়ানিয়া (রাজধানী—ভিলনাস), (১০) কিরগিজিয়া (রাজধানী—ফ্রুন্‌জ), (১১) তাদঝিকিস্তান (রাজধানী—ডুশানবে), (১২) ল্যাটভিয়া (রাজধানী—রিগা), (১৩) আর্মেনিয়া (রাজধানী—ইয়েরেভ্যান), (১৪) তুর্কমেনিস্তান (রাজধানী—আশখাবাদ), (১৫) ইস্তোনিয়া (রাজধান—তালিন)।

রাশিয়ার আয়তন ২,২৪,০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার (৮৬,৫০,০০০) বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ২৩,৫৫,০০,০০০ (১৯৬৭)।

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে ইংলণ্ডের নাম ছিল **ব্রিটেন,** এবং সেখানে যে-সব লোক বাস করত তারা এখনকার মত সভ্য ছিল না। ছোট্ট ছোট্ট কুঁড়েঘর তৈরি করে তারই ভিতর তারা থাকত এবং কাপড় বুনতে জানত না বলে বন্য জন্তু শিকার করে তাদের ছাল পরত। তবুও তারা স্বাধীন ছিল; তাদের সঙ্গে বাণিজ্য করবার জন্যে দূর-বিদেশ থেকেও অনেক লোক আসত। ব্রিটেনে তখন খুব বেশী পরিমাণে টিন পাওয়া যেত। টিন ছিল খুব দরকারী জিনিস। তামার সঙ্গে টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জ ধাতু তৈরী হত এবং সেই ধাতু দিয়ে তলোয়ার, বর্শা প্রভৃতি অস্ত্র বানিয়ে, তাই দিয়ে লোকে বন্য জন্তু শিকার করত এবং দরকার হলে যুদ্ধও করত।

ব্রিটেনের লোকদের বলত **ব্রিটন**। দেশের বেশির ভাগ জায়গাতেই তখন জঙ্গল। ব্রিটনরা জঙ্গল কেটে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে সেইখানে মাটির ঘর তুলে তার উপর দিত পাতার ছাউনি,—আর সারাটা গ্রামের চারিপাশে গাছের গুঁড়ি পুঁতে এমনভাবে বেড়া দিয়ে দিত যাতে বন্য জন্তু বা শত্রু এসে হঠাৎ আক্রমণ না করতে পারে। জীবজন্তু শিকার, মাছ ধরা এবং চাষবাস ছিল তাদের পেশা।

তাদের মধ্যে অনেক পুরোহিত ছিল, তাদের বলা হত **ড্রুইড**। ব্রিটনরা সূর্য, চন্দ্র এবং তারাগুলিকে দেবতা বলে বিশ্বাস করত। ড্রুইডেরা ছিল বনবাসী, লোকালয়ের বাইরে তারা বাস করত। তারা শুধু যে পূজা করত তা নয়, লোকের ঝগড়া-বিবাদ বিচার করে মিটিয়ে দেওয়া এবং রোগে চিকিৎসা করাও ছিল তাদের কাজ।

ব্রিটনদের যুগে ইংলণ্ড

রোমানদের আগমন

যতই দিন যেতে লাগল, বিদেশ থেকে ততই বেশী বেশী করে লোক ব্রিটেনে ব্যবসা করতে আসতে লাগল। ব্রিটনরাও সমুদ্র পার হয়ে অন্য দেশে যেতে আরম্ভ করল। একদল গেল **গলে** বা বর্তমান **ফ্রান্সে**। সেখানে গিয়ে তারা দেখল যে, বিখ্যাত রোমক সেনাপতি **জুলিয়স সীজারের** সৈন্যরা এসে গলদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের হারিয়ে দিয়ে সে দেশটাকে দখল করে নেবার চেষ্টা করছে। ব্রিটনরা ছিল গলদের আত্মীয়; তাই তাদের স্বাধীনতা বাঁচাবার জন্যে তারা রোমানদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করল। কিন্তু তখনকার দিনে রোমানরা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী যোদ্ধা ছিল। তাদের সঙ্গে যুদ্ধে গলজাতি পেরে উঠল না, রোমানরা গল দখল করে নিল।

সীজারই তখন গল জয় করেছিলেন। ব্রিটনরা গলে এসে রোমানদের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে দেখে তিনি অত্যন্ত চটে গেলেন, এবং ব্রিটনদের শাস্তি দেবার জন্যে তাদের দেশ ব্রিটেন আক্রমণ করার সংকল্প করলেন। খ্রীঃ পূঃ ৫৫ অব্দে তিনি রোমানদের নিয়ে, জাহাজে চড়ে ব্রিটেনে এসে নামলেন।

সমুদ্রের তীরে ব্রিটনরা দলে দলে এসে সীজারের সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করল। কিন্তু রোমানদের অস্ত্র-শস্ত্র ব্রিটনদের চেয়ে ভাল ছিল বলে তারা যুদ্ধে হেরে গিয়ে, বনে-জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়ল। সীজার বুঝতে পারলেন যে, ব্রিটেন জয় করা তিনি যত সহজ ভেবেছিলেন তত সহজ হবে না। ব্রিটনরা হেরে গেল, কিন্তু কিছুতেই বশ্যতা স্বীকার করল না। এই দেখে সীজার সেবারের

ব্রিটেনে বিখ্যাত রোমের প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ

মত গলে ফিরে গিয়ে আবার পর-বৎসর, আরও বেশী সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ব্রিটেন আক্রমণ করলেন।

এবারও ব্রিটনরা প্রাণপণে যুদ্ধ করল বটে, কিন্তু রোমানদের সঙ্গে পেরে উঠল না। সীজার ব্রিটনদের কাছ থেকে অনেক কর ও উপঢৌকন আদায় করলেন। ব্রিটেন জয় করা তাঁর মতলব ছিল না, তাদের শাস্তি দেওয়াই উদ্দেশ্য ছিল। তাই তিনি ব্রিটেন ত্যাগ করে গলদেশে ফিরে এলেন।

সীজারের অভিযানের পর, প্রায় একশ বছর রোমানরা আর ব্রিটেনের দিকে দৃষ্টি দিল না। কালক্রমে রোমে সাধারণতন্ত্র-যুগের পর সাম্রাজ্যতন্ত্রের যুগ আরম্ভ হল। তারপর ৪৩ খ্রীস্টাব্দে **সম্রাট্ ক্লডিয়াস** (১৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ—

৫৪ খ্রীঃ) ব্রিটেন জয় করবার জন্যে অনেক সুশিক্ষিত সেনাপতি ও রোমান সৈন্যবাহিনী সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। ব্রিটনরা এবারও সকল শক্তি দিয়ে যুদ্ধ করল, কিন্তু এবারও তারা হেরে গেল। তাদের স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়ে এবার

আলস বারটন চার্চ—স্যাক্সন-যুগের একটি শিল্প-নিদর্শন

তাদের দেশ রোমান অধিকারে চলে গেল। এ-সময়ে ব্রিটেনের একজন রানী **বোডিসিয়া** খুব বীরত্ব ও শৌর্যের সঙ্গে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।

এরপর রোমানরা প্রায় চারশ বছর ধরে ব্রিটেনে রাজত্ব করেছিল। তাদের রাজত্বের সময় ব্রিটেনে লোকজনের সুবিধার জন্যে অনেক ভাল ভাল রাজপথ, বড় বড় দেওয়াল এবং নদীর উপর পুল তৈরী হয়েছিল। তখনকার অনেক রাস্তা এবং প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ আজও দেখা যায়।

রাজা আলফ্রেড

রোমক সাম্রাজ্য বিভিন্ন বর্বর জাতিদের দ্বারা আক্রান্ত হলে, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম দিকে রোমানরা ব্রিটেন ছেড়ে চলে যায়। তখন ব্রিটনরা বেশ মুশকিলে পড়ে গেল। এতদিন রোমক শক্তির অভিভাবকত্বের মধ্যে থেকে তারা তাদের পূর্বের যুদ্ধবিদ্যা একেবারেই ভুলে গিয়েছিল। বাইরে থেকে কোন শত্রু এলে তাকে তাড়িয়ে দেবার ক্ষমতা তাদের আর ছিল না।

ব্রিটনদের এই অসুবিধার কথা বুঝতে পেরে, দলে দলে দুর্ধর্ষ জাতিরা এসে ব্রিটেন আক্রমণ করতে লাগল। স্কটল্যাণ্ড থেকে **পিক্ট, স্কট** এবং জার্মেনী থেকে **অ্যাঙ্গল, স্যাক্সন, জুট** প্রভৃতি অসভ্য জাতির লোকেরা এসে দেশের উপর ভীষণ অত্যাচার শুরু করল। তারা ব্রিটনদের দেখতে পেলেই হত্যা করত, তাদের সমস্ত সম্পত্তি লুটপাট করে নিত, ঘরবাড়ি সব জ্বালিয়ে দিত। তাদের নিষ্ঠুর স্বভাব দেখে এবং তারা সমুদ্র-পার থেকে এসেছিল বলে ব্রিটনরা তাদের নাম দিয়েছিল, 'জলের নেকড়ে'।

মহামতি আলফ্রেড

এই সব আক্রমণকারী জাতিদের মধ্যে ক্রমে অ্যাঙ্গল এবং স্যাক্সনরাই ব্রিটেনের অধিকাংশ স্থানে আধিপত্য বিস্তার করল। তাদের নাম থেকে দেশের লোকের নাম হল ইংরেজ এবং দেশের নাম হল ইংলণ্ড। ব্রিটনরা ইংরেজদের দাস হল এবং অনেকে ওয়েলসে পালিয়ে গেল।

ইংরেজরা ক্রমে ক্রমে ইংলণ্ডে অনেক রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করল। এই সবের মধ্যে কেণ্ট, নর্দামব্রিয়া, মার্সিয়া এবং ওয়েসেক্স রাজ্য প্রধান। এই সব রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকত। তাদের মধ্যে কোন একতা ছিল

না। অবশেষে **এগবার্ট** নামে একজন রাজা ওয়েসেক্সের সিংহাসনে বসে (রাজত্বকাল ৮০২—৮৩৯ খ্রীঃ) ইংলণ্ডের আর সব রাজাকে হারিয়ে দিলেন। তখন থেকে **ওয়েসেক্স রাজ্যের প্রাধান্য** আরম্ভ হল।

এগবার্টের নাতির নাম ছিল **আলফ্রেড** (৮৪৯—৮৯৯ খ্রীঃ)। ইংলণ্ডের প্রাচীনকালের রাজাদের মধ্যে এই আলফ্রেডই ছিলেন সব চেয়ে বড়। তাঁর রাজত্বের সময়, নরওয়ে এবং ডেনমার্ক থেকে, দুর্ধর্ষ ও সমুদ্রবিলাসী **ডেন** জাতির লোকেরা এসে ইংলণ্ডে ভীষণ উৎপাত আরম্ভ করে। আলফ্রেড প্রথমটা তাদের বাধা দিতে পারলেন না, ডেনরা আলফ্রেডের লোকজনদের যুদ্ধে হারিয়ে দিল।

আলফ্রেড নিজেও পালিয়ে এক জঙ্গলে গিয়ে সেখানে এক রাখালের কুটীরে আশ্রয় নিলেন। সেখানে বসে বসেও তিনি রাতদিন শুধু ভাবতেন, কেমন করে ডেনদের তাড়িয়ে দিয়ে, দেশকে তাদের উপদ্রব হতে মুক্ত করবেন। ধীরে ধীরে তিনি তাঁর লোকজনদের একত্র করতে লাগলেন; তারপর ঠিক করলেন যে, ডেনদের দলে কত লোক আছে, তা জানবার জন্যে তিনি নিজেই তাদের ঘাঁটিতে যাবেন।

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। আলফ্রেড বাজনদার সেজে একটা বাজনা নিয়ে ছদ্মবেশে ডেনদের আড্ডায় গিয়ে হাজির হলেন। ডেনরা বুঝতেই পারল না যে, তাদের পরম শত্রু এসে তাদের বাজনা শুনিয়ে যাচ্ছেন। আলফ্রেড এইভাবে ডেনদের আড্ডার খবর নিয়ে এসে সেইভাবে প্রস্তুত হয়ে অনেক বেশী লোক নিয়ে শত্রুদের আক্রমণ করলেন। এবার ডেনরা হেরে গেল (৮৭৮ খ্রীঃ) এবং তাদের দলপতি বাধ্য হয়ে আলফ্রেডের সঙ্গে সন্ধি করল। এই সন্ধিকে **ওয়েডমুরের সন্ধি** বলে। আলফ্রেড তাদের বসবাসের জন্যে খানিকটা জায়গা ছেড়ে দিলেন।

আলফ্রেডের রাজত্বে ইংলণ্ডের লোকেরা খুব সুখে ছিল। তিনি দেশের লোকদের জন্যে অনেক বিদ্যালয় খুলে দিয়েছিলেন, অনেক ভাল ভাল বই লিখিয়েছিলেন এবং সুন্দর সুন্দর আইন তৈরি করে সকলের সুখে ও শান্তিতে থাকবার বন্দোবস্ত করেছিলেন। তিনি অনেক জাহাজও তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। রাজা আলফ্রেডের বহুমুখী প্রতিভা ছিল বলে তাঁর নাম দেওয়া হয়, **মহামতি আলফ্রেড**।

রাজা ক্যানিউট

রাজা আলফ্রেডের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য বংশধরদের অধীনে অনেক বছর ইংলণ্ডের লোকদের ভাল ভাবেই কেটে গেল। তারপর বাইরের ডেনরা আবার এসে ইংলণ্ড আক্রমণ করল এবং এবার স্যাক্সনদের দোষ-ত্রুটি ও অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে, তাদের হারিয়ে দিয়ে, দেশ জয় করে নিল। **ক্যানিউট** (৯৯৫—১০৩৫ খ্রীঃ) নামে একজন ডেন রাজকুমার ইংলণ্ডের রাজা হলেন। ক্যানিউট বিদেশী হলেও ভাল রাজা ছিলেন। তিনি ডেন ও ইংরেজদের সমচক্ষে দেখতেন। তিনি খোশামোদ পছন্দ করতেন না।

একদিন তিনি তাঁর খোশামোদপ্রিয় পারিষদদের বেশ জব্দ করেছিলেন। ক্যানিউট সেদিন সমুদ্রের তীরে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় তাঁর একজন পারিষদ বলে বসলেন, "মহারাজ, আপনি শুধু যে এই দেশের রাজা তাই নয়, আপনি সমুদ্রেরও প্রভু।" ক্যানিউট এই কথা শুনে একটা চেয়ার এনে জলের ধারে পাতবার জন্যে সঙ্গের লোকদের হুকুম দিলেন। তখন জোয়ার আসছে, আর একটু পরেই সেই জায়গাটা জলে ভেসে যাবে। তবুও ক্যানিউট সেখানে সেই চেয়ারে বসলেন এবং তাঁর পারিষদেরা গিয়ে তাঁর পিছনে দাঁড়ালেন।

ক্যানিউট তখন সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি সমুদ্রের প্রভু। অতএব হে সমুদ্র, তুমি আমার কাছে এস না। দেখ যেন তোমার জলে আমার পা না ভিজে যায়।" বলা বাহুল্য, সমুদ্র সে কথা মোটেই শুনল না, জোয়ারের জল এসে ক্যানিউটের পায়ের উপর আছড়িয়ে পড়ল, তাঁর পা ভিজে গেল। রাজা ক্যানিউট তখন সেই পারিষদদের দিকে ফিরে বললেন, "এখন দেখতে পাচ্ছ তো যে, আমি সমুদ্রের প্রভু নই! মনে রেখ, পৃথিবীতে একজন মাত্র প্রভু আছেন, তিনি ঈশ্বর। একা তিনিই শুধু স্বর্গে, মর্তে এবং সমুদ্রের উপর প্রভুত্ব করেন।" পারিষদেরা লজ্জায় মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। সেইদিন থেকে ক্যানিউট রাজমুকুট নিজের মাথা থেকে খুলে, এক গির্জায় খুব উঁচুতে ঝুলিয়ে রাখলেন; এরপর যতদিন তিনি রাজত্ব করেছেন, ততদিন তিনি আর রাজমুকুট পরেন নি।

নরম্যান অভিযান

ফ্রান্সের উত্তরে **নরম্যাণ্ডি** বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে ডেনদের সমজাতিভুক্ত **নরম্যান** নামক এক জাতির লোকেরা বাস করত। তাদের পূর্বপুরুষরাও ইংরেজ এবং ডেনদের মতই হিংস্র ও নিষ্ঠুর স্বভাবের লোক ছিল। জল-দস্যুতা ছিল তাদের পেশা। উত্তর দেশগুলি থেকে এসে নরম্যাণ্ডিতে বসবাস আরম্ভ করবার পর ফরাসী প্রভাবে তারা অনেকটা সভ্য হয়ে এসেছিল।

বিজয়ী উইলিয়ম

তাদের একজন ডিউক বা প্রধান ব্যক্তির নাম ছিল **উইলিয়ম** (১০২৭—১০৮৭ খ্রীঃ)। ইংলণ্ডে তখন **এডওয়ার্ড দি কনফেসর** (১০০৪—১০৬৬ খ্রীঃ) নামে এক ইংরেজ রাজা রাজত্ব করছিলেন, তাঁর কোন ছেলে ছিল না। উইলিয়মের সামন্ত-রাজ্য নরম্যাণ্ডি, ইংলণ্ডের খুব কাছে ছিল; রাজা এডওয়ার্ডের সঙ্গে তাঁর একটা সম্পর্কও ছিল, কাজেই তাঁর মনে মনে আশা ছিল, এডওয়ার্ডের মৃত্যুর পর তিনিই ইংলণ্ডের রাজা হবেন। এডওয়ার্ডের মৃত্যুর পর ইংরেজরা **হ্যারল্ড** (১০২২—১০৬৬ খ্রীঃ) নামক একজন ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে রাজা করে দিল। উইলিয়ম ভয়ানক চটে গেলেন।

স্যাক্সন পদাতিক ও নরম্যান অশ্বারোহী

উইলিয়ম ১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দে অনেক সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ইংলণ্ড আক্রমণ করলেন। ইংলণ্ডের দক্ষিণে **হেস্টিংস** নামক একটা জায়গায় উইলিয়মের সঙ্গে হ্যারল্ডের ভীষণ যুদ্ধ হল। তখনও যুদ্ধে

কামান-বন্দুকের প্রচলন হয় নি, সৈন্যরা তীর-ধনুক, ঢাল-তলোয়ার এইসব অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করত। এই যুদ্ধে নরম্যানদের একটা তীর রাজা হ্যারল্ডের চোখে গিয়ে বিঁধল এবং তাতে হ্যারল্ড মারা গেলেন। রাজার মৃত্যুতে ইংরেজরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল।

উইলিয়ম নিজেকে ইংলণ্ডের রাজা বলে ঘোষণা করলেন। ইংলণ্ডের ইতিহাসে তাঁকে **বিজয়ী উইলিয়ম** বা **প্রথম উইলিয়ম** বলে। তিনি রাজা হলেন বটে, কিন্তু ইংরেজদের বশীভূত করতে তাঁর অনেক বছর কেটে গিয়েছিল।

বিখ্যাত কেনিলওয়ার্থ ক্যাস্‌ল্ (নরম্যান যুগ)

তিনি ইংলণ্ড এবং নরম্যাণ্ডি দুটো দেশেরই রাজা হলেন। উইলিয়ম বিচক্ষণতার দ্বারা সামন্তপ্রথায় নানারূপ পরিবর্তন এনে জমিদারদের ক্ষমতা খর্ব করেছিলেন এবং ইংলণ্ডে খুব শক্তিশালী কেন্দ্রীয় রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। হ্যারল্ড অ্যাঙ্গলো-স্যাক্সন যুগের শেষ রাজা। প্রথম উইলিয়ম ইংলণ্ডে নরম্যান রাজবংশের প্রবর্তন করেন।

রাজা প্রথম রিচার্ড

উইলিয়মের পরে যাঁরা রাজা হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে **দ্বিতীয় হেনরী** (১১৩৩—১১৮৯ খ্রীঃ) খুব বিচক্ষণ ও সুদক্ষ। তিনি দুর্দান্ত জমিদারদের বশে এনেছিলেন, কিন্তু ধর্মব্যাপারে, ক্যাণ্টারবেরির আর্চবিশপ **টমাস বেকেটের** (১১১৮—১১৭০ খ্রীঃ) সঙ্গে বিরোধে, ঘটনাচক্রে শেষ পর্যন্ত লাঞ্ছিত হয়েছিলেন।

টমাস বেকেট নিহত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় হেনরীর ছেলে **প্রথম রিচার্ডের** (১১৫৭—১১৯৯ খ্রীঃ) বীরত্ব-কাহিনী দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। রিচার্ড খুব সাহসী ও শক্তিশালী ছিলেন এবং যুদ্ধ করতে ভালবাসতেন বলে লোকে তাঁর নাম দিয়েছিল, **সিংহ-হৃদয় রিচার্ড।**

রিচার্ড যখন রাজত্ব করছিলেন সেই সময় ইংলণ্ডের লোকেরা খবর পায় যে, প্যালেস্টাইন নামে খ্রীস্টানদের তীর্থক্ষেত্রটিকে তুর্কীরা দখল করে নিয়েছে। প্যালেস্টাইন যীশু খ্রীস্টের জন্মভূমি এবং এইজন্যে খ্রীস্টানেরা ঐ জায়গাটিকে পবিত্র তীর্থক্ষেত্র বলে মনে করত। রিচার্ড তুর্কীদের কবল থেকে প্যালেস্টাইন উদ্ধার করবার জন্যে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে রওনা হলেন। অন্যান্য জায়গা থেকেও খ্রীস্টান রাজা ও বীরেরা এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিল। প্যালেস্টাইনের এই যুদ্ধ তৃতীয় ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ নামে বিখ্যাত। এ-যুদ্ধে রাজা রিচার্ড যথেষ্ট বীরত্ব দেখিয়েছিলেন বটে, কিন্তু হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন; তাঁর দলের অনেক লোকও মারা গেল। তিনি বুঝতে পারলেন যে, এ-যাত্রা দেশে ফিরে যাওয়া ছাড়া তাঁর আর কোনও উপায় নেই।

প্রথম রিচার্ড

রিচার্ড এক জাহাজে চড়ে ভূমধ্য-সাগর দিয়ে ইংলণ্ডে রওনা হলেন। পথে এক জায়গায় তাঁর জাহাজ ডুবে গেল, রিচার্ড অনেক কষ্টে সাঁতার দিয়ে এক দেশে গিয়ে উঠলেন। সেই দেশের রাজার সঙ্গে রিচার্ডের শত্রুতা ছিল। সেই রাজা রিচার্ডকে পাহাড়ের উপরে একটা দুর্গে বন্দী করে রেখেছিলেন। সেখান থেকে রিচার্ড তাঁর গানের সঙ্গী ব্লণ্ডেল নামক এক ব্যক্তির চাতুরীর সাহায্যে মুক্তি পেয়েছিলেন।

রিচার্ডের কিন্তু যুদ্ধ ছাড়া আর কোন কাজই ভাল লাগত না। দেশে ফিরে এসে কিছুদিন চুপচাপ বসে থেকে তিনি হাঁপিয়ে উঠলেন। ফ্রান্সের রাজার সঙ্গে যুদ্ধের জন্যে তিনি শীঘ্রই ফ্রান্সে চলে গেলেন। সেখানে তিনি অনেক বীরত্ব দেখিয়েছিলেন, কিন্তু একটা যুদ্ধে তীর বিঁধে মারা যান।

ম্যাগনা কার্টা

রিচার্ডের মৃত্যুর পর তাঁর ছোট ভাই **জন** (১১৬৭—১২১৬ খ্রীঃ) ইংলণ্ডের রাজা হলেন। জন মানুষটি মোটেই **ভাল ছিলেন না।** একবার তিনি তাঁর পিতা দ্বিতীয় হেনরীকে হত্যা করে রাজা হবার ফন্দি এঁটেছিলেন ; আর একবার বড় ভাই রিচার্ড যখন প্যালেস্টাইনে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন, তখনও তিনি নিজে রাজা হবার চেষ্টা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য রাজ-মুকুট তিনি পরতে পেরেছিলেন।

জন ম্যাগনা কার্টায় সহি করছেন

জন যেমন অত্যাচারী ছিলেন, তেমনি ছিলেন খামখেয়ালী। প্রজারা তাঁর ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠে-যার কাছ থেকে খুশি তিনি টাকা আদায় করতেন, টাকা দিতে কেউ অস্বীকার করলে হয় তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করতেন, নইলে দেশ থেকে নির্বাসিত করে দিতেন। **রোমের পোপ** ছিলেন খ্রীস্টান জগতের ধর্মগুরু। তিনিও জনের ব্যবহারে এমন অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, ইংলণ্ডের প্রজাদের জানিয়ে দিলেন যে, জন আর ধর্মতঃ দেশের রাজা নন ; তারা যদি জনকে জোর করে সিংহাসনচ্যুত করে, তা হলে তাদের কোন অন্যায় হবে না।

রাজা জনের অনাচার-অত্যাচারে ইংলণ্ডের লোকেরা তাঁর উপরে ভীষণ ক্ষেপে গেল। তারা প্রধান ধর্মযাজক **স্টিফেন ল্যাংটনের** (১১৫১—১২২৮ খ্রীঃ) নেতৃত্বে রাজার কাছে অনেক অধিকার দাবি করল। জন প্রজাদের মনের ভাব দেখে বুঝলেন যে, এই দাবি উপেক্ষা করা চলবে না। তাই তিনি রাজী হলেন। ১২১৫ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই জুন, টেমস নদীর উপরে, **রানীমিড** নামক একটি ছোট দ্বীপে রাজা জন অনেক লোকের সামনে এক ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করলেন। এই ঘোষণাপত্রই পৃথিবীর ইতিহাসে **'ম্যাগনা কার্টা'** বা

'মহাসনন্দ' নামে বিখ্যাত হয়ে আছে। ম্যাগনা কার্টা ল্যাটিন ভাষার শব্দ, এর মর্মার্থ হল স্বাধীনতার ঘোষণা।

ম্যাগনা কার্টায় যে সব শর্ত ছিল তার মধ্যে প্রধান কয়েকটি এইরূপ : রাজা যখন খুশি কর বসিয়ে, যত ইচ্ছা টাকা সকলের কাছ থেকে আদায় করতেন বলে একটি শর্ত দেওয়া হল এই যে, দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যে পরিষদ্ গঠন করবেন, তার অনুমতি না নিয়ে রাজা কখনও কোন রকম কর বসাতে পারবেন না। দেশে সুবিচার বলে কোন জিনিস ছিল না; এই জন্যে একটি শর্ত হল এই যে, দেশের প্রত্যেক লোক সুবিচার পাবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিচারকার্য শেষ হবে। অনর্থক লোকের উপর মকদ্দমা ঝুলিয়ে রেখে তাকে হয়রান করা হবে না।

অশ্বপৃষ্ঠে সাইমন ডি মণ্টফোর্ট

এতদিন রাজারা যাকে ইচ্ছা গ্রেফতার করে তার বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন বিচার না করে, তাকে নিজের কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে, যতদিন ইচ্ছা কারাগারে বন্দী করে রাখতে পারতেন। এইজন্যে ম্যাগনা কার্টার একটি শর্ত এই হল যে, রাজা কোন লোককে বিনা বিচারে আটক করে রাখতে পারবেন না।

রাজা জন এই ঘোষণাপত্রে সই করলেন বটে, কিন্তু তাঁর মন এতে সায় দিল না। তিনি রেগে আগুন হয়ে রইলেন। হঠাৎ একদিন তিনি ম্যাগনা কার্টার **শর্তগুলি অস্বীকার** করে বসলেন। তিনি বললেন যে, ঘোষণাপত্রে সই করবার আগে ভগবানের নামে তিনি যে শপথ করেছেন, তা তিনি মানতে বাধ্য নন। দেশের লোকেরা এতে ভীষণ অসন্তুষ্ট হল।
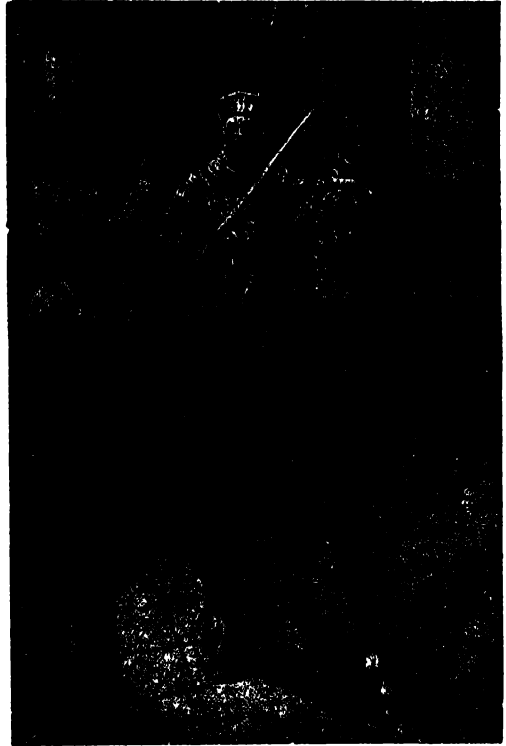
তারা জনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল। জন তাঁর জিদ ছাড়লেন না বলে অবশেষে যুদ্ধ আরম্ভ হল। এক বছর যুদ্ধ চলবার পর, জন হঠাৎ একদিন **মারা গেলেন।** যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেল, দেশের লোকেরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

রাজা জনের মৃত্যুর পর, তাঁর ছেলে **তৃতীয় হেনরী** (১২০৭—১২৭২খ্রীঃ) ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসেন। তিনি নিজে রাজকার্যে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। তাঁর রাজত্বকাল **সাইমন ডি মণ্টফোর্টের** (১২০৬—১২৬৫ খ্রীঃ) জন্যেই স্মরণীয় হয়ে আছে। সাইমন রাজার অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নিজে আধিপত্য লাভ করেন এবং তিনি ইংলণ্ডে, **হাউস অব কমনস** বা গণপ্রতিনিধি-সভার সূচনা করেন।

তৃতীয় হেনরীর পরে রাজা হন তাঁর পুত্র **প্রথম এডওয়ার্ড** (১২৩৯—১৩০৭ খ্রীঃ)। তিনি খুব শক্তিশালী ও প্রতিভাবান্ নৃপতি ছিলেন। তিনি ১২৯৫ খ্রীষ্টাব্দে **আদর্শ পার্লামেণ্ট** গঠন করে সাইমনের পার্লামেন্টের উন্নতি বিধান করেন। তিনি আইন-প্রণয়ন ও রাজ্য-সংগঠনে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। প্রথম এডওয়ার্ড খুব উচ্চাভিলাষী ছিলেন। তিনি ওয়েলস রাজ্য আক্রমণ করে ইংলণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি স্কটল্যাণ্ডও অন্যায়ভাবে আক্রমণ করেছিলেন, কিন্তু স্কটল্যাণ্ডবাসীরা দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে প্রাণপণে যুদ্ধ করে। স্কটল্যাণ্ডের এই স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস ওয়ালেস, ব্রুস প্রভৃতি বীরগণের শৌর্য-কাহিনীর দ্বারা পূর্ণ হয়ে আছে। এডওয়ার্ড অশেষ চেষ্টা করেও স্কটল্যাণ্ডের স্বাধীনতা হরণ করতে পারেন নি। প্রথম এডওয়ার্ডের পর অপদার্থ রাজা **দ্বিতীয় এডওয়ার্ড** (১২৮৪—১৩২৭ খ্রীঃ) রাজত্ব করেন। তারপরে সিংহাসনে উপবেশন করেন আর একজন প্রসিদ্ধ নরপতি। তাঁর নাম **তৃতীয় এডওয়ার্ড** (১৩১২—১৩৭৭ খ্রীঃ)। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের 'শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ' তাঁর রাজত্বেই শুরু হয়।

রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ডের ক্যালে অধিকার

তৃতীয় এডওয়ার্ডের ফ্রান্স জয়ের আকাঙ্ক্ষা থেকেই শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের উৎপত্তি। তিনি অনেক সৈন্য-সামন্ত নিয়ে গিয়ে, **ফ্রান্স আক্রমণ** করেছিলেন। ফ্রান্সে **ক্যালে** নামক একটি সুন্দর ও প্রকাণ্ড শহর আছে, তখনকার দিনে সেই শহরটির চারদিকে মস্ত উঁচু দেয়াল আর তার পাশে গভীর খাদ ছিল।

এডওয়ার্ড বুঝলেন যে, এই শহরটিকে সোজাসুজি আক্রমণ করে দখল করা অসম্ভব, সুতরাং তিনি ঠিক করলেন, শহরটিকে এমনভাবে ঘেরাও করে বসে থাকবেন যেন শহরের লোকেরা বাইরে থেকে খাবার জিনিস কিছুই আনতে না পারে। শহরের মজুত খাবার ফুরিয়ে গেলে তারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে।

এই ভেবে এডওয়ার্ড ক্যালে শহরটিকে ঘেরাও করে চুপটি করে পুরো এক বৎসর বসে রইলেন। সত্যি সত্যিই তিনি যা ভেবেছিলেন, তাই হল। মজুত রুটি ও মাংস সব যখন ফুরিয়ে গেল, ঘোড়া, কুকুর, বিড়াল এমন কি ইঁদুরের মাংস পর্যন্ত যখন আর পাওয়ার উপায় রইল না, সবাই যখন বুঝতে পারল যে, এডওয়ার্ডের কাছে আত্মসমর্পণ না করলে, এবার শহর সুদ্ধ ছেলে-বুড়ো সকলকেই অনাহারে মরতে হবে, তখন তারা রাজা এডওয়ার্ডের কাছে খবর পাঠাল যে, যদি তাদের প্রাণে না মারেন, তা হলে তারা শহরের সিংহ-দ্বারের চাবি তাঁর হাতে দিয়ে দেবে।

ব্ল্যাক প্রিন্স

রাজা এডওয়ার্ড এক বছর ধরে শহর অবরোধ করে বসেছিলেন, এর জন্যে তাঁর অনেক সময় নস্ট তো হয়েছেই, সৈন্যদের বসিয়ে রাখতে হয়েছে বলে অনেক ক্ষতিও হয়েছে। এইসব কারণে ক্যালের লোকদের উপর তিনি ভীষণ চটে গিয়েছিলেন এবং ঠিক করেছিলেন যে, তাদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।

শহরের লোকেরা যখন **আত্মসমর্পণ** করবে বলে খবর পাঠাল, তিনি তখন তাদের বলে দিলেন, "তোমাদের শহরের যারা নেতা, তাদের ছয় জনকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। তারা যেন শহরের সিংহ-দ্বারের চাবি সঙ্গে নিয়ে আসে, আর তাদের গলায় যেন দড়ি পরানো থাকে। আমি সেই দড়িতে ঝুলিয়ে তাদের ফাঁসি দেব। যদি এই রকম ছয় জন লোক তোমরা পাঠাতে পার, তা হলে আমি শহরের আর কাউকেই প্রাণে মারব না।"

রাজা এডওয়ার্ডের এই নিষ্ঠুর শর্তের কথা সবাই যখন জানতে পারল, তখনই ক্যালের এক সাহসী বৃদ্ধ, সকলের আগে এসে বললেন, "ছয় জনের এক জন আমি হব। হাজার লোকের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে আর পাঁচ জন কে কে জীবন দিতে চাও, এগিয়ে এস।" তখুনি আরও পাঁচ জন লোক এসে সেই বৃদ্ধের পাশে দাঁড়ালেন।

তাঁরা ছয় জন গলায় দড়ি পরে শহরের চাবি হাতে নিয়ে, রাজা এডওয়ার্ডের শিবিরে, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চললেন। ক্যালের লোকেরা জলভরা চোখে তাঁদের বিদায় দিল। তারা বেশ বুঝতে পারল যে, নিষ্ঠুর রাজা এডওয়ার্ডের হাতে তাঁদের নিষ্কৃতি নেই, ফাঁসিকাষ্ঠে তাঁদের প্রাণ দিতে হবে।

ক্যালের এই ছয় জন লোককে সত্যিই কিন্তু প্রাণ দিতে হল না; তাঁরা রাজার দরবারে এসে পৌঁছেছেন এই খবর পেয়েই এডওয়ার্ডের রানী ছুটে এলেন সেখানে। রানী ছিলেন পরম দয়াবতী, তিনি রাজার কঠোর সংকল্পের কথা শুনে তখনই ঠিক করেছিলেন যে, এই ছয় জনকে যেমন করে হোক বাঁচাতেই হবে। তাই তিনি রাজার সামনে এসে এঁদের প্রাণ ভিক্ষা চাইলেন।

রাজা এডওয়ার্ড তাঁর রানীর এই অনুরোধ ঠেলে ফেলতে পারলেন না। তিনি শহরের চাবি নিয়েই ক্যালের সেই সাহসী ছয়টি লোককে মুক্তি দিলেন। এর পর অনেক বছর পর্যন্ত ক্যালে শহর ইংলণ্ডের অধীন ছিল। তৃতীয় এডওয়ার্ডের জ্যেষ্ঠপুত্র **ব্ল্যাক প্রিন্স** (১৩৪০—১৩৭৬ খ্রীঃ) শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধে বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি কৃষ্ণবর্ণ বর্ম পরিধান করতেন বলে তাঁকে সকলে "ব্ল্যাক প্রিন্স" বলত।

যোয়ান অব আর্ক

তৃতীয় এডওয়ার্ডের পর রাজা **পঞ্চম হেনরী** (১৩৮৭—১৪২২ খ্রীঃ) আবার ফ্রান্স আক্রমণ করেন এবং ফরাসীদের অনেকগুলো যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে, তিনি ফ্রান্স জয় করে তাকে ইংলণ্ডের অধীন করে নেন। তাঁর ছেলে **ষষ্ঠ হেনরী** (১৪২১—১৪৭১ খ্রীঃ) ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

একটার পর একটা যুদ্ধে হারতে হারতে ফরাসীরা হতাশ হয়ে গিয়েছিল; তারা ভাবতে শুরু করেছিল যে আর যুদ্ধ করে লাভ নেই। এমনি সময় ফ্রান্সের এক গ্রামের একটি কৃষক-বালিকা, দেশের লোকের মনে সাহস জাগাতে আরম্ভ করল। সবাইকে ডেকে সে বলতে লাগল, "আবার

আমাদের স্বাধীনতা ফিরে আসবে। ওঠ, জাগ তোমরা, হতাশ হয়ো না।" এই বালিকাটির নাম **যোয়ান** (১৪১২—১৪৩১ খ্রীঃ)।

. যোয়ান লেখাপড়া জানত না। গ্রামের মেয়ে সে, আর দশটি গ্রামবাসীর মতই মানুষ হয়েছে। ইংরেজ এসে তাদের দেশ দখল করে নিয়েছে এই কথাটা যখনই তার মনে আসত, ব্যথায় তার সমস্ত প্রাণ ভরে উঠত। ভেড়া চরানো ছিল তার কাজ।

একদিন ভেড়ার পাল মাঠে ছেড়ে দিয়ে, একটি গাছে ঠেস দিয়ে সে যখন দেশের কথা ভাবছে, সেই সময় হঠাৎ তার মনে হল যেন একজন দেবদূত স্বর্গ থেকে নেমে এসে, একটি তলোয়ার হাতে নিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন আর তাকে ডেকে বলছেন, "তুমিই ইংরেজের কবল থেকে ফ্রান্সের স্বাধীনতা উদ্ধার করতে পারবে। এই তলোয়ার নাও, সৈন্য সংগ্রহ করে যুদ্ধে যাও।"

পর-মুহূর্তেই অবশ্য যোয়ান আর সেই দেবদূতকে দেখতে পেল না, কিন্তু সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করল দেবদূত সত্যিই এসেছিলেন এবং ভগবানের ইচ্ছার কথা তাকে জানিয়ে গিয়েছেন।

সেই দিনই যোয়ান তার গ্রামের লোকদের বলল, "আমায় আমাদের ফরাসী রাজার কাছে নিয়ে চল।" তারপর যোয়ান তাদের সবাইকে সেই দেবদূতের কথা জানাল। তারা সে সব বিশ্বাসই করল না, হেসেই যোয়ানের কথা উড়িয়ে দিল। ফ্রান্সের রাজ্যচ্যুত রাজা তখনও বেঁচে ছিলেন, তারা তাঁর কাছে যোয়ানকে নিয়ে যেতে সাহস করল না।

যোয়ান কিন্তু দমবার পাত্রী নয়। তার মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, দেশের স্বাধীনতা তার দ্বারাই আসবে। যোয়ানের ব্যাকুলতা এবং স্বাধীনতা লাভের জন্যে প্রবল ইচ্ছা দেখে দেশের লোকদের মন একটু একটু করে ভিজতে লাগল। শেষে রাজার কাছে তারা যোয়ানের কথা বলল।

সব কথা শুনে যোয়ানের উপর রাজার ধারণাও খুব ভাল হল না। তিনি ভাবলেন, তাঁকে ঠকিয়ে কিছু আদায় করাই হয় তো তার মতলব! কিন্তু তবুও তিনি ঠিক করলেন যে, মেয়েটিকে পরীক্ষা করাই যাক। যেদিন যোয়ানকে তাঁর কাছে নিয়ে আসবার কথা, সেদিন তিনি অন্য একজন যোদ্ধাকে তাঁর আসনে বসিয়ে, নিজে সাধারণ পোশাক পরে অন্য লোকদের সঙ্গে ঘরের ভিতর রইলেন।

যোয়ান ঘরে ঢুকে রাজার সিংহাসনের দিকে তাকিয়ে সেদিকে মোটেই

গেল না। চারপাশে একবার দেখে নিয়ে, সোজা রাজার কাছেই গিয়ে তাঁর সামনে নতজানু হয়ে বসল। রাজা ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তিনি কিছুতেই বুঝতে পারলেন না, যোয়ান তাঁকে কেমন করে চিনল! এর আগে কোনদিনও সে তাঁকে দেখে নি। যোয়ানের কথায় তাঁর তখন আস্তে আস্তে বিশ্বাস হতে লাগল। যোয়ান তাঁকে পরিষ্কার জানিয়ে দিল, "ভগবান এ দেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করবার জন্যে আমায় আদেশ দিয়েছেন। আমাকে সৈন্য দাও, আমি তোমার শত্রুদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেব।"

রাজা যোয়ানকে একটা ধবধবে সাদা ঘোড়া আর একটি ঝকঝকে সাদা নিশান দিয়ে তাঁর সৈন্যদের হুকুম দিলেন, "তোমরা যোয়ানের সঙ্গে যাও। তার সমস্ত আদেশ পালন কর।" **যোয়ানের নেতৃত্বে** এই সৈন্যদল একটা শহর আক্রমণ করল এবং সেটাকে দখলও করে নিল।

একজন মেয়েকে যুদ্ধ করতে দেখে ইংরেজরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। তারা ভাবল এ মানুষ নয়, নিশ্চয়ই কোন ডাইনী। যোয়ানকে আসতে দেখলেই অনেক ইংরেজ দৌড়ে পালিয়ে যেত। এই ভাবে একটির পর একটি **যুদ্ধে জয়লাভ করে** যোয়ান ফ্রান্সের অনেক জায়গা ইংরেজদের হাত থেকে কেড়ে নিল। ফরাসী রাজা আবার ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করলেন।

রাজার যেদিন অভিষেক, তাঁর মাথায় যেদিন রাজমুকুট পরানো হয়, যোয়ান সেদিন তার সেই ঝকঝকে সাদা নিশানটি এক হাতে, আর এক হাতে খোলা তলোয়ার নিয়ে রাজার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। নিজের জন্যে সে কোনদিন কিছু চায় নি; তার স্বপ্ন, তার সাধনা ছিল দেশের লুপ্ত স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার। ফ্রান্সের রাজা যেদিন ফ্রান্সের রাজমুকুট মাথায় তুলে নিলেন, যোয়ান সেদিন মনে ভাবল তার স্বপ্ন সফল হয়েছে, তার সাধনা সার্থক হয়েছে।

যোয়ানের মৃত্যুর কাহিনী বড়ই করুণ। একদিন হঠাৎ যোয়ান ফরাসী রাজার এক **শত্রুর হাতে ধরা** পড়ে গেল। সে তাকে সঁপে দিল ইংরেজদের হাতে। যোয়ানের জন্যেই ফ্রান্সের রাজত্ব তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে ইংরেজরা এটা মোটেই ভুলতে পারে নি, তার উপর তাদের ধারণা ছিল যোয়ান মানুষ নয়—**ডাইনী**। একজন পাদরী এবং কয়েকজন লোক দিয়ে যোয়ানের একটা বিচারও হয়ে গেল। বিচারকেরাও রায় দিলেন যে, যোয়ান ডাইনী।

তখনকার দিনের লোকেরা কাউকে ডাইনী বলে সন্দেহ করলেই তাকে পুড়িয়ে মারত। কাজেই এখানেও ঠিক হয়ে গেল যোয়ানকে **পুড়িয়ে মারা** হবে। যোয়ান এই নিষ্ঠুর সংবাদ শুনে একটু ভয় পেল না, একবার কাঁপল না, এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলল না।

কাঠের একটা স্তূপের উপর ইংরেজরা তাকে দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর তার চারপাশে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। যোয়ান তবুও অটল, অচল, স্থির! আকাশের পানে চোখ তুলে, জোড় হাত করে সে ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রার্থনা করল। আগুনের শিখা লক্ লক্ করে তাকে ঘিরে ধরল। যোয়ানের নশ্বর দেহ পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

একজন ইংরেজ এই দৃশ্য দেখে আর সহ্য করতে না পেরে বলে উঠেছিলেন, "আমাদের আর উপায় নেই, আমরা এক স্বর্গের দেবীকে পুড়িয়ে মেরেছি!" এই লোকটির কথাই সত্যি হয়েছিল। ইংরেজরা তখনও ফ্রান্সের যে সব জায়গা দখলে রেখেছিল, যোয়ানকে পুড়িয়ে মারবার কিছুদিন পরেই, ফরাসীরা তাদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। ফরাসী রাজত্ব চিরদিনের মত ইংরেজদের হাতছাড়া হয়ে যায়।

স্পেনের রাজার ইংলণ্ড অভিযান

রাজা ষষ্ঠ হেনরীর পর **চতুর্থ এডওয়ার্ড** (১৪৪২—১৪৮৩ খ্রীঃ) ইংলণ্ডের রাজা হন। চতুর্থ এডওয়ার্ডের দুই ছেলে ছিল। তিনি যখন মারা যান তখন তারা নাবালক। তাদের কাকা, রিচার্ড ছিলেন খুব নিষ্ঠুর এবং দুষ্ট প্রকৃতির লোক। তিনি কুঁজো হয়ে চলতেন বলে লোকে তাঁর নাম দিয়েছিল, **কুঁজো রিচার্ড।**

চতুর্থ এডওয়ার্ড মারা যাবার পর তাঁর নাবালক বড় ছেলে রাজা হলেন বটে, কিন্তু কুঁজো রিচার্ডই তাঁর অভিভাবক হয়ে দেশ-শাসন করতে লাগলেন। শেষে একদিন রিচার্ড ছেলে দুটিকে জেলখানায় বন্দী করে রাখলেন। এতেও তিনি সন্তুষ্ট হলেন না, গুপ্তঘাতক নিযুক্ত করে নির্মল ও নিষ্কলঙ্ক ছেলে দুটিকে **কারাগারে হত্যা** করিয়ে নিজে পুরোদস্তুর রাজা হয়ে বসলেন।

রিচার্ড রাজা হয়ে উপাধি নিলেন **তৃতীয় রিচার্ড,** কিন্তু তাঁকে বেশীদিন রাজত্ব করতে হল না। দু বছরের মধ্যেই, তাঁর সঙ্গে **হেনরী টিউডর** নামক রাজবংশের একজনের যুদ্ধ বেধে গেল। যুদ্ধে কুঁজো রিচার্ড নিহত

হলেন। নতুন রাজা, **সপ্তম হেনরী** (১৪৫৭—১৫০৯ খ্রীঃ) এই নাম নিয়ে, ইংলণ্ডের রাজমুকুট মাথায় তুলে নিলেন।

সিংহাসনের অধিকার নিয়ে ইয়র্ক ও ল্যাঙ্কাস্টারের মধ্যে এক যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ ১৪৫৫ খ্রীস্টাব্দে ষষ্ঠ হেনরীর রাজত্বকালে আরম্ভ হয় এবং শেষ হয় ১৪৮৫ খ্রীস্টাব্দে। এই যুদ্ধকে বলে **"গোলাপের যুদ্ধ"।** "গোলাপের যুদ্ধের" এই দীর্ঘ গৃহ-যুদ্ধ ও স্বার্থদুষ্ট অভিজাতশ্রেণীর অনাচার-বিশৃঙ্খলার যুগের পর, সপ্তম হেনরী রাজা হয়ে প্রসিদ্ধ **টিউডর বংশের** প্রবর্তন করেন। তারপর রাজা হলেন জবরদস্ত **অষ্টম হেনরী** (১৪৯১—১৫৪৭ খ্রীঃ)। অষ্টম হেনরীর রাজত্বকাল একটি ঘটনার জন্যে প্রসিদ্ধ। সেই ঘটনাটিই ইংলণ্ডের ইতিহাসের মোড় ফিরিয়ে দেয়, এতে ইংলণ্ডে প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মমত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

বহুদিন থেকেই রোমের পোপ খ্রীস্টান জগতের ধর্মগুরুরূপে সম্মান পেয়ে আসছিলেন। একচ্ছত্র প্রভুত্বের ফলে নৈতিক অবনতি সর্বত্রই ঘটে। পোপ-দেরও নৈতিক অধঃপতন ঘটল। তাঁদের অধীন ধর্মযাজকদেরও চরিত্র অকলঙ্কিত রইল না। তাঁরা অতিমাত্র বিলাসী ও অর্থগৃধ্নু হয়ে উঠলেন। তাঁদের অনাচারে ও অত্যাচারে সকল দেশের রাজা-প্রজা সমানভাবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল।

তৃতীয় রিচার্ড

অবশেষে জার্মেনীর এক পল্লীতে, **মার্টিন লুথার** (১৪৮৩—১৫৪৬ খ্রীঃ) নামে এক মহাপুরুষের অভ্যুদয় হল। তিনি পোপের ও যাজকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন এবং বাইবেলের সরল অনুবাদ করে দেখিয়ে দিলেন যে, সে-পুণ্যগ্রন্থের কোথাও এমন কথা লেখা নেই যে, পোপের মতামত ধর্ম-বিষয়ে চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করতে হবে। লুথারের বহুপূর্বে ইংলণ্ডে **জন ওয়াইক্লিফ** (১৩২৪—১৩৮৪ খ্রীঃ) নামক এক ধর্মসংস্কারক, ধর্মযাজকশ্রেণীর অনাচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন। মার্টিন লুথারের মতাবলম্বীরা **প্রোটেস্টাণ্ট** বা প্রতিবাদকারী নামে অভিহিত হল।

ফলে খ্রীস্টজগৎ দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। যারা পোপের অনুরক্ত রইল, তারা **রোমান ক্যাথলিক** নাম পেল। আর লুথারের ভক্তদের নাম হল প্রোটেস্টাণ্ট। জার্মেনী ও স্কটল্যাণ্ডে প্রোটেস্টাণ্ট মতবাদের বহুল প্রচার ঘটলেও, ইংলণ্ড এ-যাবৎ রোমান ক্যাথলিকই ছিল।

কিন্তু নিতান্ত ব্যক্তিগত কারণে, অষ্টম হেনরীর সঙ্গে **পোপের**

মনোমালিন্য ঘটল। পূর্বেকার দিন হলে রাজাকে বাধ্য হয়ে পোপের আদেশই অবনতশিরে মেনে নিতে হত; কিন্তু এখন সুযোগ পেয়ে অষ্টম হেনরী প্রোটেস্টাণ্ট ধর্ম গ্রহণ করলেন এবং পোপকে অগ্রাহ্য করলেন। সেই থেকে ইংলণ্ডে প্রোটেস্টাণ্ট ধর্ম দিনে দিনে প্রবল হতে লাগল। অষ্টম হেনরীর রাজত্বকালে **কার্ডিনাল উলসে** (১৪৭১—১৫৩০ খ্রীঃ) কিছুদিন তাঁর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। উলসে বৈদেশিক নীতিতে খুব কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন।

অষ্টম হেনরীর মৃত্যুর পর, প্রথমে তাঁর পুত্র **ষষ্ঠ এডওয়ার্ড** (১৫৩৭—১৫৫৩ খ্রীঃ), তারপর তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা **মেরী** (১৫১৬—১৫৫৮ খ্রীঃ), তারপর তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা **এলিজাবেথ** (১৫৩৩—১৬০৩ খ্রীঃ) সিংহাসনে আরোহণ করেন।

অষ্টম হেনরী

এলিজাবেথের রাজত্বকালে, স্পেনের রাজা **দ্বিতীয় ফিলিপ** (১৫২৭—১৫৯৮ খ্রীঃ) খুব শক্তিমান সম্রাট্ ছিলেন। রানী এলিজাবেথ তাঁকে বিয়ে করতে অস্বীকার করেন এবং তিনি স্কটল্যাণ্ডের সুন্দরী রানী মেরী স্টুয়ার্টের (১৫৪২—১৫৮৭ খ্রীঃ) প্রাণদণ্ড দেন। এই সব কারণে ফিলিপ ভীষণ চটে গিয়ে, নৌবহর দ্বারা ইংলণ্ড আক্রমণ করে এলিজাবেথকে সমুচিত শাস্তি দিবেন এই মনস্থ করলেন। ইংলণ্ড জয় করতে হলে অনেক জাহাজ দরকার—এটা তিনি বুঝতে পারেন এবং সেইজন্যে শত শত জাহাজ তৈরি করালেন।

তারপর ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে একদিন তাঁর আদেশে, সেই সব জাহাজ হাজার হাজার সৈন্য নিয়ে ইংলণ্ডের দিকে বেরিয়ে পড়ল। ইংরেজদেরও অনেক জাহাজ

ছিল, তবে সেগুলো ছিল স্পেনের জাহাজের চেয়ে ছোট এবং তাদের চেয়ে অনেক বেশী দ্রুতগামী। **ফ্রান্সিস ড্রেক** (১৫৪০—১৫৯৬ খ্রীঃ) নামক একজন বিখ্যাত নাবিক ছিলেন ইংরেজ নৌ-সৈন্যদের একজন সেনাপতি।

স্পেনের জাহাজ ইংলণ্ড আক্রমণ করতে আসছে এই সংবাদ চারিদিকে রটে যাবার পর, ড্রেক যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন। রানী এলিজাবেথ নিজে এসে সৈন্যদের উৎসাহ দিলেন। স্পেনের জাহাজ, ইংলণ্ডের উপকূলের কাছাকাছি এসে পৌঁছাবার পরই যুদ্ধ আরম্ভ হল। পূর্বেই বলেছি, ইংরেজদের জাহাজগুলো ছিল ছোট, কিন্তু সেগুলো খুব তাড়াতাড়ি ছুটতে পারত। এরা দল বেঁধে স্পেনের জাহাজগুলোর কাছে গিয়ে, এক এক ঝাঁক গুলি মেরেই অমনি পালিয়ে আসত, স্পেনের বড় বড় জাহাজ তাদের তাড়া করেও ধরতে পারত না। এইভাবে এক সপ্তাহ যুদ্ধ চলল।

স্পেনের জাহাজগুলো আস্তে আস্তে ক্যালে শহরে পৌঁছে গেল। ইংরেজরা তখন তাদের জব্দ করবার জন্যে নতুন ফন্দি আবিষ্কার করল। তারা ছয়টি পুরানো জাহাজ এমন সব জিনিস দিয়ে বোঝাই করল, সেগুলো খুব সহজে আগুন ধরে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। একদিন রাত্রিবেলা তারা দূর থেকে সেই **জাহাজগুলোতে আগুন ধরিয়ে** পাল তুলে সেগুলোকে অতর্কিতে স্পেনের জাহাজগুলোর দিকে চালিয়ে ছেড়ে দিল।
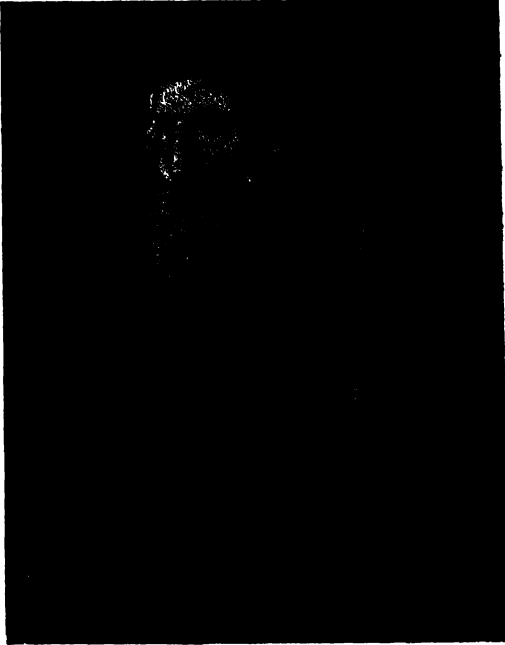
জন ওয়াইক্লিফ

স্পেনের নৌ-সেনাপতি মেডিনা সিডোনিয়া বিপদ্‌টা বুঝতে পারলেন। তিনি দেখলেন যে, ইংরেজদের ঐ আগুন-ধরা জাহাজ যদি তাঁর জাহাজের ঝাঁকের ভিতর এসে ঢুকে পড়ে, তাহলে তাঁর জাহাজগুলোতেও আগুন ধরে যাবে। তিনি তখুনি হুকুম দিলেন, সব জাহাজ তাড়াতাড়ি নোঙ্গর তুলে সমুদ্রে ভেসে পড়বার জন্যে।

আগুন লাগার ভয়ে, স্পেনের জাহাজগুলো কে কোথায় ছুটে চলেছে তা কেউই ঠিক করতে পারছিল না। রাতের অন্ধকারে তারা এমনভাবে **ছত্রভঙ্গ** হয়ে পড়ল যে, পরদিন সকালে ইংরেজদের জাহাজগুলো তাদের খুঁজে বের করে এক এক করে ডুবিয়ে দিতে লাগল। তারপর এক **ভীষণ ঝড়** উঠল। এই ঝড়েও স্পেনের অনেক জাহাজ এসে চড়ায় ঠেকে সেখানে আটকে গেল। মোটে তিপ্পান্নটি জাহাজ স্পেনে ফিরে যেতে পেরেছিল। এই **'স্প্যানিশ আর্মাডায়'** অভিযানের সময় প্রথম ১৩০ খানি জাহাজ ছিল।

স্পেনের সম্রাটের এই গর্বিত অভিযানের শোচনীয় ব্যর্থতার পর, ইংলণ্ডের ঘরে ঘরে উৎসব শুরু হয়ে গেল। প্রত্যেক গির্জায় অসংখ্য লোক সমবেত হয়ে এই বিপদ্ থেকে মুক্ত করে দেবার জন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে লাগল।

কার্ডিনাল উলসে

স্পেনকে হটিয়ে দেবার পর, এলিজাবেথের রাজত্বের শেষের দিকে ইংলণ্ড সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা সমস্ত দিকেই খুব উন্নত ও সমৃদ্ধ হল। অমর নাট্যকার **সেক্সপিয়র** (১৫৬৪—১৬১৬ খ্রীঃ) এই যুগেরই লোক।
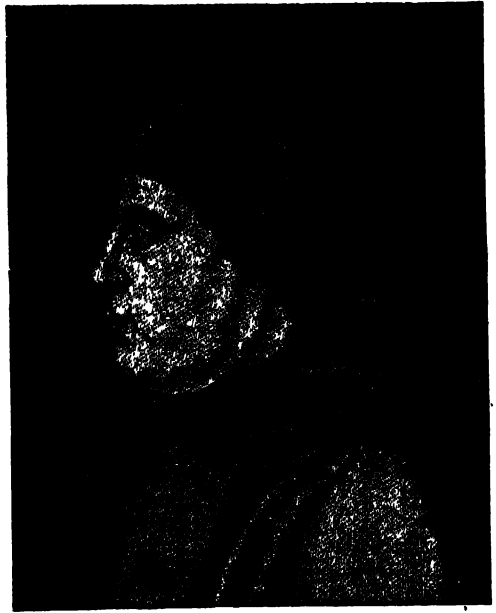
ওলিভার ক্রমওয়েল

রানী এলিজাবেথের মৃত্যুর পর, স্কটল্যাণ্ডের রানী মেরী স্টুয়ার্টের ছেলে, রাজা **প্রথম জেমস** (১৫৬৬—১৬২৫ খ্রীঃ) ইংলণ্ডে **স্টুয়ার্ট-বংশের** প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি স্বেচ্ছাচারী রাজা ছিলেন। তাঁর সময়, রাজার সঙ্গে পার্লামেণ্টের বিরোধের সূত্রপাত হয়, এই বিরোধ চরমে ওঠে তাঁর ছেলে প্রথম চার্লসের রাজত্বকালে।

জেমসের পর সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁর পুত্র **প্রথম চার্লস** (১৬০০—

১৬৪৯ খ্রীঃ)। চার্লস এমনি ভাল লোক ছিলেন, কিন্তু তাঁর একটা মস্ত দোষ এই ছিল যে, রাজ্যশাসন-ব্যাপারে তিনি কোন লোকের পরামর্শ শুনতেন না, সম্পূর্ণভাবে নিজের ইচ্ছামত তিনি চলতে চাইতেন।

রানী এলিজাবেথ

ইংলণ্ডে ততদিনে একটা পার্লামেণ্ট ভালরূপে গড়ে উঠেছে। জমিদারদের স্থলে এ সময়ে পার্লামেণ্টে উগ্রপন্থী মধ্যবিত্ত শ্রেণীই প্রধান হয়ে ওঠে। রাজা এই পার্লামেণ্টের সঙ্গে পরামর্শ করে সব কাজ করবেন, দেশের লোকেরা তাই চাইত। রাজা চার্লস যতই **খামখেয়ালী ভাবে** চলতে আরম্ভ করলেন, তাঁর বিরুদ্ধেও তেমনি একটা মস্ত দল গড়ে উঠতে লাগল।

রাজার বিরুদ্ধে যারা দাঁড়াল লোকে তাদের নাম দিল, **রাউণ্ডহেড**। রাউণ্ডহেড মানে হচ্ছে গোল মাথা। তাদের রাউণ্ডহেড বলত এইজন্যে যে, তারা

খুব ছোট ছোট করে চুল ছাঁটত, কাজেই মাথাটা একেবারে গোল দেখা যেত। দেশের জমিদার, ধনিকশ্রেণী এবং আরও অনেকে ছিল রাজার দলে; তারা আবার লম্বা লম্বা চুল রাখত। রাউণ্ডহেডরা সাধারণ পোশাক পরত এবং তারা ছিল খুব গম্ভীর প্রকৃতির। রাজার সমর্থকেরা পরত রংচং-এ পোশাক এবং তারা খুব হেসে খেলে বেড়াতে ভালবাসত।

ক্রমে ক্রমে এই দুই দলের মতবিরোধ চরমে উঠল এবং শেষ পর্যন্ত রাউণ্ডহেডদের সঙ্গে, রাজা চার্লসের দলের **গৃহযুদ্ধ** বেধে গেল। ছয় বছর এই যুদ্ধ চলল, দুপক্ষেই অনেক লোক মারা গেল। রাউণ্ডহেডদের নেতা ছিলেন **ওলিভার ক্রমওয়েল** (১৫৯৯—১৬৫৮ খ্রীঃ) নামক একজন দৃঢ়চরিত্র, শক্তিশালী লোক। এই যুদ্ধে ক্রমওয়েল জয়লাভ করলেন, রাজা চার্লস প্রাণের ভয়ে পলায়ন করলেন স্কট-ল্যাণ্ডে। সেখানকার লোকেরা কিন্তু তাঁকে আশ্রয় দিল না, বরং তাঁকে ধরে নিয়ে রাউণ্ডহেডদের হাতে সমর্পণ করল।

দ্বিতীয় ফিলিপ

দেশের লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, রাজার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনে, রাউণ্ডহেডরা চার্লসের বিচার করল বিচারে তাঁর **প্রাণদণ্ডের আদেশ** হল। তারপর একদিন রাজা প্রথম চার্লসের মাথা **কেটে ফেলা হল**। ওলিভার ক্রমওয়েল নিজে রাজা হলেন না, কিন্তু রাজার জায়গায় তিনিই সর্বেসর্বা হয়ে দেশ-শাসন করতে আরম্ভ করলেন। তিনি 'লর্ড প্রোটেক্টর' উপাধি নিয়েছিলেন। তিনি বিরক্ত হয়ে পার্লামেণ্ট বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

ফ্রান্সিস ড্রেক

রাজা চার্লসের এক ছেলে ছিল। সাধারণ নিয়মে অবশ্য তাঁরই রাজা হওয়ার কথা; কিন্তু দেশের লোকে

তাঁকে রাজ-সিংহাসনে বসাতে রাজী হল না, তারা ক্রমওয়েলের শাসনই মেনে নিল। চার্লসের ছেলে বেঁচে থাকলে, হয়ত হঠাৎ কোনদিন, তিনি রাজা হবার জন্যে যুদ্ধবিগ্রহ আরম্ভ করে দেবেন এই ভেবে, ক্রমওয়েলের দলের লোকেরা তাঁকে ধরবার জন্যে খুঁজে বেড়াতে লাগল। রাজপুত্র এই খবর পেয়ে **ফ্রান্সে পালিয়ে** গিয়ে প্রাণ বাঁচালেন। যতদিন ক্রমওয়েল বেঁচে ছিলেন, তিনি আর দেশে ফেরেন নি। ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর, তিনি ইংলণ্ডে ফিরে আসেন এবং তখন দেশের লোকের ইচ্ছায়ই তিনি রাজ-সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তাঁর নাম হয়, **দ্বিতীয় চার্লস** (১৬৩০—১৬৮৫ খ্রীঃ)। ক্রমওয়েলের শাসনকাল ইংলণ্ডে সামরিক কর্তৃত্বেরই নামান্তর, তবে এ সময় বৈদেশিক ব্যাপারে ইংলণ্ডের খুব প্রতিপত্তি-বৃদ্ধি ও উন্নতিসাধন হয়েছিল।

দ্বিতীয় চার্লসের পরে **দ্বিতীয় জেমস** (১৬৩৩—১৭০১ খ্রীঃ) রাজ-সিংহাসনে বসলেন। তিনিও একজন স্বেচ্ছাচারী, খামখেয়ালী শাসক ছিলেন। ধর্মব্যাপারে তিনি প্রোটেস্টাণ্টদের অপ্রিয়ভাজন হন। অনেক দায়িত্বপূর্ণ চাকরি থেকে প্রোটেস্টাণ্টদের বিতাড়িত করে তিনি রোমান ক্যাথলিকদের সেখানে বহাল করেন।

চারি মাস্তুলবিশিষ্ট যুদ্ধ-জাহাজ

ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোকই প্রোটেস্টাণ্ট; তারা রাজা জেমসের উপর বিরক্ত হয়ে জেমসের প্রোটেস্টাণ্ট জামাতা, হল্যাণ্ডের অরেঞ্জ-বংশের **রাজা উইলিয়মকে** ইংলণ্ডের সিংহাসন গ্রহণ করতে **আহ্বান করে।** রাজা উইলিয়ম ইংলণ্ডে এসে, **তৃতীয় উইলিয়ম** (১৬৫০—১৭০২ খ্রীঃ) উপাধি নিয়ে রাজত্ব আরম্ভ করলেন। দ্বিতীয় জেমস যুদ্ধ না করে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। এই ঘটনা ইংলণ্ডের ইতিহাসে ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দের **"রক্তপাতহীন গৌরবময় বিপ্লব"** নামে খ্যাত।

তৃতীয় উইলিয়মের মৃত্যুর পর **রানী অ্যান** (১৬৬৫—১৭১৪ খ্রীঃ) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজত্বে, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে "স্পেন-সিংহাসন উত্তরাধিকার যুদ্ধে" ইংলণ্ডের অজেয় সেনাপতি **মালবরো** (১৬৫০—১৭২২ খ্রীঃ) বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছিলেন।

রানী অ্যানের মৃত্যুর পর, জার্মেনীর অন্তর্গত, হ্যানোভার রাজ্যের **প্রথম জর্জ** (১৬৬০—১৭২৭ খ্রীঃ) এসে ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। এরূপে ইংলণ্ডে **হ্যানোভার-বংশের** রাজত্বকাল শুরু হয়। ইংলণ্ডে প্রথম জর্জ ও দ্বিতীয় জর্জের রাজত্বকালের বিখ্যাত লোকদের মধ্যে **ওয়ালপোল** (১৬৭৬—১৭৪৫ খ্রীঃ) এবং **বড় পিটের** (১৭০৮—১৭৭৮ খ্রীঃ) **নাম** বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ওয়ালপোল দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি আনেন এবং তাঁকে ইংলণ্ডের প্রথম প্রধানমন্ত্রী বলা হয়। বড় পিট নামজাদা সমর-সচিব ছিলেন।

পিট **'সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে'** (১৭৫৬—১৭৬৩ খ্রীঃ) বিশেষ রণনীতি-কৌশল দেখিয়ে, পৃথিবীর নানা-স্থানে ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য প্রসার করেন এবং ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যশক্তি খর্ব করেন।

সেক্সপিয়র

দ্বিতীয় জর্জের মৃত্যুর পর **তৃতীয় জর্জ** (১৭৩৮—১৮২০ খ্রীঃ) ইংলণ্ডের অধীশ্বর হন। তাঁর স্বেচ্ছাচারী ও ভ্রান্ত-নীতির ফলে, উত্তর-আমেরিকার ইংরেজ উপনিবেশগুলি বিদ্রোহ করে এবং জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে, ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে স্বাধীন হয়। এই ভাবে **আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি** হয় (১৭৮৩ খ্রীঃ)।
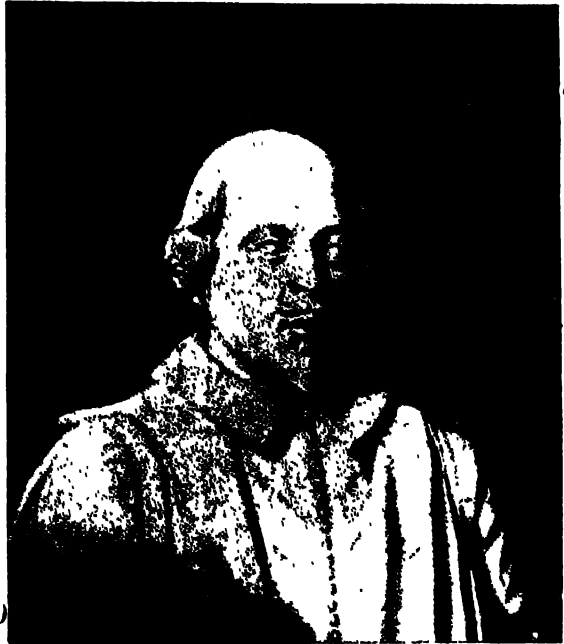
নেলসন

ইংলণ্ড যে পৃথিবীর সব দেশের চেয়ে বেশী শক্তির অধিকারী হয়েছিল তার প্রধান কারণ, ইংলণ্ডে অনেক বড় বড় যোদ্ধা এবং নাবিক জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের নাম ইংলণ্ডের ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে আছে। ইংলণ্ডের নাবিকদের মধ্যে জলযুদ্ধে যাঁরা সব চেয়ে বড় বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে নেলসনের সম্মান সবার চেয়ে বেশী।

নেলসনের পুরা নাম ছিল, **হোরেসিও নেলসন** (১৭৫৮—১৮০৫ খ্রীঃ)। ছোট বেলায় তিনি রোগা ও দুর্বল ছিলেন, কিন্তু তাঁর বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ ও সাহস খুব প্রবল ছিল। তিনি তাঁর ঠাকুরমার কাছে থাকতেন।

প্রথম চার্লস

একদিন বালক নেলসন একা বাইরে গিয়েছেন ; সারাদিন তাঁকে ফিরতে না দেখে ঠাকুরমা খুব চিন্তিত হয়ে বাড়ির চাকরকে তাঁর খোঁজে পাঠিয়ে দিলেন। চাকর অনেক খোঁজাখুঁজি করে, তাঁর সন্ধান পেয়ে, তাঁকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে এল। ঠাকুরমা জিজ্ঞেস করলেন, "সারাদিন ছিলে কোথায়? ভয় বলেও কি কিছু তোমার নেই!" নেলসন অবাক হয়ে উত্তর দিলেন, "ভয়! সে আবার কে? তাকে তো কখনও দেখি নি!" কথাটা সম্পূর্ণ সত্য, নেলসন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভয় কাকে বলে জানতেন না।

বার বছর বয়সে নেলসন ঠাকুরমার কাছে বিদায় নিয়ে, জাহাজে নাবিকের কাজ শিখতে চলে গেলেন। তিনি এত ভাল করে কাজ শিখেছিলেন যে, মাত্র কুড়ি বছর বয়সেই, তাঁকে একটা যুদ্ধ-জাহাজের ক্যাপ্টেনের দায়িত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হল।

নেলসনের বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বছর, তখন ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে বিরাট এক যুদ্ধ বেধে গেল। ইতিমধ্যে ফ্রান্সে প্রথমে হল **'ফরাসী-বিপ্লব'** ও তার অল্প

পরেই, বিখ্যাত যোদ্ধা **নেপোলিয়নের অভ্যুত্থান** হল। নেপোলিয়নের ভয়ে তখন সারা ইওরোপ কম্পমান। তাঁর বিরুদ্ধে নৌযুদ্ধের সমস্ত ভার এসে পড়ল নেলসনের উপর। নেলসন অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে অনেকগুলো জলযুদ্ধে, ফরাসী যুদ্ধ-জাহাজগুলোকে পর্যুদস্ত করলেন। একটা যুদ্ধে নেলসনের একটি চোখ নষ্ট হয়ে গেল, আর এক যুদ্ধে তাঁর একটা হাত উড়ে গেল ; কিন্তু তবু তিনি দমবার পাত্র নন।

একবার ফরাসীপক্ষীয় ডেনদের যুদ্ধ-জাহাজের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ-জাহাজের প্রচণ্ড যুদ্ধ বেধে গিয়েছিল। ডেনরা এত ভাল যুদ্ধ করেছিল যে, ইংরেজ দলের নৌ-সেনাপতি ভাবলেন যে, তিনি জয়লাভ করতে পারবেন না। এই ভেবে তিনি যুদ্ধ থামাবার সংকেত করে নিশান উড়িয়ে দিলেন।

ওলিভার ক্রমওয়েল

নেলসন এই যুদ্ধে একটা যুদ্ধ-জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলেন। তিনি যখন খবর পেলেন যে, সেনাপতি যুদ্ধ থামাবার জন্যে সংকেত করেছেন, তখন তিনি মনে মনে ভয়ানক অসন্তুষ্ট হলেন। নাবিকদের কিন্তু সে সম্বন্ধে তিনি কিছু বললেন না, একটা দূরবীন নিয়ে নিজের অন্ধ চোখটিতে লাগিয়ে তিনি শুধু বললেন, "কই, যুদ্ধ থামাবার কোন সংকেত তো আমি দেখতে পাচ্ছি না! তোমরা আরও বেশী করে গোলা চালাও।"

যুদ্ধ পেলে নেলসন আর কিছু চাইতেন না। তাঁর উৎসাহে নাবিকেরা এমন ভীষণ যুদ্ধ শুরু করল যে, ডেনদের যুদ্ধ-জাহাজগুলো পালাতে লাগল। শেষ পর্যন্ত নেলসনই জয়লাভ করলেন বালটিকের যুদ্ধে।

এই যুদ্ধে নেলসনের বুদ্ধি এবং বীরত্ব দেখে রাজা এত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে,

তিনি নেলসনকে **লর্ড** করে দিলেন এবং তাঁকে নৌ-বিভাগে এডমিরালের পদে উন্নীত করলেন। এডমিরাল হল নৌ-বিভাগের সবচেয়ে বড় সম্মানজনক পদ।

নেলসনের শেষ যুদ্ধ হয়েছিল ফ্রান্স এবং স্পেনের মিলিত নৌ-বহরের সঙ্গে। নেপোলিয়নের ফরাসী নৌবহর, স্পেনের সঙ্গে যোগ দিয়ে যখন ইংলণ্ড আক্রমণ করবার উপক্রম করল, নেলসন তখন তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে রওনা হলেন। স্পেনের উপকূলে, **ট্রাফালগার** অন্তরীপের কাছে নেলসনের জাহাজ-গুলির সঙ্গে ফ্রান্স ও স্পেনের জাহাজের **ভীষণ যুদ্ধ** হল (১৮০৫ খ্রীঃ)। যুদ্ধের মধ্যে হঠাৎ একটা গুলি এসে নেলসনের গায়ে বিঁধল। তিনি পড়ে গেলেন। নাবিকেরা ছুটে এসে ধরাধরি করে তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গেল। যুদ্ধে ইংরেজরা জয়লাভ করেছে, এই সংবাদটি শোনবার জন্যেই যেন তিনি বেঁচে রইলেন!
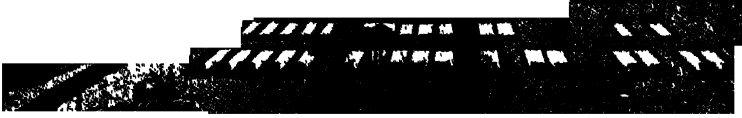
আমেরিকায় ইংরেজ উপনিবেশ

যুদ্ধ শেষ হলে তাঁর লোকজন এসে যখন তাঁকে জয়ের কথা জানাল, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তিনি শুধু বললেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার কর্তব্য আমি করেছি।" এর অল্পপরেই তিনি মারা যান। নেলসনের কৃতিত্বের ফলে নেপোলিয়নের ইংলণ্ড আক্রমণ ও জয়ের পরিকল্পনা চিরতরে বিনষ্ট হয়।

নেলসন যে জাহাজে যুদ্ধ করেছিলেন, তার নাম ছিল 'ভিক্টরী'। এই জাহাজটি পুরানো হয়ে গেলেও ইংরেজরা তাকে নষ্ট করে নি ; নেলসনের স্মৃতি-রক্ষার জন্যে অত্যন্ত যত্ন করে পোর্টসমাউথ নামক বন্দরে সেটিকে রেখে দিয়েছে। ট্রাফালগারের যুদ্ধে নেলসন যেদিন জয়লাভ করেছিলেন, প্রতি বৎসরে সেই তারিখে, ভিক্টরী জাহাজের মাস্তুলের উপর নিশান উড়িয়ে দেওয়া হয়।

সেনাপতি ওয়েলিংটন

নেলসন ছিলেন জলযুদ্ধে ইংলণ্ডের সবচেয়ে বড় যোদ্ধা, আর স্থলযুদ্ধে সবার চেয়ে বেশী বীরত্ব দেখিয়ে, অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন **ডিউক অব ওয়েলিংটন** (১৭৬৯—১৮৫২ খ্রীঃ)। ওয়েলিংটনকেও যুদ্ধ করতে হয়েছিল ইওরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা নেপোলিয়নের সঙ্গে।
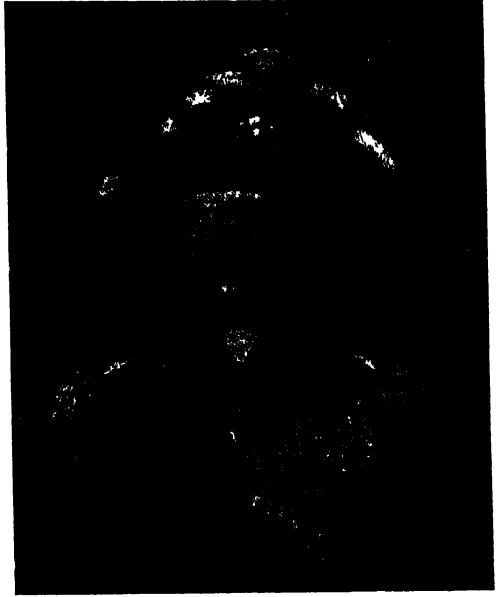
নেলসন

নেপোলিয়ন তখন ফ্রান্সের সম্রাট্। দেশের পর দেশ জয় করে বেড়ানোই ছিল তাঁর নেশা। ইওরোপের প্রায় সব দেশকেই তিনি যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু ইংলণ্ডকে অনেক চেষ্টা করেও তিনি কাবু করতে পারেন নি ইংরেজরা নেপোলিয়নকে হারাবার জন্যে আয়োজন করছে এই দেখে প্রাসিয়ানরাও এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিল। প্রাসিয়ার লোকদের বলে প্রাসিয়ান।

ডিউক অব ওয়েলিংটন

বেলজিয়মের মধ্যে **ওয়াটার্লু** নামে একটা শহর আছে। সেখানে ইংরেজ সৈন্যেরা আছে এই সংবাদ পেয়ে, নেপোলিয়ন তাদের আক্রমণ করতে রওনা হলেন। ওয়েলিংটন একটা ছোট পাহাড়ের উপর তাঁর সৈন্যদের নিয়ে নেপোলিয়নের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

নেপোলিয়ন এসেই ইংরেজ

সৈন্যদের আক্রমণ করলেন। সারাদিন ধরে ভীষণ যুদ্ধ চলল। অবশেষে নেপোলিয়ন দেখলেন যে, প্রাসিয়ান সৈন্যরা এসে, ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দিয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করেছে। তিনি আবার পূর্ণ বিক্রমে লড়তে লাগলেন, কিন্তু ইংরেজ ও প্রাসিয়ানের মিলিত শক্তির কাছে ফরাসী সৈন্যরা আর দাঁড়াতে পারল না। তারা পালাতে লাগল। **নেপোলিয়ন আত্মসমর্পণ করলেন।** ওয়েলিংটনের জয়-জয়কার পড়ে গেল। এই যুদ্ধই ইতিহাসে **ওয়াটার্লুর যুদ্ধ** নামে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে এই যুদ্ধ হয়েছিল।

মহারানী ভিক্টোরিয়া

ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনে যাঁরা আরোহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে দুজন ছিলেন বিখ্যাত রানী—একজনের নাম **রানী এলিজাবেথ,** আর একজনের নাম **মহারানী ভিক্টোরিয়া** (১৮১৯—১৯০১ খ্রীঃ)। ভিক্টোরিয়ার বয়স যখন মাত্র চার মাস, তখন তাঁর বাবা মারা যান। তিনি মানুষ হয়েছিলেন তাঁর মায়ের কাছে।

মহারানী ভিক্টোরিয়া

ভিক্টোরিয়ার বয়স যখন বার বছর তখন তিনি জানতে পারলেন যে, একদিন তিনি ইংলণ্ডের রানী হবেন। এই সংবাদ শুনে তিনি আনন্দে আত্মহারা হলেন না, ধীরভাবে শুধু বললেন, "আমি খুব ভাল হব।"

তারপর আরও ছয় বছর কেটে গেল। ভিক্টোরিয়ার বয়স যখন আঠার বছর তখন একদিন খুব ভোর বেলা তাঁকে জাগিয়ে জানানো হল যে, দুজন লর্ড তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। ভিক্টোরিয়া তাঁদের বসিয়ে না রেখে তখনি দেখা করতে এলেন।

এই লর্ড দুজনের মধ্যে একজন ছিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী, আর একজন ছিলেন দেশের সবচেয়ে বড় পাদরী, কেণ্টারবেরীর আর্চবিশপ। প্রধানমন্ত্রী ভিক্টোরিয়াকে বললেন, "রাজা মারা গিয়েছেন, আজ থেকে আপনি আমাদের

পঞ্চম জর্জ ও রানী মেরী

রানী।" ভিক্টোরিয়ার চোখ থেকে জল পড়তে লাগল। আর্চবিশপের দিকে তাকিয়ে তিনি শুধু বললেন, "আমার জন্যে ভগবানের আশীর্বাদ প্রার্থনা করুন।"

ভগবান সত্যই ভিক্টোরিয়াকে আশীর্বাদ করেছিলেন। মহারানী

ভিক্টোরিয়ার রাজত্বে দেশের লোক খুব সুখে ও শান্তিতে বাস করেছিল। চৌষট্টি বছর রাজত্ব করবার পরে, ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে মহারানী ভিক্টোরিয়া **দেহত্যাগ** করেন।

সপ্তম এডওয়ার্ড ও পঞ্চম জর্জ

প্রিন্স অব ওয়েলস (এখন ডিউক অব উইণ্ডসর)

মহারানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর বড় ছেলে **সপ্তম এডওয়ার্ড** (১৮৪১—১৯১০ খ্রীঃ) রাজা হন। এডওয়ার্ডেব বয়স তখন ষাট বছর। তিনি বেশীদিন রাজত্ব করতে পারেন নি।

সপ্তম এডওয়ার্ডেব পর রাজা হন তাঁর মেজ ছেলে **পঞ্চম জর্জ** (১৮৬৫—১৯৩৬ খ্রীঃ)। জর্জের দাদা আগেই মারা গিয়েছিলেন। পঞ্চম জর্জ ছোট-বেলায় নাবিকের কাজ শিখে ছিলেন এবং একটা যুদ্ধ-জাহাজের ক্যাপ্টেনের পদও পেয়েছিলেন।

পঞ্চম জর্জ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সব দেশে নিজে গিয়েছিলেন। তাঁর আগে আর কোন ইংরেজ রাজা নিজেদের সাম্রাজ্যের দেশগুলো দেখতে যান নি। পঞ্চম জর্জের আমলেই **প্রথম বিশ্বযুদ্ধ** হয়েছিল।

অষ্টম এডওয়ার্ড, ষষ্ঠ জর্জ ও রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ

রাজা পঞ্চম জর্জের মৃত্যুর পরে, তাঁর বড় ছেলে **অষ্টম এডওয়ার্ড** (জন্ম ১৮৯৪ খ্রীঃ) ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। অষ্টম এডওয়ার্ড যখন প্রিন্স অব ওয়েলস ছিলেন, তখন তিনি পৃথিবীর প্রায় সব দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি নিজে যুদ্ধক্ষেত্রেও গিয়েছেন।

অষ্টম এডওয়ার্ড খুব স্বাধীনচেতা ছিলেন। নিজের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করার চেয়ে সিংহাসন ত্যাগ করাও তিনি শ্রেয়ঃ মনে করতেন। **মিসেস সিম্পসন** নামে এক সাধারণ আমেরিকান মহিলাকে তিনি বিয়ে করতে চান। ইংলণ্ডের মন্ত্রীরা এতে ঘোর আপত্তি করেন। প্রধান-মন্ত্রী স্টানলি বলডুইন (১৮৬৭—১৯৪৭ খ্রীঃ) অষ্টম এডওয়ার্ডকে এই বিয়ে না কর-বার জন্যে অনেক অনুরোধ করলেন। নিজের বিবাহ-ব্যাপারে তাঁর স্বাধীন ইচ্ছার কোন মূল্য থাকবে না, অষ্টম এডওয়ার্ড একথা মানতে কিছুতেই রাজী হলেন না।

অষ্টম এডওয়ার্ড

অষ্টম এডওয়ার্ড তাঁর স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করলেন না; ইংলণ্ডের **সিংহাসন ত্যাগ করে** তিনি দেশ ছেড়ে চলে গেলেন। এখন তিনি **ডিউক অব উইণ্ডসর** নামে পরিচিত। মিসেস সিম্পসনকে তিনি বিয়ে করেছেন।

অষ্টম এডওয়ার্ডের মেজ ভাই ছিলেন **ডিউক অব ইয়র্ক**। দাদার সিংহাসন ত্যাগের পর তিনিই রাজা হলেন এবং **ষষ্ঠ জর্জ** (১৮৯৫—১৯৫২ খ্রীঃ) এই নাম গ্রহণ করলেন। ষষ্ঠ জর্জ ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর প্রথমা কন্যা এলিজাবেথ, **দ্বিতীয় এলিজাবেথ** (জন্ম ১৯২৬ খ্রীঃ) নামে এখন ইংলণ্ডের রানী হয়েছেন। মহারানী ভিক্টোরিয়ার পরে, এই আর একজন রানী ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের রাজ্যাভিষেক উৎসব মহা আড়ম্বরে সম্পন্ন হয়।

জেমস ওয়াট ও জর্জ স্টিফেনসন

শুধু রাজা-রানীদের কথা জানলেই ইংলণ্ডের ইতিহাসের সবখানি জানা যাবে না, তার শিল্প-বাণিজ্য এবং কলকারখানার কথাও জানতে হবে।

ষষ্ঠ জর্জ

বাষ্পচালিত ইঞ্জিন আবিষ্কার হবার আগে ইংলণ্ড ছিল কৃষিজীবী দেশ। জমি চাষ করে এবং গরু ভেড়া পালন করেই লোকে জীবন ধারণ করত। বাষ্পচালিত ইঞ্জিন আবিষ্কার হবার পর থেকেই ইংলণ্ডে মস্ত মস্ত কলকারখানা গড়ে উঠতে আরম্ভ হয়। এই সব কারখানায় তৈরী জিনিস জাহাজে করে দূর বিদেশে যেদিন থেকে চালান দেওয়া শুরু হয়, সেদিন থেকেই ইংলণ্ডের ধনদৌলত খুব তাড়াতাড়ি বাড়তে আরম্ভ করে।

এই **বাষ্পচালিত ইঞ্জিন** যিনি আবিষ্কার করেন, তাঁর নাম **জেমস ওয়াট** (১৭৩৬—১৮১৯ খ্রীঃ)। ওয়াট যখন বালক, তখন একদিন তিনি এক টেবিলে তাঁর কাকা আর কাকীমার সঙ্গে চা খেতে বসেছিলেন। টেবিলের উপর স্টোভে একটা কেটলিতে চায়ের জল গরম হচ্ছিল। সামনে কেকগুলো রয়েছে, কিন্তু ওয়াট সেদিকে না তাকিয়ে, শুধু দেখছিলেন কেমন করে কেটলির মুখ দিয়ে,

ধোঁয়া বেরোচ্ছে আর কেটলির ঢাকনিটা লাফিয়ে উঠছে। তিনি ঢাকনিটা দু-একবার চেপে ধরবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তবুও সেটা লাফিয়ে উঠতে থাকে।

সাধারণ জল ফুটে যে বাষ্প হয়, সেই বাষ্পের এত জোর দেখে তিনি অবাক্ হয়ে যান। এরপর থেকে তিনি দিনরাত ভাবতে থাকেন, এই বাষ্পকে কেমন করে মানুষের কাজে লাগানো যায়। তার সাধনা ব্যর্থ হয় না, বড় হয়ে তিনি বাষ্পচালিত ইঞ্জিন তৈরি করেন।

কাপড়ের কল ও পশমের কলে এই ইঞ্জিন বসিয়ে কল চালানো আরম্ভ হয়, তখন হতে মানুষের খাটুনি অনেক কমে যায়, আর সুতার **কাপড়**

ঊনবিংশ শতাব্দীর বিদ্যুৎ-চালিত কাপড়ের কল

ও পশমের কাপড় খুব তাড়াতাড়ি বেশী বেশী করে তৈরী হতে থাকে। ক্রমে ক্রমে এই ইঞ্জিনের সাহায্যে **খনি থেকে কয়লা** তোলা হতে থাকে। এই ইঞ্জিনের জোরে **জাহাজ ও ট্রেন** আগেকার চেয়ে অনেক জোরে চলতে আরম্ভ করে।

বাষ্পচালিত ইঞ্জিন ইংলণ্ডকে যে সম্পদের অধিকারী করেছে, পৃথিবীতে তার তুলনা নেই। ইংলণ্ডের যে ধনসম্পদ দেখে পৃথিবী-সুদ্ধ লোক অবাক্ হয়েছে, তার সবই এসেছে এই বাষ্পের ইঞ্জিনের দৌলতে।

রেলওয়ে ইঞ্জিন অবশ্য ওয়াটের আগেই আর একজন ইংরেজ তৈরি করেছিলেন। তাঁর নাম **জর্জ স্টিফেনসন** (১৭৮১—১৮৪৮ খ্রীঃ)। ওয়াটের

মৃত্যুর পাঁচ বছর আগে, স্টিফেনসনের তৈরী ইঞ্জিন রেল টানতে আরম্ভ করে। ইংরেজরা নেলসন, ওয়েলিংটন প্রভৃতি বড় বড় যোদ্ধাদের যেমন ভুলতে পারবে না, জেমস ওয়াট, জর্জ স্টিফেনসনকেও তেমনি চিরদিন মনে রাখবে। নেলসন এবং ওয়েলিংটন বাইরের শত্রুকে পরাজিত করে ইংলণ্ডের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ
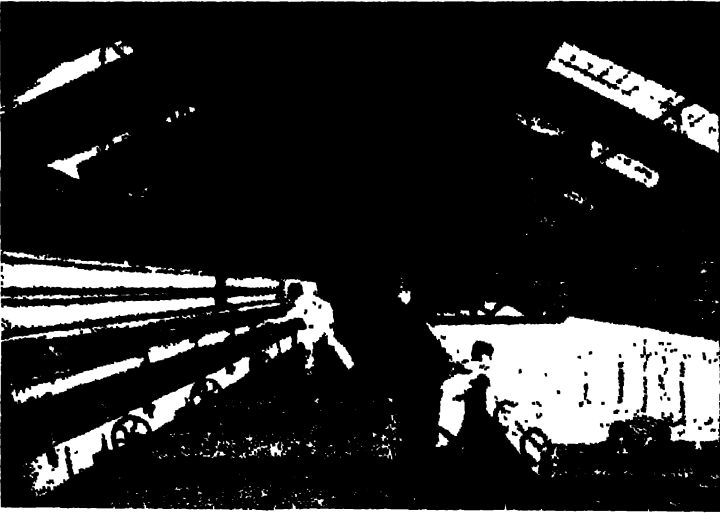
পুরাতন ও আধুনিক কাপড়ের কল

রেখেছিলেন, আর ওয়াট এবং স্টিফেনসন দৈত্যের মত বিরাট শক্তিশালী বাষ্পকে কাবু করে তাকে মানুষের কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে গিয়েছেন।

ইংলণ্ডের শাসন-ব্যবস্থা

ইংলণ্ডের রাজা দেশের প্রধান শাসনকর্তা, তাঁর হুকুমে দেশের রাজকার্য পরিচালিত হয় এবং **আইন তৈরী** হয়। দেশের যে কোন মামলা-মকদ্দমার চূড়ান্ত বিচারও একমাত্র তিনিই করতে পারেন। কিন্তু রাজা একান্ত নিজের ইচ্ছায় এর একটি কাজও করতে পারেন না।

দেশ-শাসনের জন্যে যখন তিনি কোন আদেশ দেন, তখন **মন্ত্রীদের পরামর্শ** তাঁকে শুনতে হয় এবং মন্ত্রীরা তাঁর কোন আদেশ সম্বন্ধে আপত্তি করলে, তিনি সে পরামর্শ অগ্রাহ্য করতে পারেন না। কোন আইন জারি করতে হলেও তেমনি তাঁকে **পার্লামেণ্টের পরামর্শ** শুনতে হয়। পার্লামেণ্ট যেভাবে আইন জারি করা হবে বলে ঠিক করে দেন, রাজাকে সেই ভাবেই তা করতে হয়।

উইলিয়ম পিট, আর্ল অব চ্যাথাম
(বড় পিট)

বিচারের বেলাতেও তাই। **প্রিভি কাউন্সিল** বলে রাজার একটি মন্ত্রণা পরিষদ আছে, দেশের সবচেয়ে বড় আইনজ্ঞ পণ্ডিতেরা সেই পরিষদের সভ্য। সব আদালতের মামলায় হেরে গিয়ে কোন লোক রাজার কাছে চূড়ান্ত বিচার প্রার্থনা করলে, তাঁরা আগে সেই মকদ্দমার কাগজপত্র দেখেন এবং দুপক্ষের ব্যারিস্টারদের বক্তব্য শোনেন। তারপর তাঁরা সেই মামলা সম্বন্ধে যে রায় দেওয়া ভাল মনে করেন, রাজাকে ঠিক সেইভাবে রায় দেওয়ার জন্যে অনুরোধ করেন। রাজাকে তাঁদের পরামর্শ শুনে, তাঁদেরই কথামত রায় দিতে হয়।

ইংলণ্ডের রাজা সমস্ত দেশের অধীশ্বর, দেশের সৈন্য-সামন্ত, যুদ্ধ-জাহাজ প্রভৃতি সবই তাঁর অধীন, তবুও তাঁকে রাজ্য শাসন করতে গিয়ে মন্ত্রীদের কথা শুনে চলতে হয় কেন? চলতে হয় এইজন্যে যে, রাজা যদি মন্ত্রীদের মরামর্শ না শোনেন, তা হলে তাঁরা এসে পার্লামেণ্টের কাছে নালিশ করবেন।

পার্লামেণ্টে যাঁরা দলে ভারী, মন্ত্রীরা তাঁদের প্রতিনিধি। মন্ত্রীরা তাঁদের সমস্ত কাজের জন্যে দলের সদস্যদের কাছে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য। পার্লামেণ্টের

সভ্যদের কাছে কৈফিয়ত দেওয়া আর দেশের সব লোককে সে কথা জানানো একই জিনিস। কারণ, পার্লামেন্টের সভ্যরা দেশের লোকের প্রতিনিধি।

আগে ইংলণ্ডের অনেক রাজাই তাঁদের কোন কাজের জন্যে দেশের লোকের কাছে জবাবদিহি করতে চাইতেন না। প্রজারা কিন্তু চাইত যে, রাজা কোন কর বসাতে হলে অথবা কোন আইন পাস করতে হলে, তাদের মতামত জেনে তবে সে কাজ করবেন। এই নিয়ে এক এক রাজার সঙ্গে প্রজাদের বিরোধ বাধত। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রজা-বিদ্রোহ পর্যন্ত ঘটত।

শেষ পর্যন্ত রাজারা বাধ্য হয়ে এই নিয়ম মেনে নিয়েছেন যে, প্রজাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে পার্লামেন্ট গঠিত হবে। পার্লামেন্টে দুটি ভাগ থাকবে; প্রজাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হবে **কমন্স-সভা** আর রাজা যাঁদের লর্ড উপাধি দেবেন, তাঁদের নিয়ে গঠিত হবে **লর্ড-সভা**। এই দুই সভা যে আইন পাস করা উচিত বলে ঠিক করে দেবেন রাজা তাতে সই করবেন। পার্লামেন্টের অনুমোদন না নিয়ে, তিনি নিজে হতে কোন আইন জারি করতে পারবেন না। দেশে যে কোন রকম কর বসাতে হলে রাজাকে পার্লামেন্টের সম্মতি নিতে হবে।

ডিজরেলি

কমন্স-সভার সভ্যেরা এক একটি দলের অন্তর্ভুক্ত থাকেন; যেমন, **রক্ষণ-দল, উদারনৈতিক দল, শ্রমিক দল,** স্বতন্ত্র দল প্রভৃতি। এর মধ্যে যে-দল একা অথবা দু-তিন দল মিলে ভারী হবে, তারাই ঠিক করবে কারা দেশের মন্ত্রী হবেন।

মন্ত্রীদের এক এক জনের উপর এক একটা বিভাগের ভার থাকে; যেমন, দেশের পুলিশ-বিভাগের ভার থাকে স্বরাষ্ট্র-সচিবের হাতে, বিদেশের সঙ্গে কথাবার্তা বলার এবং সন্ধি করার ভার থাকে বৈদেশিক সচিবের হাতে,

প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করা এবং সেটা খরচ করবার ভার থাকে অর্থ-সচিবের হাতে ইত্যাদি।

সমস্ত বিভাগের কাজ চলে রাজার নামে, কিন্তু তার জন্যে পার্লামেন্টের কাছে **দায়ী** থাকতে হয় মন্ত্রীদের। তার মানে, বিদেশের সঙ্গে যদি কোন সন্ধি হয়, তা হলে সেটা প্রচার করা হবে এই বলে যে, রাজা সেই সন্ধি করেছেন; কিন্তু পার্লামেন্টের সভ্যেরা যদি মনে করেন যে, সন্ধি করাটা ভাল কাজ হয় নি, তা হলে তাঁরা রাজার কাছে কোন কৈফিয়ত চাইবেন না, তাঁরা বৈদেশিক মন্ত্রীকে চেপে ধরবেন কৈফিয়ত দেবার জন্যে। রাজা যে দলিলে সই করবেন, সেই দলিলে একজন না একজন মন্ত্রীকে সই করতেই হবে, এবং যদি সেই দলিলের কোন কথা নিয়ে কখনও আপত্তি ওঠে, তা হলে সেই মন্ত্রীকে তার জন্যে জবাবদিহি করতে হবে—এই হল ইংলণ্ডের নিয়ম।

গ্ল্যাডস্টোন

পার্লামেন্টের **সদস্য নির্বাচন** হয় পাঁচ বছর পর পর। নির্বাচন হয় শুধু কমন্স-সভার জন্যে। লর্ড-সভার সদস্যেরা দেশের লোকের ভোটে নির্বাচিত হন না; রাজা যাঁদের লর্ড উপাধি দেন, তাঁরাই সেখানকার সদস্য হন। কমন্স-সভায় **প্রায় সাড়ে ছয়শো জন** সদস্য থাকেন। নির্বাচন হয়ে গেলে পর, যে দলের সদস্য কমন্স-সভায় সংখ্যায় বেশী হন, সেই দলের নেতাকে রাজা ডেকে পাঠান এবং তাঁকে মন্ত্রিসভা গঠন করবার জন্যে অনুরোধ করেন। তিনি তখন যাঁদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করতে চান, তাঁদের নাম রাজার কাছে দাখিল করেন এবং রাজা সেটা মঞ্জুর করেন। দলের নেতা নিজে হন **প্রধানমন্ত্রী**। মন্ত্রিসভাকে ইংরেজিতে বলে **ক্যাবিনেট**। মন্ত্রীরা এক-একজন এক-একটি বিভাগের ভার নেন এবং তাঁদের হুকুমে সেই সব বিভাগ পরিচালিত হয়।

কোন **আইন** পাস করার দরকার হলে মন্ত্রিসভা পার্লামেণ্টে তার জন্যে যে প্রস্তাব উপস্থিত করেন তাকে বলে **বিল**; এই বিল কমন্স-সভা এবং লর্ড-সভা দুটোতেই যখন পাস হয়ে যায় তখন রাজা তাতে সম্মতি দেন। রাজার সম্মতি পাওয়ার পর সেই বিল আইনে পরিণত হয়। দেশে কোন রকম কর বসাবার দরকার হলে মন্ত্রীরা একটি বিলের মত করে যদি সেই প্রস্তাব পাস করাতে না পারেন, তা হলে তাঁরা, কারও কাছ থেকে কর আদায় করতে পারেন না।

এরই নাম **পার্লামেণ্টারী গবর্নমেণ্ট**। এই নিয়মে গবর্নমেণ্ট চললে প্রজাদের অধিকার বজায় থাকে। এইজন্যে ইংলণ্ডের এই পার্লামেণ্টারী গবর্ন-মেণ্টকে পৃথিবীর অনেক দেশ গ্রহণ করেছে।

ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীদের মধ্যে এই কয়জনের নাম **বিশেষ উল্লেখযোগ্য**: **ওয়ালপোল, বড় পিট** বা আর্ল অব চ্যাথাম ও তাঁর ছেলে **ছোট পিট** (১৭৫৯—১৮০৬ খ্রীঃ), **রবার্ট পীল** (১৭৮৮—১৮৫০ খ্রীঃ), **পামারস্টোন** (১৭৮৪—১৮৬৫ খ্রীঃ), **গ্ল্যাডস্টোন** (১৮০৯—১৮৯৮ খ্রীঃ), **ডিজরেলি** (১৮০৪—১৮৮১ খ্রীঃ) **লয়েড জর্জ** (১৮৬৩—১৯৪৫ খ্রীঃ), **চার্চিল** (জন্ম ১৮৭৪—২৯৬৫ খ্রীঃ), এবং **অ্যাটলি** (জন্ম ১৮৮৩—১৯৬৭ খ্রীঃ)। তাঁরা সকলেই রাজনীতিতে ও নানা বিষয়ে খুব কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

ইংলণ্ডের রাজবংশ

নরম্যানরা ইংলণ্ড আক্রমণ করে জয়লাভ করবার পর প্রথম উইলিয়ম সেখানকার রাজা হলেন। তাঁর আমল থেকে আরম্ভ হয় **নরম্যান-রাজ-বংশ**। তাঁর আগে সমস্ত ইংলণ্ডের উপর বংশানুক্রমে কোন রাজা রাজত্ব করতে পারেন নি। নরম্যান-বংশের চার জন রাজা রাজত্ব করেছেন; **প্রথম উইলিয়মের** পর তাঁর পুত্র **দ্বিতীয় উইলিয়ম** রাজা হন, তাঁর পরে দ্বিতীয় উইলিয়মের ভাই **প্রথম হেনরী** সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রথম হেনরীর পুত্রসন্তান ছিল না, কাজেই তাঁর মৃত্যুর পর রাজা হন তাঁর ভাগিনেয় **স্টিফেন**।

নরম্যান-বংশের পর ইংলণ্ডে রাজত্ব করেন **প্লাণ্টাজেনেট-বংশ**। প্রথম হেনরীর দৌহিত্র **দ্বিতীয় হেনরী** থেকে এই বংশ আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় হেনরীর পিতা ছিলেন ফ্রান্সের আঞ্জু নামক স্থানের অধিপতি। তিনি নিজের মুকুটে তৃণগুচ্ছ ধারণ করতেন। ল্যাটিন ভাষায় তৃণগুচ্ছকে বলে 'প্লাণ্ট-জেনিস্ট'—এইজন্যে তাঁর বংশের নামই হয়ে গেছে **প্লাণ্টাজেনেট-বংশ**।

প্লাণ্টাজেনেট-বংশের সপ্তম রাজা ছিলেন **তৃতীয় এডওয়ার্ড**। তৃতীয় এডওয়ার্ডের মৃত্যুর পর তাঁর পৌত্র **দ্বিতীয় রিচার্ড** রাজা হন। তৃতীয় এডওয়ার্ডের জীবিতকালেই তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং রিচার্ডের পিতা **ব্ল্যাক প্রিন্সের মৃত্যু** হয়েছিল। **জন অব গণ্ট** ছিলেন তৃতীয় এডওয়ার্ডের তৃতীয় সন্তান। তাঁর পুত্র হেনরীর সঙ্গে, দ্বিতীয় রিচার্ডের সিংহাসন নিয়ে ভীষণ শত্রুতা আরম্ভ হয়। এই নিয়ে যুদ্ধও হয়। এই যুদ্ধই **ল্যাঙ্কাস্ট্রিয়ান বিপ্লব** নামে পরিচিত (১৩৯৯ খ্রীঃ)। **হেনরী** ইংলণ্ডের অন্তর্গত ল্যাঙ্কাস্টার নামক স্থানের ডিউক ছিলেন, এইজন্যে তাঁর দলকে বলত 'ল্যাঙ্কাস্ট্রিয়ান দল'। তৃতীয় এডওয়ার্ডের বংশধরগণের মধ্যে, সিংহাসন নিয়ে এই শত্রুতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনেক বছর ধরে চলে। এই ঝগড়া থেকে **গোলাপের যুদ্ধের** উৎপত্তি হয়।

দ্বিতীয় উইলিয়ম

পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ হয় **টিউডর-বংশের** রাজত্ব। **সপ্তম হেনরী** এই বংশের প্রথম রাজা। এই বংশে মাত্র পাঁচজন রাজত্ব করেছেন। **রানী এলিজাবেথ** টিউডর-বংশের শেষ রানী।

এলিজাবেথের পর স্কটল্যাণ্ডের রানী মেরীর পুত্র **জেমস** ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। মেরী এলিজাবেথের আত্মীয়া ছিলেন। এই রাজা জেমস হতেই ইংলণ্ডের **স্টুয়ার্ট-বংশের আরম্ভ** হয়।

স্টুয়ার্ট-বংশের শেষ রানী **অ্যান** হঠাৎ মারা যাওয়ায় ইংলণ্ডের লোকেরা জার্মেনীর অন্তর্গত হ্যানোভার প্রদেশের শাসনকর্তা জর্জকে ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করবার জন্যে আমন্ত্রণ করেন। তিনি **প্রথম জর্জ** নাম নিয়ে রাজত্ব আরম্ভ করেন এবং তাঁর বংশ **হ্যানোভার-রাজবংশ** বলে পরিচিত হয়।

মহারানী ভিক্টোরিয়া এই বংশেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে জার্মেনীর অন্তর্গত স্যাক্সে-কোবার্গ নামক স্থানের শাসনকর্তার বংশধর, প্রিন্স অ্যালবার্টের বিবাহ হয়েছিল বলে তাঁর পুত্র **সপ্তম এডওয়ার্ডের** আমল থেকে ইংলণ্ডের রাজবংশ, **স্যাক্সে-কোবার্গ**-বংশ নামে পরিচিত হয়। সপ্তম এডওয়ার্ডের

পুত্র পঞ্চম জর্জের আমলে, ইংলণ্ডের সঙ্গে জার্মেনীর যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর, তিনি ব্রিটিশ রাজবংশের নাম বদলে দিয়ে, স্যাক্সে-কোবার্গের বদলে, **উইণ্ডসর বংশ** নাম দেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে বিজয়ী শক্তিসমূহ ফ্রান্সের **ভার্সাই** নগরীতে সমবেত হয়ে এক **সন্ধিপত্র** স্বাক্ষর করেন (১৯১৯ খ্রীঃ)। এতে জার্মেনীর শক্তি ও সমৃদ্ধি সকল দিক্ দিয়েই খর্ব করার ব্যবস্থা হয়। রাষ্ট্রীয় অধিকার অতঃপর সামান্যই রইল জার্মেনীর, আলসেস-লোরেন ও রাইন-উপত্যকা থেকে বঞ্চিত করা হয় তাকে। তার সৈন্যসংখ্যা কমিয়ে আনা হয় আগের তুলনায় এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশে, উপরন্তু যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ একটা অসম্ভব রকম মোটা টাকা জার্মেনী বৎসর বৎসর দিতে বাধ্য থাকে মিত্রশক্তিকে।

প্রথম হেনরী

বিজিত, পদানত জার্মেনীর পক্ষে এইসব সুকঠোর শর্তে রাজী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। জার্মান সম্রাট্ কাইজার তখন হল্যাণ্ডে পলাতক। জার্মানরা দেশ থেকে রাজতন্ত্র তুলে দিয়ে সেখানে প্রতিষ্ঠা করে এক **সাধারণতন্ত্র**। বিশ্বযুদ্ধকালীন সমরনায়ক **ভন্ হিণ্ডেনবুর্গকে** নির্বাচিত করা হয় **প্রেসিডেণ্ট** পদে। অসহ্য দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়ে হিণ্ডেনবুর্গ কোন-মতে চালিয়ে যেতে থাকেন দেউলিয়া দেশের দৈনন্দিন শাসনকার্য।

এই সময়ে এক ভাগ্যান্বেষী পুরুষের ক্রমবর্ধমান ছায়া এসে মাঝে মাঝে পড়তে লাগল জার্মেনীর রাষ্ট্রিক ও সামাজিক বিবর্তনের উপরে। তাঁর নাম **অ্যাডলফ হিটলার**। অস্ট্রিয়ায় তাঁর জন্ম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি ছিলেন সামান্য সৈনিক। ভার্সাই-সন্ধির পরে তিনি নিজস্ব একটি দল সৃষ্টি করেন, এই দলই পরে **নাৎসীদল** নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে এই নাৎসীদল ক্রমশঃ শক্তিসঞ্চয় করতে থাকে। অবশেষে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে এই দলের অধিনায়ক হিসাবে হিটলার জার্মান রাইখের **চ্যান্সেলার** পদে অধিষ্ঠিত হন।

ডেনদের সঙ্গে আলফ্রেডের যুদ্ধ

অতঃপর ভার্সাই-সন্ধির সমস্ত শর্ত একে একে পদদলিত করতে আরম্ভ করেন হিটলার। ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে অস্ট্রিয়া জার্মান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। চেকোশ্লোভাকিয়ার অন্তর্গত সুদেতানল্যাণ্ড মূলতঃ জার্মানজাতি কর্তৃক অধ্যুষিত এই দাবিতে,—ঐ অঞ্চলটিকে জার্মেনীর অন্তর্ভুক্ত করে নেন হিটলার।

এত অত্যাচার সত্ত্বেও শান্তিকামী ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকা সহ্য করে যাচ্ছিল হিটলারকে, কিন্তু তিনি যখন **পোল্যাণ্ডকে আক্রমণ** করে বসেন **১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর** তারিখে, তখন আর নীরব থাকা সম্ভব হয় না তাদের।

ইতিপূর্বে রাশিয়ার সঙ্গে এক 'অনাক্রমণ সন্ধি' স্থাপন করেছিলেন হিটলার, এতেও ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের অস্বস্তির কারণ ঘটেছিল। এখন এই পোল্যাণ্ডের ব্যাপারে তারা সমস্বরে প্রতিবাদ করতে থাকে। ভার্সাই-সন্ধির শর্ত অনুযায়ী পোল্যাণ্ড-রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পূর্বাবধিই ছিল প্রতিশ্রুত, এজন্যে তারা স্পষ্টাক্ষরে হিটলারকে জানিয়ে দিয়েছিল যে, তিনি পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ বেধে ওঠা অনিবার্য।

স্টিফেন
(অপুত্রক প্রথম হেনরীর ভাগিনেয়)

হিটলার এ ধমকে ভয় পাবার পাত্র ছিলেন না। তিনি পোল্যাণ্ড আক্রমণ করেন এবং পোলদের যথাসাধ্য প্রতিরোধ সত্ত্বেও চারি সপ্তাহের ভিতর **পোল্যাণ্ডের পশ্চিমার্ধ গ্রাস** করে ফেলেন। ইতিমধ্যে রুশ সেনা এসে পোল্যাণ্ডের পূর্বাংশ দখল করে বসেছিল; রাজধানী ওয়ার্স **আত্মসমর্পণ** করার পর, পোল্যাণ্ডের আর যুদ্ধ করবার সামর্থ্য থাকে না। জার্মেনী ও রাশিয়া মিলে ভাগাভাগি করে নেয় গোটা পোল্যাণ্ড দেশটাকে।

হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জার্মেনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল (৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯)।

এখন হিটলার নানাভাবে সন্ধির চেষ্টা করতে থাকেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি আর কোন দেশ আক্রমণ বা অধিকার করবেন না। কিন্তু তিনি এর পূর্বেও বহুবার এমনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ও তা ভঙ্গ

করেছেন। কাজেই ইংলণ্ড ও ফ্রান্স আর তাঁকে বিশ্বাস করতে রাজী হয় না।

দলে দলে ইংরেজ সৈন্য ফ্রান্সে এসে অবতরণ করতে থাকে—ফ্রান্সের পথে জার্মেনীর দিকে অগ্রসর হবার জন্যে। সমুদ্রপথে জার্মেনীকে অবরুদ্ধ করে বসে থাকে ইংরেজ রণতরীর বহর। জলে স্থলে ও ব্যোমপথে সমান তালে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। ফ্রান্সের জেনারেল **গামেলাঁ** অভিষিক্ত হন মিলিত ইংরেজ ও ফরাসী বাহিনীর সর্বাধিনায়ক-পদে। ইংরেজ সেনার প্রধান সেনাপতি হন **লর্ড গর্ট,** তাঁর সহকারী পদে কাজ করতে থাকেন **জেনারেল আয়রনসাইড।**

দ্বিতীয় হেনরী

চেম্বারলেন (১৮৬৯—১৯৪০ খ্রীঃ) তখন ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী, **দালাদিয়ের** ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী। চেম্বারলেন ডেকে পাঠান উইনস্টন চার্চিলকে নৌবাহিনীর প্রধান নিয়ামক (First Lord of the Admiralty) পদ গ্রহণ করবার জন্যে। জার্মান আক্রমণ থেকে ফ্রান্সকে রক্ষা করবার জন্যে, ফ্রান্সের পূর্বসীমান্ত-বরাবর এক দুর্ভেদ্য দুর্গশ্রেণী নির্মিত হয়েছিল—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। এর নাম **ম্যাজিনো-লাইন।** এখানেই ইংরেজ ও ফরাসী বাহিনীর প্রধান কর্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ম্যাজিনো-লাইন থেকে কিছুদূরে অবস্থিত ছিল জার্মেনীর **সিগফ্রিড-লাইন।** এও এক দুর্ভেদ্য দুর্গশ্রেণী। এই দুই দুর্গশ্রেণীর ভিতর **মালিকবিহীন দেশ** (No Man's Land); এখানে ক্রমাগত চলতে থাকে প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুদের হানাহানি—স্থলপথে ও ব্যোমপথে।

এদিকে **রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ** বাধে ফিনল্যাণ্ডের। বালটিক সমুদ্রের তীর-বর্তী কতিপয় দ্বীপ ও উপদ্বীপ, রাশিয়া দাবি করেছিল ফিনল্যাণ্ডের কাছে। স্বভাবতঃই ফিনল্যাণ্ড এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হতে পারে নি। যুদ্ধ বাধবার সঙ্গে সঙ্গেই রুশবাহিনী হানা দেয় কারেলিয়ান যোজকের উপর। ফিনদের **সেনাপতি ম্যানারহাইম** ছিলেন বিচক্ষণ যোদ্ধা। তাঁর পরিচালনায় দুর্ধর্ষ রুশ সৈন্যকেও দীর্ঘদিন ধরে ঠেকিয়ে রাখে ফিনল্যাণ্ডবাসীরা।

১৩ই ডিসেম্বর (১৯৩৯ খ্রীঃ) দক্ষিণ-আটলাণ্টিক সমুদ্রে এক রোমাঞ্চকর যুদ্ধ

হয়েছিল, জার্মান রণতরী **"গ্রাফ-স্পী"** এবং ব্রিটিশ ক্রুজার একিলিস, আজাক্স ও এক্সেটারের মধ্যে। গ্রাফ-স্পী ঐ অঞ্চলের সমুদ্রে ব্রিটিশ বাণিজ্য-জাহাজগুলির ধ্বংস-সাধনে ব্যাপৃত ছিল। একিলিস, আজাক্স ও এক্সেটার ওকে দেখতে পেয়ে আক্রমণ করে। এক তুমুল যুদ্ধে পরাজিত হবার পর হিটলারের আদেশে গ্রাফ-স্পী জাহাজখানিকে বারুদ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়।

তৃতীয় এডওয়ার্ড

অবশেষে ১৩ই মার্চ (১৯৪০ খ্রীঃ) তারিখে, ফিনল্যাণ্ড পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়। রাশিয়ার দাবিমত ভূখণ্ডগুলি থেকে অপসৃত হয়ে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে সে। এদিকে হিটলার ও মুসোলিনীর ভিতর ব্রেনার-গিরিবর্ত্মে সাক্ষাৎ হয়—ইওরোপীয় পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবার জন্যে। ইতালির সর্বময় কর্তা এই মুসোলিনী, তখন পর্যন্ত নিরপেক্ষই রয়েছেন এই ইওরোপীয় যুদ্ধে। এমন কি, যুদ্ধ বন্ধ করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টাও বারবার করেছেন তিনি। কিন্তু হিটলার তাঁর সাহায্যলাভের আশা চিরদিনই করেছিলেন।

মসিয়েঁ দালাদিয়ের ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন প্রেসিডেণ্ট লেব্রানের অনুরোধে **মসিয়েঁ রেনো** নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

দ্বিতীয় রিচার্ড

তুরস্ক ইতিপূর্বে রাশিয়ার সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিল; কিন্তু এই সময়ে ইংলণ্ডের সঙ্গেও এক সন্ধি স্থাপন করে সে। মিশর, সিরিয়া প্রভৃতি প্রাচ্য-দেশ থেকেও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আসতে থাকে ইংলণ্ডে।

নরওয়ের যুদ্ধ অমীমাংসিত থাকে দীর্ঘদিন ধরে। নার্ভিক অঞ্চলে ইংরেজদের আধিপত্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে, কিন্তু ট্রনডিমস্থিত ইংরেজ সেনাকে জাহাজে চড়ে পলায়ন করতে হয় এবং নামসোস শহর একেবারেই ত্যাগ করে চলে আসে মিত্রশক্তি।

কিন্তু ইতিমধ্যে বিশ্বযুদ্ধের নাটকে দেখা দেয় এক চমকপ্রদ দৃশ্যান্তর। হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম ও লাক্সেমবুর্গের বিরুদ্ধে জার্মেনী যুদ্ধ ঘোষণা করে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মে তারিখে। অমনি নরওয়ের যুদ্ধের গুরুত্ব হ্রাস পেয়ে যায় অনেকখানি, ইংরেজ অভিযাত্রী-বাহিনীর একটা বৃহৎ অংশ ফ্রান্স থেকে ধেয়ে আসে বেলজিয়াম-সীমান্তে।

এসময়ে **ইংরেজ মন্ত্রিসভার পতন** হয়। চেম্বারলেন-মন্ত্রিসভার উপর জনসাধারণ ক্রমশঃ বিরক্ত হয়ে উঠছিল। নরওয়ের যুদ্ধে কার্যতঃ পরাজয় স্বীকার করে অপসৃত হয়ে আসার দরুন তাঁদের প্রতিপত্তি নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে যায়। চেম্বারলেনের জায়গায় প্রধানমন্ত্রী হন **উইনস্টন চার্চিল**। অবশ্য মন্ত্রি-সভার অন্যতম সম্মানিত সদস্য হিসাবে চেম্বারলেন কাজ করতে থাকেন তখনও।

উত্তর-সমুদ্রতীর থেকে মোসেল শহর পর্যন্ত, এই দীর্ঘ সীমান্ত-রেখার সর্বত্রই ইংরেজ অভিযাত্রী-বাহিনী তৎপর হয়ে ওঠে। ইংরেজ সেনা অবিলম্বে

ক্রমওয়েল কর্তৃক পার্লামেণ্ট বন্ধ

আইসল্যাণ্ডে অবতরণ করে সেখানে ঘাঁটি স্থাপন করে—যাতে জার্মানরা ঐ দ্বীপটি দখল করে না নিতে পারে।

১৪ই মে **ওলন্দাজ সরকার,** যুদ্ধবিরতির আদেশ প্রচার করতে বাধ্য হন। ইংরেজ অভিযাত্রী-বাহিনী নানাস্থানে বোমাবর্ষণ ভিন্ন উল্লেখযোগ্য আর কিছুই করতে সমর্থ হয় না।

অবশেষে ২৮শে মে, **বেলজিয়ান সৈন্য** অস্ত্র ত্যাগ করে। মিত্রশক্তির সম্মিলিত বাহিনীর উপর এই ব্যাপারের প্রতিক্রিয়া হয় অতি ভয়ানক। তারা

প্রায় তিনদিকে বেষ্টিত হয়ে পড়ে জার্মান সেনার দ্বারা। প্রাণপণে যুদ্ধ করতে করতে তারা অপসৃত হতে থাকে সমুদ্রতীরের দিকে। অবশেষে **ডানকার্কে** এসে উপনীত হয় তারা।

তখন আরম্ভ হয় তিন লক্ষ তেত্রিশ হাজার সশস্ত্র সৈনিককে জাহাজে করে সাগর-পারে পাঠিয়ে দেবার পালা। বড়-ছোট, সশস্ত্র-নিরস্ত্র যতরকম জাহাজ ইংরেজ ও ফরাসীদের ছিল, সবই দিবারাত্রি ইংলিশ চ্যানেল পারাপার করতে থাকে ছয় দিন ধরে। সেই বিরাট বাহিনীর অধিকাংশ সৈনিকই নিরাপদে ইংলণ্ডে পেঁাছে যায় এই ভাবে। ওদের পৃষ্ঠরক্ষার জন্যে যারা ডানকার্কে ছিল, সেই সৈন্যদল কয়টিই কেবল জার্মান হস্তে বন্দী হয়। আর পতিত হয় জার্মান কবলে—কোটি কোটি পাউণ্ড মূল্যের অগণিত সমর-সম্ভার। তার কিছু ইংরেজেরা যাবার সময় নষ্ট করে দিয়ে যেতে পেরেছিল, বাকী সবই জার্মান বাহিনীর কাজে লেগে যায়। তাই চার্চিল বলেছিলেন, "ডানকার্কের পশ্চাদপসরণ একদিকে যেমন পরমাশ্চর্য, অন্যদিকে তেমনি সর্বনাশা। বাহিনীটা উদ্ধার পেয়েছে আশ্চর্য-ভাবে, কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রের ক্ষতি যা' হয়েছে, তাকে সর্বনাশই বলা যেতে পারে।"

মার্শাল পেতাঁ্যা

এখানে লক্ষ্য করবার জিনিস এই যে, **ডানকাকের ব্যাপারে** ইংরেজের বিমান ও নৌ-শক্তির প্রাধান্য আবার সপ্রমাণ হয় সারা জগতের সম্মুখে। দীর্ঘ ছয় দিন ধরে অভিযাত্রী-বাহিনী ইংলিশ চ্যানেল পার হয়, কিন্তু জার্মান রণতরী বা বিমানবহর তাদের সে পারাপারের কোন ব্যাঘাতই করতে পারে না। জলপথে ইংরেজের রণতরী ও আকাশপথে ইংরেজের বিমানবহর, জার্মেনীর সমস্ত আক্রমণকেই অনায়াসে প্রতিহত করতে সমর্থ হয়েছিল।

ইংরেজ অভিযাত্রী-বাহিনী ডানকার্ক বন্দর থেকে পালিয়ে আসে ইংলণ্ডে, ওদিকে জার্মানবাহিনীকে বাধা দেবার বেলজিয়ম বা ফ্রান্সের আর কোন উপায়ই থাকে না। দুর্বার গতিতে হিটলারের সৈন্য সীন নদী পার হয়ে ফ্রান্সের ভিতর ঢুকে পড়ে। ফরাসী গবর্নমেণ্ট জেনারেল **গামেলাঁকে অপসারিত** করে সর্বাধিনায়কের পদে প্রতিষ্ঠিত করেন **জেনারেল ওয়েগাঁকে।**

তারপর ফরাসী মন্ত্রিসভারও পতন হয়। মসিয়েঁ রেনোকে পদত্যাগ করতে হয়। নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন **মার্শাল পেতাঁ্যা**। ওয়েগাঁও জার্মান সেনাকে প্রতিরোধ করতে পারেন না। এদিকে ইতালি আবার জার্মেনীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে (১০ই জুন, ১৯৪০)। তখন পেতাঁ্যা **যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব** করে দূত পাঠান হিটলারের কাছে।

যে শর্তে হিটলার যুদ্ধ বন্ধ করতে রাজী হন, তা ফ্রান্সের পক্ষে অত্যন্ত অবমাননাকর। তা সত্ত্বেও পেতাঁ্যা সেই শর্তই গ্রহণ করে **সন্ধি** করেন। প্যারিসসহ ফ্রান্সের অধিকাংশই, বিজয়ী জার্মানদের সামরিক শাসনের পদানত থাকে। ভিচীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করে মার্শাল পেতাঁ্যা ফ্রান্সের বাকী অংশে, হিটলারের আজ্ঞাবহরূপে গবর্নমেণ্ট পরিচালনা করতে থাকেন।

তখন চার্চিল ইংরেজ নৌবহর প্রেরণ করেন—যেখানে যত ফরাসী জাহাজ আছে সব আটক করবার জন্যে—যাতে সেগুলি জার্মানদের কবলে পড়তে না পারে। ডাকার, আলেকজাণ্ড্রিয়া, ওরান প্রভৃতি বিভিন্ন বন্দর থেকে বহু ফরাসী রণতরী ও বাণিজ্যতরী, এইভাবে ইংরেজ বন্দরে আনীত হয়। কতক ফরাসী জাহাজ আবার ইংরেজ নৌবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করে বিধ্বস্তও হয়ে যায়।

এখন থেকে যুদ্ধ চলতে থাকে প্রধানতঃ দুই প্রকারের। এক—**জার্মেনী ও ইংলণ্ডের ভিতর বিমান-যুদ্ধ (ব্যাটল্ অব ব্রিটেন**—৮ই অগস্ট—৩১শে অক্টোবর, ১৯৪০)। দুই—ইংলণ্ড ও ইতালির ভিতর নৌযুদ্ধ। ঝাঁকে ঝাঁকে, হাজারে হাজারে জার্মান বোমারু-বিমান লণ্ডন ও ইংলণ্ডের অন্যান্য অংশে দিবারাত্রি বোমা নিক্ষেপ করতে থাকে। ব্রিটিশ জঙ্গী-বিমানের সাথে তাদের যুদ্ধ হতে থাকে প্রতিনিয়ত। ব্রিটিশ বোমারুরাও আক্রমণে ক্ষান্ত ছিল না। তারা কীল, মিউনিক, লিপজিগ, বার্লিন এবং ফ্রান্সের সীমানার ভিতর জার্মান অধিকৃত বিভিন্ন শহরে সুযোগ পেলেই হানা দিতে থাকে।

একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, জার্মান বিমানের আক্রমণে ভয়াবহ দুর্দশা হয়েছিল ইংলণ্ডের। নারী ও শিশুদিগকে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি সুদূর

দেশে পাঠানো হয়েছিল নিরাপত্তার খাতিরে। ইংলণ্ডের সর্বত্র রজনীতে নিষ্প্রদীপ, রাজপথে ট্রেঞ্চ ও অ্যাণ্ডারসন-আশ্রয়স্থানের ছড়াছড়ি। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় স্বাভাবিকভাবে অগ্রসর হওয়ার কোন উপায়ই ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও, একদিনের জন্যেও ইংরেজজাতির মনোবল ক্ষুণ্ণ হয় নি, জার্মেনীকে পরাজিত করবার জন্যে সর্বরকম ত্যাগ স্বীকারে তারা দৃঢ়সংকল্প হয়েই থাকে।

ইংরেজ নৌবাহিনীর ভূমধ্যসাগরীয় বহর, মাল্টাদ্বীপের পূর্বদিকে, এক

ফরাসী সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল দ্য'গল

ইতালিয় নৌবহরকে আক্রমণ করে পর্যুদস্ত করে। তোব্রুক বন্দরস্থিত ইতালিয় জাহাজগুলি ব্রিটিশ বিমান-বহরের আক্রমণে হয় বিধ্বস্ত।

এদিকে নতুন রণক্ষেত্র সৃষ্টি হয় আফ্রিকার দেশে দেশে। **ইতালিয়েরা** ব্রিটিশ-সোমালিল্যাণ্ড **আক্রমণ** করে। লিবিয়াতেও চলে ভীষণ যুদ্ধ।

ইতালিয়-বাহিনী মিশর-সীমান্ত অতিক্রম করে সোলম অধিকার করে বসে।

ফরাসী সৈন্যাধ্যক্ষ **জেনারেল দ্য'গল,** পেতাঁ্যা-গবর্নমেণ্টের যুদ্ধবিরতির আদেশ অগ্রাহ্য করেছিলেন। তিনি ইংলণ্ড-প্রবাসী ফরাসীদের নিয়ে ফরাসী জাতীয়-গবর্নমেণ্টের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন লণ্ডনে। সেখান থেকে ইংরেজের সহযোগিতায়, জার্মানদের বিরুদ্ধাচরণ করছিলেন তিনি। ডাকার বন্দরে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন তিনি পেতাঁ্যা-সরকার ও জার্মান-বাহিনীর নৌশক্তির সঙ্গে।

গ্রীসের যুদ্ধ চলতে চলতেই, জার্মান-বাহিনী ক্রীট দ্বীপ আক্রমণ করেছিল। ভয়াবহ যুদ্ধের পর ক্রীট ছেড়ে অপসৃত হতে হল ইংরেজ সৈন্যকে।

গ্রীসের যুদ্ধের মোড় ফিরে গেল ৬ই এপ্রিল তারিখে (১৯৪১ খ্রীঃ)—যখন জার্মেনীর বিজয়-বাহিনী প্রবেশ করল গ্রীসে। ৪৩,০০০ সৈন্য নিয়ে, ইংরেজ সেনাপতিরা গ্রীস ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

ইংলণ্ডের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ

ওদিকে **আফ্রিকাতেও** যুদ্ধ চলেছে নানাস্থানে। বেনগাজী থেকে অপসৃত হতে হল ইংরেজদের—যদিও ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস-আবাবাতে প্রবেশ করল তাদের সেনা।

২রা মে তারিখে, ইংরেজ সেনা বাসরা শহর অধিকার করল। ইংরেজাধিকৃত

আদ্দিস-আবাবায় ইথিওপিয়ার সিংহাসনচ্যুত ও নির্বাসিত সম্রাট্, **হাইলে সেলাসী** আবার প্রবেশ করলেন—ইংরেজ সেনার সহায়তায়। ইথিওপিয়াতে ইতালিয় সেনাপতি **ডিউক আওস্টা** ইংরেজদের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। গ্রীনল্যাণ্ডযাত্রী জার্মান-নৌবহর পথিমধ্যেই ইংরেজদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হল। বাগদাদ ও মুসল ইংরেজ সেনার করায়ত্ত হল। জাতীয় ফরাসী-বাহিনীর সহযোগিতায় ইংরেজরা সিরিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করল।

সপরিবারে ইংলণ্ডের রানী
উপবিষ্ট—প্রিন্স ফিলিপ, প্রিন্স এডওয়ার্ড, রানী এলিজাবেথ,
দণ্ডায়মান—প্রিন্সেস অ্যান, প্রিন্স অব ওয়েল্স্, প্রিন্স অ্যাণ্ড্রু

আফ্রিকার যুদ্ধ মৃদুমন্দ গতিতে অগ্রসর হতে লাগল। জার্মান সেনাপতি **রোমেল** মিশরে প্রবেশ করে ইংরেজদের পিছন থেকে আক্রমণ করলেন।

২৮শে নভেম্বর ইংলণ্ডের তরফ থেকে **ফিনল্যাণ্ড, হাঙ্গারী** ও **রুমানিয়াকে** চরমপত্র দেওয়া হল; কারণ তাদের নিরপেক্ষতা, পরোক্ষভাবে অক্ষশক্তিরই সহায়ক হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। তারা প্রকাশ্যে ইংরেজপক্ষে যোগদান করুক, এই ছিল চরমপত্রের উদ্দেশ্য। এই পত্রকে কোন গুরুত্বই দিল না ঐ তিনটি দেশ। ফলে, ৬ই ডিসেম্বর ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল ব্রিটেন।

৭ই ডিসেম্বর (১৯৪১ খ্রীঃ), **জাপান** যুদ্ধ ঘোষণা করল ইংলণ্ড ও মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। ৮ই তারিখে জাপানের বিরুদ্ধে পালটা যুদ্ধ ঘোষণা হল ইংলণ্ড থেকে।

এদিকে জাপানীরা স্থল ও জলপথে ইংরেজ-অধিকৃত চীনা বন্দর **হংকং আক্রমণ** করল। জাপানের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, দক্ষিণ-আফ্রিকা, কানাডা, মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র সবাই করল যুদ্ধ ঘোষণা। জাপানী বোমা-বর্ষণে ইংরেজদের "**প্রিন্স অব ওয়েলস**" এবং "**রিপাল্‌স্‌**" নামে দুটি জাহাজ জলমগ্ন হল।

হংকং থেকে ইংরেজরা অপসৃত হতে লাগল। **বর্মায়** তারা ভিক্টোরিয়া পয়েন্ট ত্যাগ করে গেল। **মালয়ের** উত্তর-পশ্চিম অংশেও তারা পশ্চাৎপদ
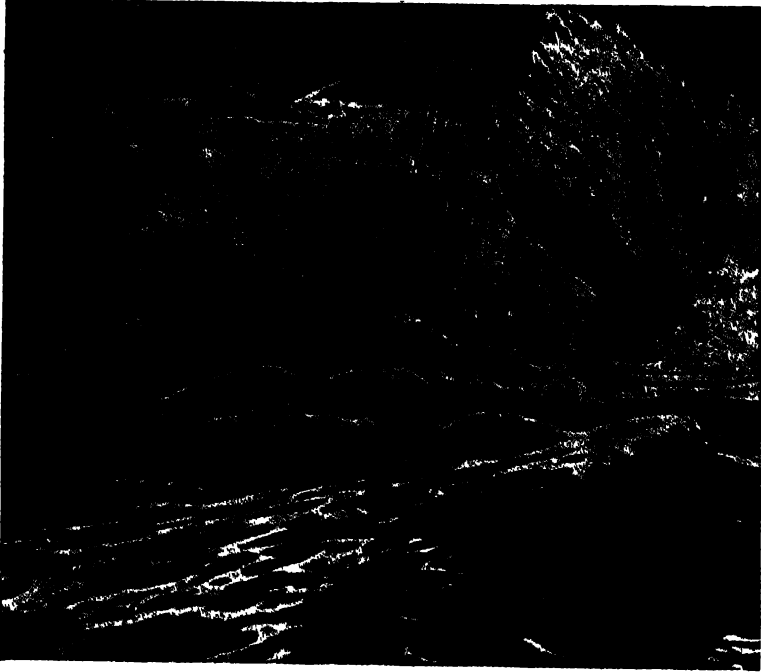
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে একখানি নিমজ্জমান রণতরী

হল। জাপানীরা উত্তর-বোর্নিওতে অবতরণ করল। ১৮ই ডিসেম্বর হংকং এবং ১৯শে পেনাংয়ে প্রবেশ করল জাপানীরা।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের সঙ্গে মন্ত্রণা করবার জন্যে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ওয়াশিংটনে উপস্থিত হলেন।

ওয়াশিংটন মন্ত্রণাসভায় সম্মিলিত হয়ে ছাব্বিশটি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা

ঘোষণা করলেন—তাঁরা একযোগে যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে এবং কেউই স্বতন্ত্রভাবে সন্ধি করবেন না ওদের সঙ্গে।

চার্চিল কানাডার রাজধানী অটোয়া পরিদর্শন করে ইংলণ্ডে ফিরে এলেন। বর্মার প্রধানমন্ত্রী জাপানীদের সঙ্গে গুপ্ত-ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন সন্দেহ করে তাঁকে বন্দী করা হল। ২৫শে জানুয়ারি (১৯৪২ খ্রীঃ) **থাইল্যাণ্ড** ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

এই সময় চীনের প্রেসিডেণ্ট **চিয়াং-কাইশেক** ভারত পরিভ্রমণে আগমন করেন।
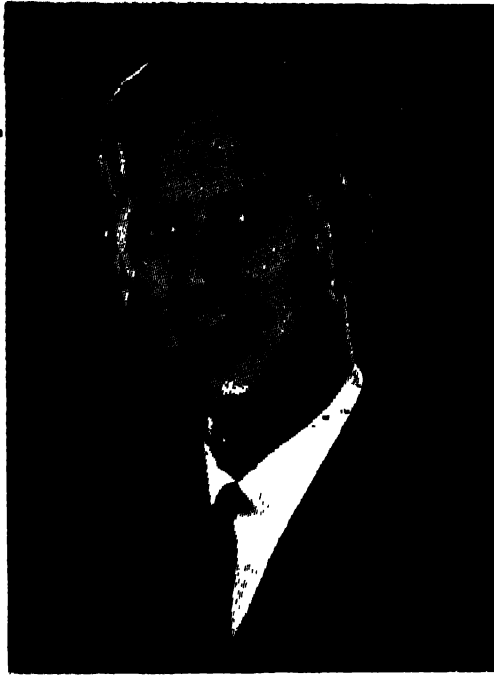
ডিউক অব এডিনবার্গ প্রিন্স ফিলিপ

১৫ই ফেব্রুয়ারি জাপানী আক্রমণে **সিঙ্গাপুরের পতন** হল। তারপর **বালি দ্বীপ** আক্রমণ করল জাপানীরা। ব্রহ্মদেশে ব্রিটিশ সেনা সীতাং নদীর পরপারে অপসৃত হল। জাপানীরা **জাভা দ্বীপে** অবতরণ করল।

৫ই মার্চ ব্রহ্মদেশের গভর্নর ভারতবর্ষে পলায়ন করলেন। **রেঙ্গুন** পরিত্যক্ত হল।

১২ই মার্চ ইংরেজ সেনা **আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ** থেকে অপসৃত হল।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানকল্পে, ইংলণ্ড থেকে **সার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসকে** (১৮৮৯—১৯৫২ খ্রীঃ) পাঠানো হল ভারতে। তিনি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃবর্গের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাতে লাগলেন ; কিন্তু পরিণামে তাঁর কোন প্রস্তাবই কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হল না।

ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন অংশে, জাপানী ও **আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর** অগ্রগতি অব্যাহত রইল। ইংরেজ সেনা ইরাবতী নদীর তীরে এসে নতুন ঘাঁটি নির্মাণ করল।

ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভবন

নাইট্‌সব্রিজে (লিবিয়াতে) জার্মান আক্রমণে, ব্রিটিশ সেনা নির্মূল হয়ে গেল। তোব্রুক আক্রমণে উদ্যত হল জার্মানরা। লিবিয়ার অধিকাংশ ইংরেজ সেনা মিশরে আশ্রয় গ্রহণ করল। দুই দল জার্মান সেনা তোব্রুক আক্রমণ ও অধিকার করল। **জেনারেল রিচিকে** অপসারিত করে সেখানে **জেনারেল অচিনলেককে** নিযুক্ত করা হল ইংরেজ সেনার অধিনায়ক-পদে।

এল-আলামিনে পালটা আক্রমণ আরম্ভ করল ইংরেজ সেনা। অষ্টমবাহিনী অনেকটা অগ্রসর হয়ে গেল এল-আলামিন লাইনে।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল মস্কো যাত্রা করলেন—রুশ প্রধানমন্ত্রী স্টালিনের সঙ্গে সামরিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে পরামর্শ করবার জন্যে।

সেপ্টেম্বরের প্রথমেই ইংরেজবাহিনী **ইথিওপিয়া ত্যাগ** করে গেল। **মাডাগাস্কার** দ্বীপে যুদ্ধ চলতে লাগল। সাময়িকভাবে ঐ দ্বীপটি মিত্রশক্তির সামরিক কর্তৃত্বের অধীনে রইল।

নভেম্বরের প্রথমে, অষ্টমবাহিনী মিশরে টেল-এল-আকিবের নিকটে ভীষণ ট্যাঙ্ক-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল। ঐ শহর অধিকার করে ইংরেজ সৈন্য দ্রুতগতি অগ্রসর

মিঃ চার্চিল

হয়ে গেল, জার্মান সেনা পশ্চাৎপদ হল। বারদিয়া, সোলম, তোব্রুক ও গাজালা শত্রুকবল থেকে উদ্ধার হল আবার। এদিকে ব্রিটিশ প্রথমবাহিনী তিউনিসিয়াতে প্রবেশ করল। ব্রহ্মদেশের মংদ-বুথিডং অঞ্চলে ইঙ্গ-ভারতীয় সেনা ঘাঁটি স্থাপন করল।

১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি, চার্চিল ও রুজভেল্টের সাক্ষাৎ হল ক্যাসাব্লাঙ্কাতে। জার্মানরা বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ না করলে যুদ্ধ বন্ধ করা হবে না, এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হল এই সম্মেলনে। তারপর আদানায় গিয়ে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট ইনোনুর সঙ্গেও মিলিত হলেন চার্চিল।

ক্রীট দ্বীপে অবতরণ করতে সমর্থ হল ইংরেজ সেনা ৪ঠা জুলাই। ৯ই তারিখে সিসিলিতে অবতরণ করল তারা। ১০ই অগস্ট চার্চিল কুইবেকে আগমন করলেন, মিত্রপক্ষীয় বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সাথে সম্মিলিত হবার জন্যে। ২রা সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনে চার্চিল-রুজভেল্টের আবার সাক্ষাৎ হল।

ইতালির রেগিওতে, ইংরেজ অষ্টমবাহিনী অবতরণ করল ৩রা সেপ্টেম্বর। ইতালি আত্মসমর্পণ করল ৮ই তারিখে। স্থালার্নো, টরণ্টো, ব্রিন্দিসি, ক্রটোন অধিকৃত হল। মাল্টাতে ইতালির নৌবাহিনী আত্মসমর্পণ করল। ইংরেজ, মার্কিন ও রুশ পররাষ্ট্র-সচিবদের এক বৈঠক হল মস্কোতে।

২২শে নভেম্বর চার্চিল, রুজভেল্ট ও চিয়াং-কাইশেক এক সম্মেলনে একত্র হলেন কাইরো নগরে। আবার ২৮শে তারিখে তেহারানে, চার্চিল-রুজভেল্ট মিলিত হলেন স্টালিনের সঙ্গে। কাইরোতে আবার ইনোনুর সঙ্গেও সাক্ষাৎ হল চার্চিল-রুজভেল্টের।
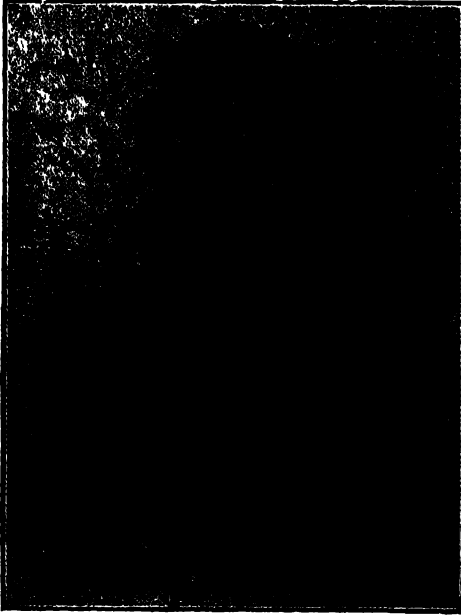
প্রথম জেমস

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ইতালির ক্যাসিনো শহরে পঞ্চম ইংরেজবাহিনী আক্রমণ চালাল। রোম নগরী থেকেও জার্মানগণকে বিতাড়িত করল ইংরেজ ও মার্কিন সেনা।

১৯৪৫-এর মার্চ মাসের সূচনাতেই, সম্মিলিত ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীসমূহ, ফ্রান্সের উপকূলে অবতরণ করতে আরম্ভ করল। তাদের সঙ্গে যোগ দিল জেনারেল দ্য'গল-পরিচালিত জাতীয়তাবাদী ফরাসী সেনাদল। জার্মানরা তখন পূর্ব-সীমান্তে রুশ-আক্রমণ নিয়েই ভীষণ ব্যতিব্যস্ত, তারা আর কোনক্রমেই পশ্চিম-দিকের এই রণাঙ্গনে বিশেষ শক্তি নিয়োগ করতে সমর্থ হল না। সমগ্র ফ্রান্স ক্রমশঃ ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসী সেনার বশীভূত হল। ভিচী-গবর্নমেণ্ট বাতিল করে দিয়ে, জেনারেল দ্য'গল স্বাধীন ফ্রান্সের নতুন গবর্নমেণ্ট

গঠন করলেন। এই গবর্নমেণ্ট অচিরেই ইংলণ্ড, মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতির স্বীকৃতি লাভ করল।

ফ্রান্সের সীমা পার হয়ে, মিত্রশক্তির বিভিন্ন বাহিনী একে একে রাইন নদী পার হয়ে প্রবেশ করল খাস জার্মান ভূখণ্ডে। তখনও হিটলার রুশ-আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যতিব্যস্ত। জেনারেল **মণ্টগোমারী** দ্রুতবেগে জার্মেনীর অভ্যন্তরে অগ্রসর হয়ে গেলেন। ৩রা মে, জার্মান সেনাপতি **ভন ফ্রিডবার্গ** এসে সাক্ষাৎ করলেন তাঁর সঙ্গে, হামবুর্গের নিকটবর্তী লুনে-বার্গ-হীদে। এখানে তিনি বার্লিনের পশ্চিমদিকস্থিত দশ লক্ষ **জার্মান সেনার** বিনাশর্তে **আত্মসমর্পণ** চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন ৪ঠা মে, ১৯৪৫ তারিখে। তারপর **৮ই মে** বার্লিনে স্বাক্ষরিত হল সমগ্র জার্মান-রাষ্ট্রের আত্মসমর্পণের চুক্তি।

১৭ই জুলাই **পট্‌সডামে** ইংলণ্ড, রাশিয়া ও মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের ভিতর এক সম্মেলন হল—জার্মেনীর ভবিষ্যৎ শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্যে। ২৫শে জুলাই পর্যন্ত এই সম্মেলনে ইংলণ্ডের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন চার্চিল। তারপর সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হল। শ্রমিকনেতা ক্লিমেণ্ট অ্যাটলী হলেন ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী। ২৫শে জুলাইয়ের পর পট্‌সডাম-সম্মেলনে তিনিই ইংলণ্ডের প্রতিনিধিত্ব করতে লাগলেন।

মিঃ অ্যাটলী

অতঃপর ২রা সেপ্টেম্বর, **জাপান** বিনাশর্তে **আত্মসমর্পণ** করায় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হল।

অ্যাটলীর নেতৃত্বে শ্রমিক গবর্নমেণ্ট, ইংলণ্ডের শাসনভার গ্রহণ করবার পরে, ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলকে স্বাধীনতা প্রদান করেন। হিন্দু ও মুসলমান নেতৃগণের বিরোধ-মীমাংসা করবার জন্যে তাঁরা ভারতকে করেন **দ্বিখণ্ডিত**। উত্তর-পশ্চিমে কিছু
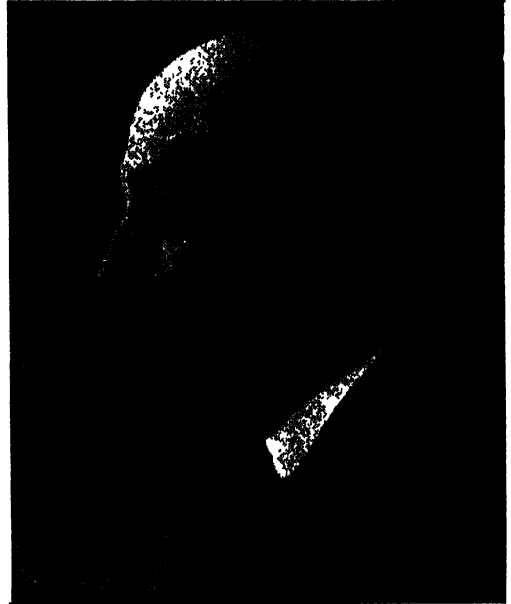
এবং পূর্ব-সীমান্তে কিছু ভূখণ্ড, মূল ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে নাম দেওয়া হয় **পাকিস্তান**। এইটি এখন মুসলিম রাষ্ট্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতের অবশিষ্ট অংশ **ভারত** বা **ইণ্ডিয়া** নামেই পরিচিত রয়েছে।

ভারত, পাকিস্তান ও সিংহল এখনও ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ভারতবর্ষে এক সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রী গবর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ব্রহ্মদেশ স্বাধীনতা পেয়েই ব্রিটিশ কমনওয়েলথের বাইরে চলে গিয়েছে। ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের আয়তন ১,১১,৩৩,৮৩৮ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৭৩,৮৪,৪৬,৯৬৩।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইংলণ্ডের বৈদেশিক ব্যাপারে মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশই প্রধানতঃ মেনে নিতে হচ্ছে। অবশ্য ইন্দোচীন যুদ্ধবিরতি, কম্যুনিস্ট চীনের স্বীকৃতি প্রভৃতি ব্যাপারে আমেরিকার সঙ্গে ইংলণ্ডের মতবিরোধ হয়েছে। ইংলণ্ড কয়েকটি রাষ্ট্রকে স্বাধীনতা দিয়েছে, এবং ক্রমশঃ বিভিন্ন রাষ্ট্রকে স্বাধীনতা দিয়ে চলেছে।

মিঃ হ্যারল্ড ম্যাকমিলান

ভারতের সঙ্গে ইংলণ্ডের সম্পর্ক এখন মোটের উপর বন্ধুত্বপূর্ণ।

সাম্প্রতিক ইংলণ্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, ইংরেজ সৈন্যের সুয়েজ খাল অঞ্চল আক্রমণ। মিশরের রাষ্ট্রপতি নাসের চুক্তিভঙ্গ করে সুয়েজ খাল রাষ্ট্রীয় করণ করাতে ইংরেজরা ক্ষেপে উঠে সুয়েজ খালের অধিকার বজায় রাখতে যায়। কিন্তু সারা জগৎবাসীর সমবেত প্রতিবাদে তারা যুদ্ধ বন্ধ করে সুয়েজ খাল পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে, সার অ্যাণ্টনী ইডেন প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন (জানুয়ারি, ১৯৫৭ খ্রীঃ)। তাঁর স্থানে প্রধানমন্ত্রী হন মিঃ হ্যারল্ড ম্যাকমিলান।

তারপর প্রধানমন্ত্রী হন সার আলেকজাণ্ডার ডগলাস হোম। বর্তমানে মিঃ হ্যারল্ড উইলসন প্রধানমন্ত্রী।

ইংলণ্ডের আয়তন ৫০,৩৩১ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৪,৩৪,৬০,৫২৫ (১৯৬১ খ্রীঃ)। ইংলণ্ড, ওয়েলস, স্কটল্যাণ্ড, আইল অব ম্যান ও চ্যানেল দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে

ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ হ্যারল্ড উইলসন

গ্রেট ব্রিটেন। গ্রেট ব্রিটেনের আয়তন ২,৩০,৬০৯ বর্গ কিলোমিটার (৮৯,০৩৮ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা ৫,৩৫,৭৭,৪০০ (১৯৬৭ খ্রীঃ)। গ্রেট ব্রিটেন, উত্তর আয়ার্লণ্ড এবং কতকগুলি আশ্রিত রাজ্য নিয়ে যুক্তরাজ্য। গ্রেট ব্রিটেন ও উত্তর আয়ার্লণ্ডের অধিবাসীরা খ্রীস্টধর্মাবলম্বী। ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন।

ইংলণ্ডের উত্তরে **স্কটল্যাণ্ড** দেশ অবস্থিত। ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড গ্রেট ব্রিটেন নামক **একই দ্বীপের দুটি অংশ**। আজকাল এই দুটি দেশ একেবারে এক হয়ে মিলে গেছে বটে, কিন্তু এদের মধ্যে অতীতে শত্রুতা চলেছিল অনেকদিন ধরে।

রোমানরা যখন ইংলণ্ডে আগমন করে, তখন সেখানে ব্রিটন নামে যে জাতির লোক বাস করত, স্কটল্যাণ্ডেও সেই জাতিরই জ্ঞাতি **কেল্ট, পিক্ট ও স্কটরা** বাস করত। একই দ্বীপের দুই অংশে, দুইটি দেশে প্রায় একই জাতির লোক বসবাস করলে কি হবে, তাদের মধ্যে ছিল ভীষণ শত্রুতা।

স্কটল্যাণ্ড পাহাড়ে দেশ বলে সেখানকার লোকদের আক্রমণ করে কাবু করাও কঠিন ছিল। রোমানরা এসে ইংলণ্ড জয় করেছিল বটে, কিন্তু স্কটল্যাণ্ডকে তারা কখনও আক্রমণ করে নি। পিক্ট ও স্কটরা যাতে উত্তরদিক থেকে ব্রিটেন আক্রমণ করতে না পারে, সেজন্যে রোমানরা ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের সীমান্ত-বরাবর অনেক বড় বড় প্রাচীর নির্মাণ করেছিল।

রোমানদের পর স্যাক্সনরা এসে ইংলণ্ড দখল করেছিল, কিন্তু তারাও স্কটল্যাণ্ডের দিকে কোন অভিযান করে নি। স্যাক্সন জাতির কতক লোক

স্কটল্যাণ্ডের দক্ষিণদিকের সমতল ভূমিতে বসবাস আরম্ভ করেছিল, কিন্তু সে-দেশ আক্রমণ করে জয় করবার চেষ্টা করে নি। ধীরে ধীরে তারা সবাই স্কটদের সঙ্গে এক হয়ে গেল। **এডিনবরা** নামক শহরে স্কটল্যাণ্ডের রাজধানী স্থাপিত হল। রাজায় রাজায় ঝগড়া না করে তারা সকলে মিলে একজন রাজার প্রভুত্ব স্বীকার করে নিয়ে সুখে-শান্তিতে বাস করতে লাগল।

এমনি ভাবে অনেক বছর কেটে গেল। স্কটল্যাণ্ড জয় করে তাকে নিজেদের অধীনে নিয়ে আসবার ইচ্ছা ইংলণ্ডের অনেক রাজারই মনে মনে ছিল, কিন্তু স্কটল্যাণ্ড পাহাড়ে দেশ বলে তাকে আক্রমণ করবার সুবিধা তাঁদের হয় নি। স্যাক্সন-যুগে, ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের সীমান্ত-স্থান নিয়ে পরস্পর দুই জাতির লোকের মধ্যে অনেক সময় ঝগড়া-বিবাদ হয়েছে, আবার কখনও কখনও ইংলণ্ডের রাজার সঙ্গে স্কটল্যাণ্ডের রাজার সন্ধি দ্বারা মৈত্রীও স্থাপিত হয়েছে।

উইলিয়ম ওয়ালেস

স্কটল্যাণ্ডের স্বাধীনতা-সংগ্রাম

১২৮৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজা প্রথম **এডওয়ার্ড** দুর্জয় লোভ নিয়ে স্কটল্যাণ্ড আক্রমণ করে বসলেন। এডওয়ার্ডের উচ্চাভিলাষ ছিল—সমস্ত ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েলসকে তাঁর রাজদণ্ডের অধীনে আনা। ইতিমধ্যে তিনি অন্যায়ভাবে ওয়েলস দেশটি হস্তগত করে-ছিলেন। এরপর তিনি, স্কটল্যাণ্ডের সিংহাসন নিয়ে নিজেদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ দেখে, সেই দেশে হস্তক্ষেপ করলেন। শীঘ্রই ইংরেজ সৈন্যরা স্কটল্যাণ্ড দেশটির উপরে ছড়িয়ে পড়ল।

এ পর্যন্ত স্কটদের নিজেদের মধ্যে বিশেষ একতা ছিল না, বিভিন্ন দলের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ লেগেই ছিল। কিন্তু যখন সারা স্কটল্যাণ্ড **ইংলণ্ড দ্বারা আক্রান্ত** হল, তখন দেশের সমস্ত লোক পরস্পরের শত্রুতা

ভুলে গিয়ে এক হয়ে গেল। তাদের মধ্যে এক নতুন প্রেরণা ও উদ্দীপনা দেখা দিল। **উইলিয়ম ওয়ালেস** (১২৭০—১৩০৫ খ্রীঃ) নামক এক স্বদেশপ্রেমিক বীর স্কটদের স্বাধীনতা-যুদ্ধের নেতা হলেন। তিনি ১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দে **'স্টার্লিং ব্রিজের' যুদ্ধে** অপূর্ব নৈপুণ্য দেখিয়ে, ইংরেজদের হারিয়ে দিলেন। রাজপুতবীর রানা প্রতাপের মত, পাহাড়ে, গুহায় লুকিয়ে থেকে, ওয়ালেস অনেকদিন পর্যন্ত
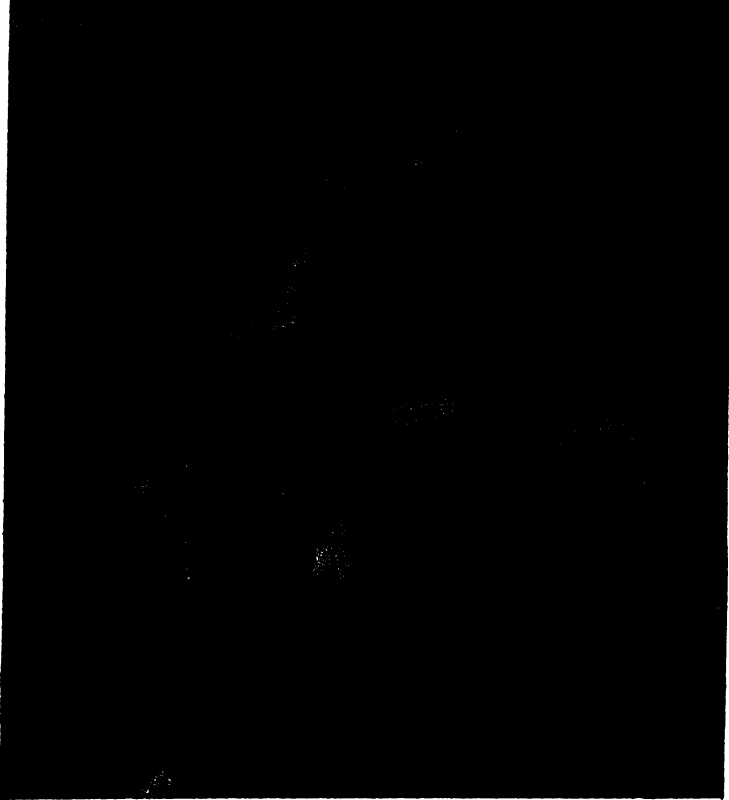
রবার্ট ব্রুস

ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করে গিয়েছিলেন; কিন্তু এক বিশ্বাসঘাতকের চক্রান্তের ফলে, ওয়ালেস শীঘ্রই ইংরেজদের হাতে ধরা পড়লেন ও নিষ্ঠুরভাবে নিহত হলেন।

ওয়ালেসের পরও স্কটজাতি দমল না, তারা নানা বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে স্বাধীনতার যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগল। এর পরের স্কটবীরদের মধ্যে **রবার্ট ব্রুসের** (১২৭৪—১৩২৯ খ্রীঃ) নাম ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। তিনি প্রায় সমস্ত জীবন ধরে আক্রমণকারী ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। অবশেষে

এই দীর্ঘ যুদ্ধে ইংরেজরা হেরে যায়; তারা স্কটল্যাণ্ডের স্বাধীনতা হরণ করতে পারল না। ১৩১৪ খ্রীষ্টাব্দে **ব্যানকবানের যুদ্ধে,** ইংরেজদের স্কটদের কাছে খুব বড় পরাজয় হয়েছিল।

এই স্বাধীনতা-যুদ্ধের ফলে, স্কটল্যাণ্ড **আরও বেশী একতাবদ্ধ** ও শক্তিশালী হয়। রবার্ট ব্রুস হলেন নতুন সম্মিলিত **স্কটল্যাণ্ডের প্রথম স্বাধীন রাজা।** স্কটরা এর পর প্রায় তিনশ বছর পর্যন্ত, ইংরেজদের এই ব্যবহার ভুলতে না পেরে, যখনই সুবিধা পেয়েছে তখনই ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ফরাসী বা অন্যান্য দেশকে সাহায্য করেছে।

ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের মিলন

ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের পরস্পর ঝগড়ার মধ্যেও, 'তাদের দুই রাজবংশের ছেলেমেয়েদের বিয়েতে কোন বাধা হয় নি। শত্রুতা সত্ত্বেও, দুই দেশের রাজবংশের মধ্যে অনেক আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত এই সব আত্মীয়তার মধ্য দিয়েই ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড এক হয়ে মিলে গেল।

রানী মেরী স্টুয়ার্ট

টিউডর-বংশের শেষ রানী, **রানী এলিজাবেথের মৃত্যুর পরে,** ইংলণ্ডের লোকেরা ঠিক করল যে, তারা এলিজাবেথের প্রতিদ্বন্দ্বিনী ও তাঁর সম্পর্কে বোন, স্কটল্যাণ্ডের সুন্দরী **রানী মেরী স্টুয়ার্টের** ছেলে, **ষষ্ঠ জেমসকেই** সিংহাসনে বসাবে। ষষ্ঠ জেমস তখন স্কটল্যাণ্ডের রাজা। ষষ্ঠ জেমস ইংলণ্ডে এসে **"প্রথম জেমস"** নাম নিলেন। তাঁর থেকেই ইংলণ্ডের

স্টুয়ার্ট রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হল (১৬০৩ খ্রীঃ)। প্রথম জেমসের রাজত্বকাল হতে ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড দুই দেশই ইংলণ্ডের রাজার অধীনে এল—তবে স্কটল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা তখনও বজায় রইল। প্রথম চার্লসের রাজত্ব-কালে স্কটল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডের মধ্যে কয়েকবার যুদ্ধ হয়েছিল।

প্রথম জেমসের সময় হতে দুটো দেশ এক রাজার অধীনে মিলিত হল বটে, কিন্তু তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, পার্লামেণ্ট প্রভৃতি সবই আলাদা রয়ে গেল। স্কটল্যাণ্ডের তৈরী জিনিসপত্র সেখানকার বণিকেরা অবাধে ইংলণ্ডে এনে বিক্রি করতে পারত না। ইংলণ্ডের কল-কারখানা দিন দিন বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার ধন-সম্পদ বাড়ছিল, অথচ স্কটরা তার থেকে কোন ভাগ পাচ্ছিল না। ইংলণ্ডের অধীনে যে-সব উপনিবেশ ছিল, সেখানে নিজ দেশে তৈরী শিল্পদ্রব্য বিক্রি করবার যে সুযোগ ইংলণ্ড পেত, স্কটল্যাণ্ড তা পেত না। এই নিয়ে দুই দেশে আবার **মন-কষাকষি** আরম্ভ হয়ে গেল।

অবশেষে ইংলণ্ডের **রানী অ্যানের সময়** ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের প্রতিনিধিরা **একসঙ্গে বসে** ঠিক করে দিলেন যে, ঐ দুই দেশ তখন যে-ভাবে এক রাজার অধীনে দুটো আলাদা দেশ ছিল, সে রকম আর থাকবে না। দুটি দেশই মিলিত হয়ে, একটি মাত্র দেশরূপে পরিচিত হবে এবং তার নতুন নাম হবে, **গ্রেট ব্রিটেন**। ইংলণ্ডের ও স্কটল্যাণ্ডের দুটো আলাদা পার্লামেণ্ট আর থাকবে না। স্কটল্যাণ্ডের পার্লামেণ্ট উঠে যাবে, স্কটরা ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে তাদের প্রতিনিধি পাঠাবে এবং সেই পার্লামেণ্টেরই প্রভুত্ব স্বীকার করবে। স্কটল্যাণ্ডের পার্লামেণ্ট তুলে দেবার জন্যে প্রতিদানে, স্কটরা ইংলণ্ডে এবং ইংলণ্ডের অধীন উপনিবেশগুলিতে **অবাধে ব্যবসা-বাণিজ্য** করতে পারবে।

এই বন্দোবস্তে দুই দেশেরই লাভ হল। ইংলণ্ডের রাজনৈতিক ক্ষমতা বাড়ল আর স্কটল্যাণ্ড পেল আর্থিক সুবিধা। আজ পর্যন্ত এই সন্ধির কোন ব্যতিক্রম হয় নি। এর পর থেকে ইংরেজ ও স্কটরা অনেকটা একজাতির মতই রয়ে গেল। বিংশ শতাব্দীর দুই বিশ্বযুদ্ধে স্কটরা ইংরেজদের পাশে দাঁড়িয়ে সমানভাবেই শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লড়েছে। আজকাল স্কটদের পৃথিবীর নানাস্থানে অনেক বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আছে।

স্কটল্যাণ্ডের আয়তন ৩০,৪১১ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৫১,৯০,৮০০ (১৯৬৬ খ্রীঃ)।

আয়র্লণ্ড

ব্রিটনরা যখন ব্রিটেন দেশটি অধিকার করে তখন কেল্টদের অধিকাংশ ব্রিটেন থেকে আয়র্লণ্ডে পালিয়ে যায়। সেই সময় থেকেই কেল্টরা আয়র্লণ্ডে বসবাস করতে থাকে।

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে, আয়র্লণ্ড সংস্কৃতি ও সভ্যতায় পশ্চিম-ইওরোপের একটি কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। খ্রীস্টানধর্ম অতি প্রাচীনকালে আয়র্লণ্ডে প্রবেশ করে। সেখানে খ্রীস্টানদের অনেক মঠ তৈরী হয়। এই মঠগুলি বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র ছিল। খ্রীস্টধর্মের এক অংশ আয়র্লণ্ডের কেল্ট-প্রচারকদের দ্বারাই, স্কটল্যাণ্ড হতে উত্তর-ইংলণ্ডে বিস্তৃত হয়। বর্তমান আইরিশগণ, ষষ্ঠ শতাব্দীর পর দুই-তিন শত বৎসরকালকে আয়র্লণ্ডের স্বর্ণযুগ বলে মনে করে। এ-যুগকে বলে **গ্যেলিক সংস্কৃতির** যুগ।

বহুদিন পর্যন্ত আয়র্লণ্ডবাসীরা বিভিন্ন দল ও জাতিতে বিভক্ত ছিল। তাদের মধ্যে কোন একতা ছিল না। মধ্যযুগে দিনেমার ও নর্মান জাতির লোকেরা এসে, আইরিশদের উপর অত্যাচার করে ও অনেক স্থান দখল করে।

'আয়র্লণ্ডের দক্ষিণ দিকে খানিকটা জায়গা, ইংলণ্ডের রাজা **দ্বিতীয় হেনরী** জয় করেন এবং তার নাম দেন 'দি পেল'। অনেক ইংরেজ সেখানে গিয়ে বাস করতে আরম্ভ করে। ক্রমে এই ইংরেজ ও আরও অনেক আগমনকারী স্কটদের

সঙ্গে, আইরিশদের তীব্র বিরোধ হতে শুরু করল। আইরিশগণ যখনই সুবিধা পেত, বিদেশীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করত। তারা অনেক সময় ইংলণ্ডের শত্রু ফ্রান্স ও স্পেনের সঙ্গে মিলিত হত।

ষোড়শ শতাব্দীতে, রানী এলিজাবেথের সময় ইংলণ্ড, বিদ্রোহী আইরিশদের জব্দ করবার জন্যে, অনেক ইংরেজ ভূস্বামীকে আয়র্লণ্ডে প্রতিষ্ঠিত করল। তাঁরা গিয়ে আইরিশদের জমি বাজেয়াপ্ত করলেন। আয়র্লণ্ড তখন প্রকৃতপক্ষে একটি কৃষিজীবী জাতির দেশে পরিণত হল। ভূস্বামীরা হলেন সব বিদেশী।

আইরিশ বিপ্লবীদের আক্রমণ

রাজা **প্রথম জেমসের** আমলে, আয়র্লণ্ডের উত্তর দিকে **আলস্টার** নামক জায়গাটিতে, ইংলণ্ড এবং স্কটল্যাণ্ড থেকে লোক পাঠিয়ে সেখানে একটি বসতি স্থাপন করবার চেষ্টা হয়। এই ব্যাপারটিতে আয়র্লণ্ড, ইংলণ্ডের উপর আরও বেশী অসন্তুষ্ট হল। উত্তর-আয়র্লণ্ডে এই নিয়ে একটা বিদ্রোহ ঘটে গেল, কিন্তু আইরিশ বিদ্রোহীরা ইংরেজ গবর্নমেণ্টের কাছে পরাজিত হল। যে-সব প্রজা বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল, তাদের জমি

জমা সমস্ত ইংরেজ গভর্নমেণ্ট, বাজেয়াপ্ত করে সেগুলো ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের যে-সব লোক আলস্টারে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন।

আলস্টারে যারা এসে বসতি স্থাপন করল, তারা খ্রীস্টান হলেও তাদের ধর্ম ছিল প্রোটেস্টাণ্ট। আয়র্লণ্ডের লোকেরাও খ্রীস্টান ছিল, কিন্তু তারা ছিল রোমান ক্যাথলিক। আয়র্লণ্ডের ক্যাথলিকরা, তাদের দেশে ইংরেজ এবং স্কটদের আগমনে এমনিতেই সন্তুষ্ট হয় নি, তার উপর আবার তারা প্রোটেস্টাণ্ট হওয়াতে আইরিশরা আরও বেশী অসন্তুষ্ট হল।

কর দিতে অসম্মত গৃহস্বামীর ভিটা-মাটি উচ্ছেদ করা হচ্ছে

আলস্টারের বিদ্রোহ দমনের পরও আয়র্লণ্ডের লোকেরা কিন্তু স্বাধীনতা লাভের আশা ছাড়ে নি। তারা আবার বিদ্রোহ করবার সুযোগ খুঁজছিল। ইংলণ্ডের রাজা **প্রথম চার্লসের** সঙ্গে ক্রমওয়েলের দলের যুদ্ধ যখন আরম্ভ হল, আইরিশরা দেখল বিদ্রোহ করবার এই সুযোগ। ক্রমে বিদ্রোহীরা আয়র্লণ্ডের সর্বত্র প্রভুত্ব স্থাপন করল, শুধু ডাবলিন শহর থেকে ইংরেজদের হটাতে

পারল না। **ডাবলিন** এখন আয়র্লণ্ডের রাজধানী। ইংরেজরা সেখানকার যে-জায়গাটা দখল করেছিল, তখনও সেটা তার রাজধানী ছিল।

তারপর রাজা প্রথম চার্লসের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ করে **ক্রমওয়েল** যখন দেশের শাসনভার গ্রহণ করলেন, তখন তিনি আয়র্লণ্ডের এই বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করবার জন্যে রওনা হলেন। ক্রমওয়েল সেখানে এমন **অত্যাচার** করেছিলেন যে, আইরিশরা সে-কথা আজও ভুলতে পারে

পুলিস আইরিশ গৃহে অস্ত্রের জন্যে খানাতল্লাশি করছে

নি—এবং সেই অত্যাচারের পর, প্রায় সত্তর বছর আর মাথা তুলে স্বাধীনতার দাবি জানাতে সাহস পায় নি। ক্রমওয়েল সেখানকার বহু জমি বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে, ইংরেজ সেনাপতিদের সেগুলো বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

ক্রমওয়েল জয়লাভ করলেন বটে, আয়র্লণ্ডের সমস্ত লোক তাঁর ভয়ে কাবু হয়ে গেল এটাও সত্যি, কিন্তু মনে মনে তারা ইংলণ্ডের উপর ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়ে রইল। দেশ স্বাধীন করবার জন্যে আবার তারা সুযোগের সন্ধান করতে লাগল।

সুযোগ মিলল প্রায় সত্তর বছর পরে। **দ্বিতীয় জেমস** তখন ইংলণ্ডের রাজা। ইংরেজরা যখন তাঁকে ইংলণ্ডের সিংহাসন থেকে তাড়িয়ে দিল, তখন তিনি এলেন আয়র্লণ্ডে। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্যে তিনি আইরিশদের সাহায্য চাইলেন। আলস্টার ছাড়া সমগ্র আয়র্লণ্ড তাঁর ডাকে সাড়া দিল। জেমস ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। এই যুদ্ধে তিনি পরাজিত হলেন। এবারও ইংলণ্ড আয়র্লণ্ডের এই বিদ্রোহের জন্যে, তার উপর এমন অত্যাচার করল যে, এর পর অনেকদিন আয়র্লণ্ড আর মাথা খাড়া করতে পারে নি।

আয়র্লণ্ড ও ইংলণ্ডের মিলনের আইন

আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের সম্পর্কে, যখন ফ্রান্সের সঙ্গে ইংলণ্ডের শত্রুতা বেড়ে উঠতে আরম্ভ করল, এই দুটি দেশের মধ্যে যখন কথায় কথায় যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল, আয়র্লণ্ড তখন সেই সুযোগে আবার একবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্র ক্রমে স্বাধীন হয়ে গেল। আয়র্লণ্ডও আমেরিকানদের মত স্বাধীন হয়ে যেতে পারে এই ভেবে, ইংরেজ-কর্তৃপক্ষ আয়র্লণ্ডকে একটি **স্বতন্ত্র পার্লামেণ্ট** গঠন করার অধিকার দিলে। এর দ্বারা, আয়র্লণ্ড আপাতদৃষ্টিতে স্বাধীন হল; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আইরিশ পার্লামেণ্ট হল, তার পূর্বেকার আইনসভাগুলির ন্যায়ই বৈদেশিক জমিদারদের অধিকৃত শুধু প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মাবলম্বীদের পার্লামেণ্ট। আইরিশরা আগেকার মতই উৎপীড়িত হতে লাগল।

ইংলণ্ডের অবিচার ও ফরাসী বিপ্লবীদের সাম্যবাদ-বাণীর ছোঁয়াচ লেগে কিছুদিনের জন্যে আয়র্লণ্ডের ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টাণ্টদের মধ্যে একটু মিলনের ভাব এল। এরা **"যুক্ত আয়র্লণ্ডবাসী"** নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলল; কিন্তু সরকার এ-প্রতিষ্ঠানকে মানল না। ফলে, আয়র্লণ্ডে ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে, একটা জোর **বিদ্রোহ** দেখা দিল। ইংলণ্ড বিদ্রোহীদের উপর কঠোর অত্যাচার করে শীঘ্রই তাদের আন্দোলনকে ভেঙে দিল। তখনকার ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী **ছোট পিট** মনে করলেন যে, আয়র্লণ্ডের স্বতন্ত্র পার্লামেণ্ট তুলে দিয়ে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে আইরিশ প্রতিনিধিদের আসতে দেওয়া উচিত।

এতদিন পরে ইংরেজরা বুঝতে আরম্ভ করল যে, জোর করে আয়র্লণ্ডকে দাবিয়ে রাখা যাবে না। পিট একটি আইনের খসড়া তৈরি করলেন এবং আইরিশ পার্লামেণ্টকে দিয়ে সেটা পাস করিয়ে নিলেন। এই আইনটিকে বলে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের **"অ্যাক্ট অব ইউনিয়ন"**। এই আইনে ঠিক হল যে আয়র্লণ্ডের আলাদা কোন পার্লামেণ্ট থাকবে না, ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টই হবে

তাদেরও পার্লামেণ্ট। লর্ড-সভায় তাদের আটাশ জন প্রতিনিধি থাকবেন, আর কমন্স-সভায় থাকবেন একশ' জন। ইংলণ্ডের রাজার প্রতিনিধিরূপে এক জন বড়লাট আয়র্লণ্ড শাসন করবেন।

এই আইনে আয়র্লণ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ কোন সুবিধা হল না, তা ছাড়া দুটো দেশের ধর্ম যে আলাদা একথা আগেই বলা হয়েছে। এই সব কারণে বাইরের মিলন সত্ত্বেও, আইরিশদের মনে মনে ইংরেজদের উপর একটা অসন্তোষের ভাব রয়েই গেল। **ডানিয়েল ও'কনেল** (১৭৭৫—১৮৪৭ খ্রীঃ) নামক একজন আইরিশ নেতা, পিটের তৈরী আইনটিকে বাতিল করবার চেষ্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু তাতে বিশেষ কোন সাড়া তিনি পান নি।

চার্লস স্টুয়ার্ট পার্নেল

ধীরে ধীরে দেশে আবার **স্বাধীনতা-আন্দোলন** আরম্ভ হল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আইরিশগণ নানা বিপর্যয়ের মধ্যে প্রাণপণ করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। কখনও তারা হতোদ্যম হয় নি। এবার আন্দোলন অন্য পথে চলল। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে **"আইরিশ স্বায়ত্ত-শাসন সংঘ"** নামক একটি দল গঠিত হল। স্বায়ত্ত-শাসন মানে হচ্ছে নিজেদের দেশ নিজেরা শাসন করবার অধিকার। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে এই দলের লোকেরা যাতে বেশী করে যেতে পারে, সেজন্যে স্বায়ত্ত-শাসন সংঘ জোর চেষ্টা শুরু করল। ক্রমে ক্রমে এদের চেষ্টায় পার্লামেণ্টের মধ্যেই "আইরিশ জাতীয় দল" নামে একটি দল গঠন করা সম্ভব হল। **চার্লস স্টুয়ার্ট পার্নেল** (১৮৪৬—১৮৯১ খ্রীঃ) হলেন এই দলের নেতা।

ইংলণ্ডের বিখ্যাত প্রধানমন্ত্রী **গ্ল্যাডস্টোন** আয়র্লণ্ডের সমস্যা সমাধানে নিজেকে নিবিড়ভাবে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁর প্রথম মন্ত্রিত্বকালে, তিনি আইরিশ কৃষকদের আর্থিক দুর্দশা দূর করবার জন্যে কয়েকটি আইন পাস করেছিলেন, কিন্তু এ-সবে আইরিশগণ মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারল না। পার্নেলের নেতৃত্বে, একদল আয়র্লণ্ডবাসী তখন **"হোমরুল"** বা স্বায়ত্ত-শাসন দাবি করতে

লাগল। গ্ল্যাডস্টোন দেখলেন যে, আইরিশদের খানিকটা স্বায়ত্ত-শাসন অধিকার মঞ্জুর করা একান্ত পক্ষে দরকার। তা না হলে আবার যে-কোন সময় বিদ্রোহ ঘটতে পারে। গ্ল্যাডস্টোন দুবার এই হোমরুলের জন্যে বিশেষভাবে চেষ্টা করলেন, কিন্তু দুবারই বিপুল বাধার দরুন তাঁর চেষ্টা সফল হল না। অবশেষে **হেনরী অ্যাসকুইথের** (১৮৫২—১৯২৮ খ্রীঃ) প্রধানমন্ত্রিত্বের সময় তৃতীয়বারের চেষ্টায়, ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে **আইরিশ স্বায়ত্ত-শাসন আইন** পাস হল।

এই আইন অনুসারে আয়র্লণ্ডের ডাবলিন শহরে আবার আইরিশ পার্লামেণ্ট স্থাপিত হল। ঠিক হল যে, এই পার্লামেণ্টই আয়র্লণ্ডের জন্যে আইন পাস করবে। আয়র্লণ্ড শাসন করবার জন্যে এই পার্লামেণ্টেরই সদস্যদের মধ্যে থেকে নেতাদের নিয়ে একটি মন্ত্রিসভা গঠিত হবে, এবং আয়র্লণ্ডে রাজার প্রতিনিধি যিনি থাকবেন তিনি এই মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারে কাজ করবেন। এই সময় ইওরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাবার জন্যে উক্ত আইনটি কার্যকরী হল না।

ঈস্টার বিদ্রোহ

এই আইনটি পাস হবার অল্পদিন পরেই, ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে **প্রথম বিশ্বযুদ্ধ** আরম্ভ হয়ে গেল। যুদ্ধের প্রথম বছরটা আইরিশরা চুপচাপ রইল; কিন্তু ভিতরে ভিতরে আইরিশ তরুণেরা পূর্ণ-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্যে তৈরী হতে আরম্ভ করল। স্বায়ত্ত-শাসন আইনে যতটুকু অধিকার আয়র্লণ্ড পেয়েছিল, তাতে তারা সন্তুষ্ট হয় নি; তাদের ইচ্ছা, আয়র্লণ্ড ইংলণ্ডের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবে না, একেবারে আলাদা হয়ে যাবে। আয়র্লাণ্ড কোন রাজা থাকবে না, প্রজারা ভোট দিয়ে যাঁকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করবে, তিনিই দেশ শাসন করবেন। প্রজাদের নির্বাচিত পার্লামেণ্টের নেতাদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠিত হবে, এই মন্ত্রিসভার পরামর্শে রাষ্ট্রপতি চলবেন।

এই কল্পনাকে কাজে খাটাতে হলে দল চাই, কাজেই **'সিন্‌ফিন্‌'** নাম দিয়ে একটা দল গঠিত হল। 'সিন্‌ফিন্‌' আইরিশ কথা, এর মানে, "আমরা আলাদা থাকব।" সিন্‌ফিন্‌ দল ঠিক করল যে, ইংরেজের শত্রু জার্মেনীর কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তারা দেশ স্বাধীন করবে। **সার রজার কেসমণ্ট** নামক তাদের একজন নেতার মারফত তলে তলে তারা জার্মানদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করল যে, জার্মেনী তাদের দলকে অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ দিয়ে সাহায্য করবে। সার রজার কেসমণ্টের এই ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে গেল। তিনি গ্রেফতার হলেন এবং তাঁর ফাঁসি হয়ে গেল।

সিন্‌ফিন্‌রা কিন্তু এতে দমে গেল না। তাদের দলে অসংখ্য যুবক এসে যোগ দিতে লাগল। বিদ্রোহের জন্যে তারা এমন অধৈর্য হয়ে উঠল যে, জার্মেনী থেকে অস্ত্র আসবার অপেক্ষাও তারা করতে পারল না। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের গুড ফ্রাইডের পরের সোমবার, ডাবলিন শহরে বিদ্রোহীরা পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করল।

যুদ্ধে লিপ্ত থাকলে কি হবে, ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট ঘরের পাশে এই বিদ্রোহ সহ্য করল না। কঠোর ভাবে তারা এই বিদ্রোহ দমন করল। গুড ফ্রাইডের পরের সোমবারকে বলে, ঈস্টার সোমবার; এই দিনে বিদ্রোহ হয়েছিল বলে একে "ঈস্টার বিদ্রোহ" বলে। বিদ্রোহীদের মধ্যে যারা ধরা পড়ল, তাদের অনেকেরই ফাঁসি হয়ে গেল।

বিদ্রোহ এবারও দমন হল বটে, কিন্তু আইরিশরা ইংরেজদের উপর চটেই রইল। যুদ্ধ শেষ হবার পর যখন আবার ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের নির্বাচন হল আইরিশরা তখন তাদের একশ জন সদস্যের মধ্যে, ৭৩ জন সিন্‌ফিন্‌ দলের লোককে নির্বাচিত করে পাঠিয়ে দিল এবং তাদের জানিয়ে দিল যে, তারা যেন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে যোগ না দিয়ে দূরে থাকে।

বর্তমান আয়র্লণ্ড

উদারনৈতিক দলের বিখ্যাত নেতা **লয়েড জর্জ** ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হয়ে আয়র্লণ্ডকে শান্ত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি আলস্টারের জন্যে একটা, আর আয়র্লণ্ডের জন্যে একটা, এই দুটি পার্লামেণ্টের ব্যবস্থা করলেন। আলস্টারের অধিবাসীরা এতে খুব খুশী হল, কিন্তু আইরিশরা তাদের পার্লামেণ্টের জন্যে কোন সদস্য নির্বাচন করল না।

আইরিশরা মিলিত হয়ে স্থির করল যে, ইংরেজের তৈরী পার্লামেণ্টে তারা যাবে না, ইংরেজের তৈরী আদালতে তারা মামলা-মকদ্দমা করবে না, ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের কোন হুকুমই তারা মানবে না। তারা নিজেরাই নিজেদের পার্লামেণ্ট ও নিজেদের আদালত গড়ে নিল, নিজেদের পুলিস পর্যন্ত নিযুক্ত করে তারা দস্তুরমত একটা পালটা-গবর্নমেণ্ট চালাতে আরম্ভ করল।

ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট প্রথমটা সৈন্য পাঠিয়ে গায়ের জোরে, এই পালটা-গবর্নমেণ্ট ভেঙে দেবার চেষ্টা করল। আইরিশরা ঝোপে-ঝাড়ে লুকিয়ে থেকে এই সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল। আড়াল থেকে লুকিয়ে যুদ্ধ করাকে বলে **গেরিলা যুদ্ধ**। আইরিশরা তাই করেছিল বলে আয়র্লণ্ডের এই বিদ্রোহকে

গেরিলা যুদ্ধ বলা হয়। **ডি. ভ্যালেরা** (জন্ম ১৮৮২ খ্রীঃ), **মাইকেল কলিন্স** (১৮৯০—১৯২২ খ্রীঃ), **ডান ব্রিন** প্রভৃতি এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন।

ডি. ভ্যা.লরা

সাতশ বছরের বিবাদ-বিসংবাদের পর এই যুদ্ধেই ইংরেজরা ভাল করে বুঝতে পারল যে, আইরিশদের কিছুতেই গায়ের জোরে দাবিয়ে রাখা চলবে না। আইরিশরাও বুঝল যে, ইংরেজকে একেবারে তাড়িয়ে দেওয়া সম্ভবপর নয়।

এবার উঠল সন্ধির কথা। লয়েড জর্জ তখনও প্রধানমন্ত্রী। তিনি বিদ্রোহী নেতাদের লণ্ডনে ডেকে পাঠালেন। একটা সন্ধিপত্র তৈরী হল। ইংলণ্ডের
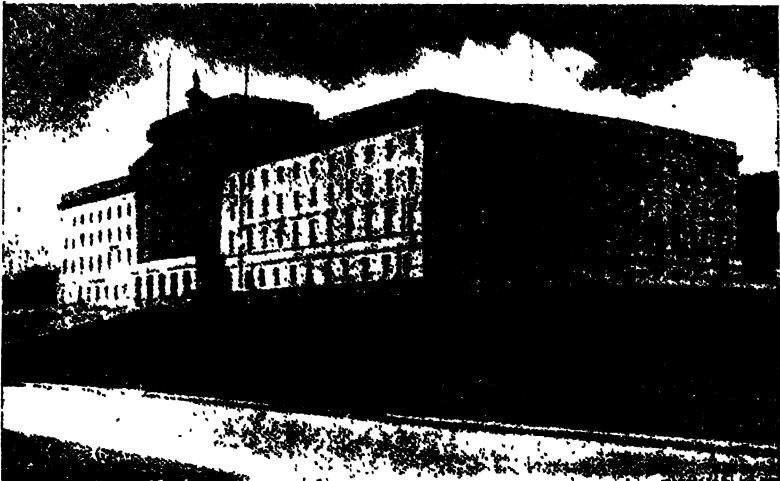
পার্লামেণ্ট ভবন

পক্ষে লয়েড জর্জ এবং আর কয়েকজন মন্ত্রী তাতে সই করলেন। বিদ্রোহীদের পক্ষ থেকে সই করলেন ডি. ভ্যালেরা, মাইকেল কলিন্স প্রভৃতি কয়েকজন।

সন্ধি হল এই যে, আয়র্লণ্ড কি ভাবে শাসিত হবে সেটা আইরিশরাই ঠিক করবে। আইরিশ পার্লামেণ্ট, মন্ত্রিসভা, আইন-প্রণয়নের ব্যবস্থা, বিচার-আদালত প্রভৃতির গঠনপ্রণালী আইরিশরা স্থির করে দেবার পর, ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট সেই বন্দোবস্ত মেনে নেবে। রাজার প্রতিনিধিস্বরূপ একজন বড়লাট থাকবেন, তবে তিনি আইরিশ মন্ত্রিসভার পরামর্শ না নিয়ে কোন কাজ করবেন না। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে আয়র্লণ্ডে তাদের নতুন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হয়।

উত্তর আয়র্লণ্ড

আয়র্লণ্ড বর্তমানে দুই ভাগে বিভক্ত উত্তর আয়র্লণ্ড ও আইরিশ রিপাবলিক উত্তর আয়র্লণ্ড গ্রেট ব্রিটেনের অন্তর্ভুক্ত। পূর্বতন আলস্টারের অধিকাংশ নিয়েই উত্তর আয়র্লণ্ড।

উত্তর আয়র্লণ্ডের গভর্নর লর্ড আর্সকিন অব রেরিক। প্রধানমন্ত্রী টেরেন্স মানে ও' নীল।

এর আয়তন ১২,৫৭৪'৭ বর্গ কিলোমিটার (৫,৪৬১'৮৯ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ১৪,৮৪,৭৭০ (১৯৬৬ খ্রীঃ)।

আইরিশ রিপাবলিক (দক্ষিণ আয়র্লণ্ড)

দক্ষিণ-আয়র্লণ্ডকে এখন **"আয়ার"** বলে। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর যে শাসনতন্ত্র রচিত হয় তাতে ঠিক হয়, 'আয়র্লণ্ড' নামই থাকবে। ঐ বৎসর আয়র্লণ্ড স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আয়ার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নিরপেক্ষ ছিল। তথাপি বিভিন্ন যুদ্ধরত দেশের নৌ-শক্তির আক্রমণে তার কুড়িখানি জাহাজ বিনষ্ট হয়েছিল—বিভিন্ন সময়ে। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও হিটলার—উভয়ের মৃত্যুতেই ডি. ভ্যালেরা শোক প্রকাশ করেছিলেন।

১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুন ডি. ভ্যালেরা রাষ্ট্রপতি হন। মেজর জেমস চিচেসটার ক্লার্ক প্রধানমন্ত্রী (১৯৬৯ খ্রীঃ)।

ডাবলিন আয়ারের রাজধানী। এর আয়তন ৬৮,৮৯৩ বর্গ কিলোমিটার (২৬,৬০০ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা ২৮,৮৪,০০২ (১৯৬৬ খ্রীঃ)।

ইওরোপের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে স্পেন অবস্থিত। স্পেনের চতুর্দিক সমুদ্র আর পর্বতমালা দ্বারা বেষ্টিত। প্রকৃতিদেবী স্পেনকে এমন করে সুরক্ষিত করে দেওয়া সত্ত্বেও, স্পেন কিন্তু বাইরের শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পায় নি।

সবার আগে, পুরাকালের এশিয়ার বিখ্যাত বণিকজাতি ফিনিশীয়গণ স্পেনের উপকূলভাগে আগমন করে। এর পরে গ্রীকরা এসে স্পেনের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন করে। গ্রীকরা অবশ্য স্পেনের ভিতরে বেশীদূর পর্যন্ত যায় নি। তারপরে স্পেন জয় করে এখানে রাজ্য-প্রতিষ্ঠা করেন কার্থেজের সেনাপতি **হামিলকার বার্কা** ও তাঁর পুত্র পৃথিবী-বিখ্যাত যোদ্ধা **হানিবল**। রোমানগণ যখন শক্তিশালী হয়ে ওঠে তখন তারা কার্থেজ-শক্তিকে পরাভূত করে স্পেনের অধীশ্বর হয়। ছয়শ বছর স্পেনকে রোম-সাম্রাজ্যের অধীন হয়ে থাকতে হয়। স্পেনের প্রায় সমস্ত অংশই রোম জয় করে নিয়েছিল, গ্রীকদের মত শুধু তার একটা উপকূল নিয়েই রোমানরা সন্তুষ্ট থাকে নি।

স্পেনবাসিগণ নানা পাহাড়ী জাতিতে বিভক্ত ছিল। তারা সহজে রোমানদের পদানত হয় নি। ক্রমে স্পেনিশগণ রোমক-সভ্যতা গ্রহণ করে।

রোমানরা স্পেন জয় করেছিল বটে, কিন্তু স্পেনের লোকদের কাছ থেকে তারাও শিল্প-কলা প্রভৃতি অনেক জিনিস শিখেছিল।

স্পেনের ক্যাথলিক ধর্মগ্রহণ

আরব রাজত্ব

রোমানদের পতনের পর পঞ্চম শতাব্দীতে বর্বর টিউটন আক্রমণকারিগণ স্পেন অধিকার করে। এই বর্বর জাতিদের মধ্যে **ভ্যাণ্ডাল** ও **ভিসিগথদের** নাম উল্লেখযোগ্য। তাদের যুগ প্রায় তিনশ বছর চলে। ৭১১ খ্রীষ্টাব্দে, আরব সেনাপতি **তারিক** সদলবলে স্পেন আক্রমণ করেন। তিনি জিব্রালটারে অবতরণ করেন। তাঁর নাম থেকেই জিব্রালটার নামের উৎপত্তি। দুই বছরের মধ্যে আরব-মুসলমানগণ, ভিসিগথদের হাত থেকে সম্পূর্ণ স্পেন জয় করে এবং কিছুকাল পরে তারা পোর্তুগালও অধিকার করে।

স্পেনে আরবগণের রাজত্বকালের সভ্যতার ইতিহাস একটি গৌরবময় কাহিনী। স্পেনের আরবদের **মূর** বা **সারাসেন** বলে। মূররা স্পেনে প্রায় সাতশ বছর ধরে রাজত্ব করে। উত্তর-স্পেনে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল **করডোভা** রাজ্য। করডোভা নগরী ছিল এই দেশের রাজধানী। প্রায় পাঁচশ বছর পর্যন্ত এই নগরীর খ্যাতি সারা ইওরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই নগরীতে ছিল দশ লক্ষেরও উপর লোকের বসতি। এই উদ্যানমণ্ডিত নগরী দৈর্ঘ্যে ছিল দশ

মূরদের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টানদের অভিযান

মাইল। আর কথিত আছে, এতে ষাট হাজার প্রাসাদ, দুই লক্ষ অপরাপর গৃহ, আশি হাজার বিপণি, প্রায় চার হাজার মসজিদ এবং সাতশ স্নানাগার ছিল। তা ছাড়া ছিল অনেক গ্রন্থাগার—যার মধ্যে আমীরের নিজের গ্রন্থাগারে চার লক্ষের উপর বই ছিল। করডোভা-বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি সমস্ত ইওরোপ ও এমন কি, পশ্চিম-এশিয়া অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছিল। আরবযুগে স্পেন দর্শন, জ্যোতিষ, কাব্যচর্চা, ইতিহাস ও বিজ্ঞান নানাদিকে শ্রেষ্ঠ উন্নতির পরিচয় দেয়।

দশম শতাব্দীতে করডোভার আমীরের প্রভুত্ব প্রায় সমস্ত স্পেনের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দক্ষিণ-ফ্রান্সের কতকটা অঞ্চলও এই রাজ্যের অন্তর্গত হয়েছিল। কিন্তু শীঘ্রই আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার জন্যে করডোভা রাজ্যে ভাঙ্গন

শুরু হল। স্পেনের উত্তরভাগে কয়েকটি খ্রীস্টান রাজ্য ছিল। তারা ক্রমাগত মুরদের বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছিল। অবশেষে আরবদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ক্যাস্টিল রাজ্যের নৃপতি করডোভা জয় করলেন।

আরবগণ দক্ষিণ দিকে বিতাড়িত হলেও খ্রীস্টান রাজ্যগুলিকে বাধা দিতে লাগল। স্পেনের দক্ষিণ দিকে তারা **গ্রানাডা** নামে একটি রাজ্যের পত্তন

গ্রানাডার আত্মসমর্পণ

করল। এখানে আরও দুশ বছর তাদের প্রতিপত্তি থাকল। এই গ্রানাডায়ও মুর-সভ্যতা খুব উৎকর্ষ লাভ করেছিল। প্রসিদ্ধ **অলহামব্রা প্রাসাদ** আজও সেই যুগের উন্নত আরব-সভ্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলার রাজত্বকালে, গ্রানাডা রাজ্যের অবসান হয় ও সমগ্র স্পেনে মুসলমানদের পরিবর্তে খ্রীস্টান প্রভুত্ব স্থাপিত হয়।

ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলা

এতদিন পর্যন্ত স্পেন ঠিক একটি রাজ্য ছিল না। দেশটা ছিল ছোট ছোট অনেকগুলো রাজ্যে বিভক্ত। এদের মধ্যে বড় রাজ্যগুলি আরবশক্তির পতনের পর ছোট রাজ্যগুলিকে জয় করে নিতে আরম্ভ করল। তা ছাড়া

এদের প্রায় প্রত্যেক রাজ্যের সঙ্গেই অপর রাজ্যের বিবাহ-সম্পর্কে আদান-প্রদান চলত। তাতেও অনেক সময় এক রাজ্যের ছেলের সঙ্গে অন্য রাজ্যের মেয়ের বিয়ে হয়ে দুটো রাজ্য এক হয়ে যেত। এইভাবে পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি স্পেনে শুধু চারটি রাজ্য অবশিষ্ট রইল। তাদের নাম, **ক্যাস্টিল, অ্যারাগন, নোভার** এবং **গ্রানাডা**।

স্পেনের বিভিন্ন রাজ্যের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে-সব বিয়ে হয়েছে, তার মধ্যে সব-চেয়ে উল্লেখযোগ্য **ফার্দিনান্দ** (১৪৫২—১৫১৬ খ্রীঃ) ও **ইসাবেলার** (১৪৫১—১৫০৪ খ্রীঃ) বিয়ে। ফার্দিনান্দ ছিলেন অ্যারাগনের উত্তরাধিকারী, ইসাবেলা ছিলেন ক্যাস্টিলের রাজার মেয়ে। ইসাবেলার এক ভাই ছিলেন, তাঁর নাম **হেনরী**। পিতার মৃত্যুর পর হেনরী ক্যাস্টিলের রাজা হলেন বটে, কিন্তু তাঁর দুর্ব্যবহারে প্রজারা এমন ভীষণ অসন্তুষ্ট হল যে তারা তাঁকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে দিল। ক্যাস্টিলের লোকেরা হেনরীর বদলে সিংহাসনে বসাল ইসাবেলাকে। কাজেই ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলার বিবাহের ফলে, অ্যারাগন এবং ক্যাস্টিল, তাঁদের দুজনের শাসনাধীনে এসে এক হয়ে গেল।

ফার্দিনান্দ

গ্রানাডা তখনও ছিল মুরদের হাতে। এই ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলাই মুরদের তাড়িয়ে গ্রানাডা দখল করেন। এর কিছুদিন পরে তাঁরা নোভার রাজ্যটিও জয় করে নেন। এইভাবে ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলার রাজত্বকালে স্পেন প্রায় **এক দেশ** ও **এক রাজ্যে** পরিণত হল।

এই সময়ে স্পেনে সামন্ত-জমিদার ও ধনীদের অসীম ক্ষমতা ছিল। ছোট

ছোট রাজ্যগুলোতে যাঁরা রাজা হতেন, আসলে তাঁরা থাকতেন জমিদার ও ধনীদের হাতের পুতুল। ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলা জমিদার ও ধনীদের এই ক্ষমতা খর্ব করে তাঁদের রাজার হুকুম মানতে বাধ্য করেন। ক্যাস্টিলের জমিদারেরা একবার তাঁদের লুপ্ত ক্ষমতা ফিরে পাবার জন্যে বিদ্রোহ করবার চেষ্টা করেন, কিন্তু রাজা ফার্দিনান্দের তৎপরতায় তাঁদের ষড়যন্ত্র অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়।
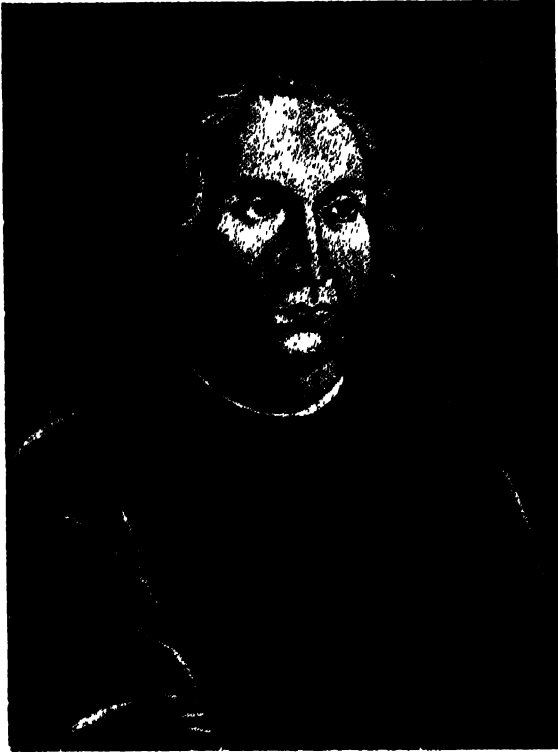
কলম্বাস

ইসাবেলার উৎসাহেই বিখ্যাত নাবিক **কলম্বাস** (১৪৪৬—১৫০৬ খ্রীঃ) **আমেরিকা আবিষ্কার** করেছিলেন। কলম্বাসের এই আবিষ্কার একটি বড় ঐতিহাসিক ঘটনা। এর ফলে, দক্ষিণ-আমেরিকায় স্পেনের বিরাট সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হল। এসময় ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দে পোর্তুগিজ নাবিক **ভাস্কো-দা-গামা** (১৪৬০—১৫২৪ খ্রীঃ), আবিষ্কারের নেশায়, দক্ষিণ-আফ্রিকা পরিক্রম করে, ভারতের পশ্চিম-উপকূলে কালিকটে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন।

স্পেনের সাম্রাজ্য

ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলার পর সম্রাট্ **পঞ্চম চার্লসের** (১৫০০—১৫৫৮ খ্রীঃ) রাজত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চার্লস ছিলেন ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলার মেয়ের ছেলে। কলম্বাসের আবিষ্কারের ফলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ স্পেনের অধিকারে আসে। **কোর্টিস** (১৪৮৫—১৫৪৭ খ্রীঃ) নামক একজন যোদ্ধা ৫০০ সৈন্য নিয়ে **মেক্সিকো** দেশ জয় করে সেখানে স্পেনের কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। **পিজারো** (১৪৭১—১৫৪১ খ্রীঃ) নামক আর এক সাহসী বীর মাত্র ২০০ সৈন্য নিয়ে, দক্ষিণ-আমেরিকায় **চিলি** এবং **পেরু** নামক দুটি দেশে স্পেনের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এই ভাবে ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেনের সাম্রাজ্য অতলান্তিক মহা-সমুদ্রের ওপারে আমেরিকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। স্পেন থেকে আরও সৈন্য এই সব দেশে গিয়ে সেখানে স্পেনের আধিপত্য পাকা করে এবং ধীরে ধীরে **প্রায় সমস্ত দক্ষিণ-আমেরিকাই** স্পেনের অধীনে এসে যায়।

কলম্বাসের জাহাজ 'সাণ্টামেরিয়া'

চিলি, পেরু, মেক্সিকো, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রভৃতি দেশ থেকে স্পেনে সোনা আর রূপা প্রচুর পরিমাণে আসতে থাকে। স্পেনের লোকদের ধারণা ছিল, বিদেশ থেকে সোনা আর রূপা ছাড়া আর কিছু এনে লাভ নেই; তারা সে সব দেশের অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের দিকে নজর দিত না, খুঁজে বেড়াত শুধু সোনা আর রূপা।

ষোড়শ শতাব্দীতে, পঞ্চম চার্লসের পুত্র **দ্বিতীয় ফিলিপের** (১৫২৭—১৫৯৮ খ্রীঃ) রাজত্বকালে স্পেন ইওরোপে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হয়। এই

সময় বিশাল আমেরিকা-সাম্রাজ্য থেকে প্রভূত ধনরত্ন এসে স্পেনকে খুব সমৃদ্ধিশালী করে। ফিলিপ পোর্তুগালও জয় করেন; কিন্তু গর্বিত সম্রাট্ ফিলিপের ভ্রান্তনীতি ও ধর্ম সম্বন্ধে উগ্র সংকীর্ণতার জন্যে চারিদিকে অসন্তোষের সৃষ্টি হওয়ায় সাম্রাজ্য স্থায়ী হতে পারে নি। এলিজাবেথের রাজত্বকালে, ইংলণ্ড জয় করার অভিপ্রায়ে ফিলিপ যে বিরাট **"ইন্‌ভিন্‌সিব্‌ল্ আর্মাডা"** পাঠিয়েছিলেন,

পঞ্চম চার্লস

তার মস্ত বিপর্যয় ঘটে। ফিলিপের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে স্পেন-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল্যাণ্ড দেশ বিদ্রোহ করে ও নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক **উইলিয়ম দি সাইলেণ্টের** (১৫৩৩—১৫৮৪ খ্রীঃ) নেতৃত্বে জোর সংগ্রাম করে স্বাধীনতা লাভ করে।

দ্বিতীয় ফিলিপের রাজত্বের পর আর কোন উপযুক্ত রাজা স্পেনের সিংহাসনে বসেন নি। আয়তনে স্পেন-সাম্রাজ্য খুব বিস্তৃত রইল বটে, কিন্তু তার ভিতরটায় ঘুণ ধরে গেল। সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন প্রতাপান্বিত সম্রাট্ **চতুর্দশ লুই** ফ্রান্সদেশে রাজত্ব করছিলেন, তখন দুর্বল ও অন্তর্জীর্ণ

কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার

স্পেন লুইর প্রলুব্ধ দৃষ্টির আকর্ষণে পড়ল। লুইর সারা জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সংগ্রাম সত্ত্বেও স্পেন ফরাসী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল না, তবে "স্পেনিশ উত্তরাধিকার" যুদ্ধের ফলে, বুর্বন-রাজবংশের চতুর্দশ লুইর পৌত্র **পঞ্চম ফিলিপ** (১৬৮৩—১৭৪৬ খ্রীঃ) স্পেনের অধীশ্বর হলেন। এর পর থেকে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ফরাসী বিপ্লবের সময় পর্যন্ত স্পেন একরূপ ফ্রান্সের আওতায় থাকল। আস্তে আস্তে স্পেনের পারিপার্শ্বিক ইওরোপীয় রাজ্য ও অধিকারসমূহ তার হাতছাড়া হয়ে গেল।

এলিজাবেথের রাজত্বের সময় থেকে ইংরেজদের সঙ্গে স্পেনিশদের ঝগড়া-বিবাদ লেগেই ছিল। ইংরেজ নাবিকগণ লোভের তাড়নায় দক্ষিণ-আমেরিকা

কোর্টিসের মেক্সিকো বিজয়

হতে আগত ধন-সম্পত্তি বোঝাই স্পেনিশ জাহাজগুলি আক্রমণ করে লুট করত। স্পেনের শাসন-ব্যবস্থা অপটু ও বিশৃঙ্খল ছিল বলে আমেরিকায় তার সাম্রাজ্য থাকা সত্ত্বেও, সে বিদেশী আক্রমণকারীদের দমন বা নিজের ঘর-সামলানো কোনটাতেই সমর্থ হল না।

বিনা পরিশ্রমে সাম্রাজ্যের দেশগুলো থেকে বহু ধনরত্ন পেয়ে স্পেনের লোকেরা বিলাসী হয়ে পড়েছিল; তা ছাড়া দেশের ভাল ভাল ছেলেদের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্যে দক্ষিণ-আমেরিকায় পাঠিয়ে দেওয়া হত; এই সব কারণে স্পেনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা কমে গেল এবং সভ্যতার দিক্ দিয়ে স্পেন ইওরোপের অন্যান্য দেশ থেকে অনেক পিছনে পড়ে গেল। স্পেনের রাজারা

ধর্মনীতিতে ছিলেন উগ্র ক্যাথলিকপন্থী। **জেস্যুইট** নামে একদল গোঁড়া, ধর্মোন্মত্ত যাজক সম্প্রদায়ের সাহায্যে তাঁরা বিরুদ্ধধর্মবাদীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করতেন। দেশের লোক এই সব নিয়ে মত্ত থাকত, তাদের

দ্বিতীয় ফিলিপ

স্বাধীন মনোবৃত্তি স্ফুরণের সুযোগ মিলত না। তাই স্পেনবাসীদের সহজ স্বাভাবিক মনোবিকাশ হতে পারল না।

ফরাসী বিপ্লবের পর, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নেপোলিয়ন যখন দেশের পর দেশ জয় করছিলেন, তখন তিনি জোর করে স্পেনের

স্বাধীনতা হরণ করে তাঁর ভাই **জোসেফকে** স্পেনের সিংহাসনে বসান। এতে স্পেনিশদের মধ্যে একটা প্রবল **জাতীয়-জাগরণ** দেখা দেয়। **'পেনিনসুলার যুদ্ধে'** স্পেনিশরা, ইংরেজ সেনাপতি ওয়েলিংটনের সাহায্যে, আক্রমণকারী ফ্রান্সের হাত থেকে স্পেনের স্বাধীনতা উদ্ধার করে। ১৮১২ খ্রীস্টাব্দে স্পেনে একটি উদার শাসনবিধিও অবলম্বন করা হয়—তবে স্বেচ্ছাচারী রাজা **সপ্তম ফার্দিনান্দ** নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর যখন স্পেনে ফিরে আসেন, তখন তিনি এই শাসনতন্ত্র রহিত করে দিয়েছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকেই দক্ষিণ-আমেরিকার দেশগুলির মধ্যে স্পেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু হয়। স্পেন সে-সব আন্দোলন দমন করতে পারল না। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট **মনরোর নীতি** ও

"ইন্‌ভিন্‌সিব্‌ল্‌ আর্মাডা"

ইংলণ্ডের সহানুভূতির ফলে, দক্ষিণ-আমেরিকার রাষ্ট্রগুলি শীঘ্রই বিদ্রোহ আরম্ভ করল ও একে একে তারা সকলেই স্বাধীন হয়ে গেল। এইভাবে স্পেনের আমেরিকা-সাম্রাজ্য তার হাতছাড়া হয়ে গেল।

প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইওরোপের সব দেশই যখন অনেক দূরে এগিয়ে গেছে, স্পেনেও তখন কয়েকবার শাসন-সংস্কারের দাবি উঠল বটে, কিন্তু তার ফল বিশেষ কিছু হল না। শুধু একবার রাজনৈতিক আন্দোলন সফল হয়েছিল। এই সময় **ইসাবেলা** (১৪৫১—১৫০৪ খ্রীঃ) নামে এক নিষ্ঠুর অত্যাচারী রানীর

শাসনে স্পেনের লোকেরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। আন্দোলনকারীরা এই রানী ইসাবেলাকে দেশ থেকে তাড়াতে পেরেছিল এবং তাঁর বদলে **আমাদেয়োস** (১৮৪৫—১৮৯০ খ্রীঃ) নামক নতুন একজন রাজাকে সিংহাসনে বসিয়েছিল।

আমাদেয়াস স্বীকার করলেন যে, দেশের জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পার্লামেন্টের কথা শুনে তিনি চলবেন। কিন্তু তিনি দুর্বল লোক ছিলেন, তাঁর শাসনে লোকে সন্তুষ্ট হল না। স্পেনের লোকেরা তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করল। এইবার তারা ঘোষণা করল যে, দেশে আর কাউকেই

পেনিনসুলার যুদ্ধ

রাজা করা হবে না। প্রজারা তাদের পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচন করবে, এই সদস্যদের মধ্য থেকে দেশের মন্ত্রিসভা গঠিত হবে এবং তাঁরাই দেশ-শাসন করবেন। রাজার বদলে দেশে প্রজাদের নির্বাচিত একজন রাষ্ট্রপতি থাকবেন। এই রকম শাসনব্যবস্থাকে বলে **প্রজাতন্ত্র**।

প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেও কিন্তু মোটেই সুবিধা হল না। নতুন গবর্নমেণ্টের ভার যাঁরা নিলেন তাঁরা কেউই শক্ত লোক ছিলেন না। প্রজারা অনেকেই তাঁদের গ্রাহ্য করত না। ট্যাক্সের টাকা উঠত না, সরকারী কর্মচারীরাও

মাইনে পেত না। প্রায় দুই বছর এইভাবে বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে চলবার পর, প্রজারা বুঝল যে এভাবে বেশী দিন চালানো সম্ভবপর নয়। আবার দেশে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে সকলের ধারণা হল।

পুরানো রাজবংশের **দ্বাদশ আলফন্সোকে** (১৮৫৭—১৮৮৫ খ্রীঃ) ডেকে এনে তারা তাঁকে সিংহাসনে বসাল। রাজা মন্ত্রীদের পরামর্শ নিয়ে সব কাজ করবেন এবং মন্ত্রীরা প্রজাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পার্লামেণ্টের কাছে দায়ী থাকবেন, এটা এবারও ঠিক রইল বটে, কিন্তু কার্যকালে পার্লামেণ্টের নির্বাচনের সময় ঘুষ, জুয়াচুরি, ধাপ্পাবাজি, জালিয়াতি প্রভৃতি সব রকম উপায় অবলম্বন করে

ইংরেজ সেনাপতি ওয়েলিংটনের সাহায্যে ফ্রান্সের হাত হতে স্পেনের স্বাধীনতা-উদ্ধার

রাজা তাঁর দলের লোকদের নির্বাচনে জিতিয়ে দিয়ে, পার্লামেণ্টের বেশির ভাগ সদস্যকে নিজের হাতে রাখতেন। ফলে তিনি নিজের ইচ্ছামত মন্ত্রী নিযুক্ত করতে পারতেন এবং তাঁদের নিজের খুশিমত চালাতে পারতেন।

দ্বাদশ আলফন্সো মারা যাবার কয়েক মাস পর তাঁর ছেলে **ত্রয়োদশ আলফন্সো** ভূমিষ্ঠ হন এবং ষোল বছর বয়সে তিনি রাজা হন। রাজ্যাভিষেকের সময় তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে, শাসনতন্ত্র মেনে তিনি চলবেন। নতুন রাজা মানুষ হয়েছিলেন পাদরী, সৈন্যদল ও বড়লোকদের সংসর্গে, কাজেই তাদের প্রভাব তিনি কিছুতেই এড়াতে পারলেন না। স্পেনের রাজনীতিক্ষেত্রেও আবার এই তিন দল ছিল একেবারে একজোট। পাদরীদের এক একটি গির্জার

অধীনে বিরাট এক একটি জমিদারি ছিল, তা ছাড়া দেশের সমস্ত শিক্ষায়তন-গুলি ছিল তাঁদের হাতে। দেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্যে পাদরীদের যে খুব আগ্রহ ছিল তা নয়। তাঁদের আমলে স্পেনের অর্ধেক লোকই লিখতে পড়তে শেখে নি।

রাজার উপর সৈন্যদলের প্রভাবও কম ছিল না। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধে, স্পেনের যে-সব অবশিষ্ট সাম্রাজ্য ছিল সেগুলো হাতছাড়া হয়ে যাবার পর, সেই যুদ্ধে যে-সব সেনাপতি হেরে এসে-ছিলেন, তাঁদের মোটা মোটা পেনশন বরাদ্দ করে দেওয়া হয়। সেনাপতিদের সংখ্যাও বড় কম ছিল না, তখনকার স্পেনে প্রত্যেক সাতজন সৈন্যের জন্যে একজন করে সেনাপতি থাকতেন। এই-ভাবে তাঁদের তুষ্ট করতে গিয়ে সামরিক বিভাগের জন্যে খরচ ভয়ানক ভাবে বেড়ে গেল।

সপ্তম ফার্দিনান্দ

অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা ছিলেন আরও ভয়ানক। তাঁরাই ছিলেন দেশের অধিকাংশ জমির মালিক; গরিবেরা তাঁদের জমি চাষ করে দিত। তাদের পারিশ্রমিক ছিল সামান্য কয়েক পয়সা। বড়লোকেরা ঠিক যেটুকু ফসল নিজেদের খোরাকের জন্যে দরকার সেইটুকুই শুধু তাঁদের জমিতে উৎপাদন করাতেন, বাকী জমি অমনি পড়ে থাকত। কাজেই গরিবদের খাবারের অভাব কিছুতেই ঘুচত না।

এই সব কারণে **পাদরী, সেনাপতি ও অভিজাত**—এই তিন শ্রেণীর

বিরুদ্ধে ক্রমেই দেশের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এই তিন দলের অন্যায় প্রভুত্ব নষ্ট করবার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা সবার আগে অগ্রসর হলেন; ফলে তাঁদের এত বেশী সম্মান বেড়ে গেল যে, লোকে তাঁদের দেবতা বলে পূজা করতে আরম্ভ করে দিল।

স্পেনে **সালামাঙ্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের** নাম খুব বিখ্যাত। অধ্যক্ষ **মিগুয়েল উনামুনো** এবং স্পেনের রাজধানী, মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক **জোসে ওর্টেগা ই গ্যাসেট,** দেশের যুবকদের মধ্যে নব-জাগরণ এনে দেশসুদ্ধ সকলকে নতুন ভাবধারায় মাতিয়ে তুললেন। জাতীয় ঐক্য না থাকলে যে স্বাধীনতারা আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয় ও দেশের উন্নতি হয় না, তাঁদের কথায় সকলে তা অনুভব করতে পারল।

আমাদেয়োস

শুধু যুবকদের মধ্যে নয়, শ্রমিকদের মধ্যেও জীবনের স্পন্দন দেখা দিল। শ্রমিকরা এর আগে রাজনীতি-চর্চা করত না; এই সময় থেকেই তারা রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাতে আরম্ভ করল; কিন্তু শ্রমিকদের মধ্যে কোন একতা ছিল না বলে তারা বিশেষ কিছু করে উঠতে পারল না। রাজার বিরোধী দলগুলি যথেষ্ট প্রবল হলেও রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করবার মত শক্তি সঞ্চয় করতে পারল না। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এইভাবে চলল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে স্পেনের নিরপেক্ষতা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর রাজা আলফন্সো সবচেয়ে বড় বুদ্ধির পরিচয় দিলেন যুদ্ধে যোগ না দিয়ে নিরপেক্ষ থেকে। তাঁর মা ছিলেন অস্ট্রিয়ান আর রানী ছিলেন ইংরেজ। দেশের মধ্যে সমান দুটো দল হয়ে গিয়েছিল, একদল চেয়েছিল ইংরেজের পক্ষে আর একদল চেয়েছিল জার্মেনীর পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিতে।

দ্বাদশ আলফন্সো

আলফন্সো দেখলেন যে, ইওরোপের সবগুলো দেশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় তাদের শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। তাদের সব লোকজন যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিতে হচ্ছে এবং কারখানাগুলোতে কেবল যুদ্ধের জন্যে দরকারী জিনিসই তৈরী হচ্ছে। ব্যবসা করবার জন্যে কোন শিল্পদ্রব্য তৈরি করবার ক্ষমতা কিছুদিন পরে অনেকেরই থাকবে না। কাজেই এই সময় তিনি যদি নিজের দেশকে যুদ্ধের বাইরে রেখে কারখানাগুলোকে ভাল করে চালাবার বন্দোবস্ত করে দিতে পারেন, তা হলে তাঁর গরিব দেশ এই যুদ্ধের সুযোগে অনেক টাকা রোজগার করতে পারবে।

হলও ঠিক তাই। প্রত্যেক দেশ থেকে স্পেনে বড় বড় সব অর্ডার আসতে লাগল; কারখানার মালিকেরা লাখ লাখ টাকা রোজগার করতে

লাগলেন, শ্রমিকদেরও মজুরি বাড়ল। যুদ্ধের শেষে দেখা গেল, স্পেনের অবস্থা আগের চেয়ে অনেক ভাল হয়ে গেছে।

দেশে কারখানার সংখ্যা অনেক বেড়ে যাওয়ায় শ্রমিকের সংখ্যাও বাড়ল এবং এবার তারা গবর্নমেণ্ট দখল করবার জন্যে জোর চেষ্টা শুরু করে দিল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশের অনেক জায়গায় **শ্রমিক ধর্মঘট** হল। বিব্রত হয়ে গবর্নমেণ্ট নেতাদের গ্রেফতার করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন; কিন্তু এই আদেশ টিকল না। নেতাদের কারাদণ্ডে শ্রমিকরা এমন ভয়ানক ভাবে ক্ষেপে গেল যে, রাজা তাঁদের ছেড়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করলেন। পরের নির্বাচনে এই সব নেতাই পার্লামেণ্টের প্রতিনিধি নির্বাচিত হলেন।

ত্রয়োদশ আলফন্সো

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে অন্যান্য দেশের সঙ্গে সঙ্গে স্পেনের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্প-ক্ষেত্রেও একটু মন্দা দেখা দিল। কারখানাগুলোতে কাজ কমে গেল, অনেক শ্রমিকের কাজ চলে গেল, যারা কাজে রইল তাদেরও মাইনে কাটা গেল। এই সব নিয়ে আবার শ্রমিক-মহলে ভয়ানক চাঞ্চল্য দেখা দিল।

রাজা আলফন্সো দেখলেন—মহাবিপদ্! তিনি এবার এক মস্ত চাল চাললেন। তিনি দেখলেন যে, যদি বাইরের কোন ছোটখাট দেশের সঙ্গে একটা যুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে দেশের লোকে নিজেদের মধ্যে বেশী গোলমাল করবে না।

স্পেন-অধিকৃত মরক্কোতে **আবদুল করিমের নেতৃত্বে** এর কিছু দিন আগে থেকে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়েছিল। আলফন্সো এই আবদুল করিমকে দমন করবার জন্যে **সিলভেস্তর** নামক এক জেনারেলকে পাঠালেন; কিন্তু ফল হয়ে গেল উলটো। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে, **আনুয়ালের যুদ্ধে** স্পেনীয় বাহিনী আবদুল করিমের হাতে ভীষণভাবে পরাজিত হল, দশ হাজার স্পেনীয় সৈন্য নিহত হল, পনেরো হাজার বন্দী হল এবং সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র আবদুল করিমের হাতে পড়ল। রাগে, দুঃখে জেনারেল সিলভেস্তর **আত্মহত্যা** করলেন।

এই ব্যাপারে দেশে ভয়ানক অসন্তোষ দেখা দিল। **প্রাইমো ডি রিভেরা** (১৮৭০—১৯৩০ খ্রীঃ) নামক একজন জেনারেল তখন জনসাধারণের খুব প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর, তিনি গবর্নমেণ্ট দখল করলেন এবং নিজেকে **ডিক্টেটর** বলে ঘোষণা করলেন।

প্রাইমো ডি রিভেরা

প্রাইমো ডি রিভেরা ছিলেন শক্তিশালী দৃঢ়চরিত্রের লোক। তিনি বুঝলেন মরক্কোর বিদ্রোহী নেতা আবদুল করিমের কাছে পরাজিত হয়ে স্পেনের যে বদনাম হয়েছে, তা অবিলম্বে দূর করা দরকার। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ফ্রান্সকে দলে টেনে ফরাসী সৈন্যের সাহায্যে আবদুল করিমের বিরুদ্ধে অভিযান করলেন। স্পেন ও ফ্রান্সের মিলিত আক্রমণ **আবদুল করিম** ঠেকাতে পারলেন না—বাধ্য হয়ে তিনি **আত্মসমর্পণ** করলেন।

দেশে ফিরে এসে রিভেরা জাতি-সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। বিদেশী জিনিসের উপর আমদানি-শুল্ক বসিয়ে তিনি দেশী কারখানার মালিকদের সুবিধা করে দিলেন। বড় বড় রাস্তা তৈরি আরম্ভ করে তিনি লক্ষ লক্ষ লোককে কাজ দিলেন। প্রাইমো ডি রিভেরা চাইতেন যে, তাঁর ইচ্ছা এবং আদেশ অনুসারেই দেশের সমস্ত কাজ হবে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের নিয়ে তিনি **ইউনিয়ন প্যাট্রিওটিকা** বলে একটা দল তৈরি করে নিয়েছিলেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এই দলের সাহায্যে তিনি স্পেনে পূর্ণভাবে ডিক্টেটরি শাসন প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে চেষ্টা আরম্ভ করলেন। ডিক্টেটরি শাসনের অর্থ এই যে, দেশে একজন মাত্র নেতার

আদেশে গবর্নমেণ্ট পরিচালিত হবে। তাঁর শাসনে কলকারখানার মালিক এবং জমিদারদের আয় বেড়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু দরিদ্র জনসাধারণের বিশেষ কোন লাভ হয় নি।

প্রাইমো ডি রিভেরা যে দেশের স্থায়ী উপকার করতে পারবেন না, দেশের শিক্ষিত লোকেরা তা বুঝতে পেরেছিলেন—এবং এইজন্যে দেশে ডিক্টেটরি প্রতিষ্ঠার জন্যে শাসনবিধি পরিবর্তনের যে-চেষ্টা তিনি করছিলেন, তাতে তাঁরা বাধা দিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপক। রিভেরা তাঁদের পদচ্যুত করলেন, তাঁদের ক্লাবগুলো বন্ধ করে দিলেন, তাঁরা যে-সব সংবাদপত্র চালাতেন সেগুলো ছাপা বন্ধ করলেন। **উনামুনো, ওর্টেগা** প্রভৃতি নেতাদের তিনি দেশ থেকে নির্বাসিত করলেন। পুলিসের গুপ্তচরে দেশ ছেয়ে গেল। প্রত্যেকেই বুঝতে পারত যে, তার পিছনে গোয়েন্দা লেগেছে, চিঠিপত্র লুকিয়ে খোলা হচ্ছে, টেলিফোন-এক্সচেঞ্জে কারা বসে তার সব কথাবার্তা শুনছে!

রিভেরার পদত্যাগ

১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে রিভেরার বিরুদ্ধে লোকের **তিক্ত মনোভাব** চরমে উঠল, চারিদিক থেকে তাঁর প্রত্যেক কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আসতে লাগল। **রাজা আলফন্সো** এতদিন রিভেরার হাতে দেশশাসনের সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়ে নিজে চুপটি করে বসে ছিলেন; এবার তিনি এগিয়ে এসে রিভেরার পদত্যাগ-পত্র দাবি করলেন। রিভেরা নিজেও হাঁপিয়ে উঠেছিলেন, রাজা চাইবামাত্র তিনিও পদত্যাগ-পত্র লিখে তাঁর হাতে তুলে দিলেন।

বৈপ্লবিক আন্দোলন

রাজা আলফন্সো রাজ্যশাসনের ভার স্বহস্তে নিলেন বটে, কিন্তু তিনিও দেশকে ঠিক পথে চালাতে পারলেন না। বিপ্লবীরা দেশে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে গোপনে আয়োজন আরম্ভ করলেন। নির্ধারিত সময়ের আগেই হঠাৎ একদিন একটা সৈন্যদল **বিদ্রোহ** ঘোষণা করে বসল। রাজার হুকুমে তাদের গ্রেফতার করে গুলি করে হত্যা করা হল। বিদ্রোহ কিন্তু এতে থামল না; প্রদেশে প্রদেশে ধর্মঘট এবং দাঙ্গা আরম্ভ হল। নানাস্থানে পুলিসের গুলি চলল। ১৬ জন বিপ্লবী নেতা নিহত হলেন এবং ৯৯২ জন কারাদণ্ডে দণ্ডিত

হলেন। প্রজাতন্ত্রের সমর্থক এই সব নেতাকে একসঙ্গে **মাদ্রিদ জেলে** রাখা হয়। সেখানে তাঁরা দেশের ভবিষ্যৎ শাসন-পদ্ধতি কি হবে তার একটা খসড়া রচনা করলেন। এই খসড়াই স্পেনের বিখ্যাত **"জেলের প্রোগ্রাম"** বলে পরিচিত।

এই বিপ্লবী নেতাদের কারাদণ্ডে দেশের লোক এমন ভাবে ক্ষেপে উঠল যে, রাজা বুঝলেন তাঁদের বেশী দিন আটকে রাখা চলবে না, প্রজাতন্ত্রের দাবিকেও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হবে না। তিনি কারারুদ্ধ নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ করলেন। স্থির হল যে, আগামী নির্বাচনে রাজা কোন রকমে হস্তক্ষেপ করবেন না। প্রজারা তাদের স্বাধীন ইচ্ছানুসারে দেশের পার্লামেণ্টের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। এই বন্দোবস্তের পর বন্দীরা সকলে মুক্তি পেলেন।

নতুন নির্বাচনে বিপ্লবীরা অংশ গ্রহণ করলেন। শহরের মিউনিসিপ্যালিটি-গুলি সম্পূর্ণরূপে তাঁরা দখল করলেন, রাজার দল সব জায়গায় ভয়ানক ভাবে হেরে গেল। বেগতিক দেখে রাজা বিপ্লবীদের ঠেকাবার জন্যে একবার শেষ চেষ্টার আয়োজন করলেন। তিনি বুঝলেন যে, বিপ্লবীদের হাতে গবর্নমেণ্ট চলে গেলে তাঁর কোন ক্ষমতাই আর থাকবে না। বিপ্লবী নেতা **আলকালা জামোরা** রাজার অভিসন্ধি বুঝতে পেরে তাঁকে দেশত্যাগ করবার উপদেশ দিলেন। রাজাকে তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, বিপ্লবাদের সঙ্গে আবার যদি তিনি বিরোধ করতে যান, তা হলে তাঁর জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হতে পারে।

জামোরার উপদেশ যে অর্থহীন নয়, সেটা বুঝতে পেরে রাজা আলফন্সো **দেশ ছেড়ে পলায়ন** করলেন। রাজার উপর সৈন্যদলের বিশ্বাস আগেই টলে গিয়েছিল, তারাও এসে প্রজাতন্ত্রের নেতাদের সঙ্গে যোগ দিল। বিপ্লবীরা রাজপরিবারের কারও উপর কোন অত্যাচার করল না, কিন্তু যে সব **পাদরী** রাজার নামে তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার বছরের পর বছর ধরে চালিয়ে গিয়েছে, তাদের তারা ছাড়ল না। পাদরীদের তারা প্রাণে মারল না বটে, কিন্তু প্রায় ২০০ গির্জা তারা পুড়িয়ে ছাই করে দিল। পাদরীদের হাতে দেশে শিক্ষাবিস্তারের ভার ছিল, সেটা কেড়ে নেওয়া হল, সরকার থেকে তারা যে সব বৃত্তি পেত, সেগুলো বন্ধ করে দেওয়া হল, টাকা রোজগার করে বড়লোক হবার জন্যে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য করা নিষিদ্ধ হল। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে বিনা রক্তপাতে এই **প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত** হল।

প্রজাতন্ত্রের অধীনে রেলওয়ে সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত হল, দেশে সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহের বন্দোবস্ত হল, শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির জন্যেও অনেক রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করা হল।

বিপ্লবীদের মধ্যে দুটি দল হয়ে গিয়েছিল। একদল চাইল যে, দেশের বড় বড় কলকারখানা প্রভৃতি কোন লোকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে পারবে না; গবর্নমেণ্ট এগুলোর মালিক হবে এবং গবর্নমেণ্টই কর্মচারী নিযুক্ত করে এগুলো চালাবে। এই দলের নাম হল **সমাজতন্ত্রবাদী দল**।

আর একদল বলল যে, এত কড়াকড়ির কোন প্রয়োজন নেই, প্রজাদের নিজেদের গবর্নমেণ্ট যদি প্রতিষ্ঠিত হয়, তা হলেই বড়লোকেরা গরিবদের উপর যাতে অন্যায়-অবিচার না করতে পারে তার ব্যবস্থা হবে। কলকারখানা প্রভৃতি ব্যক্তিগত সম্পত্তিই থাকুক। এই দলের নাম **প্রজাতন্ত্রী দল**। বিপ্লবীদের মধ্যে প্রজাতন্ত্রী দলের লোক ছিল সংখ্যায় বেশী, কাজেই গবর্নমেণ্ট এল তাদের হাতে। সমাজতন্ত্রবাদীরাও পার্লামেণ্টে ঢুকেছিল; তারা প্রজাতন্ত্রী দলকে হারিয়ে গবর্নমেণ্ট হাত করবার জন্যে গোপনে চেষ্টা আরম্ভ করল।

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সমাজতন্ত্রবাদীদের সঙ্গে গবর্নমেণ্টের একটা ছোটখাট রকমের যুদ্ধ হয়, এবং এই সংঘর্ষে গবর্নমেণ্টই জয়লাভ করে। কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদীরা এতে হাল ছাড়ল না। ক্রমাগত চেষ্টার ফলে তারা গবর্নমেণ্ট দখল করতে সক্ষম হল। প্রজাতন্ত্রীরা এবার তাদের কাছে হেরে গেল।

সমাজতন্ত্রবাদীদের বিরুদ্ধে দেশে আবার একটা দল গড়ে উঠতে লাগল। এই দলের নেতা হলেন **জেনারেল ফ্রাঙ্কো** (জন্ম ১১ই ডিসেম্বর, ১৮৯২ খ্রীঃ)। ফ্রাঙ্কো ডিক্টেটরী শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন। দেশের প্রজাদের মতামত নিয়ে কাজ করার চেয়ে, একজন বড় নেতার ইচ্ছানুসারে দেশ শাসন করাই তিনি ভাল মনে করতেন। ফ্রাঙ্কো তাঁর দলবল নিয়ে, সমাজতন্ত্রবাদীদের তাড়িয়ে গবর্নমেণ্ট দখল করবার জন্যে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। এই যুদ্ধই স্পেনের ১৯৩৬—১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের **ঐতিহাসিক গৃহযুদ্ধ**।

এই যুদ্ধে রাশিয়া, ফ্রান্স ও মেক্সিকো সমাজতন্ত্রবাদীদের সাহায্য করেছিল, আর ফ্রাঙ্কো পেয়েছিলেন হিটলার ও মুসোলিনীর সাহায্য। প্রায় তিন বছর ধরে এই যুদ্ধ চলেছিল। ইংলণ্ড এই ব্যাপারে প্রথমে নিরপেক্ষ ছিল, কিন্তু পরে তারা ফ্রাঙ্কো-গবর্নমেণ্টকেই মেনে নিয়েছিল। সমাজতন্ত্রবাদীরা শেষ পর্যন্ত এই যুদ্ধে পরাজিত হল। এই যুদ্ধে প্রায় দশ লক্ষ লোক নিহত হয়। ১৯৩৯

খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ ফ্রাঙ্কো, মাদ্রিদ অধিকার করলে যুদ্ধের অবসান হয়। ফ্যালানজিস্ট দলের নেতা ফ্রাঙ্কো স্পেনে **ডিক্টেটরী শাসন** প্রতিষ্ঠা করলেন। স্পেনে তিনি সর্বময় কর্তা হয়ে বসলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ফ্রাঙ্কো-শাসিত স্পেন বরাবরই **নিরপেক্ষ** ছিল, কিন্তু হিটলার ও মুসোলিনীর প্রতি তাঁর আন্তরিক সহানুভূতির পরিচয় অনেক ক্ষেত্রেই পাওয়া গিয়েছে। প্রধানতঃ তারই ফলে, যুদ্ধ-বিরতির পরে যখন সম্মিলিত জাতিসংঘ-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল, তখন তার সদস্যপদ থেকে বঞ্চিত হল স্পেন।

জেনারেল ফ্রাঙ্কো

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিচক্রের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার তীব্র বিরোধের জন্যে, ইংলণ্ড, মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইওরোপের জাতিসমূহ, ফ্রাঙ্কো-পরিচালিত স্পেনকে নিজেদের দলে টানতে চেষ্টা করে। স্পেনকে একটি কম্যুনিস্ট-বিরোধী ফ্যাসিস্ট-রাষ্ট্রই বলা চলে। একমাত্র ফ্যালানজিস্ট দল দেশে শাসন চালাচ্ছে, সেনাপতি ফ্রাঙ্কো হলেন কডিলো বা রাষ্ট্রনেতা ও প্রধানমন্ত্রী।

১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে আমেরিকার সঙ্গে ফ্রাঙ্কোর একটি সামরিক চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। এই চুক্তির বলে মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র এখন স্পেনের বিমান ও নৌ-ঘাঁটিগুলি ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছে। স্পেন ১৯৫৩ খ্রীঃ রাষ্ট্র-সংঘে প্রবেশের অধিকার লাভ করে। স্পেন এখন জিব্রালটার প্রণালী ফিরে পেতে চায়। এই নিয়ে স্পেনের জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে ইংলণ্ডের কিছু মন কষাকষির সৃষ্টি হয়েছে।

স্পেনের অধিবাসীরা খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী। স্পেনের আয়তন ৪,৯২,৫৯২ বর্গ কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা ৩,২০,০০,০০০ (১৯৬৬ খ্রীঃ)। রাজধানী মাদ্রিদ।

বালটিক সাগরের উত্তরদিকস্থিত দেশগুলিকে প্রাচীনকাল থেকে এক-কথায় **স্কাণ্ডিনেভিয়া দেশ** বলে। নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্ক এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এরা আলাদা আলাদা দেশ হলেও, অনেক বিষয়ে এদের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। একই প্রোটেস্টাণ্ট ধর্ম, এক জাতীয় ভাষা—এবং এদের ইতিহাসেও আরও অনেক ব্যাপারে মিল আছে। এক কথায় এদের **নর্থমেন** বা উত্তরদেশস্থ লোক বলে অভিহিত করা হয়। যারা ইতিহাসে **ভাইকিং** বা সমুদ্রে বিচরণকারী ও লুণ্ঠনকারী জাতি বলে প্রসিদ্ধ, তাদের মধ্যে শুধু দিনেমারগণই নয়, নরওয়ে ও সুইডেনের প্রাচীন জাতিদেরও ধরা যায়।

সুইডেনের প্রাচীন ইতিহাস অনেকটা অস্পষ্ট ও অজ্ঞাত। সুইডিশগণ প্রধানতঃ দেশের উত্তর অঞ্চলেই বাস করত। সুইডেনের দক্ষিণদিকের উর্বর উপদ্বীপ-অঞ্চলে দিনেমারগণের বসতি ছিল। ডেনমার্কের উত্তর অংশে **গথরা** বসবাস করত। সুইডিশগণ আস্তে আস্তে দেশের মধ্য-অঞ্চলে ছড়াতে থাকে। ক্রমে তারা বালটিক সাগরের পূর্বদিকে, বিশেষ করে ফিনল্যাণ্ডের উপকূলভাগে বিস্তৃত হতে থাকে।

খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি সুইডেনের একজন অভিযাত্রী দলপতি, **রুরিক** তাঁর সশস্ত্র দলবলসহ বালটিকের পূর্ব-অঞ্চলে যান এবং সেখানে তিনি প্রথমে ফিনল্যাণ্ডের ফিনদের এবং পরে বালটিকের পূর্বতীরের স্লাভদের যুদ্ধে পরাভূত করেন। কিয়েভ ও নোভগোরড অধিকার করে রুরিক এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে আজকালকার এক শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র রাশিয়ার উৎপত্তি হয়।

সুইডিশগণ অনেক পরে খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করে। তারা পূর্বেকার ধর্ম সহজে ছাড়তে চায় না—এবং দশম শতাব্দীতে, যখন খ্রীস্টধর্ম সুইডেনে ঢুকে পড়েছে তখনও দেশের অনেক লোক আগেকার দেব-দেবীতে বিশ্বাস করত।

রুরিকের সমুদ্র-যাত্রা

প্রথম দিকের রাজাদের দেশের সমস্ত স্থানের উপরে কর্তৃত্ব ছিল না। একাদশ শতাব্দীতে প্রাচীন রাজবংশ লোপ পায়। নতুন **স্টেঙ্কিল** রাজবংশের সময়ে, দেশের রাজা-মনোনয়নে নির্বাচন-প্রথার প্রবর্তন হয়। রাজা **ওলফ** সুইডেনের প্রথম খ্রীস্টান নৃপতি। তাঁর রাজত্বের কিছুদিন পর দ্বাদশ শতাব্দীতে, **ভারকার** সারা দেশের উপর আধিপত্য স্থাপিত করেন। বিদেশী আক্রমণ-কারীদের হাত থেকে দেশরক্ষা-কল্পে, দ্বাদশ শতাব্দীতে, সুইডেনের বর্তমান রাজধানী **স্টকহোলম্** নগরীকে একটি দুর্গরূপে পরিণত করা হয়।

সুইডেনের পরবর্তী নৃপতিগণকে **ফোকুঙ্গার** রাজবংশের লোক বলে। **ম্যাগনাস** এই বংশের একজন নামজাদা রাজা ছিলেন। তিনি অনেক সময়ে দেশের জমিদার ও প্রধান প্রধান লোকদের সঙ্গে নানা বিষয়ে পরামর্শ করতেন। তাঁর শাসনকালে রাজ্যে শৃঙ্খলা ও শান্তি আসে। তাঁর রাজ্যের পরিধি যথেষ্ট বিস্তৃত হয়েছিল। সুইডেনের দুর্দান্ত জমিদারদের ক্ষমতাও তিনি অনেকটা খর্ব করেছিলেন।

ক্রমে সুইডিশ জাতি উত্তরদিকে বিস্তৃত হয় এবং ল্যাপল্যাণ্ড দেশ তাদের অধীন হয়। ইতিমধ্যে শক্তিশালী রাজার অভাবে দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

সুইডেনে অভিজাতবর্গ সর্বদাই ক্ষমতা আদায় করার জন্যে ব্যস্ত থাকতেন, তাঁরা কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতা দেখে অত্যন্ত প্রতাপশালী ও অত্যাচারী হয়ে ওঠেন। জমিদারদের মধ্যে তেমন দেশপ্রেম ছিল না। তাঁরা এই সময়ে নিজেদের স্বার্থসাধন-কল্পে বৈদেশিক জাতি, বিশেষ করে দিনেমার ও জার্মানদের সুইডেনে আমন্ত্রণ করেন। তাঁরা **আলবার্ট** নামে একজন জার্মানকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করতে চাইলেন। বৈদেশিক জার্মান শাসকের সাহায্যে জমিদারগণ নিজেদের ক্ষমতা বাড়িয়ে তুললেন।

কিন্তু দেশের লোকদের মধ্যে এই সময়ে বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে একটা প্রবল অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। শীঘ্রই ফোকুঙ্গার বংশের শেষ শাসনকর্ত্রী **রানী মার্গারেট** সুইডেন, ডেনমার্ক ও নরওয়ের অধীশ্বরী হয়ে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত করেন। মার্গারেট কিছুদিনের জন্যে **"কালমার ঐক্য"** নামে এক একতার প্রবর্তন করে স্কাণ্ডিনেভীয় দেশগুলিকে এক শাসনের অধীনে আনয়ন করেন (১৩৯৭ খ্রীঃ)।

তিনি একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনের প্রতিষ্ঠা ও অভিজাত পরিষদের ক্ষমতা-হ্রাসে প্রয়াসী হন ; কিন্তু তিনি বা তাঁর পরবর্তী শাসনকর্তারা বিদেশী ছিলেন। এই কারণে মার্গারেটের রাজত্বের পর, যখন বৈদেশিক কর্মচারীদের হাতে দেশে কুশাসন আরম্ভ হয়, তখন সুইডিশগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। তারা ডেনমার্কের জার্মান রাজবংশের বিরুদ্ধে দেশের প্রিয় নেতা **কার্ল নুটস্থানকে** শাসনকর্তারূপে নিযুক্ত করল। কার্লের পরে তাঁর বিশ্বস্ত আত্মীয় **স্টেনস্টুর** দেশবাসীর অধিপতিরূপে মনোনীত হন।

স্টেনস্টুর যদিও কোনদিন রাজা উপাধি পান নি, তথাপি সুইডেনের ইতিহাসে তাঁর শাসনকাল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি শাসন-বিষয়ে

সর্বদা কৃষক ও নগরবাসীর সাহায্য নিতেন। ডেনমার্কের **ওল্ডেনবুর্গ** রাজাদের বিরুদ্ধে তিনি ক্রমাগত সংগ্রাম করেন। তাঁরই শাসনকালে সুইডেনে, ১৪৭৭ খ্রীস্টাব্দে **উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়** প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দেশে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন হয়। দেশের জমিদারগণ অনেক সময়ে তাঁর কার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করেন। তবে **পাদরী হেমিংগাড্** প্রভৃতির সাহায্যে স্টেনস্টুর দেশ থেকে দিনেমারদের বিতাড়িত করেন।

এর পর দেশ-নেতাদের মধ্যে **ভাণ্টস্টুরের পুত্র, ছোট স্টেনস্টুর** বিশেষ নামজাদা শাসনকর্তা। তাঁর শাসনকাল মোটেই নিরাপদ বা বাধাহীন ছিল না। এই সময়ে ডেনমার্কে জবরদস্ত **দ্বিতীয় ক্রিশ্চিয়ান** রাজা ছিলেন। তিনি খুব ক্ষমতাপ্রিয় ছিলেন। সুইডেনেও এই সময়ে অন্তর্বিরোধ দেখা দেয়। রাজা ক্রিশ্চিয়ান স্টেনস্টুরের উপর রুষ্ট হয়ে নিজে সমুদ্রপথে স্টক্‌হোল্‌ম নগরী আক্রমণ করেন; কিন্তু বীর স্টেনস্টুর, তাঁর অনুগামী সহচর তরুণ **গাস্টেভাস ভাসার** সাহচর্যে স্টক্‌হোল্‌ম নগরীটি উদ্ধার করেন।

স্টেনস্টুরের মৃত্যু

স্টেনস্টুর ক্রিশ্চিয়ানের সঙ্গে বন্ধুভাবে মিটমাটের আলোচনা আরম্ভ করেন, কিন্তু ডেনগণ **বিশ্বাসঘাতকতা করে** হেমিংগাড্, গাস্টেভাস ভাসা প্রমুখ নেতাগণকে ধরে নিয়ে ডেনমার্কে চলে যায়। তারপর রাজা ক্রিশ্চিয়ান সুইডেনকে অধিকার করবার জন্যে উঠে পড়ে লাগেন। যুদ্ধের পর যুদ্ধ চলতে থাকে। একটি যুদ্ধে স্টেনস্টুর আহত হয়ে শীঘ্রই মারা যান, ফলে বীর

নগরবাসী এবং কৃষকগণ আর বেশীদিন সংগ্রাম চালাতে পারল না। অবিলম্বে ক্রিশ্চিয়ান সুইডেনের **সিংহাসন কেড়ে** নিলেন।

ক্ষমতালাভের পর রাজা ক্রিশ্চিয়ান শক্তি-মাদকতায় মত্ত হয়ে উঠলেন। বিচারের প্রহসন করে তিনি বহু সুইডিশ নেতাকে **হত্যা** করলেন। এই সময়ে হেমিংগাড্‌কেও হত্যা করা হয়। কিন্তু এই অতিমাত্র **অত্যাচারের ফলে** সুইডিশদের মনে ভীষণ আক্রোশ জমে ওঠে। তারা এর প্রতিশোধ নেবার জন্যে উন্মুখ হয়ে ওঠে। সুইডেনের ইতিহাসে তখন যে ব্যক্তির আবির্ভাব হয়, তাঁর নাম পূর্বেই বলেছি। তিনি একজন অসাধারণ লোক। তিনি সুইডেনে নতুন রকমের স্বাধীনতা ও জাগরণ আনেন। তাঁর নাম **গাস্টেভাস ভাসা।**

গাস্টেভাস ভাসা

গাস্টেভাস ছিলেন দৃঢ়চিত্ত, ক্ষিপ্রগতি, স্থিরবুদ্ধি ও উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁর দেশের দুর্গতি ও অত্যাচারের কথা শুনে তিনি আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। নানা কৌশল অবলম্বন করে তিনি ছদ্মবেশে ডেনমার্ক থেকে পালিয়ে এলেন। শীঘ্রই তিনি সুইডেনে এসে উপস্থিত হলেন। দেশের লোকদের উৎসাহিত করার জন্যে তিনি নানাস্থানে বেড়ালেন ও নানাভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি দিনেমারদের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে উত্তেজিত করে তাদের সংঘবদ্ধ করলেন। সুইডিশরাও সকলে ক্রিশ্চিয়ানের অত্যাচারে এত জর্জরিত হয়েছিল যে; তারা গাস্টেভাসকেই সুইডেনের **রাজা বলে মনোনীত** করল। গাস্টেভাস এই স্বাধীনতার ও মুক্তিকামী-যুদ্ধে অসামান্য সাফল্য লাভ করলেন এবং সুইডেন্ থেকে ডেনমার্কের ক্ষমতা অপসারিত করলেন। তিনি অবিলম্বে স্টক্‌হোল্‌ম নগরী, অপরাপর দুর্গ এবং ফিনল্যাণ্ড দেশ পুনরুদ্ধার করে সুইডেনকে একটি **পূর্ণ স্বাধীন রাজ্যে** পরিণত করলেন।

গাস্টেভাস এখন দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির দিকে মনোযোগ দিলেন। নিজের শাসনের সুবিধার জন্যে তিনি **প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মকে** সুইডেনের রাজধর্ম করলেন। কেন্দ্রীয় গবর্নমেণ্টকে শক্তিশালী করে তিনি দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়ন করলেন। তিনি ১৫২৩ খ্রীস্টাব্দে রাজা হন—এবং তারপর প্রায় পঁচিশ বছর পর্যন্ত অনবরত একটি বড় রাষ্ট্রের শক্তিমান্ রাজা হতে চেষ্টা করেন। তিনি শান্তিকামী ও কৌতুকপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু নতুন নিয়ম-কানুন প্রবর্তনে

কোনরূপ বাধা মানতেন না। সুইডেনের আইন-পরিষদ বংশপরম্পরায় **ভাসা-বংশকে** দেশের **রাজবংশ** বলে স্থির করে নিল।

গাস্টেভাস শুধু নিজের সম্পত্তি বাড়ালেন না, রাজ্যের সমৃদ্ধিও অনেক বাড়িয়ে তুললেন; ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতিসাধন করলেন। তিনি সৈন্যদলকে নতুন ভাবে গঠন করলেন, বড় বড় জাহাজ তৈরি করে নৌ-বহর সৃষ্টি করলেন এবং ফিনল্যাণ্ডের উপর রাশিয়ার আক্রমণ প্রতিরোধ

গাস্টেভাস ভাসা

করলেন। সৃজনী-শক্তি ও কর্মদক্ষতায় তাঁকে ফ্রান্সের একাদশ লুই, প্রাসিয়ার গ্রেট ইলেকটর এবং এমন কি, রাশিয়ার পিটার দি গ্রেটের সঙ্গে তুলনা করা চলে।

গাস্টেভাস সুইডেনে যে ভাসা-রাজবংশের প্রবর্তন করেন, সেই বংশে বহু সুদক্ষ রাজার আবির্ভাব হয়। তাঁদের রাজত্বকালে সুইডেনের রাজ্যসীমা ক্রমেই বিস্তৃত হতে থাকে। ধীরে ধীরে বালটিক সাগর অঞ্চলে সুইডেনের

প্রভুত্ব গড়ে ওঠে। গাস্টেভাসের পর তাঁর ছেলে **চতুর্দশ এরিক** সিংহাসনে বসেন। এরিক এস্তোনিয়া দেশ জয় করেন, কিন্তু শীঘ্রই তিনি ডেনমার্ক ও পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়ে পড়েন। এরিকের নানা গুণ ছিল, কিন্তু তিনি স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী ছিলেন। তাঁর দুই বৈমাত্রেয় ভাই, **জন** এবং **চার্লস** তাঁকে **সিংহাসন থেকে বিতাড়িত** করেন।

তারপর **জন** সুইডেনে রাজত্ব করতে থাকেন। রাজা হয়ে জনের নাম হয় **তৃতীয় জন**। তিনি রাজ্যশাসনে কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। ডেনমার্কের সঙ্গে দীর্ঘ যুদ্ধে সুইডেনের খুব ক্ষতি হয়েছিল। ধর্মব্যাপারে জনের আত্মম্ভরিতা ও রোমান-ক্যাথলিক ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্বে সুইডিশগণ খুব চটে যায়। জনের ভাই চার্লসও রাজার বিরুদ্ধাচরণ করেন।

১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে জন তাঁর পুত্র, **সিগিসমুণ্ডকে** পোল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসান। এর ফলে ভবিষ্যতে পোল্যাণ্ডের ভাসা-বংশের রাজাদের সঙ্গে সুইডেনের ভাসা-বংশের রাজগণের অনেকদিন পর্যন্ত সংঘর্ষ চলে। কিছুদিন পর্যন্ত সিগিসমুণ্ড সুইডেনেরও অধিপতি ছিলেন সত্য, কিন্তু তার ক্যাথলিক-ধর্মের জন্যে দেশবাসিগণ চার্লসের পক্ষই সমর্থন করল।

এর পরে চার্লস **নবম চার্লস** উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসলেন। তিনি পোল্যাণ্ড ও ডেনমার্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

গাস্টেভাস অ্যাডলফাস

নবম চার্লসের পরে তাঁর পুত্র **গাস্টেভাস অ্যাডলফাস** (১৫৯৪—১৬৩২ খ্রীঃ) সুইডেনের অধীশ্বর হন। তিনি সুইডেনের প্রসিদ্ধ ভাসা-বংশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন। তিনি নানা রাজকীয় গুণে বিভূষিত ছিলেন। তাঁর প্রতিভা ছিল অসাধারণ। তিনি শুধু শক্তিশালী রাজা ও বড় যোদ্ধা নন, নানা বিদ্যায়ও সুপণ্ডিত ছিলেন। অল্পবয়সেই তিনি ইতিহাস, সংগীত, রাজনীতি ও উন্নত রণনীতিসমূহ আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি অনেক ভাষা জানতেন। তাঁর আন্তরিকতা ও আদর্শ দ্বারা তিনি সমস্ত জাতির মধ্যে নতুন প্রেরণা এনেছিলেন। রাজ্যের নানা ব্যাপারে তিনি দেশের লোকদের পরামর্শের জন্যে আহ্বান করতেন। সামরিক কৌশলে তিনি এত অসাধারণ উন্নতির ব্যবস্থা করেছিলেন যে, সুইডিশ জাতি ইওরোপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সামরিক জাতিতে পরিণত হল।

গাস্টেভাস অ্যাডলফাসকে প্রায় সারা রাজত্বকালেই যুদ্ধবিগ্রহ করতে হয়। বালটিক-অঞ্চলে সুইডেনের আধিপত্য বাড়াবার জন্যে তিনি আশেপাশের রাজ্যগুলির সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধ করেন। ডেনমার্ক, রাশিয়া, পোল্যাণ্ড—প্রত্যেকটি দেশের সঙ্গেই একের পরে একে তাঁকে সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়।

গাস্টেভাস অ্যাডলফাস

১৬১৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে জার্মেনীতে প্রসিদ্ধ "ত্রিশবৎসরব্যাপী যুদ্ধ" চলছিল। এই যুদ্ধে ইওরোপের অনেক রাষ্ট্র জড়িত হয়ে পড়েছিল। এতে প্রধানতঃ প্রোটেস্টাণ্ট ও ক্যাথলিক শক্তিগণ বিভিন্ন পক্ষ অবলম্বন করে। ক্যাথলিকদের পক্ষে অস্ট্রিয়ার সম্রাট্ নেতা ছিলেন। ফ্রান্সের বিখ্যাত রাজনীতিবিদ্ **রিসল্যু** নিজে ক্যাথলিক হলেও, রাজনৈতিক কারণে, জার্মেনীর যুদ্ধে প্রোটেস্টাণ্টদের

পক্ষে ছিলেন। তিনি যখন দেখলেন যে, ত্রিশ বছরের যুদ্ধে ক্যাথলিক শক্তিগণ জয়লাভ করে যাচ্ছে, তখন তিনি সুইডেনের বীর নৃপতি গাস্টেভাস অ্যাডলফাসকে, প্রোটেস্টাণ্টদের পক্ষে জার্মেনীতে যুদ্ধ করতে অনুরোধ করলেন। গাস্টেভাসও এই সুযোগ ছাড়লেন না।

গাস্টেভাস ইতিমধ্যে বহু যুদ্ধে বিশেষ নাম করেছিলেন। তিনি সুইডেনে অনেক উপযুক্ত সেনানায়কও সৃষ্টি করেছিলেন। জার্মেনীতে ত্রিশ বৎসরের যুদ্ধে যোগ দেবার সঙ্গে সঙ্গেই, তাঁর আশ্চর্য রণনৈপুণ্যে সকলেই চমৎকৃত হল। একটার পর একটা যুদ্ধে তিনি একটানা জয়লাভ করতে লাগলেন। ক্যাথলিকগণ ক্রমেই হটে যেতে লাগল। প্রোটেস্টাণ্টদের অবস্থা দ্রুতগতিতে উন্নতি লাভ করল। গাস্টেভাসের জয়-জয়কার পড়ে গেল; কিন্তু তিনি আর অধিক দিন বাঁচলেন না। ১৬৩২ খ্রীস্টাব্দে প্রসিদ্ধ **লুটজ্যেনের যুদ্ধে** তিনি অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়েছিলেন, কিন্তু এই যুদ্ধজয়ের কালেই হঠাৎ তিনি আততায়ীর গুলিতে **নিহত হন।**

গাস্টেভাস অ্যাডলফাস তাঁর বিজয়-অভিযানসমূহ ও বীরোচিত মৃত্যুর দ্বারা সুইডিশগণের মনে এক নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে চলে সুইডেন ভবিষ্যতে উন্নতির পর উন্নতি করে যেতে লাগল। তিনি সুইডেনকে শেখালেন নতুন রণবিদ্যা, তাকে দিলেন সারা ইওরোপে সম্মান, সুইডিশদের মনে বালটিক-সাম্রাজ্যের স্বপ্ন জাগরূক করলেন এবং রাজাকে করলেন দেশের কেন্দ্রশক্তি।

গাস্টেভাস অ্যাডলফাসের মৃত্যুর পর তাঁর শিশুকন্যা **ক্রিস্টিনা** দেশের রানী হলেন। গাস্টেভাসের বিশ্বস্ত অনুচর **অক্সেনস্টিয়ানা,** ক্রিস্টিনার হয়ে দেশ শাসন করতে লাগলেন। বয়ঃপ্রাপ্তা হয়ে ক্রিস্টিনা নিজের হাতে শাসনভার গ্রহণ করলেন, কিন্তু রাজকার্যে তিনি কোন কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। রানী ক্রিস্টিনার রাজ্যশাসনে বিশেষ আগ্রহও ছিল না। তিনি একটু স্বাধীনচেতা ছিলেন। দেশশাসনের চেয়ে লেখাপড়া ও সাহিত্যের আলোচনায় সময় কাটাতে তিনি বেশী ভালবাসতেন। তাঁর দরবারে বিভিন্ন **বিদ্বান্ লোকের সমাবেশ** হয়েছিল। অনেক পণ্ডিত ও সাহিত্যিককে তিনি প্রচুর অর্থ সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু তাঁর রাজকার্যে শৈথিল্য ও অপটুতা হেতু এবং অর্থ-নৈতিক বিশৃঙ্খলার জন্যে রাজ্যে ক্রমেই অবনতি দেখা দিতে লাগল। রানী ক্রিস্টিনাও আর বেশী দিন সিংহাসনে থাকতে চাইলেন না। ১৬৫৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করে রোমে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি

শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন ও সাহিত্য প্রভৃতির সাধনায় দিন কাটাতে লাগলেন ক্রিস্টিনা **চিরকুমারী ছিলেন।**

রানী ক্রিস্টিনা

ক্রিস্টিনার পরে তাঁর সম্পর্কিত ভাই **দশম চার্লস** সুইডেনের সিংহাসনে ষ্ঠিত হলেন। তিনি ছিলেন নামজাদা যোদ্ধা এবং তাঁকে **সুইডেনের নেপোলিয়ন** বলা হয়। তিনি যেমন উৎসাহী তেমনি সমরপ্রিয় ছিলেন।

প্রতিবেশী-রাজ্যগুলির সহিত যুদ্ধে তিনি অল্পকালের মধ্যেই বিশেষ যোগ্যতা দেখান। রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, প্রাসিয়া সকলেই তাঁর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে অস্ত্রধারণ করে, কিন্তু চার্লস তাঁর শৌর্য দ্বারা সমস্ত বিপদ্ অতিক্রম করেন। ডেনমার্ককে তিনি যুদ্ধে পরাভূত করেন এবং নরওয়ের ক্ষমতা বিশেষভাবে ভেঙে দেন। বিরাট বাধার বিরুদ্ধে তিনি অবিরাম ভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যান, কিন্তু শীঘ্রই তাঁর মৃত্যু হওয়ায় সুইডেনকে প্রতিপক্ষ রাজ্যগুলির সঙ্গে শান্তি স্থাপন করতে হল।

দশম চার্লসের পর তাঁর শিশুপুত্র **একাদশ চার্লস** সিংহাসনে বসলেন। এই সময় সুযোগ পেয়ে, সুইডেনের জমিদারগণ আবার দুর্বিনীত ও পরাক্রান্ত হয়ে ওঠেন। তাঁদের অনাচারের জন্যে বাইরে সুইডেনের সুনাম যথেষ্ট হ্রাস পায়।

একাদশ চার্লসও বিশেষ সুনিপুণ যোদ্ধা ছিলেন। তিনি বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে নিলেন, বিদেশী শত্রুদের তিনি পরাজিত করলেন এবং দেশের বিদ্রোহী সামন্তদের জোর করে নিজের অধীনে নিয়ে এলেন। চার্লস তাঁর শক্তির সাহায্যে দেশের শান্তি ফিরিয়ে আনলেন ও একটি প্রবল সৈন্যবাহিনী গঠন করলেন।

দ্বাদশ চার্লস

একাদশ চার্লসের রাজত্বের পর তাঁর ছেলে **দ্বাদশ চার্লস** (১৬৮২—১৭১৮ খ্রীঃ) যখন সিংহাসন অধিকার করলেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র পনের বছর। এই দ্বাদশ চার্লস ছিলেন এক অদ্ভুত ব্যক্তি। অল্প বয়সেই তিনি যে সামরিক প্রতিভা দেখান তা বিস্ময়কর। সে-যুগে তাঁর সমকক্ষ যোদ্ধা সারা ইওরোপে আর কেউ ছিলেন না। রণবীর হিসাবে তাঁকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা আলেকজাণ্ডার বা নেপোলিয়নের সঙ্গে তুলনা করা যায়; কিন্তু এত বড় প্রতিভাবান্ হলেও চার্লস মোটেই বাস্তববুদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত **একগুঁয়ে, দাম্ভিক** এবং তাঁর সব কাজই ছিল কাল্পনিক ও হঠকারিতাপূর্ণ। এই কারণে যদিও তাঁরই রাজত্বকালে সুইডেন বিরাট সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছিল, তথাপি তাঁর সময়েই সুইডেন-সাম্রাজ্যের দ্রুতগতি পতন আরম্ভ হয়।

চার্লসের সিংহাসনে বসবার অল্প পরেই সুইডেনের প্রতিবেশী শত্রুরাষ্ট্রগুলি, বিশেষ করে ডেনমার্ক, পোল্যাণ্ড এবং রাশিয়া চার্লসের বিরুদ্ধে সমবেত ভাবে

অস্ত্রধারণ করল। এই ভাবে প্রসিদ্ধ **"উত্তর অঞ্চলের যুদ্ধ"** শুরু হল। এই সময় রাশিয়ায় খ্যাতনামা জার **পিটার** ছিলেন সিংহাসনে। তিনি যেমন বুদ্ধিমান্, চতুর, তেমনি ছিলেন বড় রাজনীতিজ্ঞ। পিটারের উদ্দেশ্য ছিল বালটিক-অঞ্চল হতে সুইডেনের ক্ষমতা অপসারিত করে সেখানে রাশিয়ার প্রতিপত্তি কায়েম করা। তিনি অন্যান্য শক্তিদের সহযোগে, চার্লসের বিরুদ্ধে একটি
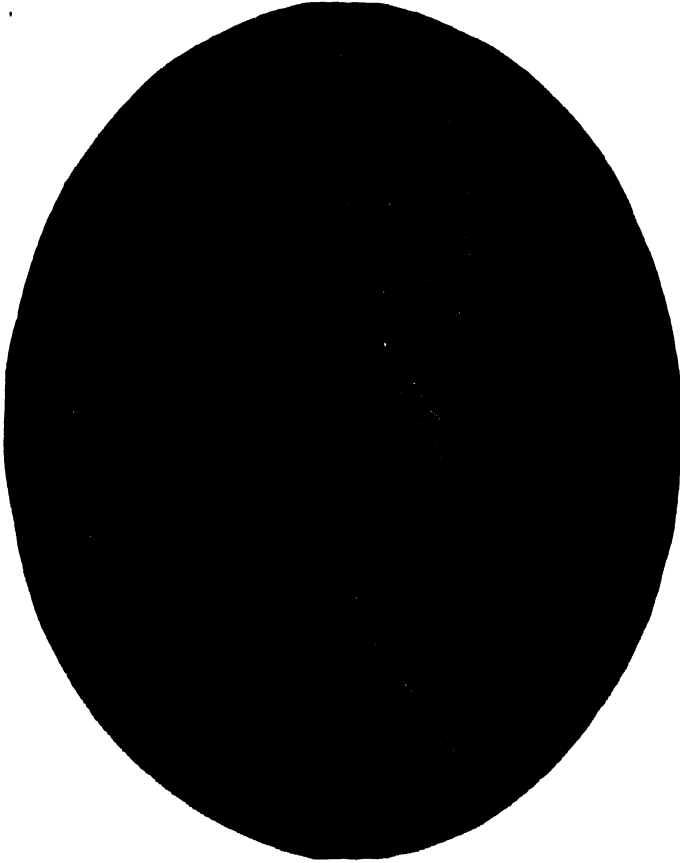
দ্বাদশ চার্লস

বিরাট মিত্রশক্তিমণ্ডলী গঠন করলেন এবং নানাদিক থেকে আক্রমণ করে চার্লসকে বিব্রত করে তুললেন।

পিটার অল্প সময়ের মধ্যেই টের পেলেন যে, দ্বাদশ চার্লস বয়সে তরুণ হলেও সামরিক বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। যুদ্ধের মত আর কোন জিনিসকেই চার্লস ভালবাসতেন না, যুদ্ধের বিপদে ও কষ্টে তিনি খুব আনন্দ পেতেন।

অসামান্য ত্বরিত গতিতে, তিনি প্রতিপক্ষ মিত্রশক্তিবর্গের একটার পর একটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলেন এবং প্রত্যেককেই হটিয়ে দিলেন।

চার্লস ছিলেন যুদ্ধে অক্লান্ত। তিনি শীঘ্রই **পোল্যাণ্ডকে হারিয়ে** দিয়ে সেখানে তাঁর মনোমত একজন লোককে রাজা করলেন। তারপর তিনি ছুটে গেলেন **জার্মেনীর অভ্যন্তরে** এবং অস্ট্রিয়ার সম্রাট্ লিওপোল্ডের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়লেন। এই সময়ে চার্লসের যশ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তখন ইওরোপে **স্পেন-উত্তরাধিকার যুদ্ধ** চলছিল। পাছে চার্লস ফ্রান্সের শক্তিমান্ সম্রাট্ চতুর্দশ লুইয়ের পক্ষে চলে যান, এই ভয়ে ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ সেনানী **মার্লবরো,** চার্লসের বন্ধুত্ব লাভ করার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠলেন। অবশ্য চার্লস তাঁর নিজের শক্তি-মাদকতায় সমস্ত সুযোগ হেলায় হারালেন। তিনি লুইয়ের সঙ্গে সহযোগিতা করলেন না। বস্তুতঃ চার্লসের জার্মেনীতে প্রবেশ করা **মস্ত ভুলের কাজ** হয়েছিল।

চার্লস যখন জার্মেনীতে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন পিটার সময় পেয়ে দৃঢ়-ভাবে তাঁর যুদ্ধের আয়োজন সম্পূর্ণ করেছিলেন। পিটার আবার বালটিকের দিকে সসৈন্যে অভিযান আরম্ভ করলেন। উদ্ধত-প্রকৃতির চার্লস এতে ভীষণ চটে গেলেন। তিনি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে একেবারে রাশিয়ার রাজধানী মস্কো নগরী জয় করার অভিপ্রায়ে তাঁর সৈন্যদল নিয়ে মূল **রাশিয়া আক্রমণ** করলেন।

চার্লস যতই দ্রুতগতিতে রাশিয়ার ভিতরে বিজয়-গর্বে এগিয়ে চললেন, ততই বিচক্ষণ পিটার তাঁর অগণিত সৈন্যসংখ্যা নিয়ে, চারপাশ থেকে চার্লসকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। হঠকারী চার্লস বিপদের জালে আটকে পড়লেন। তখন ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দে **পোল্টাভার যুদ্ধ** হল, চার্লস সম্পূর্ণভাবে হেরে গেলেন, তাঁর সৈন্যদল বিপর্যস্ত হয়ে গেল। চার্লস তুরস্কে পালিয়ে গেলেন। পোল্টাভার যুদ্ধের ফলে সুইডেনের **সাম্রাজ্য ভেঙে গেল।**

বিপক্ষ শক্তিরা একের পর এক বালটিক-সাম্রাজ্যের অংশগুলি সুইডেনের হাত থেকে কেড়ে নিতে লাগল। সুইডেনের চিরকালের স্বার্থান্বেষী, দুর্দান্ত জমিদারগণ দেশে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করল। যদিও চার্লস কিছুদিন পরে সুইডেনে ফিরলেন, কিন্তু তিনি আর দেশের পূর্বগৌরব ফেরাতে পারলেন না। তিনি ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে নরওয়ে আক্রমণ করেন। ফ্রেড্রিকশাল্ড্ দুর্গ অবরোধকালে তিনি নিহত হন। এরপর থেকে ক্ষিপ্রগতিতে সুইডেনের গরিমা ম্লান হতে লাগল ; সুইডেনের জায়গায় রাশিয়া পূর্ব-বালটিকে তার প্রভুত্ব স্থাপন করল।

এরপর পর্যায়ক্রমে দ্বাদশ চার্লসের ভগ্নী, **উলরিকা ইলিওনোরা,** তাঁর স্বামী, **প্রথম ফ্রেডারিক** এবং **এডলফাস ফ্রেডারিক** রাজত্ব করেন। তাঁদের রাজত্বকালে ক্ষুদ্র জমিদারের দলরাই সাধারণতঃ রাজকর্মচারী ছিলেন। তাঁদের হাতেই ক্ষমতা একরূপ ন্যস্ত ছিল। এই সময়ে সুইডেন একবার রাশিয়ার বড় নগরী পেট্রোগ্রাডকে আক্রমণ করতে গিয়ে হেরে গেল।

১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত, ইওরোপীয় **'সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে'** সুইডেন প্রাসিয়ার শক্তিমান্ ফ্রেডারিক দি গ্রেটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে বিশেষভাবে **অপদস্থ হল।** এই সময়ে সুইডেনের অত্যন্ত দুরবস্থা। এক সময়ে প্রাসিয়া ও রাশিয়া সুইডেন-রাজ্যকে ভাগ করে নেবারও চেষ্টা করেছিল। তখন **তৃতীয় গাস্টাক** নামক একজন সুযোগ্য যুবক রাজা, সুইডেনের স্বাধীনতা এবং রাজার ক্ষমতা রক্ষা করলেন।

চতুর্দশ চার্লস (জীন বার্নাদোত্)

তারপর **চতুর্থ গাস্টাক** ও **ত্রয়োদশ চার্লস** ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত পর পর রাজত্ব করেন। এই সময়ে ফরাসী বীর নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে সুইডেন খুব নাজেহাল হয়েছিল। অতঃপর সুইডেনের সিংহাসনে এলেন নেপোলিয়নের একজন ফরাসী সেনানায়ক, **বার্নাদোত্।**

জীন বার্নাদোত্ চতুর্দশ চার্লস উপাধি নিয়ে ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সুইডেনে রাজত্ব করেন। তিনি সিংহাসনে বসবার পর যুদ্ধ-বিগ্রহ ছেড়ে দিলেন এবং শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে সুইডেনের উন্নতি আরম্ভ করলেন।

বার্নাদোত্ ও তাঁর বংশধরগণ যথা, **প্রথম অস্কার, পঞ্চদশ চার্লস, দ্বিতীয় অস্কার** এবং **পঞ্চম গাস্টাক** প্রভৃতির রাজত্বকালে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে, সুইডেনে আবার নানাদিকে উন্নতি দেখা দিল। তাঁদের চেস্টায় ক্রমে সুইডেন একটি খুব সভ্য ও উন্নত দেশে পরিণত হল। শিল্প, কৃষি ও বিজ্ঞানে দেশ বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করল। সুইডেনে বরাবরই লোকসংখ্যা

খুব কম ছিল এবং দেশটা দরিদ্র ছিল। বর্তমান যুগে দেশের রাজা ও শাসকবৃন্দ, ক্রমাগত দেশটিকে যুদ্ধের হাত থেকে দূরে রেখে ও শান্তির নীতি অবলম্বন করে, সুইডেনে বিভিন্ন দিকে এত উন্নতির ব্যবস্থা করতে পেরেছেন।

শান্তিপূর্ণ নীতি

বিংশ শতাব্দীতে সুইডেন আশেপাশের দেশগুলি—যথা, ডেনমার্ক, নরওয়ে, ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতির সঙ্গে বন্ধুত্ব-নীতি অনুসরণ করে আসছে। সুইডেন ও নরওয়ে যদিও বর্তমানে আর আগেকার মত প্রতিপত্তিশালী রাষ্ট্র নয়, তবুও আজকাল এই দুটো দেশই শান্তি-ব্যবস্থা, সমৃদ্ধি, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি নানাদিকে খুব বেশী এগিয়ে গেছে।

বেশ কিছুকাল পর্যন্ত সুইডেনের নীতি চলে এসেছে,—শান্তিপূর্ণভাবে দেশের উন্নতি করা, যুদ্ধের পথে নয়। এই জন্যে দেখা যায়, সুইডেন বিংশ শতাব্দীর দুটি মহাসমরের একটিতেও জড়িয়ে পড়ে নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সে একরূপ নিরপেক্ষই ছিল।

১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠলে, সুইডেনের রাজা (পঞ্চম **গাস্টাফ** ইনি ১৯০৭ খ্রীঃ, ৮ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৫০ খ্রীঃ, ২৯শে অক্টোবর পর্যন্ত রাজত্ব করেন) যুদ্ধে নিরপেক্ষতা ঘোষণা করলেন। এই সময়ে সুইডেনের রাজধানী স্টক্‌হোল্‌মে বালটিক-রাষ্ট্রগুলির একটা সম্মিলন হল। এই সম্মিলনে বিভিন্ন শক্তির কর্ণধারগণ, তাঁদের পরস্পর দেশের মধ্যে নিবিড়তর সহযোগের আগ্রহ প্রকাশ করলেন এবং তাঁরা নিজেদের দেশগুলিকে যথাসম্ভব যুদ্ধ হতে দূরে রাখবার সংকল্প করলেন।

যদিও সুইডেন যুদ্ধে ব্যাপৃত হল না বটে—কিন্তু আজকাল যুদ্ধের পরিসর এত ব্যাপক যে, নিরপেক্ষ দেশগুলিরও একেবারে নিশ্চিন্ত থাকা চলে না। যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, জার্মেনী সমগ্র বালটিক-অঞ্চল তার আয়ত্তাধীনে নিয়ে এল। শীঘ্রই প্রতিদ্বন্দ্বী-শক্তি জার্মেনী ও ইংলণ্ডের মাইন-আক্রমণে সুইডেনের কয়েকটি জাহাজ ঘায়েল হল। এরপর রাশিয়া যখন অতর্কিত-ভাবে ফিনল্যাণ্ডকে আক্রমণ করল, তখন সুইডেন নিজেকে আরও বিপন্ন ভাবলে। এই সব কারণে সুইডেনকে বাধ্য হয়ে নানারূপ আত্মরক্ষা-ব্যবস্থার আয়োজন করতে হয়েছিল। তার সমস্ত উপকূল-অঞ্চল বরাবর, সুইডেন বিভিন্ন সৈন্য-ঘাঁটি স্থাপন আর দেশের চারপাশে একটা সতর্ক-পাহারার ব্যবস্থা করেছিল

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সুইডেন নিজেকে যুদ্ধ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল; তবে যুদ্ধের ঝামেলা তাকে অনেক সময়ই সইতে

হয়েছে। ইওরোপীয় যুদ্ধের অবসানে সুইডেনই শান্তির দূতরূপে কাজ করেছিল। জার্মেনী সুইডেনের মাধ্যমেই ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের নিকট, সুইডেনের নেতাদের হাত দিয়ে, যুদ্ধ-স্থগিতের ও শান্তির প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। বর্তমানে সুইডেন দেশ বেশ উন্নতি করে চলেছে।

সুইডেনের রাজা ষষ্ঠ গাস্টাক ও রানী

সুইডেনের শাসনব্যবস্থা এখন নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র, দেশের **রিকসৃডাগ** বা পার্লামেণ্ট দুই-কক্ষ বিশিষ্ট। সুইডেনের বর্তমান রাজা হলেন ষষ্ঠ **গাস্টাক**। ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের ১১ই নবেম্বর তাঁর জন্ম হয়। তিনি ১৯৫০ খ্রীঃ, ২৯শে অক্টোবর পিতা পঞ্চম **গাস্টাকের** মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ডাঃ **ট্যাগে আর্লেণ্ডার** ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ৯ই অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী হন। নরওয়ে ও ডেনমার্কের মত সুইডেনেরও সমস্যা খুব কম। দেশবাসীর সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক কল্যাণবিধানে সুইডেন এখন একটি বিশেষ অগ্রসর-রাষ্ট্র।

বর্তমানে সুইডেন উত্তর অতলান্তিক চুক্তি সংস্থার সদস্যভুক্ত রাষ্ট্র। সুইডেনের যুদ্ধ-ঘাঁটিগুলি আমেরিকাকে ব্যবহার করতে অধিকার দেওয়া হয়েছে। সুইডেন বিমান শক্তিতে পৃথিবীর চতুর্থ রাষ্ট্র (প্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দ্বিতীয় সোভিয়েট রাশিয়া, তৃতীয় গ্রেট ব্রিটেন)।

সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী ট্যাগে আর্লেণ্ডার

সুইডেনের অধিবাসীরা খ্রীস্ট-ধর্মাবলম্বী। এর আয়তন ৪,১১,৪০৬ বর্গ কিলোমিটার (১,৫৮,৮৪৫ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ৭৮,৪৩,০৮৮ (১৯৬৬ খ্রীঃ)। রাজধানী স্টক্‌হোল্‌ম

হল্যাণ্ড

নেদারল্যাণ্ডস হল্যাণ্ডের বর্তমান নাম। পূর্বে হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ফ্ল্যাণ্ডার্সকে একসঙ্গে বলা হত নেদারল্যাণ্ডস। 'নেদারল্যাণ্ড' শব্দটির মানে নিম্নতর জমি। হল্যাণ্ডের অনেক অংশ বস্তুতঃ সমুদ্রতটের সীমানার তলে অবস্থিত। উত্তর-সাগর থেকে দেশটিকে রক্ষা করার জন্যে অনেক বাঁধ ও কৃত্রিম প্রাচীরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমুদ্রের সঙ্গে সর্বদা লড়াই করে ওলন্দাজগণ ইতিহাসের গোড়া থেকে খুব দুর্ধর্ষ, সাগর-বিহারী জাতিতে পরিণত হয়েছে। নৌ-বাণিজ্যেও তারা সহজেই পারদর্শিতা লাভ করেছে।

অনেকদিন থেকেই ওলন্দাজগণ উল ও অন্যান্য জিনিস উৎপন্ন করত এবং পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মসলাপাতির ব্যবসা করত। হল্যাণ্ডের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকেই, ইওরোপের অপরাপর দেশের সওদাগরগণ এই সব বাণিজ্যদ্রব্য ক্রয় করত। দুঃসাহসিক ওলন্দাজ নাবিকেরা তাদের অসংখ্য জাহাজে করে পৃথিবীর দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে নানা স্থান থেকে যে-সকল দ্রব্যাদি আহরণ করে আনত, তা ইওরোপের বিভিন্ন দেশের লোকেরা তাদের কাছ থেকে নিত। এরূপে ব্রুজেলস, ঘেণ্ট

এবং বিশেষ করে এণ্টোয়ার্প নগরীর মত সমৃদ্ধিশালী ও কর্মচঞ্চল নগরীর উৎপত্তি হয়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে **এণ্টোয়ার্প** নগরী ইওরোপের বাণিজ্য-কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এখানকার ওলন্দাজ বণিকদের সমকক্ষ আর কোন দেশের বণিকেরা ছিল না।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে **হ্যাপসবুর্গ রাজবংশের** সম্রাট্ **পঞ্চম চার্লস,** তাঁর বাপ-ঠাকুরদার বৈবাহিক-সূত্রে অস্ট্রিয়া, স্পেন প্রভৃতি বহুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিপতি হন। তাঁর রাজত্বের পরে তাঁর বিরাট সাম্রাজ্য ভাগ হয়ে যায়। হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ম তাঁর ছেলে, স্পেনের শক্তিমান্ **সম্রাট্ দ্বিতীয় ফিলিপের** অংশে পড়ে। প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে,
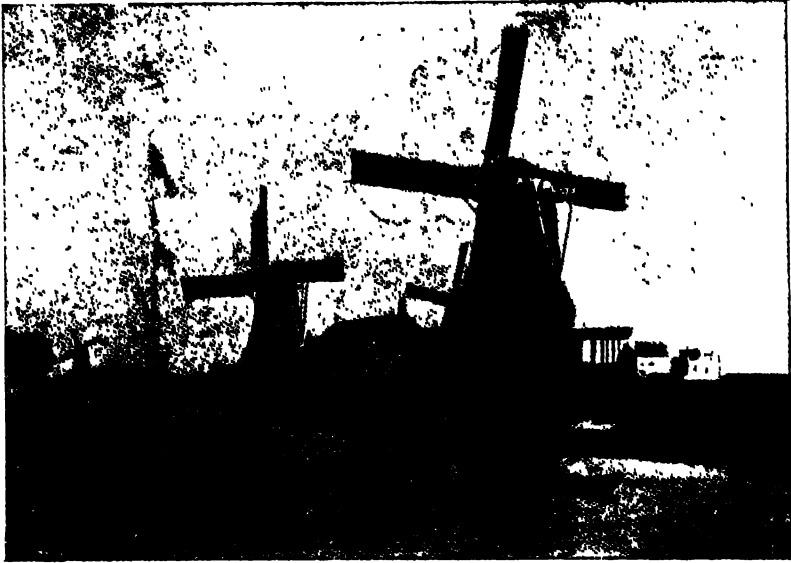
হল্যাণ্ডের একটি দৃশ্য

উত্তর-ইওরোপের অধিকাংশ জাতির মত, হল্যাণ্ডের লোকেরা বেশির ভাগই ঐ নতুন ধর্ম গ্রহণ করে। দ্বিতীয় ফিলিপ ছিলেন অত্যন্ত গোঁড়া ক্যাথলিক। তিনি সারাজীবন প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মের ধ্বংসের জন্যে সংগ্রাম করেন। তিনি যখন দেখলেন যে, তাঁরই প্রজা হল্যাণ্ডবাসীরা মার্টিন লুথারের নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছে, তখন তিনি তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি তাদের সমুচিত শিক্ষা দেবেন।

উইলিয়ম দি সাইলেণ্ট

দ্বিতীয় ফিলিপ ছিলেন ভয়ানক একগুঁয়ে, উদ্ধত প্রকৃতির নৃপতি। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের অধীন প্রজাদের কোনরূপ ধর্ম-সংক্রান্ত বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা একেবারেই বরদাস্ত করতে পারতেন না। তিনি হল্যাণ্ডের নগর-গুলির সুবিধা-সুযোগ বিনষ্ট করতে ও তাদের নতুন ধর্মের উচ্ছেদকল্পে, **ডিউক আল্‌ভা** নামক এক নির্মম অত্যাচারী ব্যক্তিকে সেখানে প্রধান শাসনকর্তা করে পাঠালেন (১৫৬৮—১৫৭৩ খ্রীঃ)।

দ্বিতীয় ফিলিপ

আল্‌ভা ওলন্দাজদের উপর অমানুষিক, নিষ্ঠুর উৎপীড়ন শুরু করলেন। তিনি একটা দেশের সমগ্র নরনারীর স্বাধীনতার চেতনার বিরুদ্ধে যে নৃশংস অভিযানের প্রবর্তন করেছিলেন, তা ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে দুরপনেয় কলঙ্কে মসীলিপ্ত করেছে। সারা বিশ্বের কলঙ্ক তৈমুরলঙ্গ বা নাদির শার নিষ্ঠুরতার সঙ্গেই শুধু তার তুলনা চলে। স্পেন-সরকারের অত্যাচার-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ওলন্দাজদের প্রতিরোধ-ক্ষমতাও বাড়তে লাগল। এই সময়ে হল্যাণ্ডে একজন স্বার্থত্যাগী, মহৎ বীরের আবির্ভাব হয়। তাঁর নাম অরেঞ্জ-বংশের **প্রিন্স উইলিয়ম** বা **উইলিয়ম দি সাইলেণ্ট**।
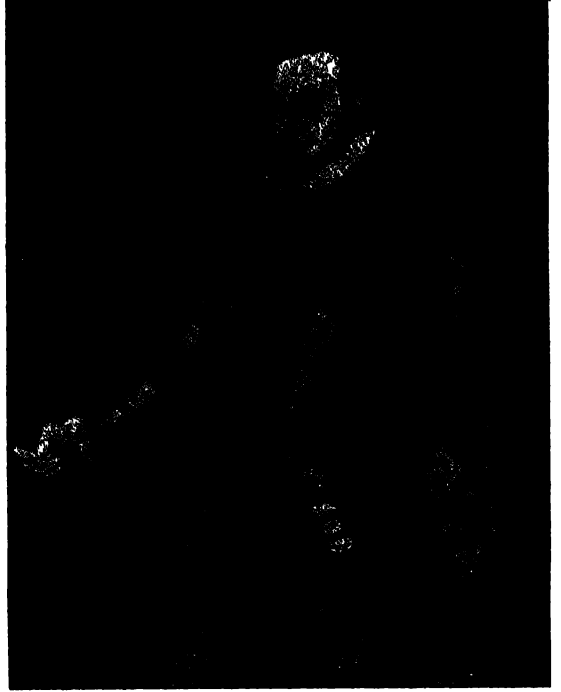
উইলিয়মের স্বাধীনতার জন্যে উদগ্র আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ প্রেরণা দেশবাসীর উপর যেন ইন্দ্রজাল বিস্তার করল। প্রথম দিকে উইলিয়ম, স্পেনের রাজাকেই হল্যাণ্ডের রাজা বলে মেনে আসছিলেন; কিন্তু পরে বাধ্য হয়ে তিনি দেশের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করেন। তখন স্পেন বিরাট প্রতাপান্বিত

শক্তি, অপরপক্ষে হল্যাণ্ড বা নেদারল্যাণ্ডস কয়েকটি সাধারণ প্রদেশের সমষ্টি মাত্র। হত্যা, লুণ্ঠন ও বিবিধ নির্যাতনের দ্বারা আল্‌ভা তাদের নিষ্পেষিত করতে লাগলেন। কাউণ্ট এগমম্প প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দেশনেতাদের তিনি প্রাণদণ্ড দিলেন। নগরের পর নগর তিনি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিলেন। অনেক সময়ে, এক একটা শহরের নিরস্ত্র স্ত্রী-পুরুষ সকলে মিলে, মাটি ও জলের উপর দাঁড়িয়ে, আল্‌ভার শিক্ষিত স্পেনিশ সৈন্যদের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করে গিয়েছে, ক্রমাগত উপবাসেও তারা দমে নি। যখন আর কোন কিছুতে পারে নি তখন হল্যাণ্ড-বাসিগণ বাঁধগুলি ভেঙে দিয়ে, উত্তর-সাগরের জলে দেশ ভাসিয়ে দিয়েছে, স্পেনের সৈন্যগণ তখন আর অবরোধ করা বা যুদ্ধ চালাবার সুযোগ পায় নি, অনেকে জলে ডুবেও গিয়েছিল।

ওলন্দাজদের উপরে প্রধান ডিউক আল্‌ভার অত্যাচার

হল্যাণ্ডের এই স্বাধীনতার সংগ্রামের ইতিহাসে হার্লেম, আল্কমার, লেডেন প্রভৃতি নগরের উপর স্পেনিশ সেনাদের অত্যাচার এবং ঐ সকল নগরবাসীর নিঃশেষে আত্মাহুতি অমর-কাহিনী হয়ে আছে। লেডেনের নর-নারী, শিশু-বৃদ্ধ এই সময়ে যে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়েছিল,

তারই **স্মৃতিস্বরূপ,** ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত **লেডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের** প্রতিষ্ঠা হয়।

এই সংগ্রাম হল্যাণ্ডই একা চালায়। দক্ষিণ-নেদারল্যাণ্ড অর্থাৎ বেলজিয়ম ক্যাথলিক-ধর্মী ছিল বলে, স্পেন সে দেশের লোকদের কৌশলে নিজের হাতে রাখে। কখনও কখনও দেশের জমিদাররাও সংকীর্ণ স্বার্থের মোহে

উইলিয়ম দি সাইলেণ্ট

বিদেশী শত্রুর পক্ষে চলে যান। নিজেদের দেশের মধ্যে এই **অনৈক্য** দেখে উইলিয়ম অনেক সময় দুঃখ করেছেন ও হতাশ হয়ে পড়েছেন। অতটুকু হল্যাণ্ড দেশে যদি আবার একতা না থাকে, তবে প্রচণ্ড শক্তিশালী স্পেনের বিরুদ্ধে তারা কতদিন প্রতিরোধ চালাতে পারবে?

তবু হল্যাণ্ড সংগ্রাম চালাতে থাকে। তখন **এলিজাবেথ** ইংলণ্ডের রানী

ছিলেন। তাঁর সঙ্গে স্পেনের ঘোরতর শত্রুতা চলছিল। তিনি প্রথমে গোপনে, পরে প্রকাশ্যে ওলন্দাজদের সংগ্রামে সাহায্য করেন। জার্মেনীর কতক প্রোটেস্টাণ্ট রাষ্ট্র থেকেও উইলিয়ম দি সাইলেণ্ট সাহায্য পেয়েছিলেন। স্পেন যখন কিছুতেই ক্ষুদ্র হল্যাণ্ডকে দমাতে পারল না, তখন বাধ্য হয়েই তার স্বাধীনতাকে স্বীকার করল। ওলন্দাজগণ দেশে একজন রাজা চাইছিল। তাদের শ্রেষ্ঠ নেতা উইলিয়মকে তারা সিংহাসনে বসতে অনুরোধ করল; কিন্তু নিঃস্বার্থ, অনাড়ম্বর, দেশপ্রেমিক উইলিয়ম কিছুতেই তাতে রাজী হলেন না। হল্যাণ্ড বাধ্য হয়ে **সাধারণতন্ত্র-শাসন** প্রতিষ্ঠা করল।

হল্যাণ্ডের "স্বাধীনতার যুদ্ধ" অনেক দিন পর্যন্ত চলেছিল। ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে হল্যাণ্ড প্রকৃতভাবে স্বাধীন হয় নি। তবে আসল সংগ্রাম চলে ১৫৬৭ থেকে ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। দ্বিতীয় ফিলিপ যখন উইলিয়ম দি সাইলেণ্টকে কিছুতেই পরাজিত করতে পারলেন না, তখন তিনি ঘৃণিতভাবে, এক আততায়ীকে লেলিয়ে দিয়ে তাঁকে **হত্যা করান**।

উইলিয়ম জীবন দিলেন বটে, কিন্তু তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করে গিয়েছিলেন। কষ্ট, লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের অগ্নি-পরীক্ষার ভিতর দিয়ে, একটি একতাবদ্ধ, নবজাগ্রত, স্বাধীন ওলন্দাজ সাধারণতন্ত্রের সৃষ্টি হল। শীঘ্রই হল্যাণ্ড জেগে উঠল এক আত্মবিশ্বাসী দেশরূপে, সে গড়ল এক বিরাট নৌশক্তি ও প্রতিষ্ঠা করল পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও পৃথিবীর অপরাপর প্রান্তে এক বিস্তীর্ণ সামুদ্রিক-সাম্রাজ্য। হল্যাণ্ডে শুরু হল ব্যবসা-বাণিজ্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক **সুবর্ণ-যুগ**।

হল্যাণ্ডের সুবর্ণ-যুগ

অতটুকু ছোট দেশ হল্যাণ্ড, লোকসংখ্যা তার মোটেই বেশী নয়। স্বাধীনতা পেয়ে যেন তার দিকে দিকে আশ্চর্য উন্নতি আরম্ভ হল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, হল্যাণ্ডের **সর্বতোমুখী উন্নতি** ইতিহাসে একটি বিস্ময়ের বস্তু। এই সুবর্ণ-যুগ যদিও নানাকারণে বেশী দিন স্থায়ী হয় নি, তবু এই যুগের হল্যাণ্ডের সমৃদ্ধির কাহিনী ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে জ্বলজ্বল করছে।

সমুদ্রের উপর ওলন্দাজদের প্রভুত্ব আরম্ভ হল। এর আগে স্পেনিশ ও পোর্তুগিজগণ পৃথিবীর নানাস্থানে দেশ আবিষ্কার করে। ক্ষুদ্র পোর্তুগাল দেশের লোকেরা পূর্ব-পশ্চিমে, বহু-বিস্তৃত দেশে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল, ব্যবসা-

বাণিজ্যে খুব একচেটিয়া অধিকার লাভ করেছিল ; কিন্তু তাদের ঔপনিবেশিক শাসনে অপটুতা ও **জলদস্যুবৃত্তির** জন্যে সর্বত্রই তাদের বিরুদ্ধে **অসন্তোষ** দেখা দিল। পোর্তুগালও শীঘ্রই পরাধীন হয়ে স্পেন-রাষ্ট্রভুক্ত হল। স্পেন তার মধ্য ও দক্ষিণ-আমেরিকার সাম্রাজ্য ও ফিলিপাইন সাম্রাজ্য নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। সে সংকীর্ণ **ধর্মসংক্রান্ত গোঁড়ামি** নিয়ে মত্ত ছিল, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গঠনে মন দিতে পারে নি, তার সামর্থ্যও ছিল না। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তাদের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ নিয়ে ব্যাপৃত ছিল। এই সুযোগে ওলন্দাজগণ উত্তর-সাগর, বালটিক-অঞ্চল, পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, উত্তর-আমেরিকা প্রভৃতি দূর-দূরান্তে সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়ল। স্পেনিশ ও পোর্তুগিজদের হাত থেকে ওলন্দাজগণই প্রথম সামুদ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য কেড়ে নেয়। ওলন্দাজদের হাজার হাজার অর্ণবপোত তৈরী হতে থাকে ও তারা নানা কেন্দ্রে, সমুদ্র-অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে।

এর আগেও ওলন্দাজগণ সারা ইওরোপে সবচেয়ে বেশী **কর্মদক্ষ জাতি-রূপে** পরিচিত ছিল। যে দেশে তারা বাস করত, তার অধিকাংশ ভাগই সমুদ্রের জলের তল থেকে উদ্ধার করে তারা বাঁধ ও প্রাচীরের সাহায্যে রক্ষা করত। দেশের জমির অবস্থার জন্যে তারা **কৃষিকার্যে** ততটা সুবিধা করতে পারে নি। এই কারণে তারা **মাছের ব্যবসা** ও অন্যান্য বাণিজ্যের দিকে মন দেয়। এইটুকু জানলেই যথেষ্ট হবে যে, তারা ইওরোপের অনেক দেশের মাছ জোগাত। পোর্তুগিজগণ পূর্বদেশ থেকে যে সব মসলা আহরণ করে আনত, তা ওলন্দাজগণই ইওরোপে বিতরণ করার ভার নিয়েছিল এবং জার্মেনীর **হান্স বণিক-সংঘের** হাত থেকে প্রভুত্ব কেড়ে নিয়ে, তারা বালটিক-সাগরের উপর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে।

নতুন যুগে সকল ব্যাপারে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা পেয়ে, ওলন্দাজেরা নৌ-বিদ্যায় ও বাণিজ্যিক দক্ষতায় অন্য দেশকে অতিক্রম করে গেল। তাদের জাহাজগুলিও সংখ্যায় ও আয়তনে সবচেয়ে বৃদ্ধি লাভ করল। ওলন্দাজেরা ভারতের দিকে ততটা আকৃষ্ট না হয়ে পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে অর্থাৎ বর্তমান **ইন্দোনেশিয়ায় ঘাঁটি** স্থাপন করল। এই অঞ্চলগুলি, বিশেষ করে জাভা— মসলা দ্রব্যাদি ও কফি প্রভৃতিতে খুব সমৃদ্ধ। এই অঞ্চলগুলি পেয়ে ওলন্দাজদের খুব লাভজনক ব্যবসা আরম্ভ হল। ইংরেজরা সেখানে গিয়ে ওলন্দাজদের ক্ষমতাচ্যুত করতে বিশেষ চেষ্টা করেছিল, কিন্তু অবশেষে ব্যর্থ হয়ে ভারতে চলে আসে। ওলন্দাজরা কালক্ষেপ না করে পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে একটি

সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করল। তারা ভারতের দিকে তত নজর দেয় নি বটে, কিন্তু ঐশ্বর্য-ভরা সিংহল বা লঙ্কা দ্বীপটি অধিকার করল—এবং তারাই সর্বপ্রথম জাপানে বন্দরের পত্তন করল। তারা উত্তর-আমেরিকার **নিউ আমস্টারডাম** (পরবর্তী **নিউ ইয়র্ক**) প্রদেশ ও দক্ষিণ-আফ্রিকার **উত্তমাশা অন্তরীপে** উপনিবেশ স্থাপন করল।

বহুদিন পর্যন্ত হল্যাণ্ডের সাম্রাজ্যের মত আর কোন সাম্রাজ্য এত ভালভাবে শাসিত হয় নি, আর কোন বণিক কোম্পানি এত সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় নি এবং আর কোন কোম্পানি এরূপভাবে সমস্ত দেশের লোকের ঐকান্তিক সমর্থন লাভ করে নি। ওলন্দাজ "ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি" এই সময় পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য-সংঘে পরিণত হয়।

ইওরোপের **উপকূলভাগের বাণিজ্য** এই সময় অধিকাংশই ওলন্দাজদের হাতে ছিল। তাদের বস্ত্রশিল্প খুব উন্নত হয়েছিল, মুদ্রাঙ্কনে তারা অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। ধনী ওলন্দাজেরা বাগিচা-চর্চা ও দুষ্প্রাপ্য চারাগাছ উৎপাদনে খুব কৃতিত্ব দেখান। তখন ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়েও হল্যাণ্ড ইওরোপের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। দেশের সব লোকই যে অর্থবান্ ছিল, তা নয়; তবে অন্যান্য দেশের তুলনায় সেখানে দারিদ্র্য কম ছিল এবং পরস্পরের তরফ থেকে জনকল্যাণকর কার্যাবলী ঐ দেশেই বেশী ছিল।

মধ্যযুগে ভেনিস নগরী যেরূপ অর্থের জোরে আড়ম্বর ও সংস্কৃতির উজ্জ্বল প্রভা দেখিয়েছিল, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে হল্যাণ্ডেও সেরূপ **উৎকর্ষের স্ফুরণ** দেখা দেয়। হল্যাণ্ডবাসী কাজের লোক ছিল বলে ধর্ম-ব্যাপারে গোঁড়ামি বা অসহিষ্ণুতা তাদের মধ্যে কমে যায়। হল্যাণ্ডে চিন্তা-জগতে স্বাধীনতার বিকাশ হয়। দেশের লোক বেশির ভাগ প্রোটেস্টাণ্ট বা অগ্রসর-প্রোটেস্টাণ্ট ছিল এবং তারা নানা ধর্মাবলম্বী ও রাজনৈতিক পলাতকদের তাদের দেশে আশ্রয় দেয়। সে যুগের বহু শ্রেষ্ঠ দার্শনিক চিন্তাবীর হল্যাণ্ডে বসে নির্বিরোধে তাঁদের দার্শনিক চর্চা করেন। হল্যাণ্ডের মুদ্রাযন্ত্র থেকেই বিখ্যাত ফরাসী রাজনৈতিক ও চিন্তানায়ক **রুশোর** প্রসিদ্ধ বই 'কনট্রাট্ সোস্যাল' ছাপা হয়।

ওলন্দাজদের মধ্যেও অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত, দার্শনিক ও শিল্পীর আবির্ভাব হয়। **হুগো গ্রোসিয়াস** একজন পৃথিবীখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁকে 'আন্তর্জাতিক আইনের' জনক বলা হয়। **রেমব্রাণ্ড** (১৬০৬—১৬৬৯—খ্রীঃ) এবং অন্যান্য ওলন্দাজ শিল্পী চিত্রাঙ্কনে বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দেন।

আরও বিবিধ ক্ষেত্রে ওলন্দাজগণ বিশেষ উন্নতি দেখায়। এ যুগের ওলন্দাজগণ পৃথিবীর যেখানে যেত, সেখানেই খুব বুদ্ধিমান্ ও অগ্রসর-মতাবলম্বী বলে পরিচিত হত। তাদের প্রখর বুদ্ধির জন্যেই তাদের বিবিধ ক্ষেত্রে উন্নতি করা সম্ভব হয়েছিল; কিন্তু নানা অন্তরায়ের জন্যে ওলন্দাজদের এই পরিপূর্ণ উন্নতি বেশী দিন টিকল না।

রেমব্রাণ্ড

ওলন্দাজদের বিশেষ প্রতিভা সত্ত্বেও, তারা তাদের সৌভাগ্যের দিন অধিক কাল চালাতে পারল না। প্রথমতঃ তাদের গবর্নমেণ্ট ছিল দুর্বল, জাতীয় বিপদ্‌কে ঠেকাবার মত তার ক্ষমতা ছিল না। "যুক্তপ্রদেশ সাধারণতন্ত্র" মূলতঃ সাতটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সমাবেশ ছিল। কেন্দ্রীয় কার্যসমূহ চালাবার জন্যে, বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত, একটি **'এসটেট্‌স্ জেনারেল'** বা আইন-সভা ছিল। আভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক ব্যাপারে, এই সভার সকল সদস্য একমত হলেই তবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে, এই

ছিল প্রথা। ফলে, কোন না কোন প্রদেশের লোকেরা কার্যসম্পাদনে প্রায়ই বাধার সৃষ্টি করত।

প্রত্যেক প্রদেশে একজন করে **'স্ট্যাড্হুডার্'** বা প্রধান শাসনকর্তা ছিলেন। অনেক সময় অধিকাংশ প্রদেশ অরেঞ্জ-বংশের প্রধান ব্যক্তিকেই তাদের স্ট্যাড্হুডার নির্বাচন করত। তবে হল্যাণ্ড প্রদেশ ছাড়া অন্যান্য প্রদেশের লোকদের **অরেঞ্জ-বংশের** প্রতি ঈর্ষার ভাব, এরূপ মনোনয়নে অনেক সময় প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করত। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থাপন্ন লোকেরা সমস্ত দেশে কতকটা একতা এনেছিল। তাদের স্বার্থের কেন্দ্র ছিল হল্যাণ্ড প্রদেশ। এই প্রদেশটি অর্থবল ও লোকসংখ্যায় আর সব প্রদেশ থেকে এত উন্নত ছিল যে, এই হল্যাণ্ড প্রদেশের নামেই সমস্ত দেশটি পরিচিত হত।

মধ্যবিত্ত অর্থবান্ বণিকেরা অনেক দিন সৌভাগ্য ভোগ করে আয়েশী ও আরামপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। দেশে তারাই সমস্ত সুবিধা ভোগ করত। এই কারণে যারা অসুবিধায় ছিল, তারা তাদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে ওঠে। এর ফলে দেশে অনৈক্য দেখা দেয়।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মত বড় দেশগুলি এখন থেকে শক্তিতে জেগে উঠছিল। হল্যাণ্ডের পৃথিবীজোড়া একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার তাদের অসহ্য হয়ে উঠল। ইংলণ্ড বা ফ্রান্সের হিংসার সঙ্গে এঁটে ওঠার ক্ষমতা ক্ষুদ্র্য হল্যাণ্ড দেশের ছিল না। **ইংলণ্ডই প্রথম হল্যাণ্ডের প্রতি আঘাত হানল।**

ইংলণ্ডে **ওলিভার ক্রমওয়েলের** শাসনের সময়, বৈদেশিক নীতি ও বাণিজ্য চারদিকে প্রসারের চেষ্টা শুরু হল। ওলন্দাজদের জাহাজের সংখ্যার আধিক্য দেখে তার গুরুত্ব কমাবার অভিপ্রায়ে, ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট ১৬৫১ খ্রীস্টাব্দে 'নেভিগেশন আইন' নামে একটি আইন পাস করল। তাতে স্থির হল যে, ইংলণ্ডের বন্দরগুলিতে ইংলণ্ডের জাহাজ বা যে দেশ হতে মাল আমদানি করা হবে, সে দেশের জাহাজ ছাড়া অন্য দেশের জাহাজের মাল আনা যাবে না। এই আইনটি প্রধানতঃ ওলন্দাজদের লক্ষ্য করেই হয়েছিল। এর ফলে ওলন্দাজদের ব্যবসায়ে যারপরনাই ক্ষতি হল। তাদের অনেক জাহাজ অকেজো হয়ে পড়ল। তথাপি তারা ইংলণ্ডের সঙ্গে একটা আপস করতে চেষ্টা করল। কিন্তু ইংলণ্ড এতে চটে গিয়ে আবার দাবি করল যে ইংলিশ চ্যানেল ও আশপাশের সমুদ্র-অঞ্চলে ইংলিশ জাহাজ, নিষিদ্ধ মালের খোঁজে ওলন্দাজ জাহাজগুলিকে অন্বেষণ করতে পারবে। তা ছাড়া উত্তর-অঞ্চলে ইংলিশ

জাহাজের সঙ্গে ওলন্দাজ জাহাজের সাক্ষাৎ হলে প্রত্যেক ওলন্দাজ জাহাজের নৌ-অধ্যক্ষ তাঁর দেশের পতাকা অবনমিত করবেন এবং ইংলিশ জাহাজের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকল্পে বন্দুকের আওয়াজ করবেন। ওলন্দাজ নাবিকদের সঙ্গে ইংরেজ নাবিকদের ক্রমেই গোলযোগ বাধতে শুরু করল। অবশেষে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হল।

বাণিজ্য-বিরোধ নিয়ে ইংলণ্ডের সঙ্গে হল্যাণ্ডের যে তিনটি যুদ্ধ হল এইটি তার প্রথম যুদ্ধ। ওলন্দাজগণ যথেষ্ট সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করল, কিন্তু

বাণিজ্য-বিরোধ নিয়ে ইংলণ্ডের সঙ্গে হল্যাণ্ডের প্রথম নৌ-যুদ্ধ

শেষ পর্যন্ত তারা হেরে গেল। তাদের উত্তর-আমেরিকার নিউ আমস্টারডাম ইংরেজদের হাতে ছেড়ে দিতে হল এবং এই সংগ্রামে তাদের ব্যবসায়ের বিশেষ ক্ষতি হল।

ইংলণ্ডের দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে, হল্যাণ্ডের সঙ্গে ইংলণ্ডের আরও দুইটি যুদ্ধ হয়। তৃতীয় যুদ্ধের সময় শুধু ইংলণ্ড নয়, প্রতাপান্বিত চতুর্দশ লুইর আমলের ফ্রান্সের সঙ্গেও একযোগে, হল্যাণ্ডকে সমরে অবতীর্ণ হতে হয়। এই সময় অবশ্য হল্যাণ্ডে অরেঞ্জ-বংশের আর একজন বীরপুরুষের আবির্ভাব হয়। তাঁর নামও **উইলিয়ম অব অরেঞ্জ।** তিনিই পরে **তৃতীয় উইলিয়ম** উপাধি নিয়ে ইংলণ্ডের রাজা হন।

উইলিয়ম অব অরেঞ্জ

ফরাসী সম্রাট্ **চতুর্দশ লুই** খুব দোর্দণ্ডপ্রতাপ নরপতি ছিলেন। তাঁর বৈদেশিক নীতি খুব আক্রমণাত্মক ছিল। ফ্রান্সের সাম্রাজ্য-বিস্তৃতির জন্যে তিনি সারা জীবন যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি সর্বদাই তাঁর ভয়ে শঙ্কিত থাকত। হল্যাণ্ড ছোট দেশ, তারও ভয় হবারই কথা। প্রথম একটা যুদ্ধে লুই বেলজিয়ম ও ফ্রান্সের সীমান্তে কতকগুলি দুর্গ কেড়ে নেন। তাতে আশঙ্কিত হয়ে, উইলিয়ম অব অরেঞ্জ নিজের দেশের রক্ষার ব্যবস্থা করেন এবং ইওরোপের অস্ট্রিয়া প্রভৃতি অন্যান্য দেশকে চতুর্দশ লুইর অভিসন্ধির বিরুদ্ধে সতর্ক করেন। লুই এতে ভীষণ চটে গিয়ে তাঁর দ্বিতীয় অভিযান সরাসরি হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধেই চালান।

এই সময় হল্যাণ্ড খুব বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। ইংলণ্ডের সঙ্গেও তার যুদ্ধ চলছিল, কিন্তু বিপদের মুখে উইলিয়ম অসাধারণ প্রতিরোধশক্তি ও পররাষ্ট্রনীতিতে দক্ষতা দেখান। তিনি ইওরোপের অস্ট্রিয়া এবং অপরাপর রাষ্ট্রকে বুঝান যে, লুইর অভিপ্রায় শুধু হল্যাণ্ডের স্বাধীনতা হরণ করা নয়, তিনি ইওরোপের শক্তি-ভারসাম্য বিনষ্ট করে আপনার প্রভুত্ব-বিস্তারে বদ্ধপরিকর। উইলিয়মের এই আবেদনে কয়েকটি দেশ সাড়া দিল ও তাঁর সঙ্গে, লুইর বিপক্ষে মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ হল। যুদ্ধে ওলন্দাজদের স্বদেশপ্রেম ও বারত্বে এবং উইলিয়মের রাজনৈতিক কৌশলে লুইর গ্রাস থেকে **হল্যাণ্ড রক্ষা পেয়ে গেল।**

হল্যাণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে, উইলিয়মের সারা জীবনের অক্লান্ত চেষ্টা ছিল, চতুর্দশ লুইর আক্রমণ-নীতিকে সর্বদা বাধা দেওয়া এবং তাঁর বিরুদ্ধে, ইওরোপীয় শক্তি-সমন্বয় সৃষ্টি করা। এই উদ্দেশ্য থেকে তিনি কখনও বিচ্যুত হন নি। এই কারণেই দেশের আভ্যন্তরীণ নানা বিরোধ ও সাধারণতন্ত্রীদলের তাঁর নীতির বিপক্ষতা সত্ত্বেও, তিনি পরাক্রমশালী ফরাসী-সম্রাটের কবল থেকে হল্যাণ্ডের স্বাধীনতা অটুট রাখতে পেরেছিলেন।

ইংলণ্ডের ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দের 'গৌরবময় বিপ্লবে'র পর উইলিয়ম যখন ইংরেজদের দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে, **তৃতীয় উইলিয়ম নাম নিয়ে** ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসেন তখন তাঁর অবস্থার অনেক উন্নতি হল। তিনি এখন লুইর বিরুদ্ধে ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ডের মিলিত শক্তির অধিকারী হলেন। **অগসবুর্গ-**

সংঘে উইলিয়ম ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড ও অস্ট্রিয়াকে লুইর বিরুদ্ধে একত্রে মিলিত করলেন। এই সময়কার যুদ্ধে লুই বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না। ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এই যুদ্ধের অবসানে **রেসিক-সন্ধিতে,** লুইর অমিতবিক্রমে প্রথম খানিকটা বিপর্যয় দেখা দিল।

লুইর পররাষ্ট্রনীতিতে প্রধান অভিপ্রায় ছিল, প্রথমে দুর্বল স্পেন-সাম্রাজ্যের কতক অংশ কেড়ে নেওয়া এবং পরে স্পেনের সিংহাসনে তাঁর পৌত্র ফিলিপকে বসিয়ে সমস্ত স্পেনই গ্রাস করা। এই অভিসন্ধি টের পেয়ে, উইলিয়ম নিরলসভাবে ইওরোপীয় শক্তিসমূহকে লুইর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে লাগলেন। তিনি তাঁর মৃত্যুর পূর্বে, ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া ও ব্রাণ্ডেনবুর্গের (ভবিষ্যৎ প্রাসিয়া) মধ্যে **'গ্র্যাণ্ড এলায়েন্স'** বা মহাশক্তি সম্মেলনের সৃষ্টি করলেন। তার মৃত্যুর পরে, দীর্ঘদিনব্যাপী 'স্পেন উত্তরাধিকার যুদ্ধ' আরম্ভ হল। এই যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি **মালবরো** অসামান্য নৈপুণ্য দেখান এবং শেষ পর্যন্ত **ফ্রান্সের পরাজয়ে** এই যুদ্ধের সমাপ্তি হয়।

সেনাপতি মার্লবরো

এর পরে হল্যাণ্ডের স্বাধীনতা বজায় রইল বটে, কিন্তু সে তার পূর্ব-গৌরব আর ফিরে পেল না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে **হল্যাণ্ডের প্রতিপত্তি** ক্রমেই **হ্রাস** পেতে লাগল। অবশ্য পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে হল্যাণ্ডের সাম্রাজ্য অব্যাহত রইল, কিন্তু সেখানে দেশবাসীর উপর ওলন্দাজদের ব্যবহার ক্রমেই খারাপ হতে লাগল। অপরাপর সাম্রাজ্যবাদী জাতির মত, সাম্রাজ্যের অন্তর্গত প্রজাদের স্বার্থের ক্ষতি করে ওলন্দাজগণ নিজেদের স্বার্থসাধন এবং ঐ দেশসমূহের ঐশ্বর্য শোষণেই মত্ত হল।

হল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ দলাদলি, কলহ-বিবাদ ও রাজনৈতিক অসততা তার **পতনের কারণ।** ক্রমে আমস্টারডামের বদলে লণ্ডন পৃথিবীর অর্থনৈতিক রাজধানীতে পরিণত হল, ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক আমস্টারডাম-ব্যাঙ্কের স্থান অধিকার করল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে, ফরাসী বিপ্লবিগণ ও পরে **নেপোলিয়ন** হল্যাণ্ড অধিকার করেন। নেপোলিয়নের পতনের পর, বিজেতা দেশগুলির কর্ণধারগণ **ভিয়েনা-কংগ্রেসে,** হল্যাণ্ডের উপর খুশী হয়ে তাকে বেলজিয়ম দিয়ে দেন (১৮১৫ খ্রীঃ)। এতে কিছুদিনের জন্যে হল্যাণ্ডের শক্তি বৃদ্ধি পায়, কিন্তু বেলজিয়মবাসীরা তাদের স্বাধীনতা হারিয়ে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। তারা হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে থাকে, পরে ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে তাদের স্বাধীনতা অর্জন করে।

বেলজিয়মের স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার—(১৮৩০ খ্রীঃ)

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে, দক্ষিণ-আফ্রিকায় ইংলণ্ডের যে দুবার **বুয়োরদের সঙ্গে যুদ্ধ** হয়, সেই বুয়োরদের পূর্বপুরুষেরাও হল্যাণ্ডের অধিবাসী। ওখানে গিয়ে তারা উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। বুয়োরগণ খুব দুর্ধর্ষ কৃষকশ্রেণী ছিল। যুদ্ধে তাদের পরাজিত করতে ইংলণ্ডের বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে যখন জার্মেনী পরাজিত হয়, তখন জার্মান সম্রাট্ কাইজার হল্যাণ্ডে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের নিকট পোল্যাণ্ডের আত্মসমর্পণের পর, তিনি পশ্চিম-সীমান্ত আক্রমণে অখণ্ড মনোযোগ দিলেন। তাঁর বিমানবাহিনী ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে বোমাবর্ষণ করতে আরম্ভ করল। এই সময়

থেকেই ওলন্দাজ-সীমান্তে জার্মান সেনা সক্রিয় হয়ে উঠল। ওলন্দাজ-সরকার এর মধ্যেই তাঁদের পূর্ব-সীমান্তের অনেকটা স্থানকে অবরুদ্ধ অঞ্চল বলে ঘোষণা করেছিলেন। হল্যাণ্ডের **রানী উইলহেলমিনা** ও বেলজিয়মের

রানী উইলহেলমিনা

রাজা লিওপোল্ড নিজেদের দেশের স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে, ইওরোপে শান্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে মিলিতভাবে চেষ্টা করেছিলেন। যখন তাঁদের নিজেদের রাজ্য বিপন্ন হয়ে উঠল, তখন তাঁরা ঘোষণা করলেন যে, তাঁরা যথাসাধ্য জার্মান আক্রমণ প্রতিরোধ করবেন।

১০ই জুন (১৯৪০ খ্রীঃ) তারিখে **হিটলার** হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম ও লুক্সেমবুর্গের বিরুদ্ধে **যুদ্ধ ঘোষণা** করলেন। ওলন্দাজেরা আটচল্লিশ ঘণ্টাকাল জার্মান সেনার গতিরোধ করেছিল, কিন্তু সে দুর্বার অভিযানকে আর ঠেকাতে না পেরে, তারা পশ্চাদপসরণ করল। এবারে তারা অনন্যোপায় হয়ে

হল্যাণ্ডে জার্মান সৈন্য
(দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ)

তাদের বিপদের মধ্যে, চিরকালের নিয়ম অনুসারে, সমস্ত খালের মুখ খুলে দিল চারদিকে। প্রবল বেগে সমুদ্রজল এসে সমগ্র হল্যাণ্ডকে ডুবিয়ে দিল। যা হক, শেষ পর্যন্ত ওলন্দাজ রাজপরিবার লণ্ডনে পলায়ন করতে বাধ্য হলেন। এদিকে ওলন্দাজ-সরকার শীঘ্রই যুদ্ধ-বিরতির আদেশ দিলেন। এই নিয়ে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে সমালোচনা হয়েছিল কিন্তু তাড়াতাড়ি যুদ্ধ বন্ধ

করে দেবার ফলে, হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ম জার্মানদের দ্বারা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হল্যাণ্ডের পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সাম্রাজ্য **জাপানের কবলিত** হয়েছিল। যুদ্ধের শেষে, জাপান হেরে যাবার পর, হল্যাণ্ড আবার ঐ-সব স্থানে তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করল। ওখানকার লোকেরা অনেকদিন থেকেই হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার আন্দোলন করে আসছিল। এবার তারা দেশের স্বাধীনতার জন্যে জোর যুদ্ধ আরম্ভ করল।

শেষ পর্যন্ত তারা সফলকাম হয়েছে। কিছুদিন পূর্বে ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর ঐ দ্বীপপুঞ্জ **ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্র** নামে স্বাধীন **সাধারণতন্ত্রী** রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। হল্যাণ্ড ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা মেনে নিয়েছে।

রানী উইলহেলমিনা সিংহাসন ত্যাগ করলে তাঁর কন্যা জুলিয়ানা মেরী উইলহেলমিনা ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর সিংহাসনে আরোহণ করেন। জুলিয়ানার জন্ম হয় ৩০শে এপ্রিল, ১৯০৯ খ্রীঃ।

হল্যাণ্ডের অধিবাসীরা খ্রীস্টধর্মাবলম্বী। এর আয়তন জলভাগ সমেত ৪০,৮৯,২৮৪ বর্গ কিলোমিটার (১৫,৭৮,৪৬৪ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা ১,২৫,৩৫,৩০৭ (১৯৬৬ খ্রীঃ)। রাজধানী আমস্টারডাম।

অস্ট্রিয়া

ইওরোপীয় ইতিহাসে অস্ট্রিয়ার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। বহুদিন পর্যন্ত ইহা একটি শ্রেষ্ঠ শক্তি ছিল। ইহা ইওরোপের মধ্যস্থলে অবস্থিত, কিন্তু যেন পূর্ব-সীমানার দ্বারপ্রান্তে। বারে বারে অস্ট্রিয়াকে ইওরোপের পূর্বদিক হতে বিভিন্ন জাতির আক্রমণ ঠেকাতে হয়েছে। এই দেশ ইওরোপের তিনটি প্রধান জাতি—স্যাক্সন, স্লাভ এবং ল্যাটিনদের মিলনক্ষেত্র ও যুদ্ধক্ষেত্র।

এক হাজার বছরেরও আগে বিখ্যাত জার্মান সম্রাট **শার্লামেন** (৭৪২—৮১৪ খ্রীঃ) স্লাভদের হাত থেকে তাঁর সাম্রাজ্য রক্ষাকল্পে, রক্ষা-ঘাটিরূপে অস্ট্রিয়ার ভিত্তি স্থাপন করেন। ইতিহাসের নানা যুগে কখনও জমিদারি, কখনও রাজ্য বা কখনও সাম্রাজ্যরূপে, অস্ট্রিয়া পূর্ব-প্রান্তের বিপদ্ থেকে পশ্চিম-ইওরোপকে রক্ষা করেছে। দানিয়ুব নদীর মধ্য-উপত্যকায় অবস্থিত থেকে, অস্ট্রিয়া সর্বপ্রথম জার্মেনীর উপর স্লাভদের আক্রমণ, তারপর হাঙ্গেরীয়দের আক্রমণ ও সর্বশেষে তুর্কীদের আক্রমণ প্রতিহত করেছে।

"অস্ট্রিয়া" কথাটি একটি ল্যাটিন শব্দ। এর মানে পূর্বদিকের রাজ্য। নবম শতাব্দীতে অস্ট্রিয়া এই নামেই পরিচিত হত। অস্ট্রিয়া প্রথমে ছিল ছোট একটি 'মার্ক' বা জমিদারি, কিন্তু ধীরে ধীরে এর চারপাশে পরবর্তী অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের পত্তন হয়। দুটি রাজবংশ এই দেশকে প্রথমে অতি সাধারণ
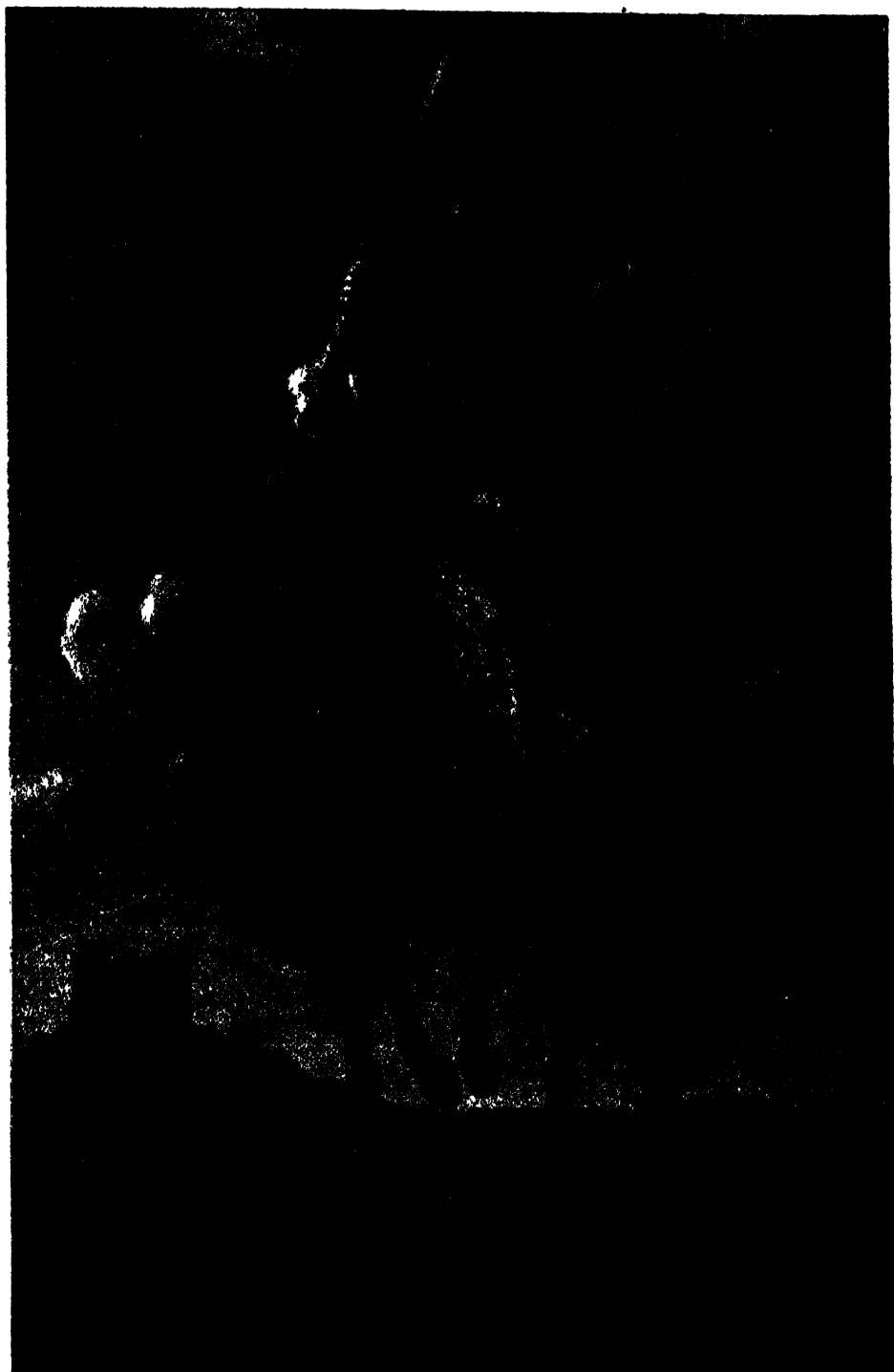
মেরিয়া থেরেসা

অবস্থা থেকে পরে বিরাট সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত করে। এ দুটির নাম যথাক্রমে **ব্যাবেনবুর্গ** এবং **হ্যাপসবুর্গ**।

অস্ট্রিয়ার ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা একটি জাতির ইতিহাস নয়, ইহা একটি রাজবংশের, বিশেষ করে হ্যাপসবুর্গ-বংশের ইতিহাস। এখানে এক জাতি, এক ভাষা ও এক ধর্ম গড়ে ওঠে নি, এখানে যুগে যুগে বিভিন্ন জাতি একটিমাত্র রাজবংশের প্রতি আনুগত্য নিয়ে

ডিউক ষষ্ঠ লিওপোল্ডের ভিয়েনায় আগমন

গড়ে উঠেছে। ফলে, হ্যাপসবুর্গ-বংশের সমস্যাও চিরকালই খুব বেশী জটিল হয়েছে।

শার্লামেন যে জমিদারিটির প্রথম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, হাঙ্গেরীয়রা ৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তা জয় করে। ৯৭৩ খ্রীস্টাব্দে ব্যাবেনবুর্গ-বংশের **লিওপোল্ড** এই জমিদারিটি লাভ করেন। এই বংশ ১২৪৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এখানে শাসনকর্তৃত্ব চালায়। ব্যাবেনবুর্গেরা এই দেশে খুব নৈপুণ্য ও দক্ষতার সঙ্গে শাসন চালান।

তাঁদের চেষ্টায় ইহা "পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের" রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্র হয়ে দাঁড়ায়। **ডিউক দ্বিতীয় হেন্‌রী** ভিয়েনা নগরীর একজন প্রতিষ্ঠাতা।

১১৫৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান সম্রাট্ **বারবারোসা** একটি সনদে অস্ট্রিয়াকে 'একরূপ স্বাধীন রাষ্ট্র বলে মেনে নেন। অস্ট্রিয়ার ডিউক **পঞ্চম লিওপোল্ড** বিখ্যাত তৃতীয় ক্রুসেডে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ইংলণ্ডের বীর রাজা প্রথম রিচার্ডের সঙ্গে তাঁর বিবাদ হয়েছিল। ডিউক **ষষ্ঠ লিওপোল্ডের** আমলে অস্ট্রিয়ার বিবিধ উন্নতির সূচনা হয়। তাঁর দরবার খুব আড়ম্বরপূর্ণ ও বিখ্যাত ছিল। তাঁর পুত্র **ফ্রেডারিক** ব্যাবেনবুর্গ-বংশের শেষ অধিপতি।

কাউন্ট রুডলফের প্রস্তরমূর্তি

এর কিছু পরে ১২৭৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মেনীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসক-বৃন্দ, হ্যাপসবুর্গ-বংশের **কাউণ্ট রুডলফকে** সম্রাট্‌রূপে নির্বাচিত করেন। সুইজারল্যাণ্ডের একটি দুর্গ থেকে 'হ্যাপসবুর্গ' নামটি এসেছে। হ্যাপসবুর্গ-বংশের কাউণ্ট বা জমিদারদের অস্ট্রিয়া ছাড়া, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি আরও সম্পত্তি ছিল।

রুডলফের উত্তরাধিকারিগণ আশেপাশের দেশগুলির উত্তরে তাঁদের শাসন বিস্তৃত করতে থাকেন। নানাবিধ কারণে, বিশেষ করে কতকগুলি সৌভাগ্যপূর্ণ বিবাহের জোরে, অস্ট্রিয়া রাজ্যটি বিপুলভাবে বিস্তৃত হল। শাসনকর্তা **চতুর্থ রুডলফ** ১৩৬৫ খ্রীষ্টাব্দে **ভিয়েনা-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন** করেন।

১৪৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ডিউক **পঞ্চম আলবার্ট** "পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের" সম্রাট্‌রূপে নির্বাচিত হন। তদবধি হ্যাপসবুর্গ-বংশের শাসনকর্তারা ১৮০৬

খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই গৌরবজনক উপাধি ভোগ করে থাকেন। এর পরের সম্রাটের নাম **চতুর্থ ফ্রেডারিক**। তাঁর ছেলে **ম্যাক্সিমিলিয়ান** হ্যাপসবুর্গ-বংশের যশ ও সুনাম খুব বৃদ্ধি করেছিলেন।

ম্যাক্সিমিলিয়ানের শাসনকাল হতে অস্ট্রিয়া ইওরোপে একটি প্রধান স্থান অধিকার করতে শুরু করে। বারগাণ্ডির ডিউকের কন্যা **মেরীকে বিয়ে করার ফলে** ম্যাক্সিমিলিয়ান হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম প্রভৃতি বহু দেশ লাভ করেন। এই

ম্যাক্সিমিলিয়ান ও রানী মেরী

নৃপতি একজন সুদক্ষ, উৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর ছড়ানো সাম্রাজ্যের মধ্যে অনেকটা ঐক্য-ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করেন। ম্যাক্সিমিলিয়ান বিবিধ গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি শিল্প, কাব্য এবং শিক্ষার একজন বিশেষ উৎসাহ-দাতা ছিলেন। অস্ট্রিয়ান জাতির স্মৃতিতে আজও তাঁর নাম জাগরূক হয়ে আছে। তাঁর সময়ে নেদারল্যাণ্ডস বা হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ম হ্যাপসবুর্গ-অধিকারভুক্ত হয় বলে তখন থেকে ফরাসী রাজাদের সঙ্গে শত্রুতা শুরু হয়।

স্পেনের **রাজকুমারী জোয়ানার সঙ্গে** ম্যাক্সিমিলিয়ানের পুত্র **ফিলিপের বিয়ে** হয়। এর ফলে বিরাট স্পেনিশ সাম্রাজ্যের উপর হ্যাপসবুর্গদের অধিকার স্থাপিত হয়। ফিলিপ ও জোয়ানার দুই পুত্র, **চার্লস** ও **ফার্দিনান্দ।** এই চার্লসই ইতিহাস-বিখ্যাত **পঞ্চম চার্লস।** পঞ্চম চার্লসের সময়ে হ্যাপসবুর্গ-সাম্রাজ্য ইওরোপের প্রায় অর্ধেক জায়গা জুড়ে ছিল। এই সময়ে হাঙ্গেরী ও বোহেমিয়াও অস্ট্রিয়া-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

পঞ্চম চার্লসের পর তাঁর ছোট ভাই ফার্দিনান্দ অস্ট্রিয়ার সম্রাট্ হন, আর স্পেনিশ সাম্রাজ্যের অধিপতি হন পঞ্চম চার্লসের পুত্র **দ্বিতীয় ফিলিপ।** সম্রাট্ ফার্দিনান্দের সময় থেকে, অস্ট্রিয়ার শাসকদের মধ্যে রাজার ক্ষমতা নিরঙ্কুশ ভাবে কেন্দ্রীভূত করা ও সাম্রাজ্যে জার্মান ভাবধারাকে প্রাধান্য দেবার চেষ্টা আরম্ভ হয়। তখন থেকে হ্যাপসবুর্গ-সম্রাট্‌গণ তাঁদের নিজেদের শক্তির সমর্থকরূপে, **ক্যাথলিক যাজকবৃন্দ** ও অভিজাত সম্প্রদায়কে সর্বদা সাহায্য করেন। তাঁদের অধীন বিভিন্ন রাষ্ট্রে এমন এক **অভিজাত শ্রেণীর সৃষ্টি** করেন যাঁরা সমস্ত ব্যাপারে তাঁদের প্রধান অবলম্বন হতে পারেন। ক্যাথলিক ধর্মায়তনের সাহায্য পাওয়ার দরুন, এখন থেকে অস্ট্রিয়ার সম্রাট্‌রা ক্যাথলিক ধর্মের প্রধান রক্ষাকর্তা হয়ে উঠলেন।

ফার্দিনান্দের রাজত্বকালে বিখ্যাত তুর্কী সুলতান **সুলেমান** হাঙ্গেরী জয় করতে বার বার চেষ্টা করেন। তিনি বহু সৈন্যের সমাবেশে ভিয়েনা নগরী অবরোধ করেন, কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হয়। এর পর থেকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত তুর্কীদের সঙ্গে অস্ট্রিয়ার যুদ্ধ-বিগ্রহ চলে। ফার্দিনান্দের সময়ে সারা ইওরোপের একটি প্রধান বিষয় ছিল ব্যাপক ধর্মসংস্কার-আন্দোলন। তিনি **প্রোটেস্টাণ্টদের প্রতি** কতকটা উদারভাবাপন্ন ছিলেন।

তারপর **দ্বিতীয় রুডলফ** সম্রাট্ হয়ে প্রোটেস্টাণ্টদের উপর অত্যাচার শুরু করেন। সম্রাট্ দ্বিতীয় ফার্দিনান্দও খুব প্রোটেস্টাণ্ট-বিদ্বেষী ছিলেন। তাঁর সময়েই বোহেমিয়ায় একটি সাধারণ ঘটনা থেকে জার্মেনীতে ঐতিহাসিক "ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধের" সূচনা হয়।

ফার্দিনান্দ ছিলেন ক্যাথলিক লীগের নেতা। এই যুদ্ধে **ওয়ালেনস্টিন** ও **টিলি** তাঁর প্রধান সেনাপতিদ্বয় ছিলেন। প্রথম দিকে যদিও অস্ট্রিয়াই এই যুদ্ধে সুবিধা করছিল, কিন্তু যখন সুইডেনের যোদ্ধা-নৃপতি **গাস্টেভাস অ্যাডলফাস** ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধে যোগদান করলেন, তখন যুদ্ধের গতি ফিরে গেল।

এই যুদ্ধে হ্যাপসবুর্গদের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী, ফরাসীদের যোগদানেও অস্ট্রিয়ার ক্রমেই পরাজয় হতে লাগল। পরিশেষে ১৬৪৮ খ্রীস্টাব্দে, 'ওয়েস্টফেলিয়ার সন্ধিতে' হ্যাপসবুর্গরা ফ্রান্সের কাছে আলসেস ছেড়ে দিলেন এবং জার্মেনীর একতা একেবারে ভেঙে গেল। অবশ্য অস্ট্রিয়ার রাজার 'পবিত্র রোমক সম্রাট্' উপাধি বজায় রইল।

এরপর সম্রাট্ **প্রথম লিওপোল্ড** অনেক দিন রাজত্ব করেন। তাঁর সময়ে তুর্কীদের পুনঃ পুনঃ হাঙ্গেরী ও অস্ট্রিয়া-সাম্রাজ্যের প্রান্তদেশে আক্রমণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৬৮৩ খ্রীস্টাব্দে **তুর্কী সেনাপতি কারা মুস্তাফা** ভিয়েনা নগরী অবরোধ করেন। এই সময় অস্ট্রিয়া খুব বিপদের মধ্যে পড়েছিল। পোল্যাণ্ডের রাজা **সোভিয়েস্কি** প্রভৃতির আপ্রাণ চেস্টায় **তুর্কী-অভিযান ব্যর্থ** করে দেওয়া হয়। এর পর থেকে তুর্কী শক্তির ক্রমাগত পতন হতে থাকে এবং তারা আস্তে আস্তে ইওরোপ থেকে ক্ষমতাচ্যুত হয়। তুর্কীদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত যুদ্ধ হয়, তার মধ্যে **জেণ্ট যুদ্ধে** অস্ট্রিয়ার সেনাপতি **প্রিন্স ইউগেনের জয়লাভ** খুব গৌরবপূর্ণ ঘটনা।

এই সময়ে ফরাসী সিংহাসনে প্রবল শক্তিমান **চতুর্দশ লুই** উপবিষ্ট ছিলেন। স্পেন-উত্তরাধিকার যুদ্ধে ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়ার পক্ষ হয়ে চতুর্দশ লুইর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। এই যুদ্ধের অবসানে **ইউট্রেক্ট সন্ধির ফলে**, বেলজিয়ম এবং ইতালির নেপলস, মিলান প্রভৃতি স্থানে অস্ট্রিয়া আপন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে।

হ্যাপসবুর্গ-বংশের পুরুষ বংশধরদের মধ্যে **ষষ্ঠ চার্লস শেষ সম্রাট্**। তাঁর কোন ছেলে ছিল না। তিনি তাঁর মেয়ে **মেরিয়া থেরেসাকে** তাঁর উত্তরাধিকারিণী করবার জন্যে **"প্রাগমেটিক স্যাংসন"** নামে এক বিধি রচনা করেন। এই বিধিকে আইনসম্মত করার জন্যে, তিনি ইওরোপের অধিকাংশ রাজাদের কাছে অনুরোধ করেন। মেরিয়া থেরেসাকে সিংহাসনে আইনগতভাবে অধিষ্ঠিত করার আকাঙ্ক্ষায়, তিনি নিজের সাম্রাজ্যের অনেক সুবিধাও অপর দেশের রাজাদের কাছে ছেড়ে দেন।

ষষ্ঠ চার্লস **তুর্কীদের বিরুদ্ধে** অনেক যুদ্ধ করেন, এবং ক্রমাগত তাদের হারিয়ে দেন। তাঁর মৃত্যুর পর অস্ট্রিয়ার উপর মস্ত বিপদ্ ঘনিয়ে আসে। তাঁর পিতার বিধি অনুসারে রানী মেরিয়া থেরেসা সিংহাসনে বসলেন বটে, কিন্তু **বহু প্রতিদ্বন্দ্বী** সিংহাসনের উপর তাঁদের দাবি নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। এই সময়ে অস্ট্রিয়ার সব চেয়ে বিপদ্ হল, তার বিরুদ্ধে প্রাসিয়ার বিখ্যাত নৃপতি **ফ্রেডারিকের সমরাভিযান**।

মেরিয়া থেরেসা

ফ্রেডারিক প্রাসিয়ারাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করার জন্যে লালায়িত ছিলেন। তিনি হ্যাপসবুর্গ-সাম্রাজ্যে একজন রানীকে দেখে সমস্ত ন্যায়-নীতি উপেক্ষা করে সাইলেসিয়া দেশটি গ্রাস করবার অভিপ্রায়ে **অস্ট্রিয়া রাজ্য আক্রমণ করেন।** এইভাবে ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দে "অস্ট্রিয়-উত্তরাধিকার যুদ্ধ" আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে ফ্রান্স ও প্রাসিয়া অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ছিল, কিন্তু ইংলণ্ড তার পক্ষে যুদ্ধ করেছিল। এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত যদিও **অস্ট্রিয়ার পরাজয়** হয়েছিল এবং ফ্রেডারিক সাইলেসিয়া জোর করে কেড়ে নিয়েছিলেন, তথাপি এই সময় মেরিয়া থেরেসার সাহসিকতা ও মনোবলের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। **আইলা-শ্যাপেলের সন্ধিতে** এই যুদ্ধের সমাপ্তি হয় (১৭৪৮)।

মেরিয়া থেরেসা চারদিকে বিপদজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তখন হাঙ্গেরীয়গণ তাঁর প্রতি খুব ভক্তি ও আনুগত্য দেখায়। যুদ্ধের পরে, মেরিয়া থেরেসা নানারূপ সংস্কারের প্রবর্তন করে অস্ট্রিয়াকে একটি আধুনিক ও উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করেন। তিনি শাসন-ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আনলেন ও সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুললেন। চিরকালের ক্যাথলিক স্বেচ্ছাচারী শাসন ত্যাগ করে তিনি **উদার কেন্দ্রীয় শাসনের প্রবর্তন** করলেন। তিনি তাঁর দূরবিস্তৃত সাম্রাজ্যের প্রজাদের মধ্যে মানসিক ও নৈতিক একতা আনতে প্রয়াসী হলেন। শিক্ষার বহুল প্রচারকল্পে তিনি অনেক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর সাম্রাজ্যে **জার্মান ভাষাকে** তিনি রাজকীয় ভাষা করতে চেষ্টা করলেন। তিনি ধর্ম-সংস্থানের অনেক দোষত্রুটির সংশোধন করলেন। এইসব **সংস্কার** প্রণয়নে তিনি খুব বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন।

অস্ট্রিয়-উত্তরাধিকার যুদ্ধের পরে অস্ট্রিয়ার **বৈদেশিক নীতিতে পরিবর্তন** দেখা দিল। এই ব্যাপারে মেরিয়া থেরেসা তাঁর সচিব **কৌনিজের** খুব সাহায্য পেয়েছিলেন। কৌনিজ বুঝতে পারলেন যে, চিরকালের শত্রু ফ্রান্সের চেয়েও নবজাগ্রত প্রাসিয়া অস্ট্রিয়ার বড় শত্রু। তাই তিনি প্রাসিয়ার সঙ্গে আবার যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী জেনে ফ্রান্সের সঙ্গে এত দিনের শত্রুতা পরিত্যাগ করে বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন।

মেরিয়া থেরেসা **সাইলেসিয়া হারিয়ে** অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত ছিলেন। তিনি পুনরায় ঐ দেশ লাভ করার জন্যে আবার যুদ্ধের আয়োজন

করতে লাগলেন ও প্রাসিয়ার বিরুদ্ধে অনেক শক্তির সহযোগিতা সংগ্রহ করতে লাগলেন। শীঘ্রই আবার একটি বড় যুদ্ধ আরম্ভ হল। এর নাম **"সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ।"** এই যুদ্ধে **ইংলণ্ড ফ্রেডারিকের পক্ষে** গেল। **ফ্রান্স অস্ট্রিয়ার পক্ষে** যোগদান করল। এই যুদ্ধেও **অস্ট্রিয়ার পরাজয়** হয় ও সাইলেসিয়া স্থায়িভাবে প্রাসিয়ার কুক্ষিগত হয়।

এই সময় **দ্বিতীয় ক্যাথারিন** রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী ছিলেন। তিনি খুব উচ্চাভিলাষিণী ছিলেন। তাঁর সঙ্গে একযোগে, মেরিয়া থেরেসা পোল্যাণ্ড রাজ্যের প্রথম বাঁটোয়ারা করেন ও গ্যালিসিয়া অধিকার করেন। মেরিয়া থেরেসা খুব জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি অস্ট্রিয়াকে খুব দুরবস্থা থেকে ভাল অবস্থায় উন্নীত করেন।

দ্বিতীয় জোসেফ

১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে মেরিয়া থেরেসার পুত্র **দ্বিতীয় জোসেফ** সম্রাট্ পদে অভিষিক্ত হন। তিনি খুব শিক্ষিত ও প্রগতিপন্থী নৃপতি ছিলেন। তিনি ফরাসী সাম্যমন্ত্রের পূজারী **রুশোর মন্ত্রশিষ্য** ছিলেন। তাঁর রাজ্য-শাসনের মূলে ছিল, যুক্তি এবং প্রগতি। তিনি ইতিহাসের এক অদ্ভুত ব্যক্তি; সারা-জীবন আন্তরিকভাবে সাম্রাজ্যের উন্নতি ও মঙ্গলের চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত তাঁকে শুধু **ব্যর্থতা বরণ** করতে হয়েছিল। এর কারণ, তিনি ছিলেন স্বপ্নবিলাসী ও অবাস্তবপন্থী।

রাজা হয়েই তিনি, একটা আদর্শের প্রেরণায়, রাজ্যের চারদিকের **সংস্কারে ব্রতী** হলেন। তিনি তাঁর বহুধাবিভক্ত সাম্রাজ্যের, বিভিন্নমুখী জাতিদের মধ্যে চিরকালের জাতিগত অধিকার, প্রথা ও জাতি-বৈষম্য দূরীভূত করতে বদ্ধপরিকর হলেন। তাঁর আদর্শ ছিল, সমস্ত সাম্রাজ্যের মধ্যে একজাতীয় শাসন-নীতির প্রবর্তন করে বিভিন্ন জাতি ও প্রজাদের মধ্যে **একতা** আনা। এই কারণে, সমস্ত প্রদেশে তিনি একজাতীয় রাষ্ট্রীয় গঠন, আইন-কানুন এবং শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত করতে আরম্ভ করলেন। এতে অনেকেরই নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগল ও তাদের চিরাচরিত প্রথায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হল। জোসেফ যখন তাঁর সাম্রাজ্যের সর্বত্র জার্মান ভাষাকে **রাজকীয় ভাষা** বলে চালাতে শুরু করলেন, তখনই অন্য-জাতীয় প্রজাদের মধ্যে **অসন্তোষের মাত্রা** বেড়ে গেল।

জোসেফের কিছু সামাজিক সংস্কার অবশ্য স্থায়ী হল। তিনি অভিজাতবর্গ ও যাজক-সম্পত্তির উপর কর বসান, দাসত্বপ্রথা রহিত করেন এবং সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় ব্যাপারে স্বাধীনতা দান করেন। অস্ট্রিয়ায় বরাবরই যাজক-সম্প্রদায়ের অপরিমিত সুযোগ-সুবিধা ছিল। তিনি তার যথেষ্ট হ্রাস করেন, যাজকদের রাষ্ট্রের অধীন করেন। চার্চের সম্পত্তির অনেকটা রাষ্ট্রগত করে তিনি তার সাহায্যে বিদ্যালয় ও হাসপাতাল নির্মাণ করেন। তিনি

দ্বিতীয় জোসেফ

দাসদের শুধু মুক্তি দান করেন নি, তাদের জমির উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব দিয়ে দেন।

এই সব থেকে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় জোসেফ, ফরাসী **বিপ্লবীদের আধুনিক নীতিগুলি** তাদেরও আগে প্রবর্তন করেন।

জোসেফের আদর্শ, স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা খুবই উচ্চ ধরনের ছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু তিনি বাস্তবতার দিকে তাকান নি বলে এবং তাঁর মাতার মতো তাঁর সব দিকে খেয়াল ছিল না বলে তাঁর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ, তাঁর মহৎ উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে বিদ্রোহী হয়। হাঙ্গেরী,

বোহেমিয়া, বেলজিয়ম ও তিরোল জোসেফের সংস্কারগুলির বিরুদ্ধে **প্রকাশ্যে বিদ্রোহ** আরম্ভ করে। জোসেফ এই সব কারণে ব্যর্থমনোরথ হয়ে তাঁর মৃত্যুর পূর্বে, নিজের হাতেই সারাজীবনের সংস্কার-ব্যবস্থাগুলির বিলোপ সাধন করেন।

জোসেফের পরবর্তী সম্রাট্ **দ্বিতীয় লিওপোল্ডও** খুব সামর্থ্যবান্ ছিলেন, কিন্তু তিনি কোন কল্পনার ধার ধারতেন না। তিনি হ্যাপসবুর্গদের বরাবরের নিয়ম অনুসারে রাজ্যে পুনরায় যাজক-প্রাধান্য প্রচলিত করেন। তিনি **কঠোর হস্তে** সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে যে বিদ্রোহের ভাব মাথা-চাড়া দিয়ে উঠেছিল, তা দমন করেন এবং **রাজ্যে শৃঙ্খলা** স্থাপিত করেন।

দ্বিতীয়-লিওপোল্ড

১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় লিওপোল্ড পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের অধিপতিপদে স্থাপিত হবার পরেই **ফরাসী বিপ্লবীদের সঙ্গে** তাঁর ভীষণ সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। আলসেস, লরেন ও রাইন নদীর অঞ্চলভাগে, নবজাগ্রত ফরাসী বিপ্লবীরা নানাস্থানে আক্রমণ করতে শুরু করেছিল। লিওপোল্ড এই কারণে ভীত হন ও তাদের উপর রুষ্ট হন। ফরাসী দেশ থেকে অনেক বিপ্লব-বিরোধী পলাতক অস্ট্রিয়া-সাম্রাজ্যের অধীনে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের **এমিগ্রিস** বলা হয়। বিপ্লবীরা তাদের ফিরিয়ে চাইলে

লিওপোল্ড তাদের ছেড়ে দিতে অস্বীকার করলেন। এই সব কারণে নব-প্রেরণায় বলীয়ান ফরাসী বিপ্লবীরা অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

ইতিমধ্যে লিওপোল্ডের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র দ্বিতীয় ফ্রান্সিস অস্ট্রিয়ার সম্রাট্ হন। ফ্রান্সিস অস্ট্রিয়ার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বিপদের সম্মুখীন হলেন। ফ্রান্সে শীঘ্রই নেপোলিয়নের আবির্ভাব হল এবং নেপোলিয়নের সঙ্গে অস্ট্রিয়ার ঘোরতর সংগ্রাম শুরু হল। নেপোলিয়নের বিজয়-অভিযান, দেখতে দেখতে সারা ইওরোপের বিরুদ্ধে এগিয়ে চলল। তিনি একটার পর একটা যুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে পর্যুদস্ত করতে লাগলেন। শীঘ্রই বেলজিয়ম

দ্বিতীয় ফ্রান্সিস

অস্ট্রিয়ার হস্তচ্যুত হল। ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে লুনভিল-চুক্তির পর, জার্মেনীতে হ্যাপসবুর্গদের প্রতিপত্তির অবসান হল। এখন থেকে ফ্রান্সিস, প্রথম ফ্রান্সিস উপাধি নিয়ে শুধু অস্ট্রিয়ার সম্রাট্ হয়ে রইলেন।

১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে অস্টারলিজের যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার বিরাট পরাজয়ের পর তাকে সাম্রাজ্যের অনেক স্থান ছেড়ে দিতে হল। এর পর যখন নেপোলিয়ন

জার্মেনীর রাষ্ট্রগুলি একত্রিত করে, "রাইন-কনফেডারেশন" বা রাইন রাষ্ট্রসংঘের সৃষ্টি করলেন, তখন ফ্রান্সিস ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে আইনগতভাবে পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের সম্রাট্ উপাধি পরিত্যাগ করলেন। এইরূপে শার্লামেনের সময় হতে আগত যে উচ্চ সম্মান এতদিন হ্যাপসবুর্গরা ভোগ করে আসছিলেন, তার অবসান হল।

বিজয়ী নেপোলিয়ন বার বার অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় প্রবেশ করতে লাগলেন। ওয়াগ্রামের যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার আরও অনেক রাজ্য হাতছাড়া হল।

অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ফরাসী আক্রমণ

তখন অস্ট্রিয়ার ভাগ্যাকাশে এক ক্ষণজন্মা, প্রতিভাবান রাজনীতিকের আবির্ভাব হল। তাঁর নাম **মেটারনিক উইনি বার্গ** (১৭৭৩—১৮৫৯ খ্রীঃ)। তিনি অপরিসীম ধৈর্য ও উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা অস্ট্রিয়ার গৃহ সংস্কারে নিজেকে নিয়োজিত করলেন।

মেটারনিক

১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের পরে বেশ কিছুদিন পর্যন্ত অস্ট্রিয়াকে নেপোলিয়নের ক্ষমতার অধীনে থাকতে হল। পরে ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে যখন নেপোলিয়নের "মস্কো অভিযানে" বিরাট ক্ষতি হল, তখন আবার অস্ট্রিয়া সুযোগ পেয়ে, নেপোলিয়নের প্রতিপক্ষ-মিত্রশক্তির সঙ্গে যোগ দিল। অস্ট্রিয়া এবার প্রচণ্ডবিক্রমে মিত্রশক্তির সহযোগে, নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ

করল। লাইপজিগ্ যুদ্ধ, ফ্রান্সে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের অভিযান এবং মিত্রশক্তির সগৌরবে প্যারিস নগরীতে প্রবেশ,—প্রত্যেকটি ব্যাপারেই অস্ট্রিয়া প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিল।

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে **ওয়াটার্লুর যুদ্ধে** নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর, সমস্ত বিজয়ী শক্তি অস্ট্রিয়ার রাজধানী **ভিয়েনাতে এক কংগ্রেসে** সম্মিলিত হল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইওরোপের **পুনরায় সংগঠন** করা। এই ভিয়েনা-সম্মিলনে মেটারনিক সবচেয়ে প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সুকৌশলী বুদ্ধি ও কূট রাজনীতির সাহায্যে অস্ট্রিয়া তার হৃত রাজ্যগুলির **অনেক স্থানই ফিরে পেল।** জার্মেনী ও ইতালিতে **অস্ট্রিয়ার প্রভুত্ব** আবার

ভিয়েনার কংগ্রেস

স্থাপিত হল। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে দীর্ঘ যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার একটি শক্তিশালা, রাজভক্ত সৈন্যদল গড়ে উঠেছিল। এই সেনাদলই এখন থেকে অস্ট্রিয়া-সাম্রাজ্যের প্রধান অবলম্বন হল।

মেটারনিক খুব প্রতিক্রিয়াপন্থী রাজনীতিবিদ্ ছিলেন। তিনি সারা ইওরোপ থেকে, ফরাসী বিপ্লবীদের প্রজাতন্ত্রী নীতিগুলিকে নির্বাসিত করে দেবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন। তাঁর উদ্দেশ্য হল, বিপ্লবী ভাবধারা বিনষ্ট করে পুনরায় অষ্টাদশ শতাব্দীর সামাজিক ও রাষ্ট্রিক প্রথায় ফিরে যাওয়া। এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে তিনি রাশিয়ার জার, প্রাসিয়ার রাজা ও অপরাপর

দেশের শাসনকর্তাদের সঙ্গে মিলে, "হোলি অ্যালায়েন্স" বা পবিত্র সংঘের সৃষ্টি ও ইওরোপীয় সংহতির নামে অনেক প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেসের অধিবেশনের ব্যবস্থা করলেন।

অস্ট্রিয়া-সাম্রাজ্যে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও ভাষার সমাবেশ ছিল। তাদের বিভিন্নমুখী জাতিগত অধিকারবোধ ছিল। ফরাসী বিপ্লবীদের মানব-অধিকার ও স্বাধীনতাবোধ তাদের মধ্যে প্রবেশ করলে অস্ট্রিয়া-সাম্রাজ্য একেবারে ভেঙে যাবে মেটারনিক এটা বুঝতে পেরে, সাম্রাজ্যের সংহতি

মেটারনিক

বজায় রাখবার জন্যে, দীর্ঘকাল ধরে ইওরোপের যেখানে গণ-আন্দোলন হয়েছে, সেখানেই সেই সব দেশের রাজা-মহারাজাদের সাহায্যে, কঠোর হাতে ঐ সব আন্দোলন দমন করেছেন। এই যুগে মেটারনিক হলেন ইওরোপে গণ-আন্দোলনের বিরোধী ও প্রতিক্রিয়াপন্থার প্রতীক।

প্রথম ফ্রান্সিসের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে **প্রথম ফার্দিনান্দ** সম্রাট্ হলেন। তাঁর রাজত্বকালে মেটারনিকের ক্ষমতা আরও বেড়ে গেল; কিন্তু মেটারনিক এত চেষ্টা করেও সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন জাতির মনে স্বাধীনতার ভাব বিনষ্ট করতে পারলেন না। ফরাসী বিপ্লবীদের স্বাধীনতার মন্ত্র প্রত্যেক দেশের লোকের মনে অঙ্কুরিত হয়েছিল। উগ্র শাসনের দ্বারা তার নাশ করা যায় না। পর পর ১৮৩০ ও ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে **ফ্রান্সে আবার বিপ্লব** হল। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের প্রতিধ্বনি সারা ইওরোপকে প্রকম্পিত করে তুলল। এই সময়ে অস্ট্রিয়া-সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরেও এক বিরাট বিপ্লবের অভ্যুত্থান হল। এই বিপ্লবের ঝড়ে সম্রাট্, মেটারনিক ও আরো অনেককে রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে যেতে হল। তবে বিপ্লব অবশেষে **ব্যর্থ** হয়ে গেল। এই সময় অস্ট্রিয়ার ছাত্রসমাজে বিশেষ জাগরণ দেখা দিয়েছিল।

বিপ্লব ভেঙে দেবার পর আবার অস্ট্রিয়ার সম্রাট্ তাঁর কেন্দ্রীয় শক্তি প্রতিষ্ঠিত করলেন। সম্রাট্ ফার্দিনান্দের পর **ফ্রান্সিস জোসেফ** অল্প বয়সে সিংহাসনে বসলেন। ফ্রান্সিস জোসেফ আইনানুগভাবে রাজ্য চালনা করবেন বলে ঘোষণা করলেন, কিন্তু কার্যকালে তার বিশেষ কিছু হল না।

ফ্রান্সিস জোসেফ অস্ট্রিয়ার সম্রাট্ ও হাঙ্গেরীর রাজা ছিলেন। তাঁর সময়ে অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, বোহেমিয়া, ট্র্যানসিলভেনিয়া, পোলিশ গ্যালিসিয়া, ট্রেন্টিনো, স্লাভনিয়া, ক্রোয়াটিস, বোসনিয়া, হার্জিগোভিনা প্রভৃতি স্থান তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল ২,৬১, ২৫৯ বর্গ-মাইল এবং লোকসংখ্যা ছিল ৫,১০,০০,০০০।

১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে অস্ট্রিয়ার জবরদস্ত রাজনীতিজ্ঞ **শবারজেনবার্গ** দেশের রাষ্ট্রবিধি রহিত করলেন। অস্ট্রিয়ায় আবার নিরঙ্কুশ **স্বৈরাচারী শাসনের প্রবর্তন** হল। সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন জাতির স্বায়ত্তশাসন বিলুপ্ত হল। সমস্ত জাতির মধ্যে একমাত্র জার্মান-নীতি প্রবর্তিত হল এবং ক্যাথলিক চার্চের প্রভুত্ব পুনরায় স্থাপিত হল। কিন্তু ইওরোপে এই সময় এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটল যার ফলে অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যে ভালরূপেই ভাঙ্গন ধরল।

ইতালিতে বহুদিন থেকেই **ম্যাৎসিনি, গ্যারিবল্ডি** ও **কাভুরের** নেতৃত্বে, সাম্রাজ্যবাদী অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল। পূর্বে অনেকবার বিফলমনোরথ হয়ে এইবার কাভুরের পররাষ্ট্রনীতির বিচক্ষণতায়, ইতালি তার স্বাধীনতা-আন্দোলনে ফ্রান্সের সম্রাট্ তৃতীয় নেপোলিয়নের সমর্থন পেল। **ইতালি শীঘ্রই স্বাধীন** হয়ে গেল।

জার্মেনীর অন্তর্গত প্রাসিয়ায় এই সময় একজন অভূতপূর্ব শক্তিমান্ রাজনীতিবিদের আবির্ভাব হয়। তাঁর নাম **বিসমার্ক**। তিনি প্রথম থেকে অস্ট্রিয়ার সমস্ত প্রভুত্ব অপসারিত করে জার্মেনীতে প্রাসিয়াকে প্রধান রাষ্ট্ররূপে স্থাপিত করবার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। প্রথমে **শ্লেজ-উইগ্-হলস্টিন্**

ফ্রান্সিস জোসেফ

সমস্যার সৃষ্টি করে বিসমার্ক অস্ট্রিয়াকে অসুবিধার জালে জড়িত করলেন, পরে সরাসরি অস্ট্রিয়া ও প্রাসিয়ার মধ্যেই যুদ্ধ বেধে গেল। এই যুদ্ধে মাত্র সাত সপ্তাহের মধ্যে অস্ট্রিয়া সর্বত্র হেরে গেল। এই সময় **সাডওয়া'র যুদ্ধ** বিশেষ উল্লেখযোগ্য (১৮৬৬ খ্রীঃ)। জার্মেনীর উপর অস্ট্রিয়ার আর কোনরূপ আধিপত্য থাকল না।

পর পর এই পরাজয়ের ফলে, অস্ট্রিয়া তার সাম্রাজ্যনীতিতে পরিবর্তন আনয়ন করল। রাজনীতিজ্ঞ ব্যারন বিউস্টের পরামর্শ অনুসারে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে একটা চুক্তি হল। এর ফলে সাম্রাজ্যে দ্বৈত-রাজতন্ত্রের প্রচলন হল। হাঙ্গেরীকে স্বাধীনতা দেওয়া হল। সাম্রাজ্যের নতুন নাম হল **"অস্ট্রিয়-হাঙ্গেরী"** সাম্রাজ্য।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ জার্মেনীকে এক ঐক্যবদ্ধ রাজ্যে পরিণত করবার পর, বিসমার্ক তাঁর পররাষ্ট্রনীতিতে, অস্ট্রিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব আরম্ভ করলেন। ইওরোপের রাষ্ট্রগুলি ক্রমে দুইটি রাজনৈতিক চক্রে বিভক্ত হল। একদিকে জার্মেনী, অস্ট্রিয়া ও ইতালি এবং আর একদিকে ফ্রান্স, রাশিয়া ও ইংলণ্ড। পশ্চিমদিকের সাম্রাজ্যগুলি হাতছাড়া হয়ে যাবার পর অস্ট্রিয়া পূর্বদিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। তার সাম্রাজ্যের অন্তর্গত স্বাধীনতাকামী জাতিগুলিকেও কঠোরহস্তে দমন করতে শুরু করল।

অস্ট্রিয়া-সাম্রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন জাতি ছিল; তাদের মধ্যে স্লাভ, চেক, রুথেন, ক্রোশিয়ান, স্লোভেন ও সার্ব প্রধান। তাদের মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠছিল। সেই অনুপাতে তাদের উপর অস্ট্রিয়ার দমননীতিও ক্রমেই প্রবলতর হচ্ছিল। স্লাভ জাতিদের বিদ্রোহী আন্দোলনে বরাবরই সার্বিয়া নেতৃত্ব করছিল।

বর্তমান অস্ট্রিয়া

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুন, অস্ট্রিয়ার যুবরাজ **ফ্রান্সিস ফার্দিনান্দ,** বোসনিয়ার রাজধানী সারাজিভোতে ভ্রমণকালে **সস্ত্রীক নিহত** হন। অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে। এই থেকেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উৎপত্তি হয়। শীঘ্রই এই যুদ্ধে জার্মেনী অস্ট্রিয়ার পাশে এসে দাঁড়াল এবং অপর পক্ষে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া প্রভৃতি শক্তিসমূহ সংঘবদ্ধ হল। এই যুদ্ধে অস্ট্রিয়া বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারে নি। এই যুদ্ধের ফলে অস্ট্রিয়া-সাম্রাজ্য বহুধাবিভক্ত হল। অস্ট্রিয়া-সাম্রাজ্য ভেঙে চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, যুগোস্লাভিয়া প্রভৃতি নতুন রাষ্ট্রের উৎপত্তি হল। অস্ট্রিয়া একেবারে একটি ছোট শক্তিতে পরিণত হল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অস্ট্রিয়ার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে লাগল। তার অর্থনীতিক ব্যবস্থায় নানারূপ বিপর্যয় দেখা দিল। জার্মেনীর রাষ্ট্র-গগনে হিটলারের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে অস্ট্রিয়া একরূপ জার্মেনীর অঙ্গীভূত হয়ে যায়। হিটলার ১৩ই মার্চ, ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়া দখল করে নিলেন।

অর্থনীতিক ব্যাপারে জার্মেনী অস্ট্রিয়ার সঙ্গে একটি ঐক্য-সংযোগ করল—যার নাম "আনস্লুস" বা অর্থনীতিক ঐক্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই জার্মেনী অস্ট্রিয়াকে তার দেশের অন্তর্ভুক্ত করেছিল। কাজে কাজেই অস্ট্রিয়ার অনিচ্ছাসত্ত্বেও, জার্মেনীর পক্ষে আগাগোড়া যুদ্ধে তাকে যোগ দিতে হল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অস্ট্রিয়ার সৈন্য কোনদিকে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারে নি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে জার্মেনীর মতো অস্ট্রিয়াও প্রধান মিত্রশক্তিবর্গের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে যায়।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছাকৃত গড়িমসির জন্যে অস্ট্রিয়ার পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হতে বিলম্ব হয়। অবশেষে সুদীর্ঘ সতের বৎসর পরে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মে অস্ট্রিয়া স্বাধীন হয়েছে। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন অস্ট্রিয়ার আয়তন যেরূপ ছিল, সেইরূপ আয়তনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেটব্রিটেন, রাশিয়া প্রভৃতি শক্তিগণ দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে। স্থির হয়েছে, পররাষ্ট্রনীতিতে অস্ট্রিয়াকে সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ থাকতে হবে। কোন শক্তি-গোষ্ঠীতে সে যোগ দিতে পারবে না।

এখন অস্ট্রিয়া তার আগেকার গরিমাময় ইতিহাসের তুলনায় একটি অতি ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হয়েছে। অস্ট্রিয়া রাষ্ট্র সংঘের সদস্য। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মে অ্যাডলফ শার্ফ (জন্ম ১৮৯০ খ্রীঃ, ২০শে এপ্রিল) প্রেসিডেণ্ট হন। ফ্র্যান্জ্ জোনাস ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেণ্ট হন।

অস্ট্রিয়ার অধিবাসীরা প্রধানতঃ রোমান ক্যাথলিক। এর আয়তন ৮৩,৮৪৯ বর্গ কিলোমিটার (৩২,৩৬৬ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ৭০,৭৩,৮০৭ (১৯৬১ খ্রীঃ)। রাজধানী ভিয়েনা।

ফিনল্যাণ্ড

ফিনল্যাণ্ড ১১৫৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুইডেনের অধীন থাকে। তারপর ইহা রাশিয়ার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর ফিনল্যাণ্ড স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ করে। ঘোরতর যুদ্ধের পর ফিনল্যাণ্ড ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ১৬১৭৩ বর্গ-মাইল স্থান সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে নাৎসী জার্মেনী রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে ফিনল্যাণ্ড তার হৃত স্থানসমূহ ফিরে পাবার আশায় যুদ্ধে নামে। কিন্তু জার্মেনী হেরে গেলে রাশিয়া আগে ফিনল্যাণ্ডের যে-সব স্থান দখল করেছিল সেই সব স্থান অধিকার তো করলই, তা ছাড়া আরো কিছু অংশ ছিনিয়ে নিল এবং ৫০ বৎসরের জন্যে পোর্ককালার উপর সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের অধিকার পেল।

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফিনল্যাণ্ড রাশিয়ার সঙ্গে দশ বৎসরের মতো এক চুক্তি করে। তাতে তারা পরস্পরকে সাহায্য করবে বলে স্বীকৃত হয়। সেই চুক্তি ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নূতন করে বলবৎ করা হয় এবং তা ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চলবে বলে স্থির হয়। রাশিয়া পোর্ককালা ফেরত দেয়।

ডাঃ উরো কেককোনেন ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেণ্ট হন। তিনি ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারি পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। ফিনল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী মাউনো কইভিস্টো।

এখানকার অধিবাসীরা খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী। এর আয়তন ৩,০৫,৪৭৫ বর্গ কিলোমিটার (এর সঙ্গে জলভাগ সংযুক্ত হবে ৩১,৫৫৭ বর্গ কিলোমিটার) এবং লোকসংখ্যা ৪৫,০৫,০০০ (১৯৬২ খ্রীঃ)।

পোলাণ্ড

পোলাণ্ড বর্তমানে মধ্য ইওরোপের একটি কম্যুনিস্ট প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র। ৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে পোলাণ্ডের নিয়মিত ইতিহাস পাওয়া যায়। চতুর্দশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত পোলাণ্ড একটি শক্তিশালী দেশ ছিল।

প্রাসিয়া, রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও জার্মেনীর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যবস্থায় চারবার পোলাণ্ড বিভক্ত হয়েছে (১৭৭২, ১৭৯৩, ১৭৯৫ ও ১৯৩৯ খ্রীঃ) ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের ১১ই নভেম্বর বিভিন্ন শক্তিবর্গের মধ্যে চুক্তি অনুসারে পোলাণ্ড স্বাধীন হয়। ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে নাৎসী জার্মেনী

ডবলিউ গোমুলকা।

ও সোভিয়েট ইউনিয়ন পোলাণ্ড আক্রমণ করে এবং চুক্তি অনুযায়ী পোলাণ্ডকে বিভক্ত করে। জার্মেনী ওয়ারশকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। তবে শেষ পর্যন্ত জার্মেনী পোলাণ্ড ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে কম্যুনিস্ট দল দেশের শাসন-ব্যবস্থা দখল করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পোলাণ্ডের আয়তন ছিল ১,৫০,৪৭০ বর্গমাইল। রাশিয়া ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে ৬৯,৮৬০ বর্গমাইল স্থান

ছিনিয়ে নেয়। তবে তাকে জার্মেনীর ৪০,০০০ বর্গমাইল স্থান দেওয়া হয়। অবশ্য এই ব্যবস্থা পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহ মেনে নেয় নি।

স্ট্যালিনপন্থীরা বার বৎসর ধরে পোলাণ্ড শাসন করে। এই সময়ে তারা জমিদারদের ক্ষমতাচ্যুত করে, স্কুলে ধর্মশিক্ষা বন্ধ করে, রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের জেলে পাঠায়। কম্যুনিস্ট শাসনে শ্রমিকরা পর্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে জুন পোজনানে শ্রমিকরা দাঙ্গা করে। সৈন্যদের গুলিতে বহু শ্রমিক হতাহত হয়।

পোলাণ্ডের কম্যুনিস্টরা পর্যন্ত সোভিয়েট হস্তক্ষেপে বিরক্ত হয়ে ওঠে। ডবলিউ গোমুলকাকে ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে জেল থেকে মুক্ত করে নেতার পদ দেওয়া

নিকোলাস কোপার্নিকাস

হয়। তাঁর চেষ্টায় দলের প্রধান প্রধান স্থান থেকে স্ট্যালিনপন্থীদের সরিয়ে দেওয়া হয়। স্কুলে ধর্মশিক্ষার অনুমতি দেওয়া হয়। গির্জায় ধর্মোপাসনার বাধা অপসারিত হয়। পশ্চিমী শক্তিদের কাছ থেকে বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য গ্রহণ করা হতে থাকে। তবে সোভিয়েট চাপে তাঁর কাজ করবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হয়ে ওঠে।

১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে জোজেফ সাইরাঙ্কিয়েউইজ প্রধানমন্ত্রী হন।

বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ নিকোলাস কোপার্নিকাস (১৪৭৩—১৫৪৩ খ্রীঃ) পোলাণ্ডের লোক। তিনিই পাশ্চাত্ত্য জগতে প্রথম প্রচার করেন যে

সূর্য সৌরজগতের কেন্দ্র এবং পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সূর্যের চারিদিকে পরিভ্রমণ করছে।

মেরী কুরি

বিখ্যাত মহিলা বিজ্ঞানী মেরী কুরি জাতিতে পোল। তাঁর স্বামী পিয়েরে কুরি অবশ্য ফরাসী। তাঁরা রেডিয়াম আবিষ্কার করে জগদ্বিখ্যাত হন।

পিয়ারে কুরি

এখানকার অধিবাসীরা অধিকাংশ রোমান ক্যাথলিক। এর আয়তন ৩,১২,৫২০ বর্গ কিলোমিটার (১,২০,৩৫৫ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ৩,১৮,১০,০০০ (১৯৬৭ খ্রীঃ), দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ছিল ৩,৪৭,৭৫,৬৯৮। রাজধানী ওয়ারশ।

নরওয়ে

নরওয়ে বহু শতাব্দী কাল সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকবার পর ১৩৮১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ডেনমার্কের সঙ্গে যুক্ত থাকে। তারপর ১৮১৪ থেকে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুইডেনের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর নরওয়ে ও সুইডেন পৃথক্ হয়ে যায়।

পঞ্চম ওলাভ

সপ্তম হাকনের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র পঞ্চম ওলাভ ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর নরওয়ের রাজা হন। আইনার গার্হার্ডসেন ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী হন।

নরওয়ের অধিবাসীরা খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী। এর আয়তন ৩,২৩,৮৮৪ বর্গ কিলোমিটার (১,২৫,২৪৯ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ৩৬,৪০,০০০ (১৯৬২ খ্রীঃ)।

পোর্তুগাল

দ্বাদশ শতাব্দী থেকে পোর্তুগাল একটি স্বাধীন রাজ্য। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে দেশে এক বিদ্রোহ দেখা দেয়। তখন দেশবাসী রাজা দ্বিতীয় মানোয়েলকে অপসারিত করে। দেশ এক প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

পোর্তুগিজরা এক সময়ে ভারতে ব্যবসায় করতে আসে এবং ভারতবাসীদের উপর নানা অত্যাচার চালায়। পোর্তুগিজ জলদস্যুরা সেই সময়ে ভারতবাসীদের কাছে এক ভীষণ ভয়ের বস্তু ছিল। পোর্তুগিজরা স্পেনীয়, ব্রিটিশ, ফরাসী প্রভৃতিদের মতো আফ্রিকা ও এশিয়ার নানাস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে। উত্তর আটলান্টিকে কেপ ভার্ডি দ্বীপপুঞ্জ (১,৫৫৭ বর্গমাইল), আফ্রিকায় অ্যাংগোলা (৪,৮১,৩৫১ বর্গমাইল), আফ্রিকায় মোজাম্বিক (২,৯৭,৭৩১ বর্গমাইল), চীনে ম্যাকাও (৬ বর্গমাইল), মালয়ে টিমর (৭,৩৩০ বর্গমাইল) প্রভৃতি স্থান পোর্তুগিজেরা অধিকার করে রেখেছে।

গোয়া অধিকারের জন্য সারা ভারতে এবং গোয়ার অভ্যন্তরে এক তুমুল আন্দোলন হয়। গোয়াবাসী আন্দোলনকারীদের উপর এবং ভারতের সত্যাগ্রহীদের উপর বর্বর আক্রমণ চালানো হয়। কয়েকজন ভারতীয় গোয়া সীমান্তে নিহত হন। ভারতের লোকসভা-সদস্যসহ বহু সত্যাগ্রহী গোয়ার কারাগারে আবদ্ধ হন। কিন্তু কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের ফলে সেই আন্দোলন বন্ধ হয়ে যায়। অবশেষে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর গোয়া, দমন ও দিউ (মোট ১৫৩৭ বর্গমাইল) ভারত সরকার কর্তৃক অধিকৃত হয়।

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুন আমেরিকো আর টমাস পোর্তুগালের প্রেসিডেন্ট হন এবং প্রধানমন্ত্রী হন অ্যান্টানিও ডি অলিভেরা সালাজার।

পোর্তুগালের অধিবাসীরা খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী। এর আয়তন ৯১,৫৬১ বর্গ কিলোমিটার (৩৪,৮৩১ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ৯২,৩৪,৪০০ (১৯৬৫ খ্রীঃ)।

সুইটজালাণ্ড

সুইটজার্লাণ্ড মধ্য ইওরোপের একটি পর্বতবহুল দেশ। আল্পস এদেশের প্রধান পর্বতমালা।

সুইটজার্লাণ্ড একসময়ে রোমক সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহা স্বাধীন হয়। তারপর নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সংযুক্ত প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে উইলি স্পালার প্রেসিডেন্ট হন।

সুইটজার্লাণ্ড কোন দেশের সঙ্গে কোনভাবে সামরিক চুক্তিবদ্ধ হয় নি। এ দেশ রাষ্ট্রসংঘের সদস্য নয়।

এখানকার অধিবাসীরা খ্রীস্টধর্মাবলম্বী। এর আয়তন ৪১,২৮৮ বর্গ-কিলোমিটার (১৫,৯৪১ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ৫৬,১০,০০০ (১৯৬২ খ্রীঃ)। রাজধানী বার্ন।

আইসল্যাণ্ড

আইসল্যাণ্ড উত্তর আটলাণ্টিকের একটি দ্বীপরাজ্য। আইসল্যাণ্ড ৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১২৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত একটি স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র ছিল। তারপর ইহা নরওয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দে নরওয়ে ও আইসল্যাণ্ড ডেনমার্কের অধীন হয়। ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে নরওয়ে ডেনমার্কের অধীনতা পাশ ছিন্ন করে। তখন আইসল্যাণ্ড ডেনমার্কেরই অধীন থেকে যায়।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ডেনমার্ক আইসল্যাণ্ডকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে গণ্য করে। শুধু ডেনমার্কের রাজা দশম খ্রীষ্টিয়ান আইসল্যাণ্ডেরও রাজা থাকেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে আইসল্যাণ্ডের পার্লামেণ্ট ডেনমার্কের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করতে সংকল্প করে। ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই জুন আইসল্যাণ্ড পুরাপুরি স্বাধীন হয়।

আইসল্যাণ্ডের পার্লামেণ্ট পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন। প্রায় এক হাজার ষাট বছর আগে এই পার্লামেণ্ট গঠিত হয়।

আসগের আসগেরসন ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা আগস্ট আইসল্যাণ্ডের প্রেসিডেণ্ট হন। বি. বেনিডিক্‌টসন এর প্রধানমন্ত্রী।

আইসল্যাণ্ডের অধিবাসীরা খ্রীস্টধর্মাবলম্বী। এর আয়তন ১,০৩,০০০ বর্গ কিলোমিটার (৩৯,৭৫৮ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ১,৯৬,৯৩৩ (১৯৬৬ খ্রীঃ)। রাজধানী রেকজাভিক।

ডেনমার্ক

ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহাগেনের প্রতিষ্ঠা করেন বিশপ অ্যাবস্যালন (১১২৮—১২০১ খ্রীঃ)। ডেনমার্কের এলসিনোর নামক স্থানে রাজা হ্যামলেটের কবর আছে।

ডেনমার্কে বহু শত বৎসর ব্যাপী রাজতন্ত্র বর্তমান। রাজা নবম ফ্রেডারিক (জন্ম ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের ১১ই মার্চ) ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল তাঁর পিতা দশম খ্রীষ্টিয়ানের মৃত্যুর পর রাজা হন। হিলমার বনসগার্ড এর প্রধানমন্ত্রী।

ডেনমার্কের অধিবাসীরা খ্রীস্টধর্মাবলম্বী। এর আয়তন ৪৩,০৬৯ বর্গ কিলোমিটার (১৬৬২৯ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ৪৮,১৩,৮৯২ (১৯৬৭ খ্রীঃ)।

গ্রীনল্যাণ্ড ও ফারো দ্বীপপুঞ্জ ডেনমার্কের অধীন।

বেলজিয়াম

বেলজিয়াম জুলিয়াস সীজারের দ্বারা অধিকৃত হয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে এ দেশ রোমান ও ফ্রাঙ্ক এবং বার্গেণ্ডি, স্পেন, অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্স দ্বারা শাসিত হয়। ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে নেপোলিয়নের পতনের পর বেলজিয়াম নেদারল্যাণ্ডসের অধীন হয়।

১৮৩০ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর বেলজিয়ামে স্বাধীন রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম লিওপোল্ড রাজা হন। তাঁর পুত্র দ্বিতীয় লিওপোল্ড ১৮৬৫ খ্রীঃ থেকে ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তারপর প্রথম আলবার্ট রাজা হন। তিনি ১৯৩৪ খ্রীঃ পর্বতারোহণকালে মারা গেলে তাঁর পুত্র তৃতীয় লিওপোল্ড রাজা হন।

১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে জার্মান সৈন্য বেলজিয়ামে প্রবেশ করে ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাজা তৃতীয় লিওপোল্ড জার্মেনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। তা সত্ত্বেও তার ক্ষতি কম হয়নি।

১৯৫১ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই জুলাই তৃতীয় লিওপোল্ডের পুত্র প্রথম বদোইন (জন্ম ১৯৩০ খ্রীঃ ৭ই সেপ্টেম্বর) রাজা হন।

বেলজিয়ামের অধিবাসীদের অধিকাংশ খ্রীস্টধর্মাবলম্বী। এর আয়তন ৩০,৫১৩ বর্গ কিলোমিটার (১১,৭৭৮ বর্গমাইল) ও লোকসংখ্যা ৯৫,৫৬,৩৮০ (১৯৬৬ খ্রীঃ)। রাজধানী ব্রাসেলস্।

ইওরোপীয় ইতিহাসের ঝটিকা-কেন্দ্র বলকান দেশসমূহ যেমন পাহাড়-উপত্যকায় ঘেরা তেমনি এদের কাহিনী নানা বৈচিত্র্য ও বিপর্যয়ে পরিপূর্ণ। কৃষ্ণসাগরের পশ্চিম প্রান্তে বলকান পর্বতমালার নাম হতেই এ-অঞ্চলের নামের উৎপত্তি হয়েছে। দক্ষিণ-ইওরোপের তিনটি উপদ্বীপের মধ্যে সকলের পূর্বে রয়েছে বলকান উপদ্বীপ। এক রুমানিয়া বাদে অপরাপর বলকান দেশগুলি দানিয়ুব নদীর দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। বলকান অঞ্চলের পূর্বদিকে দার্দানেলিস্ ও বস্‌ফোরাস্ প্রণালী এশিয়ার এত সন্নিকটে যে এই অঞ্চলকে এশিয়া ও ইওরোপ—দুই মহাদেশের সেতুস্বরূপ বলা চলে। বলকান উপদ্বীপে এত বিভিন্ন জাতি, ভাষা, রীতি-নীতি, ধর্ম ও বিভিন্নমুখী জাতীয় আদর্শের সমাবেশ হয়েছে যে পৃথিবীতে বোধ হয় আর কোন অংশে এরূপ দেখা যায় না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভের সময় বলকান অঞ্চল আটটি দেশে বিভক্ত ছিল, যথা:—সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো, আলবেনিয়া, গ্রীস, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, তুরস্কের ইওরোপীয় অংশ এবং অস্ট্রিয়া। বলকান অঞ্চলের অন্তর্গত বোসনিয়া, হার্জিগোভিনা ও ডালমেসিয়া অস্ট্রিয়ার অধীনে ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে বলকান অঞ্চলে অনেক ভাঙাগড়া হয় এবং এ স্থানের দেশগুলির নাম হয়—যুগোস্লাভিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, তুরস্ক, গ্রীস এবং আলবেনিয়া। মন্টিনিগ্রো ও সার্বিয়া

নতুন দেশ যুগোস্লাভিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়। অস্ট্রিয়ার অধীন বলকান অংশগুলি তার হাতছাড়া হয়।

বহু শতাব্দী ধরে বলকান অঞ্চলের সমস্যা যে এত জটিল তার একটা প্রধান কারণ হচ্ছে যে, বলকান জাতিনিচয় স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে, বিভিন্ন দেশগুলিতে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে আছে। ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে কখনো কখনো বলকান অঞ্চল এক শাসনের অধীনে এসেছে বটে, কিন্তু সাধারণতঃ এ-অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতা ও বিশৃঙ্খলতাই বেশী দৃষ্ট হয়। এ বিশৃঙ্খলতার ফলে নানাযুগে পার্শ্ববর্তী শক্তিশালী জাতিসমূহ, এ দেশগুলির অভ্যন্তরে জোর করে হস্তক্ষেপ করেছে। কত জাতির অগ্রাভিযান ও পশ্চাদপসরণের কাহিনী যে এ দেশগুলির সঙ্গে জড়িত, তার ইয়ত্তা নেই।

পুরাতন ইতিহাস

প্রাচীনকালে বলকান অঞ্চল রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একশাসনাধীন ছিল। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে, পশ্চিম-রোমক সাম্রাজ্যের উপর বর্বর জাতিদের আক্রমণ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, বলকান দেশগুলিই প্রথম আক্রান্ত হয়। পর পর ভিসিগথ, অস্ট্রোগথ প্রভৃতি বর্বর জাতিগুলি এ দেশের উপর হানা দিয়ে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে, কিন্তু শীঘ্রই উত্তর-ইওরোপ হতে স্লাভজাতীয় অভিযাত্রীর দল এসে পূর্ব-বর্বর জাতিদের উপর পতিত হয় এবং তাদের পশ্চিমদিকে বিতাড়িত করে।

খ্রীষ্টীয় তৃতীয় থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত স্লাভজাতীয় আক্রমণকারিগণ বলকান অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এ-যুগের প্রথমদিকে, বাইজান্টিয়ামের পূর্ব-রোমক সাম্রাজ্যের প্রভাব দানিয়ুবের দক্ষিণে বলকান দেশে বিস্তৃত ছিল। রোমক ও ল্যাটিন সভ্যতা বলকান ভূভাগের নানাস্থানে ছড়িয়ে ছিল। স্লাভজাতিরা ক্রমে ইলীরিয় প্রভৃতি পূর্বেকার জাতিদের কোণঠাসা করে চারদিকে বিস্তারলাভ করল। এখনও বলকান উপদ্বীপের নানাস্থানে স্লাভ নামগুলির পরিচয় পাওয়া যায়; এতে পরিষ্কাররূপে বুঝা যায় যে স্লাভ-প্রভাব কত দৃঢ়ভাবে বলকান উপদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত একটি স্লাভ ভাষা দক্ষিণ-গ্রীসে প্রচলিত ছিল।

সপ্তম শতাব্দীতে সার্ব-ক্রোট জাতির লোকেরা উত্তর-পশ্চিম বলকান বিভাগ আক্রমণ করে। তারা ডালমেসিয়া ও আদ্রিয়াতিক উপকূলভাগে, ইলীরিয় ও

অন্যান্য জাতিদের জয় করে সেখানে বসবাস করে। সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে তুরান গোষ্ঠীভুক্ত বুলগার জাতির লোকেরা দানিয়ুব নদী অতিক্রম করে খ্রেস প্রভৃতি স্থানের স্লাভ জাতিদের পরাভূত করে। কিন্তু শীঘ্রই বুলগারগণ পরাজিত জাতিদের নবলব্ধ সভ্যতা গ্রহণ করে।

বুলগার রাজগণ সমস্ত বলকান অঞ্চলে তাঁদের প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন। নবম-দশম শতাব্দীতে, বুলগার অধিপতি সিমিওনের সময়ে তাঁদের সাম্রাজ্য আদ্রিয়াতিক সাগর হতে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। কনস্টান্টিনোপলের পূর্ব-রোমক বা গ্রীক সম্রাট্‌দের সঙ্গে বুলগার সাম্রাজ্যের প্রায়ই সংঘর্ষ চলেছিল। বুলগার রাজগণ বলকানের নানা অঞ্চলে দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাঁদের শাসন চালিয়েছিলেন। সার্বগণ চতুর্দশ শতাব্দীতে স্টিফেন দুশানের শাসনকালে তাদের প্রভাব আলবেনিয়া, মাসিডোনিয়া, এপিরাস, থেসালী এবং উত্তর-গ্রীসের উপর বিস্তার করে। আলবেনীয়গণ ও বোসনীয়গণ কিছুকালের জন্যে বলকান উপদ্বীপের পশ্চিমাঞ্চলে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চতুর্থ ক্রুসেডের ল্যাটিনগণ কনস্টান্টিনোপলে কিছুদিনের জন্যে তাদের রাজত্ব স্থাপন করেছিল। ভেনিশীয়রা অনেকগুলি সমুদ্রকূলস্থিত নগর ও দ্বীপে তাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ফ্রাঙ্কজাতীয় সামন্ত রাজাদের শাসন কিছুকালের জন্যে সালোনিকা, এথেন্স, একিয়া প্রভৃতি স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। স্থানে স্থানে গ্রীক সম্রাট্‌দের প্রভাবও বিস্তার করত। ভেনিশীয়গণ অনেক শতাব্দী পর্যন্ত তাদের প্রতিপত্তি বজায় রেখেছিল এবং তারা তুর্কীদের সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যাপৃত থাকত।

তুর্কীশক্তির অধীনে বলকান দেশ

বলকান অঞ্চলের বিভিন্ন জাতির মধ্যে কলহ ও অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে, এশিয়া-মাইনরের প্রবল অটোমান তুর্কীজাতির আক্রমণকারীরা চতুর্দশ শতাব্দী হতে, ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মত বলকান দেশগুলির উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। ১৩৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীরা গ্যালিপোলি অধিকার করল। ১৩৬০ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান প্রথম মুরাদ আদ্রিয়ানোপলে তাঁর রাজধানী স্থাপিত করেন। দেখতে দেখতে স্লাভ ও সার্বজাতির লোকেরা মুসলমান-শক্তির দ্বারা বিজিত হল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদের রাজত্বকালে, প্রায়

সমগ্র বলকান অঞ্চল তুর্কী অধানে চলে যায়। তুর্কীরা ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কনস্টান্টিনোপল জয় করে। এতদিন পরে ঘুণে ধরা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের পতন হয়। এ যুগে নানা বলকান জাতি তুর্কী-অভিযান প্রবলভাবে প্রতিরোধ করেছিল। আলবেনীয়গণ তাদের দেশপ্রেমিক নেতা স্কাণ্ডারবেগের অধীনে, বীরত্বের সঙ্গে তুর্কীদের বাধা দিয়েছিল, কিন্তু কোন কিছুই ইসলামের দুর্জয় অভিযানকে ঠেকাতে পারল না। তুর্কীদের বিপক্ষে ভেনিশীয়দের বাধাপ্রদানও বিফল হল। দীর্ঘকালের জন্যে বলকান দেশসকল তুর্কী-ক্ষমতার অধীনে চলে গেল।

জর্জ কাস্ট্রিয়োটা (স্কাণ্ডারবেগ)

ষোড়শ শতাব্দীতে প্রতাপান্বিত সুলতান সোলেমানের রাজত্বকালে তুরস্ক শক্তিমত্তার উচ্চ-শিখরে আরোহণ করে। সোলেমান মোহাক্সের যুদ্ধে (১৫২৬ খ্রীস্টাব্দে) হাঙ্গারীর ক্ষমতা বিনষ্ট করেন। তিনি অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনার দ্বারদেশ পর্যন্ত উপনীত হয়েছিলেন। ভিয়েনা যদিও কোনরূপে তুর্কী-গ্রাস হতে রক্ষা পেল, কিন্তু বলকান দেশগুলির উপর তখন তুর্কী-অভিযান অবারিত গতিতে প্রসার লাভ করতে লাগল। তুর্কীদের প্রভাব কার্পেথিয় পর্বতমালা হতে ইরানের প্রান্তদেশ এবং ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে মরোক্কো পর্যন্ত বিস্তৃত হল। কৃষ্ণসাগর বস্তুতঃ তুরস্কের হ্রদে পরিণত হল, ভূমধ্যসাগরেও তুরস্কের আধিপত্য স্থাপিত হল। সোলেমানের প্রবল প্রতাপের সম্মুখে বলকানবাসীদের আর কোন স্বাধীনতাই অবশিষ্ট রইল না।

সোলেমানের মৃত্যুর পর তুর্কী সুলতানগণ আর সেরূপ সুদক্ষ ও বিজয়ী ছিলেন না। তাঁদের মধ্যে নানারূপ গোলমাল ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। এই সুযোগে খ্রীস্টান শক্তিগণও নিজেদের ক্ষমতা সংহত করতে সচেষ্ট হল। ১৫৭১ খ্রীস্টাব্দে লেপান্তোর নৌযুদ্ধে স্পেন, ভেনিশ ও পোপের শক্তি একত্র হয়ে তুরস্ককে হারিয়ে দেয়। তবে তুর্কী-রাজপরিবারে নিজেদের মধ্যে কলহ বিরোধ শুরু হলেও বলকান দেশগুলির উপর তাদের প্রতিপত্তি সমভাবেই বজায় রইল। কেবল তাদের প্রসারের প্রয়াস কিছুকালের জন্যে বন্ধ ছিল।

আবার সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, তুর্কী সেনাপতি কিউপ্রিলিদের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে তুর্কীদের বিজয়লিপ্সা সতেজ হয়ে উঠল। মহম্মদ ও

আমেদ কিউপ্রিলির বিজয়-পতাকা হাঙ্গারী, পোল্যাণ্ডের কতকাংশ এবং আরও কয়েকটি স্থানে উড্ডীন হল। কারা মুস্তাফা নামে তুর্কী সেনাপতি ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েনা নগরী আক্রমণ করলেন। অস্ট্রিয়া, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশগুলির মধ্যে আতঙ্কের সাড়া পড়ে গেল, ভিয়েনার পতন হলে ইসলাম-শক্তি এবার বুঝি পশ্চিম-ইওরোপকেও আচ্ছন্ন করবে। বিদেশী শত্রুকে ভিয়েনার দ্বারপ্রান্ত হতে বিতাড়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন খ্রীষ্টান শক্তি অস্ট্রিয়ার পাশে এসে দাঁড়াল। পোল্যাণ্ডের বীর নায়ক **জন সোবিয়েস্কি** যুদ্ধের নেতৃত্ব গ্রহণ করে তুর্কীদের পরাভূত করলেন। তুর্কীশক্তি বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে গেল। এসময় থেকে তুর্কী-অভিযানের প্রবাহ মন্দীভূত হল, তাদের মধ্যে দুর্বলতা দেখা দিল।

আমেদ কিউপ্রিলি
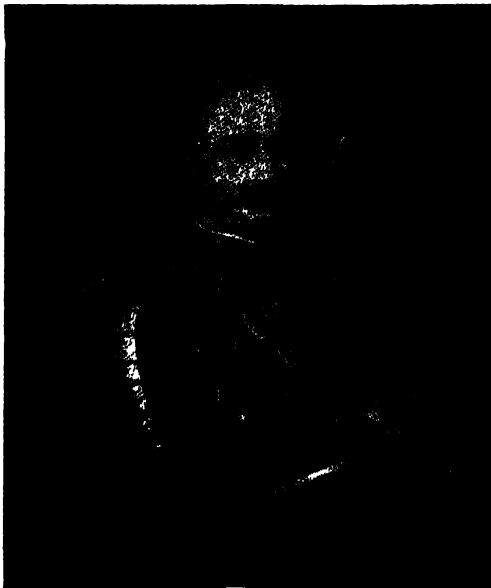
জন সোবিয়েস্কি

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে তুর্কী ক্ষমতা ক্রমেই পতনের দিকে ধাবিত হল। অস্ট্রিয়ার হ্যাপসবুর্গ শক্তি ও ভেনিশীয়রা দক্ষিণ-গ্রীস, হাঙ্গারী ও ট্রানসিলভানিয়া অধিকার করল। ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার বিখ্যাত সেনাপতি **প্রিন্স ইউগেন** জেণ্টার যুদ্ধে তুর্কীদের পরাজিত করেন। ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কের সঙ্গে কার্লোউইজের সন্ধি স্থাপিত হয়। এই সন্ধির ফলে, ইওরোপীয় শক্তিরা বলকান অঞ্চলের কতক স্থান পুনরুদ্ধার করে। কার্লোউইজের সন্ধির পর থেকেই অটোমান শক্তি খর্ব হতে থাকে। এরপর তুর্কীরা পূর্ব-ইওরোপে দুএকবার

যুদ্ধে জয়লাভ করলেও, উদীয়মান শক্তি রাশিয়ার অগ্রসর-নীতির ফলে ক্রমেই তারা কৃষ্ণসাগরের অভিমুখে হটে যেতে লাগল। রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিনের আমলে রাশিয়ার সঙ্গে তুরস্কের কতকগুলি যুদ্ধ হয়। এই

প্রিন্স ইউগেন

যুদ্ধগুলিতে ক্রমান্বয়ে হেরে গিয়ে, তুরস্ক ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার সাথে কাচুক কাইনাজি সন্ধিতে আবদ্ধ হতে বাধ্য হয়। এই সন্ধি তুরস্কের পক্ষে একটা বড় বিপর্যয়। দক্ষিণদিকে রাশিয়ার প্রতিপত্তি এখন কৃষ্ণসাগরের

উত্তর সীমানা পর্যন্ত এগিয়ে গেল। পতনশীল তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়ার এই অগ্রাভিযান-নীতি থেকেই ঐতিহাসিক **প্রাচ্য-সমস্যার** উদ্ভব হয়। এই নিকট-প্রাচ্য-সমস্যা ঊনবিংশ শতাব্দীতে ক্রমেই জটিল ও ঘনীভূত হয়ে ওঠে।

বলকান জাতিগুলির স্বাধীনতা-আন্দোলন

তুরস্কের দুর্বলতা দেখে রাশিয়া ক্রমাগত বলকান অঞ্চলে অগ্রসর হতে চেষ্টা করে। বলকান দেশের স্লাভ, সার্ব, গ্রীক প্রভৃতি জাতিরাও ফরাসী বিপ্লবের প্রেরণায়, স্বাধীনতা ও জাতীয়তার আদর্শে নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ হয়। তারা তুর্কী-অধীনতাপাশ থেকে নিজেদের মুক্ত করবার জন্যে চঞ্চল হয়ে ওঠে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে সার্বিয়া, কারা জর্জ নামক এক নেতার অধীনে তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সার্বিয়া শীঘ্রই খানিকটা স্বায়ত্তশাসন লাভ করে। এ সময়ে গ্রীকদের স্বাধীনতা-যুদ্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হতেই গ্রীকদের মধ্যে স্বাধীনতার আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এ আন্দোলনে রাশিয়ার খুব সহানুভূতি ছিল। প্রথম ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রিন্স হীপসিলান্টির স্বাধীনতার প্রয়াস ব্যর্থ হল। প্রধানতঃ গ্রীকদের স্বাধীনতার আন্দোলন হল দক্ষিণ-গ্রীসে এবং ইজিয়ান সাগরের দ্বীপগুলিতে। এই স্বাধীনতা-যুদ্ধে গ্রীক ও তুর্কী উভয় জাতি পরস্পরের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করে। তুরস্কের সামন্ত-রাষ্ট্র মিশরের অধিপতি মহম্মদ আলির পুত্র ইব্রাহিম পাশার নেতৃত্বে, তুর্কীরা পর পর যুদ্ধে গ্রীকদের হারিয়ে দিতে লাগল। গ্রীকেরা সহায়শূন্য হয়ে তাদের স্বাধীনতার সংগ্রামে জয়লাভে নিরাশ হতে লাগল।

শীঘ্রই আন্তর্জাতিক নীতির জটিলতা গ্রীক যুদ্ধের মোড় ফিরিয়ে দিল। রাশিয়া নিজের সুবিধা সাধনের অভিপ্রায়ে গ্রীসের পক্ষে যোগদানের জন্যে উদ্‌গ্রীব হল, ইংলণ্ড ও অস্ট্রিয়া রাশিয়ার অগ্রসর-নীতিতে চিন্তাব্যাকুল হল। অথচ ইংলণ্ড ও ফ্রান্স উভয় দেশেই নাগরিকদের মধ্যে গ্রীসের প্রতি একটা ব্যাপক সহানুভূতি দেখা দিল। প্রত্যক্ষভাবে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান না করলেও, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স চাইল যে ইওরোপীয় সভ্যতার জননী গ্রীস পুনরায় স্বাধীনতা অর্জন করুক।

১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে ভূমধ্যসাগরের অন্তঃপাতী **নাভারিনো উপসাগরে,** ইংলণ্ড

ও ফ্রান্সের নৌবহরের সঙ্গে ইব্রাহিম পাশার তুর্কী-মিশরীয় নৌবহরের সংঘর্ষ হল। তুর্কী জাহাজগুলো ধ্বংস হয়ে গেল। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এ যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল না, তাই এই অপ্রীতিকর ঘটনার পর তুরস্কের জোর প্রতিবাদে তারা দুঃখপ্রকাশ করল ও যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে গেল। বলকান অঞ্চলে রাশিয়ার প্রভাব এখন অব্যাহত হল। রাশিয়ার সাহায্যে গ্রীকরা অনতিবিলম্বে যুদ্ধে জয়লাভ করল এবং ১৮২৯ গ্রীস্টাব্দে, আড্রিয়ানোপল সন্ধির দ্বারা স্বাধীনতা লাভ করল। ১৮৩৩ গ্রীস্টাব্দে ব্যাভেরিয়ার **প্রিন্স অটো** গ্রীসের রাজা নির্বাচিত হলেন। রাশিয়া বলকানে কতকগুলি সুবিধা আদায় করল।

সার্বিয়া ও গ্রীসকে তুর্কীর অধীনতাপাশ থেকে মুক্তিলাভ করতে দেখে বলকান অঞ্চলের অপরাপর গ্রীস্টান দেশগুলির মধ্যেও মুক্তির আলোড়ন জেগে উঠল। কিন্তু রাশিয়ার স্বার্থদুষ্ট উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও অন্যান্য প্রধান ইওরোপীয় শক্তির সাম্রাজ্যবাদ-নীতির ফলে, বলকান জাতিগুলি বিশেষ সুবিধা লাভ করতে পারল না। রাশিয়া অনেকদিন থেকেই কৃষ্ণসাগর ও পূর্ব-ইওরোপের দিকে তার লোলুপ দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তুর্কী-ক্ষমতায় ভাঙ্গন ধরে। তুর্কীরা শত শত বৎসর বলকান অঞ্চলে রাজত্ব করলেও, তাদের আইন-কানুন, রীতিনীতি ও ধর্মের প্রতিকূলতার জন্যে গ্রীস্টান জাতিসমূহকে তারা আপন করে নিতে পারে নি। তুর্কীদের অনাচার ও উৎপীড়নে বলকান জাতিদের মধ্যে বরং অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল। বলকান গ্রীস্টানদের অধিকাংশ ছিল গ্রীক চার্চের অনুবর্তী, রাশিয়া নিজে গ্রীক চার্চের নেতা, তাই সে গ্রীস্টানদের প্রতি দরদ দেখিয়ে ক্ষীয়মাণ তুর্কী-শক্তির বিরুদ্ধে, বলকান অঞ্চলে হস্তক্ষেপ করতে লাগল। গ্রীক স্বাধীনতা-যুদ্ধই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তুরস্ককে তার অধীন মিশরের পাশা বা গভর্নর মহম্মদ আলির সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। এতে তুরস্কের দুর্বলতা ও মহম্মদ আলির ক্রমবর্ধমান শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এরপর মহম্মদ আলির উচ্চাশা বেড়েই যায়। তিনি সিরিয়া জয় করতে মনস্থ করেন ও তুরস্কের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে প্যালেস্টাইন (বর্তমান ইস্রায়েল-জর্ডন) আক্রমণ করেন। তাঁর সেনাবাহিনী একর, দামাস্কাস প্রভৃতি অধিকার করে এশিয়া-মাইনরে উপস্থিত হয় এবং রাজধানী কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। তুরস্কের সুলতান প্রমাদ গনলেন। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স থেকে অবিলম্বে সাহায্য

গ্রীসের শাসনকেন্দ্র নপ্লিয়া নগরে প্রিন্স অটোর সাড়ম্বর প্রবেশ

না পাওয়ার দরুন, তিনি বাধ্য হয়ে মহম্মদ আলির বিরুদ্ধে রাশিয়ার সাহায্য নিলেন। রাশিয়া এই সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিল। সে অসংখ্য সৈন্যবাহিনী তুর্কী-সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রেরণ করল। অবশ্য ইংলণ্ড ও ফ্রান্সেরও চৈতন্যোদয় হল, তারা রাশিয়ার অগ্রাভিযানকে সুনজরে দেখল না। তারা তাড়াতাড়ি যুদ্ধ থামিয়ে দিবার জন্যে মহম্মদ আলিকে সিরিয়া ছেড়ে দিতে তুরস্কের উপর চাপ দিল। তুরস্কের তা মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

রাশিয়াও তার পাওনা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নিল। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে **আঙ্কিয়ার স্কেলেসি চুক্তি** দ্বারা রাশিয়া তুরস্কের উপর তার সামরিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করল। এই সময়ে কনস্টান্টিনোপলে রাশিয়ার জয়-জয়কার, দার্দানেলিজ প্রণালীতে তার যুদ্ধজাহাজের অবাধ গতি। কিন্তু ইংলণ্ডের জবরদস্ত বৈদেশিক সচিব **পামারস্টোন** রাশিয়ার এরূপ প্রসার মোটেই বরদাস্ত করতে রাজী হলেন না। তিনি তাঁর নির্ভীক নীতি ও কূটনৈতিক চালের জোরে, মহম্মদ আলি, রশিয়া ও ফ্রান্স প্রত্যেকেরই সম্প্রসারণ প্রচেষ্টা দমিত করলেন। তিনি ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে একটি সম্মিলন আহ্বান করলেন এবং সেখানে প্রাচ্য-সমস্যার মীমাংসায়, পামারস্টোনের প্রাধান্য স্পষ্ট হয়ে উঠল।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ

এরপর কিছুদিন বলকান অঞ্চলে আপাতত শান্তির ভাব বিরাজ করল। কিন্তু এ শান্তি বেশীদিন টিকল না। ফরাসী সম্রাট্ তৃতীয় নেপোলিয়ন ফ্রান্সে তাঁর ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে বাইরে বিরোধ সৃষ্টির অপেক্ষায় ছিলেন। সুযোগ শীঘ্রই মিলে গেল। তিনি জেরুজালেমে ল্যাটিন সন্ন্যাসীদের হারানো অধিকারের পুনরুদ্ধারের জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন।

তুরস্কের রাজ্যপরিধির অন্তর্গত ছিল প্যালেস্টাইনের খ্রীষ্টান তীর্থগুলি। রোমক ও গ্রীক চার্চ প্রতিষ্ঠানের সন্ন্যাসিগণ এই স্থানসমূহের তত্ত্বাবধান করতেন। তুরস্কের সঙ্গে ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের শর্তাবলী অনুসারে, তখন থেকে রোমক সন্ন্যাসীরা ফরাসী পরিচালনাধীনে প্যালেস্টাইনে বিশেষ সুবিধা ভোগ করছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের ভাঙাগড়ার সংঘাতে, প্যালেস্টাইনের রোমক ও গ্রীক সন্ন্যাসীদের মধ্যে বিরোধের প্রতি ফরাসীদের মনোযোগ শিথিল হয়ে গেল। এই অবসরে রাশিয়ার উৎসাহে, গ্রীক সন্ন্যাসিগণ রোমক সন্ন্যাসীদের সুবিধা-সুযোগ কেড়ে নিলেন।

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় নেপোলিয়ন তুরস্কের সুলতানের কাছে দাবি করলেন যে, বেথলেহেম ধর্মায়তনের প্রধান দরজার চাবি রাখার অধিকার প্রভৃতি পুনরায় রোমক সন্ন্যাসীদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। সুলতান উপায়ান্তর না দেখে এই দাবি মেনে নিলেন। অমনি রাশিয়ার জার প্রথম নিকোলাস গ্রীক সন্ন্যাসীদের পক্ষে নজির টেনে, তুর্কী সুলতানের উপর পালটা চাপ দিলেন। নিরুপায় সুলতান উভয় পক্ষের বিরোধের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করলেন। কিন্তু যেখানে দুই প্রবল প্রতিপক্ষ বিবাদের জন্যে উন্মুখ, সেখানে দুর্বল সুলতান কি করতে পারেন ?

এর পরে ঘটনার গতি তীব্রবেগে ছুটল। তুরস্কের উপর রাশিয়ার আবদার বেড়েই চলল। রাশিয়া দাবি করল যে তুর্কী-সাম্রাজ্যের গ্রীকচার্চপন্থী খ্রীষ্টান প্রজাদের উপর নিয়ন্ত্রণাধিকার তার হাতে ছেড়ে দিতে হবে। তুর্কীরাজ্য বিভাগ করে বলকান দেশে অগ্রসর হওয়াও রাশিয়ার মতলব ছিল। শীঘ্রই সে দানিয়ুব নদীর উত্তরাঞ্চলে ওয়ালেচিয়া ও মোল্ডাভিয়া প্রদেশ অধিকার করল। তখন ইংলণ্ডের উসকানিতে তুরস্ক রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

কিন্তু রাশিয়ার কাছে তুরস্ক ক্রমাগত হেরে যেতে লাগল। তখন ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মাথায় টনক নড়ল যে, রাশিয়া ত বলকান ভূভাগে কর্তৃত্ব বসল বলে। বলকান অঞ্চলে রাশিয়ার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হলে পূর্ব-ইওরোপে তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁর আধিপত্য বাড়াতে পারবেন না, আর ইংলণ্ডের ভারত-সাম্রাজ্যের পথে বিঘ্নের সৃষ্টি হবে। পামারস্টোন তুরস্কের পক্ষ নিয়ে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ও সার্ডিনিয়ার সহযোগে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। এই যুদ্ধই ক্রিমিয়ার যুদ্ধ নামে খ্যাত।

মিত্রপক্ষ ক্রিমিয়া আক্রমণ করে দীর্ঘদিন তা অবরুদ্ধ করে রেখে দেয়। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে বালাক্লাভা ও ইংকারমানের সংগ্রাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ক্রিমিয়াতে **ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের** (১৮২০—১৯১০ খ্রীঃ) আহত সৈন্যদের প্রতি সদাজাগ্রত, সেবাপরায়ণা মূর্তি ইতিহাসে অমর কাহিনী হয়ে আছে। অবশেষে এ যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় ঘটে এবং ১৮৫৬, খ্রীষ্টাব্দে **প্যারিসের সন্ধিতে** যুদ্ধের অবসান হয়।

এই সন্ধির ফলে বলকান ও কৃষ্ণসাগর অঞ্চলে রাশিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং তুরস্কের ক্ষমতা একরূপ অটুট রাখা হয়। প্রবল মিত্রশক্তিগুলি নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত ছিল, বলকান জাতিগুলি বিশেষ

কিছু সুবিধা লাভ করতে পারে নি। প্যারিস সন্ধির পর বলকানে খ্রীষ্টান জাতিদের উপর তুর্কী অনাচার-অত্যাচার বেড়েই চলল। **পূর্ব-ইওরোপে বাধা পেয়ে রাশিয়ার সাম্রাজ্যলিপ্সা এশিয়ার দিকে প্রধাবিত হল।**

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পরেও ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী-সাম্রাজ্য দানিয়ুব নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বলকান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কয়েকটি স্বাধীনতা পেয়েছিল

ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল
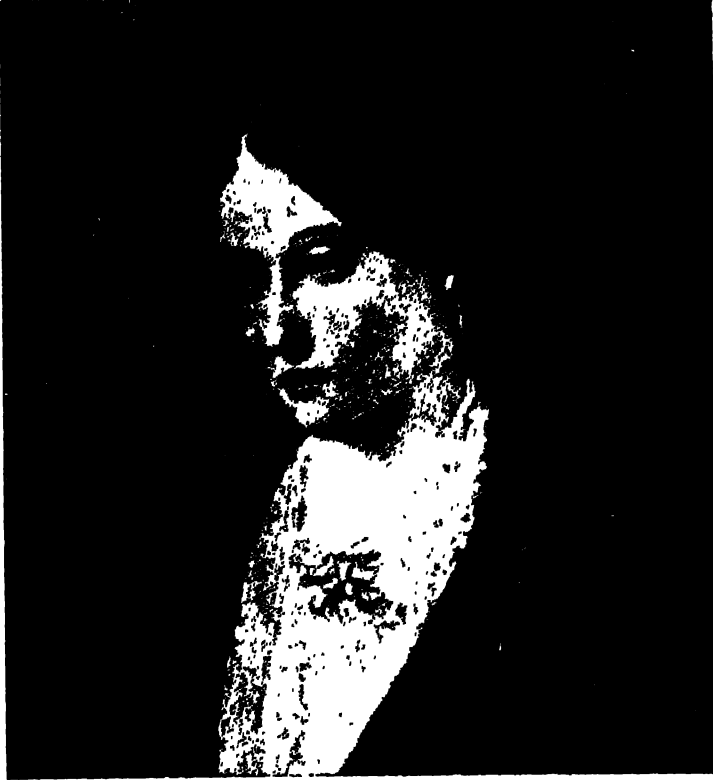
বটে, যেমন, মন্টিনিগ্রোর কৃষ্ণপর্বতমালার আশ্রয়ে একদল লোক তাদের স্বাধীনতা রক্ষা করেছিল, গ্রীস তার স্বাধীনতা লাভ করেছিল আর সার্বিয়া যদিও নামে তখনও তুরস্কের অধীন কিন্তু কার্যতঃ সে স্বাধীনভাবেই চলছিল। এই কটি বাদ দিয়ে বলকান অঞ্চলের অবশিষ্ট বিস্তীর্ণ অংশে তখনও ইসলাম পতাকা উড্ডীয়মান। ওয়ালেচিয়া ও মোল্ডাভিয়া প্রদেশ থেকে রাশিয়ার প্রভুত্ব সরিয়ে তখন কেবলমাত্র তুরস্কের আধিপত্য সেখানে আবার স্থাপিত হয়েছে।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কের কর্তৃত্ব সংকীর্ণ হয়ে মাত্র কনস্টান্টিনোপল ও তার আশেপাশে থ্রেসের ক্ষুদ্র অংশের উপর সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

মাঝখানের প্রায় পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে চারটি প্রধান সমস্যার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম, বলকান জনসমূহের স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে নানা উপায়ে কঠোর সংগ্রাম, দ্বিতীয়, নতুন বলকান রাষ্ট্রগুলির আভ্যন্তরীণ সংস্কারের জন্যে বিবিধ প্রচেষ্টা, তৃতীয়, নতুন খ্রীষ্টান শক্তিনিচয়ের তুরস্ক ও অন্যান্য বলকান রাজ্যের বিপক্ষে অভিযান করে নিজেদের রাজ্যবৃদ্ধির প্রয়াস, এবং চতুর্থ, ইওরোপের প্রবল শক্তিগুলির বিভিন্নমুখী উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

ইওরোপের প্রধান শক্তিবর্গ তুর্কী-শক্তির জীর্ণতা ও নব-উদ্ভূত বলকান রাজ্যগুলির অর্বাচীনতা দেখে, সেই সুযোগে নিজেদের সাম্রাজ্যস্ফীতির অভিপ্রায়ে, নানা কূটনৈতিক চালের আবর্তে জড়িয়ে পড়ল।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর প্রাচ্য-সমস্যায় প্রথম আলোড়ন এল ওয়ালেচিয়া ও মোল্ডাভিয়া প্রদেশ দুটি থেকে। এরা চাইল পূর্ণ স্বাধীনতা ও দুই প্রদেশের মিলন। এই দুই দেশের লোকেরা হল রুমানিয়। ইংলণ্ড চেয়েছিল তুরস্কের রাজ্য অব্যাহত রাখতে, তাই সে এদের স্বাধীনতায় বাধা দিল। তুরস্ক ত এদের স্বাধীনতার পথে অন্তরায় হবেই। অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যে বিভিন্ন জাতির সমাবেশ—রুমানিয়, সার্ব, স্লাভ, রুথেন, ক্রোট, চেক, স্লোভেন, ম্যাগেয়ার প্রভৃতি। রুমানিয়রা স্বাধীনতা পেলে তার সাম্রাজ্যভুক্ত রুমানিয় ও অপরাপর জাতিরা স্বাধীনতার আন্দোলন করবে ও তাতে অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন ধরবে, তাই অস্ট্রিয়াও রুমানিয়দের স্বাধীনতা-আকাঙ্ক্ষা ও মিলনচেষ্টা মোটেই পছন্দ করল না। এক ফ্রান্স রুমানিয়দের জাগরণের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল—কারণ ফ্রান্স ছিল পশ্চিম-ইওরোপে ল্যাটিন সভ্যতার কেন্দ্রস্থল, আর রুমানিয়রা পূর্ব-ইওরোপে ল্যাটিন জাতি ও সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় নেপোলিয়ন রাশিয়ার জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকেও নিজের মতানুবর্তী করলেন।

নানা জটিলতার পর ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে 'ওয়ালেচিয়া ও মোল্ডাভিয়া—দুটি প্রদেশ সাধারণ গণভোটের জোরে এক রাজ্যে সংযুক্ত হল ও মিলিত রাজ্যের নাম হল রুমানিয়া। বুখারেস্ট নগরী হল এর রাজধানী। আলেকজাণ্ডার কূজা হলেন রুমানিয়ার প্রথম প্রিন্স বা অধিপতি। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এক বিপ্লবে প্রিন্স কূজা সিংহাসনচ্যুত হন। তখন **প্রিন্স ক্যারোল,** পরবর্তী রাজা চার্লস রুমানিয়ার অধীশ্বর হন। তিনি ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। তিনি দেশের

নানা উন্নতি বিধান করে রুমানিয়াকে মধ্যযুগীয় অনগ্রসর অবস্থা থেকে আধুনিক উন্নত রাজ্যে পরিণত করেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রুমানিয়াকে একটি স্বাধীন রাজ্যে রূপান্তরিত করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রুমানিয়া জার্মেনীর বিপক্ষে মিত্রশক্তি-পক্ষভুক্ত হয়ে যোগদান করে।

প্রিন্স ক্যারোল

তুরস্ক যদিও বলকান জাতিগুলির সঙ্গে সদয় ব্যবহারের শপথ করেছিল, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে খ্রীস্টান প্রজাদের উপর তার অত্যাচার-উৎপীড়ন উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেতে লাগল। কিন্তু অবহেলিত বলকান খ্রীষ্টানেরা আর এই অনাচার সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল না। ক্রমে তাদের মধ্যে ব্যাপক বিদ্রোহ শুরু হয়। এ সময়ে রাশিয়ার উৎসাহে স্লাভজাতির লোকেদের মধ্যে এক সর্ব-স্লাভ আন্দোলন আরম্ভ হল। রুমানিয়ার যুবকেরা যেমন শিক্ষা-দীক্ষা, আদর্শের জন্যে প্যারিসে যেত, স্লাভ যুবকগণ সেরূপ শিক্ষা-দীক্ষা ও বিদ্রোহের প্রেরণা লাভের জন্যে রাশিয়ায় দল বেঁধে যেতে আরম্ভ করল। সার্বিয়া, বোসনিয়া, মন্টিনিগ্রো ও বুলগেরিয়া গুপ্ত-সমিতিতে ছেয়ে গেল।

দক্ষিণ-স্লাভ আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল সার্বিয়া। সার্বিয়া বোসনিয়া ও হার্জিগোভিনার সঙ্গে মিলিত হয়ে এক যুক্তরাজ্য গঠন করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তখন সে আয়োজন ব্যর্থ হয়। বোসনিয়া ও হার্জিগোভিনাতে প্রথম ১৮৭৫—৭৬ সালে তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয়। হার্জিগোভিনার কৃষকেরা তুরস্ককে ট্যাক্স দিতে অস্বীকৃত হয়। এই বিদ্রোহ ক্রমে বলকান অঞ্চলে ছড়াতে থাকে। বোসনিয়া, সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো এবং অবশেষে বুলগেরিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধ ঘোষণা করে। বুলগারদের বিদ্রোহ খুব তীব্র আকার ধারণ করে, তারা অনেক তুর্কী কর্মচারীকে হত্যা করে।

তখন শুরু হল ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দের তুর্কীদের কুখ্যাত **বুলগেরিয়-নিগ্রহ**। তুর্কী অনাচারের মুখে হাজার হাজার বুলগারের জীবন নিঃশেষিত হল। এই ভীষণ সংবাদে সারা খ্রীস্টান জগৎ ক্রোধানলে জ্বলে উঠল। ইংলণ্ডের নেতা গ্লাডস্টোন এ সময়ে তুর্কীদের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়েছিলেন। কিন্তু ডিসরেলি ছিলেন তখন ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর প্রধান নীতি ছিল ইংলণ্ডের প্রাচ্য-স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখা ও ভারত-সাম্রাজ্য সংরক্ষণ করা। ডিসরেলি রাশিয়াকে আসল শত্রু মনে করতেন, তুরস্ককে নয়।

এদিকে রাশিয়া ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে স্লাভজাতিদের পক্ষে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। অস্ট্রিয়ার সঙ্গে এক নিরপেক্ষতার সন্ধি করে রাশিয়া এ যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। রাশিয়া রুমানিয়ার সহযোগিতা লাভ করল। মন্টিনিগ্রো, সার্বিয়া সবাই রাশিয়ার পক্ষে যোগদান করে যুদ্ধ করল। চারদিক থেকে আক্রমণ করে রাশিয়া তুরস্কের রাজধানীকে বিপন্ন করল। ককেসাস অঞ্চলেও তুরস্ক রাশিয়ার অপ্রতিহত গতি ঠেকাতে পারল না। অবশেষে তুরস্ক বাধ্য হয়ে ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে রাশিয়ার সঙ্গে **সান স্টিফানো সন্ধিতে** আবদ্ধ হল। এই সন্ধির শর্ত অনুসারে কয়েকটি বলকান রাজ্যের স্বাধীনতা স্বীকৃত হল এবং রাশিয়া, এশিয়া ও ইওরোপে অনেক স্থান লাভ করল। এই ব্যবস্থার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, রাশিয়ার তাঁবেদারে নতুন প্রসারিত বুলগেরিয়া রাজ্যের সৃষ্টি। বুলগেরিয়া এখন বলকানের এক বিরাট অংশে বিস্তৃত হল, নামে তুরস্কের অধীন হলেও আসলে রাশিয়ার কর্তৃত্ব বুলগেরিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হল। তুরস্কের ইওরোপীয় সাম্রাজ্যের আর বিশেষ কিছু অস্তিত্ব থাকল না।

বার্লিন-কংগ্রেস

সান স্টিফানো চুক্তির ফলে প্যারিসের সন্ধি বিপর্যস্ত হয়ে গেল, রাশিয়ার শক্তিমত্তা আবার বলকানে প্রধান হয়ে উঠল। সান স্টিফানো সন্ধিতে বুলগেরিয়া ও রাশিয়া বাদে আর কেহই সন্তুষ্ট হল না। রুমানিয়া বিরক্ত হল; সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো এবং গ্রীস বুলগেরিয়ার রাজ্যবৃদ্ধিতে চটে গেল। অস্ট্রিয়ার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হল, কিন্তু সব চেয়ে বেশী বিরক্ত হল ইংলণ্ড। রাশিয়া, বলকান অঞ্চলে নিজের প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারলে পূর্ব-ভূমধ্যসাগরে তার প্রাধান্য স্থাপিত করবে ও ক্রমে ইওরোপ ও এশিয়া উভয়পথে হীনবল তুর্কী-সাম্রাজ্যের ভিতর দিয়ে, ভারত-সাম্রাজ্যের দিকে ধাওয়া করবে। তাই ইংলণ্ড বলকান উপদ্বীপে রাশিয়ার অগ্রসরে এবারও চঞ্চল হয়ে উঠল।

ডিসরেলি দাবি করলেন যে, নিকট-প্রাচ্য-সমস্যা শুধু রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে নিষ্পত্তি হতে পারে না, এটা সমগ্র ইওরোপীয় সমস্যা। অস্ট্রিয়াও এই মত দিল, জার্মেনীর নেতা বিসমার্কও রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব ছেড়ে দিয়ে অস্ট্রিয়ার মতানুগামী হলেন। রাশিয়া অবস্থার বিপাকে পড়ে সান

স্টিফানো সন্ধি-শর্তাবলীর পরিবর্তনকল্পে, একটি ইওরোপীয় সম্মিলনীতে যোগদানে রাজী হল। ব্যবস্থামত বার্লিনে এক কংগ্রেস বা সম্মিলন আহ্বান করা হল। এইই হল ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দের প্রসিদ্ধ **বার্লিনের কংগ্রেস।** বিসমার্ক এই কংগ্রেসের সভাপতি হলেন, কিন্তু ডিসরেলি ছিলেন এর প্রকৃত নায়ক।

বার্লিন-কংগ্রেসের বিধান অনুসারে রাশিয়ার হাতে থাকল মাত্র বেসারেবিয়া, ককেসাস অঞ্চলে বাটুম ও কার্স এবং আর্মেনিয়ার কতক অংশ। রুমানিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত হল। বোসনিয়া ও হার্জিগোভিনা অস্ট্রিয়ার শাসনাধীনে ন্যস্ত করা হল। ইংলণ্ড সাইপ্রাস দ্বীপ অধিকার করে শাসন করবার কর্তৃত্ব পেল। ফ্রান্স উত্তর-আফ্রিকায় টিউনিসের উপর ভবিষ্যৎ দাবি জানাল, নবজাগ্রত ইতালি আলবেনিয়া ও ত্রিপোলীর উপর তার দাবি পেশ করল। এক নতুন জার্মেনী কিছু না চেয়ে তুরস্কের সুলতানের কৃতজ্ঞতাভাজন হল। বলকান রাষ্ট্রগুলি কিছু সুবিধা আদায় করল বটে, তবে তারা আশানুরূপ কিছু পেল না। সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রোর স্বাধীনতা মেনে নেওয়া হল। বুলগেরিয়া রাজ্যের মধ্যেই পরিবর্তন আনা হল বেশী। সান স্টিফানোর শর্তানুযায়ী বুলগেরিয়ার যে আয়তন বৃদ্ধি হয়েছিল, এখন তা বিশেষভাবে ছাঁটাই করে পূর্বেকার প্রায় এক-তৃতীয় অংশে পরিণত করা হল। বুলগেরিয়ার দক্ষিণে পূর্ব-রুমেলিয়া নামে এক ক্ষুদ্র রাজ্যের সৃষ্টি করা হল, এর উপর তুরস্কের খানিকটা কর্তৃত্ব থাকল। মাসিডোনিয়া আবার তুরস্কের হাতে অর্পণ করা হল।

বার্লিন-কংগ্রেসে ডিসরেলির নীতিতে বলিষ্ঠতা ছিল। ইহা কতকটা কার্যকরীও হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু এই কংগ্রেসের মধ্যেই নিহিত ছিল ভবিষ্যতে ১৯১২—১৩ খ্রীস্টাব্দের বলকান যুদ্ধ ও ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অধিকাংশ কারণ। রাশিয়া সাময়িক বাধা পেল বটে, কিন্তু তার স্থলে এখন বলকানে অগ্রসর হল অস্ট্রিয়া ও তার পশ্চাতে নব শক্তিশালী জার্মান-সাম্রাজ্য। অস্ট্রিয়া বোসনিয়া ও হার্জিগোভিনা অধিকার করাতে স্লাভজাতি ও সার্বিয়ার সঙ্গে অস্ট্রিয়ার তীব্র বিরোধের সূত্রপাত হল। তুরস্কেরও তার তথাকথিত বন্ধুদের প্রতি অসন্তোষের নানা কারণ ছিল। বার্লিন-কংগ্রেসের পর ইংলণ্ডে গিয়ে ডিসরেলি অহংকার করে বলেছিলেন যে, তিনি শান্তি ও সম্মান এনেছেন। তিনি কিছুকালের জন্যে ইওরোপে শান্তি এনেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর ব্যবস্থাসমূহ সম্মানের গৌরব অর্জন করতে পারে নি।

বার্লিন-কংগ্রেসের পরবর্তী সময়ে বলকান অঞ্চলের অবস্থা দাঁড়াল এরূপ ঃ তুর্কী-সাম্রাজ্য ভেঙে এখন পাঁচটি স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি হল—দানিয়ুবের উত্তরে রুমানিয়া, দক্ষিণে বুলগেরিয়া ও সার্বিয়া, পশ্চিমে পাহাড়মালার অভ্যন্তরে মন্টিনিগ্রো এবং কোরিন্থ উপসাগরের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত গ্রীস। পূর্ব-রুমেলিয়ার অবস্থা ছিল অর্ধ-স্বাধীন আর বোসনিয়া ও হার্জিগোভিনা অস্ট্রিয়ার শাসনব্যবস্থার অন্তর্গত।

এর পরে কুড়ি বছর বুলগেরিয়াই একরূপ নিকট-প্রাচ্য-সমস্যাকে সজীব রাখে। **প্রিন্স আলেকজাণ্ডার** ১৮৭৯—৮৬ খ্রীস্টাব্দে বুলগেরিয়ার অধিপতি ছিলেন। তিনি সাহসী সৈনিক ও বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্ ছিলেন, কিন্তু বুলগেরিয়ার পার্লামেণ্ট বা সোব্রান্জি তাঁকে প্রতিপদে বাধা দেয়। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাধ্য হয়ে ক্ষমতা ত্যাগ করেন। তারপর দেশের শাসক হলেন স্যাক্সকোবার্গ-গোথার **প্রিন্স ফার্দিনান্দ**। বুলগেরিয়া স্বাধীন রাজ্য নাম পাবার পরও তিনি অনেক বছর রাজত্ব করেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি জার্মেনীর পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন।

বুলগেরিয়ার পূর্ব-রুমেলিয়ার সঙ্গে পুনর্মিলন আন্দোলন বেশ কিছুদিন চলে। এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন বুলগেরিয়ার বিখ্যাত জন-নায়ক **স্টিফান স্টামবোলোভ**। স্টামবোলোভ ১৮৮৬—৯৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বুলগেরিয়ার অবিসংবাদী নেতা ছিলেন। তিনি বুলগেরিয়ায় রাশিয়ার প্রতিপত্তি পছন্দ করতেন। তিনি জাতীয়তাবাদী ছিলেন। রাজা ফার্দিনান্দের শাসনে বুলগেরিয়ার প্রভূত উন্নতি হয়।

তুরস্কের সুলতান আবদুল হামিদের রাজত্বকালে, ১৮৯৪—৯৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অসহায় খ্রীস্টান আর্মেনীয়দের উপর তুর্কীরা যে নির্মম অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ড চালায়, ইতিহাসের পাতা তাতে মসীলিপ্ত হয়ে আছে। তুর্কীদের নৃশংস অত্যাচার ও ইওরোপীয় শক্তিদের ঔদাসীন্য ও পরস্পর স্বার্থসংঘাতের দরুন আর্মেনিয়ার হাজার হাজার লোকের জীবন বিনষ্ট হয়। আর্মেনীয় সমস্যা দ্বারা কিছুদিন নিকট-প্রাচ্য-সমস্যা সমাকীর্ণ থাকে। এর পরে বলকান অঞ্চলে গ্রীস ও ক্রীটের সমস্যা প্রবল হয়ে ওঠে।

নতুন স্বাধীন গ্রীসের রাজা **অটো** ১৮৩৩—৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তারপর রাজা হন ডেনমার্কের প্রিন্স জর্জ। তিনি **প্রথম জর্জ** নামে ১৮৬৩—১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গ্রীসে রাজত্ব করেন। তাঁর পরবর্তী রাজার নাম **কনস্টানটাইন**। গ্রীস স্বাধীন হলেও কতকগুলি গ্রীক-প্রধান স্থান সে পায় নি।

গ্রীস থেসালী, এপিরাস, মাসিডন ও ক্রীট দ্বীপকে তার রাজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করবার জন্যে বহুদিন থেকে জোর চেষ্টা করছিল। এই স্থানগুলি তুরস্কের অধীনে ছিল। ক্রীটের লোকেরা গ্রীক ছিল বলে তারা তুর্কীর অধীনতা-পাশ থেকে মুক্ত হবার নিমিত্ত বার বার বিদ্রোহ করছিল। ক্রীটের

ক্রীটের জাতীয় নেতা ভেনিজিলস

তরুণ বিপ্লবী নেতা **ভেনিজিলস** ঘোষণা করলেন যে, ক্রীট ও গ্রীস সংযুক্ত দেশ। গ্রীসও ক্রীটকে সৈন্যসাহায্য পাঠাল। ফলে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে, তুরস্ক গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল। এ যুদ্ধে গ্রীস হেরে গেল।

জার্মান সম্রাট্ কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মের পরিচালনাধীনে নতুন জার্মান সাম্রাজ্যের বলিষ্ঠ উত্থান বলকান ও তুর্কী রাজনীতিতে এক স্পষ্ট পরিবর্তন নিয়ে এল। প্রায় একশো বছর ধরে ইংলণ্ড রাশিয়ার বিপক্ষতা করেছে এবং তুরস্কের প্রতি বন্ধুভাব দেখিয়েছে। কিন্তু বার্লিন-কংগ্রেসের 'পর থেকে তুরস্কের সঙ্গে ইংলণ্ডের মনোবিবাদ শুরু হয়। এ সুযোগে বিশ্বগ্রাসী উচ্চাভিলাষী কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম, বলকান অঞ্চলে নিজের প্রাধান্য বিস্তারের অভিপ্রায়ে, তুর্কী সুলতানের সঙ্গে খুব বেশী সম্প্রীতি ও বন্ধুভাব দেখাতে থাকেন। তুর্কী-সাম্রাজ্যে রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সামরিক নানাভাবে জার্মান প্রভাব এরূপ দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে যে ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি শক্তিরা বিশেষ শঙ্কিত হয়ে পড়ে। বলকান অঞ্চলে রাশিয়ার স্থলে জার্মেনীই এখন অস্ট্রিয়ার সহযোগে, প্রবল সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জার্মেনীর বিরাট বার্লিন-বাগদাদ রেললাইন পরিকল্পনায় ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ভীত হয়ে পড়ে, কারণ এই পরিকল্পনা কার্যকরী হলে জার্মেনীর প্রভাব পূর্বদিকে এত বিস্তৃত হবে যে তাতে তাদের সাম্রাজ্য বিপন্ন হ'তে পারে। রাশিয়াও বলকান অঞ্চলে জার্মেনী ও অস্ট্রিয়ার অব্যাহত প্রসারতাকে বাধা দিবার উদ্দেশ্যে, রুশ-জাপান যুদ্ধে হেরে যাবার পরে, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সঙ্গে বন্ধুত্বের মিলনে আবদ্ধ হল।

১৯০৮—০৯ খ্রীস্টাব্দে, তুর্কী-সাম্রাজ্যে "তরুণ-তুর্কী বিপ্লব" সংঘটিত হয়। এতে করে নিকট-প্রাচ্যে যে সমস্যা জটিল হয়ে ওঠে তার পরিণতি হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে। তুরস্কের অগ্রসর যুবকদল খানিকটা গণতান্ত্রিক আদর্শ ও কতকটা জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিদ্রোহ করে সুলতান আবদুল হামিদকে সিংহাসনচ্যুত করে এবং তাঁর ভাই পঞ্চম মহম্মদকে তুরস্কের সুলতান বলে ঘোষিত করে। তুরস্কের নতুন বেশে উত্থান অনেকেরই মনঃপূত হল না—তাই বলকান অঞ্চলে প্রত্যেকে যার যার স্বার্থরক্ষার দিকে মন দিল। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে প্রিন্স ফার্দিনান্দ বুলগেরিয়াকে একটি স্বাধীন রাজ্য বলে ঘোষণা করলেন। সঙ্গে সঙ্গেই অস্ট্রিয়া বোসনিয়া ও হার্জিগোভিনাকে সরাসরি তার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিল এবং এর থেকেই অস্ট্রিয়া ও সার্বিয়ার মধ্যে বিরোধ উৎকট আকার ধারণ করল।

আদ্রিয়াতিক সাগরের দিকে পথের স্বাধীনতালাভ অস্ট্রিয়া ও সার্বিয়ার মধ্যে কলহের অন্যতম কারণ। মধ্যযুগে সার্বিয়া যে একটি স্বাধীন বড় রাজ্য ছিল, একথা সে ভুলতে পারে নি। এখন সে নিজেকে দক্ষিণ-স্লাভ-

জাতিদের মুক্তিদাতা-রূপে মনে করতে লাগল। সার্বিয়া তুরস্কের কবল থেকে প্রথম দিকেই মুক্তিলাভ করে। ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে সে স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়।

তরুণ-তুর্কী বিপ্লবের পর ইওরোপীয় ভাগ্যাকাশে বিশ্বযুদ্ধের ছায়া দ্রুত ঘনীভূত হতে লাগল। বিজয়ী অস্ট্রিয়া, মদমত্ত জার্মেনী, শঙ্কাপীড়িত পূর্ব-ইওরোপ, উত্তেজিত রাশিয়া এবং রুষ্ট সার্বিয়া—এ সব কিছুর মধ্যে আসন্ন দাবাগ্নির সংকেত স্পষ্ট হয়ে উঠল। নতুন একতাবদ্ধ ইতালিও জার্মেনীর মত সাম্রাজ্য-প্রসারের জন্যে উদ্‌গ্রীব হল। ফ্রান্স উত্তর-আফ্রিকার আলজিরিয়া ও টিউনিসিয়া জয় করেছিল, আর ইংলণ্ড মিশর অধিকার করেছিল। এজন্যে ইতালি ত্রিপোলী অধিকার করবার অভিপ্রায়ে, অতর্কিতে ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এ যুদ্ধ ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে লসেন সন্ধির দ্বারা শেষ হয়; ত্রিপোলী ইতালির হস্তগত হয়।

এ সময়ে ক্রীট-নেতা ভেনিজিলসের রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার বলে দীর্ঘ-আকাঙ্ক্ষিত **বলকান সংঘ** গঠিত হয়। পশ্চিম-ইওরোপীয় প্রধান শক্তিদের ঔদাসীন্যে বীতশ্রদ্ধ হয়ে এবং বিশেষ করে মাসিডোনিয়ার খ্রীস্টানদের প্রতি তুর্কীদের নিষ্ঠুর অত্যাচারে রুষ্ট হয়ে গ্রীস, সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো ও বুলগেরিয়া এই বলকান সংঘে যোগদান করে। এই শক্তিপুঞ্জ দাবি করে যে, তুরস্কের খ্রীস্টানদের প্রতি প্রতিশ্রুত সংস্কারগুলি অবিলম্বে কাজে পরিণত করতে হবে। তুরস্ক এই দাবি অগ্রাহ্য করার ফলে বলকান সংঘ ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়।

চারদিক থেকে তুরস্ক আক্রান্ত হয়, এবং যুদ্ধে তার ক্রমাগত পরাজয় হয়। এ যুদ্ধের ফলে তুরস্ক একপ্রকার বলকান ভূখণ্ড হতে বিতাড়িত হয়। তার হাতে মাত্র কনস্টান্টিনোপল, জানিনা এবং আলবেনিয়ার স্কুটারি অবশিষ্ট থাকে। প্রধান শক্তিগুলি অবশ্য তুরস্কের এ বিপর্যয়ে খুশী হয় নি, কিন্তু তারা বলকান রাষ্ট্রগুলিকে বাধা দিতে পারল না।

তরুণ-তুর্কীদল আদ্রিয়ানোপল ছেড়ে দিতে হল বলে একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তারা ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে আবার বলকান সংঘের সঙ্গে যুদ্ধে নিয়োজিত হল। এবারও তুরস্কের সবদিকে পরাজয়ের গ্লানি মেনে নিতে হল। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডন-শান্তির দ্বারা এই যুদ্ধের সমাপ্তি হল। কনস্টান্টিনোপল সহ থ্রেসের সামান্য একটু অংশ বাদে, তুরস্ক প্রায় সব কিছুই হারাল। আলবেনিয়া আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকার পেল। এতদিন পরে ক্রীট গ্রীসের সঙ্গে সংযুক্ত হল।

এ যুদ্ধের ফলস্বরূপ আলবেনিয়ার অধিকার নিয়ে এবং আদ্রিয়াতিক সাগরের দিকে পথ উন্মুক্ত করা সম্পর্কে, সার্বিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে ভীষণ মনান্তরের সৃষ্টি হল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং রাশিয়া এসময়ে জার্মেনী ও অস্ট্রিয়ার অগ্রসরে শঙ্কিত হয়ে, সার্বিয়ার অনুকূলে ঝুঁকে পড়ল। সার্বিয়ার ক্ষমতা বিনষ্ট করবার জন্যে অস্ট্রিয়া যুদ্ধের কামনা করছিল, আর জার্মেনী পিছন থেকে তীব্রভাবে অস্ট্রিয়াকে উত্তেজিত করছিল।

ইতিমধ্যে বিজয়ী বলকান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যুদ্ধের ফললাভ নিয়ে বিবাদ বেধে গেল। বুলগেরিয়া আবার আগের মত রাজ্যের আয়তন স্ফীত করতে সচেষ্ট হল। আবার মাসিডোনিয়ার অধিকার নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল এবং শীঘ্রই ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে বলকান রাষ্ট্রগুলির নিজেদের ভিতর গৃহযুদ্ধ শুরু হল। একদিকে বুলগেরিয়া, অপরদিকে সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো, গ্রীস ও রুমানিয়া। এই দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধে বুলগেরিয়া চতুর্দিকে বেষ্টিত হয়ে বিশেষভাবে হেরে গেল। তুরস্ক এই সুযোগে বুলগেরিয়ার বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করে পুনরায় আদ্রিয়ানোপল অধিকার করল। অস্ট্রিয়া বুলগেরিয়ার লাঞ্ছনা ও সার্বিয়ার অগ্রাভিযানে আতঙ্কিত হয়ে উভয় পক্ষকে বুখারেস্ট সন্ধি দ্বারা যুদ্ধে বিরত হতে বাধ্য করল।

দুইটি বলকান যুদ্ধের অবসানে বলকান অঞ্চল থেকে তুর্কী-সাম্রাজ্য একরূপ অন্তর্হিত হল, আর খ্রীস্টান রাজ্যগুলির আয়তন বেড়ে গেল। সবচেয়ে বেশী লাভ করল সার্বিয়া ও গ্রীস। অস্ট্রিয়াকে জব্দ করার উদ্দেশ্যে সার্বিয়া, অস্ট্রিয়া-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বোসনিয়, হার্জিগোভিন, ক্রোট, স্লোভেন প্রভৃতি দক্ষিণ-স্লাভ জাতিগুলির মধ্যে ষড়যন্ত্র চালাতে লাগল। অস্ট্রিয়াও সার্বিয়াকে উচিত শিক্ষাদানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে বিবাদের অজুহাত খুঁজতে লাগল। রাশিয়া কিন্তু ক্রমাগত সার্বিয়াকে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে লাগল। তারপরে সংঘটিত হল ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে, সেই ভীষণ কাণ্ড যার থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হল। এসময় অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফার্দিনান্দ বোসনিয়ার রাজধানী সিরাজিভো নগরীতে, এক সার্ব বিপ্লবী যুবকের গুলিতে নিহত হন। একরূপ সঙ্গে সঙ্গেই অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকে সার্বিয়া ও শেষের ভাগে রুমানিয়া মিত্রশক্তির পক্ষে যোগদান করে। বুলগেরিয়া ও তুরস্ক জার্মেনী ও অস্ট্রিয়ার পক্ষে যোগদান করে। এ যুদ্ধের প্রথম দিকে সার্বিয়া, অস্ট্রিয়া ও বুলগেরিয়া কর্তৃক প্রবলভাবে আক্রান্ত হয়। বুলগেরিয়ারও রাশিয়ার হস্তে লাঞ্ছনা কম ভোগ করতে হয় না। গ্রীস এ যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকতে চেষ্টা করে; তবে শেষের

দিকে মিত্রপক্ষের দিকে আসক্ত হয়। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে, জার্মেনী ও অস্ট্রিয়ার পরাজয় হলে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গারীর সাম্রাজ্য একেবারে ভেঙে যায়। বিজয়ী পক্ষ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে, ভার্সাই সন্ধি ও ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে জাতিসংঘের শর্তাবলী দ্বারা, বলকান রাষ্ট্রগুলিকে জাতীয়তাবাদ ভিত্তির উপরে গঠিত করে। প্রাক্তন অস্ট্রিয়া-সাম্রাজ্যের দক্ষিণ ভাগস্থ স্লাভজাতিগুলির সমাবেশে একটি নতুন বড় যুক্তরাজ্যের সৃষ্টি করা হয়। এ রাজ্যের নাম হল **যুগোসাভিয়া** এবং এর অন্তর্গত হল সার্বিয়া, বোসনিয়া, হার্জিগোভিনা রাষ্ট্র ও সার্ব, ক্রোট, স্লোভেন জাতি প্রভৃতি। সার্বিয়া এ রাজ্যে আধিপত্য লাভ করল।

ভার্সাই সন্ধির দ্বারা বলকান অঞ্চলে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হল। বহুদিনের পরাধীনতার পর পোল্যাণ্ড স্বাধীনতা লাভ করল। পূর্ব-বালটিকে ফিনল্যাণ্ড, এস্থোনিয়া, লাটভিয়া এবং লিথুয়ানিয়া—এই চারটি স্বাধীন সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সৃষ্টি হল। চেকোস্লোভাকিয়া নামে নতুন রাষ্ট্র গঠিত হল। হাঙ্গারী ও অস্ট্রিয়া ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে পরিণত হল। বুলগেরিয়ার আয়তন সংকোচ করা হল এবং ছোট রাষ্ট্র আলবেনিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করা হল। মূল বলকান খণ্ডে তিনটি বড় রাষ্ট্রের উদ্ভব হল, যথা—যুগোস্লাভিয়া, রুমানিয়া এবং গ্রীস।

এই সব নব সৃষ্টির ফলে পূর্ব-ইওরোপ ও বলকান অঞ্চল বহুভাগে বিভক্ত হল, আর এতে বলকান সমস্যার কোন সন্তোষজনক সমাধানই হল না। তুরস্কের কনস্টান্টিনোপল ছাড়া আর বলকান অঞ্চলে বিশেষ কোন অধিকার থাকল না। যদিও বলকান রাজ্যগুলিকে জাতীয়তার ভিত্তিতে নতুনভাবে পুনর্বিন্যস্ত করা হল, কিন্তু তা সত্বেও বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে নানাজাতির সংমিশ্রণ থেকে গেল। একটা সংখ্যালঘু-সমস্যা থেকে যাওয়ায় এর থেকে ক্রমাগত অশান্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। বলকান রাষ্ট্রগুলির আর্থিক বিশৃঙ্খলা বেড়েই যেতে লাগল এবং এ রাষ্ট্রগুলির সীমান্তরেখা এলোমেলো ভাবে নির্ধারিত হয়েছিল বলে, সবদিক দিয়েই গোলযোগ ও অশান্তি যুদ্ধের পর বরাবর বাড়তেই লাগল।

বলকান রাষ্ট্রগুলির ভৌগোলিক অবস্থান এরূপ জটিল যে, ইতিহাসই যেন তাদের অদৃষ্টে শান্তিতে শাসন চালনা করবার অধিকার দেয় নি। যেমন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তেমনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও, জার্মেনী ও রাশিয়া দুই দুর্দান্ত প্রতিপক্ষশক্তির ঝঞ্ঝার আবর্তে পড়ে বলকান দেশগুলিই সহ্য করেছে অধিকতম দুর্ভোগ ও লাঞ্ছনা। একবার গর্বিত হিটলারের বিজয়ী রথ এই দেশগুলির বুকের উপর দিয়ে অভিযান করে আবার শক্তিমান সোভিয়েট রাশিয়ার পালটা-আক্রমণের রথচক্র এই দেশগুলিকেই ক্ষতবিক্ষত করে।

বলকান দেশগুলির বর্তমান অবস্থা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে, বলকান দেশগুলির অধিকাংশ উৎকট আর্থিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়ে। ১৯৪৪ ও ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে পোটসডাম সন্ধির পরে অধিক সংখ্যক বলকান রাষ্ট্র আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা মিটাতে না পেরে রাশিয়ার কম্যুনিস্ট মতবাদের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে। আলবেনিয়া,

মার্শাল টিটো

চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গারী, রুমানিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্র ক্রমে পূর্ব-ইওরোপীয় কম্যুনিস্ট চক্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। এসব দেশে দ্রুতগতিতে বামপন্থী 'লোকসাধারণতন্ত্র' স্থাপিত হয়েছে। এই রাষ্ট্রগুলিতে কম্যুনিষ্ট-বিরোধী দলগুলিকে ক্রমান্বয়ে ক্ষমতাহীন করা হয়েছে। এই দেশগুলি এখন রাশিয়াপুষ্ট, "পরস্পর আর্থিক সাহায্যকল্পে পূর্ব-ইওরোপীয় পরিষদে" যোগদান করেছে। এই পরিষদ রাশিয়ার পক্ষে, ইঙ্গ-আমেরিকা উদ্ভাবিত পশ্চিম-ইওরোপীয় মার্শাল পরিকল্পনা ও উত্তর-অতলান্তিক চুক্তি-সংস্থার পালটা জবাব।

হাঙ্গারী

হাঙ্গারী বর্তমানে একটি কম্যুনিস্ট সাধারণতন্ত্রী দেশ। ১০০১ খ্রীষ্টাব্দে হাঙ্গারীতে রাজতন্ত্র স্থাপিত হয়। তারপর বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে তুর্ক-অধীনে চলে যায়। কিন্তু শীঘ্রই হাঙ্গারী ও অস্ট্রিয়ার দ্বারা তুর্করা পরাজিত হয়। কিন্তু অস্ট্রিয়া হাঙ্গারীর উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে অক্ষম হয়।

১৮৬৭ খ্রীঃ অস্ট্রিয়ার সম্রাট্ হাঙ্গারীর রাজা বলে স্বীকৃত হন।

১৯১৮ খ্রীঃ হাঙ্গারীর অন্তর্গত ট্রানসিলভ্যানিয়া রুমানিয়ার, ক্রোটিয়া ও বাক্স্কা যুগোস্লাভিয়ার, স্লোভাকিয়া ও কার্পাথো-রুথেনিয়া চেকোস্লোভাকিয়ার অধিকারে চলে যায়।

হাঙ্গারী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মেনীর পক্ষে যোগদান করে। রিজেণ্ট হর্থি অপসারিত হন। ১৯৪৫ খ্রীঃ রাশিয়া হাঙ্গারীর অধিকাংশ স্থান দখল করে। পরে হাঙ্গারী মিত্রপক্ষের সহিত শর্তক্রমে ১৯৩৭ খ্রীঃ তাহার যে সীমানা ছিল সেই সীমানা মেনে নেয়।

১৯৪৬ খ্রীঃ হাঙ্গারীতে এই সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। জোলটান টিলডি সভাপতি হন।

১৯৪৭ খ্রীঃ কম্যুনিস্টরা টিলডিকে অপসারিত করে। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই অগস্ট হাঙ্গারীতে সোভিয়েট-সদৃশ শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হয়।

১৯৫৫ খ্রীঃ হাঙ্গারী রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হয়। ইমরে নাগি ১৯৫৩ হইতে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার পর অ্যাণ্ড্রাস হেগেডাস প্রধান·মন্ত্রী হন।

ইমরে নাগি ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হন। ক্রমাগত সোভিয়েট হস্তক্ষেপ ও দেশে সোভিয়েট সৈন্যের অবস্থিতির জন্যে হাঙ্গারীতে প্রবল জনবিক্ষোভ দেখা দেয়। কিছুদিনের জন্য সোভিয়েট রাশিয়া সৈন্য সরিয়ে নেয়, কিন্তু হাঙ্গারীর বুদ্ধিজীবী মহল রাশিয়ার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু করে ক্রমে তাহা সারা দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়লে ১লা নভেম্বর রাশিয়া পুনরায় বুডাপেস্টে দুই লক্ষ সৈন্য এবং ২৫০০ ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ি পাঠিয়ে দেয়।

রাশিয়া মার্শাল জুখভের নেতৃত্বে হাঙ্গারীবাসীদের উপর নির্মম অত্যাচার চালায়। তার ফলে স্বাধীনতাকামী হাঙ্গারীবাসীদের প্রায় ত্রিশ হাজার লোক রাশিয়ার সৈন্যদের হস্তে মারা যায়, বহু নেতার মৃত্যুদণ্ড হয় এবং প্রায়

দুই লক্ষ লোক দেশ ত্যাগ করে। হাঙ্গারীর লোকে ক্রুশ্চভকে 'বুডাপেস্টের জল্লাদ' বলে অভিহিত করে।

প্রধানমন্ত্রী নাগিকে অপসারিত করে জেনস কাদারকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়। নাগিকে অন্যায়ভাবে, বলপূর্বক ধৃত করে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

ইস্ট্‌ভান ডোবি ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর প্রেসিডেন্ট হন। পল লসঙ্কজি ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট হন। প্রধান মন্ত্রী জেনো ফক।

সোভিয়েট অনুশাসনে গির্জার অধিকার বিশেষভাবে সংকুচিত করা হয়েছে। অধিবাসীরা খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী।

হাঙ্গারীর আয়তন ৯৩,০৩০ বর্গ কিলোমিটার (৩৫,৯০০ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ১,০০,৫৭,০০০ (১৯৬২ খ্রীঃ)। রাজধানী বুডাপেস্ট।

যুগোস্লাভিয়া

যুগোস্লাভিয়া সাধারণতন্ত্র সার্বিয়া, ক্রোটিয়া, স্লোভেনিয়া, মন্টিনিগ্রো, বোসনিয়া, হার্জিগোভিনা ও মাসিডোনিয়ার মিলনে গঠিত।

১৯২১ খ্রীঃ পিটারের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র ১ম আলেকজাণ্ডার যুগোস্লাভিয়ার রাজা হন। তিনি ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দের ৯ই অক্টোবর মার্শাইয়ে নিহত হলে প্রিন্স পল রিজেন্ট হন। পরে দ্বিতীয় পিটার রাজা হন।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে জার্মেনী যুগোস্লাভিয়া আক্রমণ করলে দ্বিতীয় পিটার লণ্ডনে পলায়ন করেন।

মার্শাল টিটোর অধিনায়কত্বে দেশে এক মুক্তি-আন্দোলন দেখা দেয়। জার্মেনী পরাজিত হয়। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর যুগোস্লাভিয়া স্বাধীন সাধারণতন্ত্র বলে ঘোষিত হয়। টিটোর উপর ৩১শে জানুয়ারি, ১৯৪৬ খ্রীঃ দেশের শাসনভার অর্পিত হয়।

টিটোর সঙ্গে কম্যুনিস্ট রাশিয়ার পুরাপুরি মতের মিল নেই। কম্যুনিস্ট প্রভাবাধীন রাষ্ট্র হলেও টিটো যুগোস্লাভিয়ার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সাহায্য গ্রহণ করেন। তিনি ফ্রান্স ও গ্রেটব্রিটেনের কাছ থেকে নানা ভাবে সাহায্য নেন।

টিটোর দৃঢ়চিত্ততার জন্যে প্রথমটা রুষ্ট ভাব দেখালেও শেষ পর্যন্ত রাশিয়ার ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ অনেক বিষয়ে টিটোর মতে সায় দেন। টিটো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের ন্যায় সহ-অবস্থান নীতিতে বিশ্বাসী। যুগোস্লাভিয়া ভারতের মিত্ররাষ্ট্র।

টিটো ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মে পুনরায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন।

যুগোস্লাভিয়ার অধিকাংশ অধিবাসী খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী। এখানে শতকরা ১১ ভাগ মুসলমান।

যুগোস্লাভিয়ার আয়তন ২,৫৫,৮০৪ বর্গ কিলোমিটার (৯৮,৭২৫ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ১,৮৮,৪১,০০০ (১৯৬২ খ্রীঃ)।

টিটোর সঙ্গে বিধানচন্দ্র ও নেহেরু

চেকোস্লোভাকিয়া

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে চেকোস্লোভাকিয়া কম্যুনিস্ট সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র। এখানে আশি লক্ষ চেক ও পঁয়ত্রিশ লক্ষ স্লোভাকের বাস। তারা প্রাচীন স্লাভ জাতির বংশধর। এখানে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ হাঙ্গারীয়, দু লক্ষ জার্মান, এক লক্ষ রুমানিয়ান-উক্রেনিয়ান এবং এক লক্ষ পোল আছে।

১৯১৪—১৯১৮ খ্রীঃ টমাস জি মাসারিক ও এডুয়ার্ড বেনেস এক অস্থায়ী গভর্নমেন্টের প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর চেকোস্লোভাকিয়াকে সাধারণতন্ত্র বলে ঘোষণা করেন। মাসারিক ১৯১৮ থেকে ১৯৩৫ খ্রীঃ পর্যন্ত এর সভাপতি থাকেন। পরে বেনেস সভাপতি হন।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে হিটলার চেকোস্লোভাক শাসনতন্ত্র ভেঙে দেন। তারপর

বহু পরিবর্তনের পর রাশিয়ান ও মার্কিন সৈন্যদল ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে চেকোস্লোভাকিয়া উদ্ধার করে। বেনেস ফিরে এসে ১৯৪৫ খ্রীঃ ৮ই মে পুনরায় সভাপতি হন।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে কম্যুনিস্টরা দলে পুষ্ট হয়। বেনেস কম্যুনিস্ট নেতা ক্লেমেণ্ট গটওয়ল্ডকে প্রধানমন্ত্রী করেন। গটওয়ল্ডের নেতৃত্বে দেশে কম্যুনিস্ট শাসন প্রবর্তিত হয়। বেনেস ১৯৪৮ খ্রীঃ ৭ই জুন পদত্যাগ করেন। ৩রা সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

অ্যাণ্টোনিন নভোট্নি ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৯শে নভেম্বর সভাপতি-পরিষদের প্রেসিডেণ্ট হন। জেনারেল লুডভিক স্ববোদা ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেণ্ট হন। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী ওল্ডরিক সার্নিক (১৯৬৮ খ্রীঃ)।

চেকোস্লোভাকিয়ার অধিবাসীরা খ্রীস্টধর্মাবলম্বী। এর আয়তন ১,২৭,৮৭০ বর্গ কিলোমিটার (৪৯,৩৬২ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ১,৪২,৭১,৫৪৭ (১৯৬৭ খ্রীঃ)।

রুমানিয়া

আইয়ন জি মরের

রুমানিয়া নাম হয় ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে। এই অঞ্চল ১০১ খ্রীষ্টাব্দে রোমানদের উপনিবেশ ছিল। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এখানে কতকাংশে তুর্ক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে রুমানিয়া তুরস্কের অধীনতাপাশ ছিন্ন করে। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হন প্রথম ক্যারল।

রাজা দ্বিতীয় ক্যারল ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ডিক্টেটার হন। তিনি ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে শাসন-ভার ত্যাগ করেন। প্রথম মাইকেল ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হন। তিনি কম্যুনিস্ট চাপে

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন ত্যাগ করেন।

রুমানিয়া বর্তমানে কম্যুনিস্ট চক্রভুক্ত দেশ।

১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা অক্টোবর সি স্টোইকা প্রধানমন্ত্রী হন। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী আইয়ন জি. মরের।

১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে নিকোলি কোসেস্কু প্রেসিডেণ্ট হন।

রুমানিয়ার অধিবাসীরা খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী। এর আয়তন ২,৭৩,৪২৮ বর্গ কিলোমিটার (৯১,৬৭১ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ১,৮৬,৮১,০০০ (১৯৬২ খ্রীঃ)।

প্রেসিডেণ্ট নিকোলি কোসেস্কু

আলবেনিয়া

আলবেনিয়া একটি ছোট কম্যুনিস্ট প্রভাবাধীন রাষ্ট্র। প্রায় দুই হাজার বছর ধরে ইহা নানা দেশ কর্তৃক অধিকৃত থাকে। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ইহা স্বাধীন হয়। প্রিন্স উইলিয়াম রাজা হন। তিনি ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে পলায়ন করেন।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহা সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। রাজা জোগ সভাপতি হন। তিনি ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে পলায়ন করেন।

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আলবেনিয়া জার্মান ও ইটালিয়ান সৈন্যদের অধিকারে থাকে। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর এনভার হোজার অধীনে এক অস্থায়ী গভর্নমেণ্টের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারি আলবেনিয়া সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র বলে ঘোষিত হয়। কম্যুনিস্টদল নির্বাচনে জয়লাভ করে।

মেজর জেনারেল মেহমেত শেহু ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রধানমন্ত্রী হন। প্রেসিডেন্ট —হাক্সি লিয়েসি।

আলবেনিয়া ১৯৫০ খ্রীঃ রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হয়।

আলবেনিয়ার অধিবাসীদের অধিকাংশ মুসলমান। এর আয়তন ২৮,৭৪৮ বর্গ কিলোমিটার (১১,১০১ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ১৯,১৪,০০০ (১৯৬৬ খ্রীঃ)। রাজধানী টিরানা।

বুলগেরিয়া

সপ্তম শতাব্দীতে বুলগার জাতির লোকেরা এখানে বসবাস আরম্ভ করে। ১৩৯৩ খ্রীঃ তুর্ক জাতি এ দেশ অধিকার করে। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বুলগেরিয়ায় রাজতন্ত্র স্থাপিত হয়।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বুলগেরিয়া জার প্রথম ফার্ডিন্যাণ্ডের আমলে স্বাধীন রাজতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বুলগেরিয়া অক্ষশক্তির সঙ্গে যোগদান করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও ইহা অক্ষশক্তির সঙ্গে যোগ দেয় কিন্তু ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ ত্যাগ করে।

বুলগেরিয়া বর্তমানে কম্যুনিস্ট-প্রভাবান্বিত দেশ।

এখানে সোভিয়েট ধাঁচের শাসনবিধি চালু আছে। ডিমিটার গ্যানেভের মৃত্যুর পর গেয়র্গি ত্রাইকভ প্রেসিডেন্ট হন (১৯৬৬ খ্রীঃ)। প্রধানমন্ত্রী হন টোডর ঝিভকভ।

বুলগেরিয়া ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হয়। এখানকার অধিবাসীদের অধিকাংশ খ্রীষ্টান। প্রায় ৬ লক্ষ মুসলমান এখানে বাস করে।

এর আয়তন ১,১০,৯১১ বর্গ কিলোমিটার (৪২,৮২৩ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ৮২,২৬,৫৬৪ (১৯৬৫ খ্রীঃ)। রাজধানী সোফিয়া।

আফ্রিকার কয়েকটি দেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

এক সময়ে সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশ বিভিন্ন বৈদেশিক রাষ্ট্রের অধীন ছিল। বর্তমানে এখানকার রাজনৈতিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বহু দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে এবং আরও অনেক দেশের স্বাধীনতা লাভের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এমন দিন আসতে পারে, যখন আফ্রিকার সব দেশই স্বাধীনতা লাভ করবে।

ঘানা, গিনি, সোমালিয়া, কঙ্গো সাধারণতন্ত্র, মালাগাসি, গ্যাবন, মধ্য আফ্রিকা সাধারণতন্ত্র, চাদ সাধারণতন্ত্র, নাইজার সাধারণতন্ত্র, ড্যাহোমে, আইভরি কোস্ট সাধারণতন্ত্র, ভোলটেইক সাধারণতন্ত্র, মাউরিটেনিয়া, মালি যুক্তরাষ্ট্র, ক্যামেরুন, টোগো প্রভৃতি দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে।

কঙ্গো সাধারণতন্ত্র

১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুন পর্যন্ত কঙ্গো বেলজিয়ামের উপনিবেশ ছিল। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর কঙ্গো বেলজিয়ামের উপনিবেশে পরিণত হয়।

কাটাঙ্গা, লিওপোল্ডভিল, কিভু, কাসাল, ওরিয়েণ্টাল ও ইকোয়েটার—এই ছয়টি প্রদেশ নিয়ে কঙ্গো। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জুন বেলজিয়াম ও কঙ্গোর নেতাদের এক বৈঠকে ইহাই স্বীকৃত হয় যে ৩০শে জুন কঙ্গো স্বাধীন হবে।

প্রথম নির্বাচনে পেট্রিস এমেরি লুমুম্বা প্রধানমন্ত্রী হন। রাষ্ট্রপ্রধান হন জোসেফ কাসাভুবু।

স্বাধীনতালাভের পর কঙ্গোয় ভয়াবহ বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়। কাটাঙ্গার সভাপতি টিশোম্বে কাটাঙ্গাকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করেন। গৃহযুদ্ধের ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙে পড়ে। দারুণ খাদ্যাভাবে দেশবাসী ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে পড়ে। ৯ই অগস্ট জাতিসংঘ কঙ্গোয় সৈন্য প্রেরণ করে এবং বেলজিয়ামকে সৈন্য সরিয়ে নিতে বলে।

নিদারুণ বিশৃঙ্খলার মধ্যে লুমুম্বা কাটাঙ্গায় উপজাতীয়দের দ্বারা নিহত হন। লুমুম্বার হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে বিশ্বের নানাস্থানে প্রতিবাদধ্বনি উত্থিত হয়।

এখনও কঙ্গোয় পূর্ণ শান্তি সংস্থাপিত হয় নি। বাণ্টু-নিগ্রোই কঙ্গোর প্রধান অধিবাসী।

জোসেফ কাসাভুবু রাষ্ট্রপ্রধান এবং সিরিল এডুলা হন প্রধানমন্ত্রী (১৯৬০ খ্রীঃ)।

এর আয়তন ২৩,৪৫,৪০৯ বর্গ কিলোমিটার (৮,৯৫,৩৪৮ বর্গমাইল) ; লোকসংখ্যা ১,৫৪,৪৯০০০ (১৯৬৫ খ্রীঃ)। রাজধানী কিনশাসা।

কঙ্গো প্রজাতন্ত্র

ফরাসীদের অধীন কঙ্গো রাজ্য ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা লাভ করে এবং প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। কঙ্গো ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সদস্য হয়। কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট আনফোনসে মাসাম্বা-ডেবাট। প্রধানমন্ত্রী অ্যাম্ব্রয়েসি নৌম্যাজ্যালে।

এর আয়তন ৩,৩১,৮৫০ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা ৮,৭০,০০০ (১৯৬৬ খ্রীঃ)। রাজধানী ব্রাজাকিল।

ঘানা

প্রায় সাতশ বছর আগে ঘানার বর্তমান অধিবাসীরা আফ্রিকার অন্যান্য স্থান থেকে এসে এখানে বাস করতে আরম্ভ করে। পোর্তুগিজরা প্রথম স্বর্ণের সন্ধানে এখানে আসে। তারা ১৪৮২ খ্রীষ্টাব্দে এলমিনা প্রাসাদ নির্মাণ করে। ইংরেজেরা আসে ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে।

১৮২১ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীর হাত থেকে ব্রিটিশ সরকার ঘানা শাসনের ভার গ্রহণ করে। প্রায় এক শতাব্দী কাল ইহা ব্রিটিশের শাসনাধীন থাকে। পরে ব্রিটিশ গোল্ডকোস্ট, আসান্তি ও গোল্ডকোস্টের উত্তরাঞ্চল এবং ব্রিটিশ টোগোল্যাণ্ড একসঙ্গে ঘানা নাম গ্রহণ করে এবং ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মার্চ ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অধীনে স্বাধীনতা লাভ করে।

ঘানা ১৯৫৭, ৮ই মার্চ রাষ্ট্রসংঘের ৮১তম সদস্য হয়।

১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই ঘানা সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল ঘানা, গিনি (পূর্বতন ফরাসী গিনি) ও মালি সংযুক্ত রাষ্ট্র গঠন করে যতটা সম্ভব সেই অনুযায়ী চলার শর্ত গ্রহণ করে।

ডাঃ কোয়ামি নক্রুমা ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি বর্তমানে দেশত্যাগী হতে বাধ্য হয়েছেন। এখন রাষ্ট্রপ্রধান লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল জে. এ. আংক্রা।

ঘানার অধিবাসীরা খ্রীস্টান ও মুসলমান। এর আয়তন ২,৩৮,৫৩৭ বর্গ কিলোমিটার (৯২,১০০ বর্গমাইল); লোকসংখ্যা ৭৯,৪৫,০০০ (১৯৬৬ খ্রীঃ)। রাজধানী আক্রা।

দক্ষিণ আফ্রিকা রিপাবলিক

পূর্বতন কেপ অব গুড্ হোপ (উত্তমাশা অন্তরীপ), নাটাল, দি ট্রান্সভাল ও দি অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটের সমবায়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের সৃষ্টি।

বুয়রযুদ্ধে (১৮৯৯—১৯০২ খ্রীঃ) ব্রিটিশেরা দি ট্রান্সভাল ও দি অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটকে পরাজিত করার ৮ বৎসর পরে ১৯১০ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে মে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের সৃষ্টি হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে মে দক্ষিণ আফ্রিকা রিপাবলিক নামে সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।

ডাঃ হেন্ড্রিক ভেরউর্ড ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর এর প্রধানমন্ত্রী হন। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী বি. জে. ভর্স্টার (১৯৬৮ খ্রীঃ)।

দক্ষিণ আফ্রিকা রিপারলিক বর্তমানে বর্ণবৈষম্য প্রথা তীব্র আকার ধারণ করেছে। শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের উপর অত্যাচার করে ও অসংগত আইনকানুন চাপিয়ে তাদের বিব্রত করে তুলছে। এজন্যে ভারত ও পৃথিবীর বহু দেশ তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে।

এর আয়তন ১২,২১,০৪২ বর্গ কিলোমিটার (৪,৭১,৪৪৫ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ১৮,২৯,৮০০ (১৯৬৬ খ্রীঃ)। রাজধানী প্রিটোরিয়া ও কেপ টাউন।

সুদান

সুদান ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে মিশরীয় সরকারকে অপসারিত করে নিজেরাই শাসনকার্য চালাতে থাকে। পরে দেশে বিদ্রোহ দেখা দিলে লর্ড কিচেনার ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর ইঙ্গ-মিশরীয় সৈন্যদল নিয়ে সেই বিদ্রোহ দমন করেন।

১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে ঈজিপ্ট ও ব্রিটেনের মধ্যে এক চুক্তি হয়। সেই চুক্তি-অনুসারে ঠিক হয়, সুদান একজন গভর্নর-জেনারেল দ্বারা শাসিত হবে।

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ঈজিপ্ট ব্রিটেনের সঙ্গে চুক্তি নাকচ করে দেয়। ঠিক হয় সুদানে পৃথক্ শাসনতন্ত্র রচিত হবে।

১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি সুদান সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়।

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর লেফটেনান্ট-জেনারেল ইব্রাহিম আবুদ প্রধানমন্ত্রী আবদুল্লা খলিলকে অপসারিত করে শাসনযন্ত্র অধিকার করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়ে দেশকে সামরিক শাসনের অধীন করেন।

১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দের ৮ই জুলাই ইসমাইল এল-আন্সারি সুপ্রিম কাউন্সিলের সভাপতি হন। প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আমেদ মাহ্‌গুব।

সুদান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য গ্রহণ করে থাকে।

এখানকার অধিবাসীদের অধিকাংশ মুসলমান। এর আয়তন ২৫,০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার (৯,৬৭,৫০০ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ১,৩০,১১০০০ (১৯৬৪ খ্রীঃ)। রাজধানী খার্টুম।

লিবিয়া

ট্রিপলিটানিয়া, সাইরেনাইকা ও ফেজান-এর সমবায়ে লিবিয়ার সৃষ্টি। প্রাচীনকালে লিবিয়া কার্থেজ ও রোমের অধীন ছিল। পরে ইহা অটোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তারপর ইহা ইতালির অধীন হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ট্রিপলি ও সাইরেনাইকা ব্রিটিশের এবং ফেজান ফ্রান্সের শাসনাধীন হয়। ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে গ্রেট ব্রিটেন আমীর মহম্মদ ইদ্রিস এল সেনুসিকে সাইরেনাইকার শাসনকর্তা বলে মেনে নেয়। রাষ্ট্রসংঘের ব্যবস্থায় লিবিয়া স্বাধীন হয় (২রা জানুয়ারি, ১৯৫২ খ্রীঃ)। ইদ্রিস রাজা হন।

লিবিয়া ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের সদস্য হয়।

আবদুল হামিদ বাক্কুশ ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রী হন।

লিবিয়ার অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান। এর আয়তন ১৭,৫৯,৫৪০ বর্গ কিলোমিটার (৬,৭৯,৩৫৮ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ১৫,৬৪,০০০ (১৯৬৫ খ্রীঃ)। রাজধানী ত্রিপলি ও বেনগাজি।

লাইবেরিয়া

লাইবেরিয়া একটি নিগ্রো প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র। এখানে মাত্র কুড়ি হাজার আমেরিকান নিগ্রোর বাস। বাকী সব আফ্রিকার নিগ্রো।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুক্তিপ্রাপ্ত নিগ্রো ক্রীতদাসদের নিয়ে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ

লাইবেরিয়ার প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই ইহা স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

লাইবেরিয়ার প্রেসিডেণ্ট উইলিয়াম ভি টাবম্যান (১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে)। অধিবাসীদের অধিকাংশ খ্রীস্টান। এর আয়তন ১,১১,০০০ বর্গ কিলোমিটার (৪৩,০০০ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ১০,১৬,০০০ (১৯৬২ খ্রীঃ)। রাজধানী মনরোভিয়া।

আলজিরিয়া

উত্তর আফ্রিকার একটি স্বাধীন দেশ। এর আয়তন ২,৯৫,০৩৩ বর্গ কিলোমিটার (১,১৩,৮৮৩ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ১,১০,২০,০০০ (১৯৬০ খ্রীঃ)। রাজধানী আলজিয়ার্স।

আলজিরিয়া ফ্রান্সের অধীন রাজ্য ছিল। আলজিরিয়াকে স্বাধীন করবার জন্যে জাতীয়তাবাদীরা বহুদিন ধরে যুদ্ধ চালায়। এর ফলে ফ্রান্সকে প্রভূত অর্থব্যয় করতে হয়। ফ্রান্সের প্রায় অর্ধেক সৈন্য এখানে নিয়োজিত ছিল।

১৯৬২ খ্রীস্টাব্দে আলজিরিয়া স্বাধীনতা লাভ করে। আলজিরিয়া জাতিসংঘ ও আরব লীগের সদস্য। আমেদ বেন বেলা ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর আলজিরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান হন। প্রধানমন্ত্রী হাউয়ারি বুমেদিন।

গিনি

ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকার অন্তর্গত গিনি ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দের ২রা অক্টোবর স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

সিকোউ টোউরি প্রথম সভাপতি হন। ৯ই ডিসেম্বর গিনি রাষ্ট্রসংঘের ৮২তম সদস্য হয়। ২৩শে নভেম্বর গিনি ঘানার পরে, ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল মালির সঙ্গে সংঘবদ্ধ হয়। এই থেকেই পশ্চিম আফ্রিকার রাজ্যসমূহের এক সংঘের সৃষ্টি হয়।

১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে গিনি চেকোশ্লোভাকিয়ার কাছ থেকে অস্ত্র ও কারিগরি সাহায্য গ্রহণ করে। গিনি চেকোশ্লোভাকিয়া, পূর্ব জার্মেনি, পোলাণ্ড ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য-চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। গিনি কতকটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতির বিরোধী।

ডাঃ এনক্রুমা দেশত্যাগী হতে বাধ্য হলে গিনিতে আসেন। সিকোউ টৌউরি তাঁকে রাষ্ট্রের যুগ্ম প্রেসিডেণ্ট বলে গ্রহণ করেন।

গিনির আয়তন ২,৪৫,৮৫৭ বর্গ কিলোমিটার (৯৫,০০০ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ৩০,৫০,০০০ (১৯৬৫ খ্রীঃ)। রাজধানী কোনাক্রি।

ইথিওপিয়া

ইথিওপিয়া (আবিসিনিয়া) উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার একটি দেশ। এখানে রাজতন্ত্র বর্তমান। ইতালি ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ইথিওপিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। সম্রাট্ হাইলে সেলাসী প্রবল যুদ্ধের পর পরাজিত হন। মুসোলিনী ইথিওপিয়াকে ইতালির একাংশ বলে ঘোষণা করেন। ভিক্টর ৩য় ইমানুয়েল সম্রাট্ হন।

ব্রিটিশ সৈন্য ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ইথিওপিয়াকে ইতালির কবল থেকে মুক্ত করে। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে পূর্বতন ইতালীয় উপনিবেশ ইরিত্রিয়াকে ইথিওপিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

বর্তমান সম্রাট্ হাইলে সেলাসী ইথিওপিয়ার ২২৫তম শাসক (জন্ম ১৮৯২ খ্রীঃ, ২৩শে জুলাই)। তিনি স্বেচ্ছায় ১৯৩১ খ্রীঃ, ১৬ই জুলাই পার্লামেণ্টারী শাসনপ্রথার চালু করেন।

এখানকার অধিবাসীদের অর্ধাংশের উপর খ্রীস্টধর্মাবলম্বী। মুসলমান এক-পঞ্চমাংশ। এর আয়তন (ইরিত্রিয়াসহ) ১০,০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার (৩,৯৫,০০০ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ২,২৫,৯০,৪০০ (১৯৬৫ খ্রীঃ)। রাজধানী আদ্দিস আবাবা।

মরক্কো

মরক্কো আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের একটি দেশ। সপ্তম শতাব্দীর শেষে আরবরা এখানে আধিপত্য শুরু করে। ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে মরক্কো ফরাসী আওতায় আসে। মরক্কোর কিছুটা অংশে স্পেন এবং বাকী অধিকাংশ স্থানে ফ্রান্সের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মরক্কো স্পেন ও ফ্রান্সের আশ্রিত রাজ্য বলে গণ্য হয়। এই সালে মরক্কো স্বাধীন হয়।

সিদি মহম্মদ বেন ইউসুফ এর রাজা (মেলেক) ছিলেন। তিনি মারা গেলে দ্বিতীয় হাসান নাম গ্রহণ করে যুবরাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

এখানকার অধিবাসীরা মুসলমান। এর আয়তন ৪,৩০,০০০ বর্গ কিলোমিটার (১,৬৬,০০০ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ১,১৫,৯৮,০০০ (১৯৬১ খ্রীঃ)। রাজধানী রাবাট।

টিউনিসিয়া

টিউনিসিয়া এক সময়ে তুরস্কের অধীন রাজ্য ছিল। ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দের ১২ই মে এক চুক্তি অনুযায়ী ইহা ফ্রান্সের আশ্রিত রাজ্য হিসাবে পরিগণিত হয়।

১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে ধীরে ধীরে টিউনিসিয়া স্বাধীনতা লাভ করতে থাকে। বর্তমানে ইহা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্স বাইজার্টির নৌ ও বিমান বন্দর ছাড়া সর্বত্র থেকে সৈন্য সরিয়ে নেয়।

১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দের ১লা জুন থেকে এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হয়েছে।

১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জুলাই হাবিব বুরগুইবা রাষ্ট্রের সভাপতি হন।

এখানে মুসলমানের সংখ্যাই বেশী। প্রায় ২,৫০,০০০ ইওরোপীয় এবং ৮০,০০০ ইহুদী এখানে বাস করে।

টিউনিসিয়ার আয়তন ১,৬৪,১৫০ বর্গ কিলোমিটার (৬৩,৩৬২ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ৪৪,৫৭,৮৬২ (১৯৬৬ খ্রীঃ)। রাজধানী টিউনিস।

মাদাগাস্কার

মালাগাসি সাধারণতন্ত্র

আফ্রিকার মাদাগাস্কার দ্বীপই বর্তমানের মালাগাসি সাধারণতন্ত্র। ইহা ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী আশ্রিত রাজ্য বলে গণ্য হয়। পরে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী উপনিবেশে পরিণত হয়। ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে মার্চ দেশটি গণতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

এর প্রেসিডেন্ট কিলিবার্ট ৎসিরানানা।

এর রাজধানী তানানারিভে। আয়তন ৫,৯৪,১৮০ বর্গ কিলোমিটার (২,২৯,২৩৩ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ৬৩,৫৫,৮১০ (১৯৬৩ খ্রীঃ)।

সোমালি রিপাবলিক

সোমালিয়া পূর্ব আফ্রিকার একটি স্বাধীন গণতন্ত্রী রাষ্ট্র। পূর্বে ইহা ব্রিটিশ ও ইতালীয়ের অধিকারভুক্ত ছিল।

১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই দেশটি স্বাধীন হয় এবং সোমালি রিপাবলিক নামে পরিচিত হয়। এর প্রেসিডেন্ট ডাঃ আবদি রশীদ আলি শিমার্কে এবং মোহাম্মদ হাজি ইব্রাহিম ঈগল প্রধানমন্ত্রী।

মোগাডিশু সোমালিয়ার রাজধানী। এর আয়তন ৬,৩৭,৬৬০ বর্গ কিলোমিটার (২,৪৬,১৩৫ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ২৫,০০,০০০ (১৯৬২ খ্রীঃ)।

আপার ভোল্টা

আপার ভোল্টা পূর্বে ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই আগস্ট দেশটি পূর্ণ স্বাধীন হয়, এবং ২০শে সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হয়।

মরিস ইয়াসিওগো ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রপ্রধান হন। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জুন রাষ্ট্রপ্রধান হন লেফটেন্যান্ট কর্নেল স্যাংগুল ল্যামিজানা।

এর আয়তন ২,৭৪,১২২ বর্গ কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা ৫০,০০,০০০ (১৯৬৭ খ্রীঃ)।

আইভরি কোস্ট

আইভরি কোস্ট পূর্বতন ফরাসী আফ্রিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখন ইহা সম্পূর্ণ স্বাধীন। ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দের ৭ই আগস্ট আইভরি কোস্ট স্বাধীনতা লাভ করে।

এর রাষ্ট্রপ্রধান ফেলিক্স হাউকাউয়েত-বয়নি।

এর রাজধানী আবিদজান। আয়তন ৩,২২,৪৬৩ বর্গ কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা ৩৮,৪৫,০০০ (১৯৬৫ খ্রীঃ)।

মালি

মালি এক সময়ে ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখন দেশটি সম্পূর্ণ স্বাধীন। এর পূর্ব নাম ছিল সুদান। সুদান সেনিগালের সহিত একযোগে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করেছিল। কিন্তু ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দের ২০শে আগস্ট সেনিগাল সুদানের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে। তখন সুদান মালি গণতন্ত্র নামে পরিচিত হয়।

মালি রাষ্ট্রসংঘের সদস্য। এর সভাপতি মোডিবো কিটা।

এর রাজধানী বামাকো। আয়তন ১২,০৪,০২১ বর্গ কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা ৪৭,০০,০০০ (১৯৬৭ খ্রীঃ)।

ডাহোমে

ডাহোমে পূর্বে ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দের ১লা আগস্ট দেশটি পুরাপুরি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

১৯৬০ খ্রীস্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর হিউবার্ট মাগা (জন্ম ১৯১৬ খ্রীঃ) প্রেসিডেণ্ট হন। অনেক পরিবর্তনের পর ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর মেজর মরিস কৌয়ানদিট রাষ্ট্রের শাসনভার গ্রহণ করেন।

এর রাজধানী প্রোর্টো-নোভো। আয়তন ১,১৫,৭৬২ বর্গ কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা ২৩,৭০,০০০ (১৯৬৫ খ্রীঃ)!

সিয়েরা লিয়ন

সিয়েরা লিয়ন আফ্রিকার একটি রাজ্য। এই রাজ্য পূর্বে ব্রিটিশের অধীন ছিল। ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল ইহা স্বাধীন হয়েছে। রাজ্যটি কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত।

সিয়েরা লিয়ন ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রসংঘের ১০০তম সদস্য হয়েছে।

সিয়েরা লিয়নের রাষ্ট্রপ্রধান ব্রিগেডিয়ার অ্যাণ্ড্রু জাক্সন-স্মিথ।

এর আয়তন ৭৩,৩২৬ বর্গ কিলোমিটার (২৭,৯২৬ বর্গমাইল)। লোক-সংখ্যা ২১,৮৩,০০০ (১৯৬৩ খ্রীঃ)। রাজধানী ফ্রীটাউন।

উগাণ্ডা

উগাণ্ডা ব্রিটিশের একটি আশ্রিত রাজ্য ছিল। আফ্রিকার এই রাজ্যটি ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দের ৯ই অক্টোবর স্বাধীন হয়েছে এবং ২৫শে অক্টোবর রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হয়েছে।

অ্যাপলো মিল্টন ওবোট এই রাজ্যের প্রেসিডেণ্ট।

এর আয়তন ২,৩৬,০৩৭ বর্গ কিলোমিটার (৯১,১৩৪ বর্গমাইল) এবং জনসংখ্যা ৭৭,৫০,০০০ (১৯৬৭ খ্রীঃ)। রাজধানী এণ্টেবে।

ক্যামেরুন

ক্যামেরুন ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে স্বাধীন হয়েছে এটি আফ্রিকার একটি দেশ। ইহা পূর্বে জার্মান-অধিকৃত ছিল। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্স ও ব্রিটেন ইহা অধিকার করে।

ক্যামেরুন বর্তমানে ক্যামেরুন সাধারণতন্ত্র নামে খ্যাত। ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দের ৫ই মে আমাদু আহিদজো প্রেসিডেণ্ট হন।

এর আয়তন ৪,৭৪,০০০ বর্গ কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা ৫২,০০,০০০। রাজধানী ইয়াউণ্ডি।

নাইজীরিয়া

নাইজীরিয়া প্রজাতন্ত্র পশ্চিম আফ্রিকার একটি দেশ। এর পাশেই লেক চাদ অবস্থিত। ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দের ১লা অক্টোবর নাইজীরিয়া স্বাধীন হয়। ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দের ১লা অক্টোবর নাইজীরিয়া প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে ক্যামেরুনের উত্তরাংশ নাইজীরিয়ার সহিত সংযুক্ত হয়। এখানকার সরকারী ভাষা ইংরেজী।

নাইজীরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান ইয়াকুবু গাওয়ান

মেজর জেনারেল ইয়াকুবু গাওয়ান নাইজীরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান।

নাইজীরিয়ার আয়তন ৯,২৩,৭৭৩ বর্গ কিলোমিটার (৩,৫৬,৬৬৯ বর্গ মাইল)। লোকসংখ্যা ৫,৫৬,৫৩,৮২১ (১৯৬৩ খ্রীঃ)। রাজধানী লাগোস।

তানজানিয়া

তানজানিয়া পূর্ব আফ্রিকার একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল ট্যাঙ্গানাইকা, জাঞ্জিবার ও পেম্বা ট্যাঙ্গানাইকা ও জাঞ্জিবার সংযুক্ত যুক্তরাষ্ট্র নামে এক স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। পরে ২৯শে অক্টোবর এর নাম হয় তানজানিয়া।

তানজানিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান ডাঃ জুলিয়াস কে নাইয়েরেরে

তানজানিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান ডাঃ জুলিয়াস কে নাইয়েরেরে। তিনি ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর পাঁচ বৎসরের জন্য রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হয়েছেন।

তানজানিয়ার আয়তন ৩,৬৭,৭০৮ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৯৭,১০,০০০ (১৯৬৪ খ্রীঃ)। রাজধানী দার এস সালাম।

———

কেনিয়া

কেনিয়া পূর্ব আফ্রিকার একটি দেশ। কেনিয়া ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর ব্রিটিশের অধীনতা পাশ ছিন্ন করে স্বাধীন হয়। ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর দেশটি প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

কেনিয়ার প্রেসিডেণ্ট জোমো কেনিয়াট্টা একজন শক্তিশালী শাসক। আফ্রিকার বহু দেশের উপর এ'র প্রভাব বিদ্যমান।

কেনিযার আয়তন ৫,৮২,৬০০ বর্গ কিলোমিটার (২,২৪,৯৬০ বর্গমাইল) এবং জনসংখ্যা ৮৬,৭৬,০০০ (১৯৬৮ খ্রীঃ)। রাজধানী নাইরোবি।

বটসোয়ানা

বটসোয়ানা দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার একটি রাষ্ট্র। পূর্বের ব্রিটিশের অধীন বেচুয়ানাল্যাণ্ড আশ্রিত রাজ্য ১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর বটসোয়ানা প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র নামে স্বাধীনতা লাভ করে।

বটসোয়ানার প্রেসিডেণ্ট সার সেরেৎসি খামা।

বটসোয়ানার আয়তন ৫,৭৫,০০০ বর্গ কিলোমিটার (২,২২,০০০ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ৫,৪৮,০০০ (১৯৬৫ খ্রীঃ)। রাজধানী গ্যাবেরোনস।

লেসথো

লেসথো দক্ষিণ আফ্রিকার একটি দেশ। বাসুতোল্যাণ্ড নামে যে দেশটি ব্রিটিশের শাসনাধীন ছিল, তাহাই ১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর লেসথো নামে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

লেসথোর রাজা দ্বিতীয় মশয়েশু। প্রধানমন্ত্রী লিয়াবুয়া জোনাথন।

লেসথোর আয়তন ৩০,৩৫০ বর্গ কিলোমিটার (১১,৭২০ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ৭,৩৩,০০০ (১৯৬৫ খ্রীঃ)। রাজধানী মাসেরু।

জাম্বিয়া

জাম্বিয়া মধ্য আফ্রিকার একটি দেশ। এর সীমারেখায় কঙ্গো, অ্যাঙ্গোলা, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা, রোডেসিয়া ও বটসোয়ানা অবস্থিত। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই আগস্ট উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম রোডেসিয়ার দুইটি প্রদেশ উত্তর রোডেসিয়া নাম গ্রহণ করে। পরে এই উত্তর রোডেসিয়া ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর জাম্বিয়া নামে এক স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

জাম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট ডাঃ কেনেথ ডেভিড কয়াণ্ডা।

এর আয়তন ৭,৫২,২৬২ বর্গ কিলোমিটার (২,৯০,৫৮৬ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ৩৫,০০,০০০ (১৯৬৪ খ্রীঃ)। রাজধানী লুসাকা।

গাম্বিয়া

গাম্বিয়া পশ্চিম আফ্রিকার একটি দেশ। গাম্বিয়া ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি স্বাধীন হয়। নভেম্বর মাসে গাম্বিয়া প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হবে কিনা সেজন্য ভোট নেওয়া হয়। ভোটের ফল অনুযায়ী গাম্বিয়া প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে না।

এর গভর্নর-জেনারেল অল-হাজি সার ফ্যারিম্যাং এম. সিঙ্গাতে। প্রধানমন্ত্রী সার ডি. কে. জাওয়ারা।

গাম্বিয়ার আয়তন ৯,২২৫ বর্গ কিলোমিটার (৩,৯৪৮ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ৩,১৫,৯৯৯ (১৯৬৪ খ্রীঃ)। রাজধানী বার্থার্স্ট।

মরিসাস

মরিসাস মালাগাসির ৫০০ মাইল পূর্বে ভারত মহাসাগরে অবস্থিত একটি দ্বীপরাজ্য। মরিসাস বিভিন্ন সময়ে ওলন্দাজ, ফরাসী ও ব্রিটিশ শাসনাধীনে থাকে। শেষে ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ স্বাধীন হয়।

এর গভর্নর-জেনারেল সার জন শ রেনি। প্রধানমন্ত্রী সার শিউসাগর রামগুলাম।

এর আয়তন ১৮৬৫ বর্গ কিলোমিটার (৭২০ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ৭,৬৮,৬৯২ (১৯৬৬ খ্রীঃ)। তন্মধ্যে ৪ লক্ষের অধিক হিন্দু। রাজধানী পোর্টলুইস।

সোয়াজিল্যাণ্ড

সোয়াজিল্যাণ্ড ট্রান্সভালের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত একটি দেশ। ইহা পূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকার আশ্রিত রাজ্য ছিল। ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর সোয়াজিল্যাণ্ড স্বাধীনতা লাভ করে।

সোয়াজিল্যাণ্ডের রাজা দ্বিতীয় সোভুজা। প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স মাখোসিনি ড্লামিনি।

এর আয়তন ১৭,৪০০ বর্গ কিলোমিটার (৬৭০৫ বর্গমাইল) এবং লোক-সংখ্যা ৩,৮৯,৪৯২ (১৯৬৬ খ্রীঃ)। লোকসংখ্যা ১,৯০,০২৭ জন পুরুষ এবং ১,৯৯,৪৬৫ জন নারী। রাজধানী স্যাবেন।

গ্যাবন

গ্যাবন আফ্রিকার একটি দেশ। দেশটি ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই আগস্ট স্বাধীন হয় এবং ২০শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সদস্য তালিকাভুক্ত হয়।

গ্যাবনের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী বার্নাড আলবার্ট বঙ্গো।

এর আয়তন ২,৬৭,০০০ বর্গ কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা ৪,৫৮,০০০ (১৯৬৫ খ্রীঃ)। রাজধানী লাইবারভিল।

সেনিগাল

সেনিগাল গাম্বিয়া নদীর উত্তরে অবস্থিত পশ্চিম আফ্রিকার একটি দেশ। দেশটি পূর্বে ফরাসীদের শাসনাধীন ছিল। ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দের ২০শে আগস্ট স্বাধীন হয় এবং ২৯শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সদস্য হয়।

এর প্রেসিডেন্ট লিওপোল্ড সিডার সেংঘর।

সেনিগালের আয়তন ১,৯৭,১৬১ বর্গ কিলোমিটার ও লোকসংখ্যা ৩৪,০০,০০০ (১৯৬৫ খ্রীঃ)। রাজধানী ডাকার।

মাউরিটানিয়া

মাউরিটানিয়া পশ্চিম আফ্রিকার একটি দেশ। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এ দেশ ফ্রান্সের আশ্রিত রাজ্য ছিল। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে নভেম্বর দেশটি স্বাধীনতা লাভ করে।

মাউরিটানিয়ার প্রেসিডেণ্ট ও প্রধানমন্ত্রী মোকতার দাদা।

এর আয়তন ১০,৮৫,৮০৫ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ৭,২৭,০০০ (১৯৬৫ খ্রীঃ)। রাজধানী নৌয়াকচট।

নাইজার

নাইজার পশ্চিম আফ্রিকার একটি দেশ। দেশটি ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা আগস্ট নাইজার স্বাধীন হয় এবং ২০শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সদস্য হয়।

নাইজারের প্রেসিডেণ্ট হামানি দিয়রি।

এর আয়তন ১১,৮৮,৭৯৪ বর্গ কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা ৩৩,৩০,০০০। রাজধানী নিয়ামে।

টোগো

টোগো পশ্চিম আফ্রিকার পূর্বতন ব্রিটিশ ফরাসী-শাসিত দেশ। তার আগে ১৮৯৪ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত দেশটি জার্মানীর শাসনাধীন ছিল। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল দেশটি স্বাধীন হয়।

টোগোর প্রেসিডেণ্ট কর্নেল ইয়াডেমা।

এর আয়তন ৫৬০০০ বর্গ কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা ১৬,৫০,০০০ (১৯৬৫ খ্রীঃ)। রাজধানী লোমে।

মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র

এক সময়ে এই দেশটি ফরাসী শাসনাধীন ছিল। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই আগস্ট স্বাধীনতা লাভ করে এবং ২০শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সভ্য হয়।

মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট জেনারেল জীন বেদেল বোকাসা।

এর আয়তন ৬,২৪,৯৩০ বর্গ কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা ১৪,৬৬,০০০ (১৯৬৭ খ্রীঃ)। রাজধানী বাঙ্গুই।

এশিয়ার কয়েকটি দেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

নেপাল

নেপাল ভারতের উত্তরে অবস্থিত একটি স্বাধীন হিন্দুরাষ্ট্র। নেপালেই পৃথিবীর সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ এভারেস্ট অবস্থিত।

নেপালে ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে রাজতন্ত্র বর্তমান। মহারাজাধিরাজ ত্রিভুবন বীর বিক্রম (১৯০৬—১৯৫৫ খ্রীঃ) নির্বাসন থেকে প্রত্যাবর্তন করে প্রধানমন্ত্রীর শাসনপ্রথা বাতিল করেন। এর আগে রানা বংশীয় প্রধানমন্ত্রীরাই প্রকৃতপক্ষে দেশ শাসন করতেন। তাঁরা ১৮৪৮ থেকে ১৯৫১ খ্রীঃ পর্যন্ত তাঁদের শাসন ব্যবস্থা চালু রাখেন। রাজারা তাঁদের কাছে একরূপ শক্তিহীনভাবে অবস্থান করতেন।

রাজা ত্রিভুবন ৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫১ খ্রীঃ দেশে এক জনপ্রিয় শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মহেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ দেব (জন্ম ১৯২০ খ্রীঃ) রাজা হন। তিনি ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সময়েই প্রথম পার্লামেণ্টারী প্রথা চালু হয়।

১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দে এক নির্বাচন হয়। তাতে নেপালী কংগ্রেস জয়যুক্ত হয়। নেপালীরা যোদ্ধার জাতি। তারা পৃথিবীর সর্বত্রই যুদ্ধে অমিতবিক্রম দেখিয়েছে।

নেপাল বহুভাবে ভারতের সঙ্গে জড়িত। চীনারা তিব্বত অধিকারের পর বার বার নেপাল সীমান্ত অতিক্রম করেছে। চীনের এই অযৌক্তিক আচরণের বিরুদ্ধে নেপাল বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে।

নেপালের আয়তন ১,৪১,৪০০ বর্গ কিলোমিটার (৫৪,৬০০ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ৯৫,০০,০০০ (১৯৬৪ খ্রীঃ)। রাজধানী কাটমাণ্ডু।

সিংহল (শ্রীলঙ্কা)

সিংহল বৈদিক যুগ থেকে বরাবরই ভারতেরই অংশ ছিল। রামায়ণের যুগে রাবণ এখানেই রাজত্ব করতেন।

ইতিহাসে দেখা যায়, ৫৬৩ খ্রীঃ পূর্বাব্দে গাঙ্গেয় উপত্যকা থেকে একদল লোক গিয়ে এখানে উপনিবেশ স্থাপন করে। বর্তমান কালের সিংহলীরা

তাদেরই বংশধর। তারাই সিংহলের জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ। দক্ষিণ ভারত থেকে যে-সব তামিলরা সেখানে গিয়ে বসবাস করতে থাকে তাদের বংশধরেরা জনসংখ্যার এক-দশমাংশ।

পোর্তুগিজরা ১৫০৫ খ্রীস্টাব্দে এবং ওলন্দাজরা ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দে সিংহলের একাংশ অধিকার করে। পরে ইংরেজরা এর উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করে এবং ১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দে একে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির সঙ্গে সংযুক্ত করে।

১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি সিংহল পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করে এবং ভারতের অংশ হলেও সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃত হয়। ১৯৫৬ খ্রীঃ সিংহল সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তবে কমনওয়েলথের মধ্যেই থাকতে চায়।

সলোমন ডব্লিউ আর ডি বন্দরনায়েক ১৯৫৬ খ্রীঃ ১২ই এপ্রিল সার জন কোটেলওয়ালাকে পরাজিত করে প্রধানমন্ত্রী হন।

১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে সিংহলী ভাষাকে জাতীয় ভাষা হিসাবে গণ্য করা হয়, তামিল ভাষা বাতিল হয়। তার ফলে ১৯৫৮ খ্রীঃ ভয়াবহ দাঙ্গা, ধর্মঘট প্রভৃতি হয়।

প্রধানমন্ত্রী বন্দরনায়েক ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর নিহত হন। তাঁর স্থলে বিজয়ানন্দ দহনায়েক প্রধানমন্ত্রী হন। পরে ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দের নির্বাচনে ডি, সেনানায়েক প্রধানমন্ত্রী হন।

গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে অনাস্থাপ্রস্তাব গৃহীত হলে পুনরায় নির্বাচন হয়। তাতে বন্দরনায়েকের বিধবা পত্নী শিরিমা বন্দরনায়েক প্রধানমন্ত্রী হন। তিনিই বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী। বর্তমানে ডাডলে সেনানায়েক প্রধানমন্ত্রী।

এখানে প্রায় ষাট লক্ষ বৌদ্ধ ও পঁচিশ লক্ষ হিন্দু বাস করেন। এর আয়তন ৬৫,৬১০ বর্গ কিলোমিটার (২৫,৩৩২ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ১,০৫,৯০,০৬০ (১৯৬৩ খ্রীঃ)। রাজধানী কলম্বো।

আফগানিস্তান

প্রাচীন যুগে আফগানিস্তান ভারতেরই অংশ ছিল। সে-সময়ে হিন্দু রাজারা এখানে রাজত্ব করতেন। তারপর এখানে বৌদ্ধ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে নানাস্থানে শিবের মন্দির ও বৌদ্ধ মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়।

আধুনিক কালে আফগানিস্তান একটি মুসলমান রাজ্য।

মহম্মদ নাদির শাহ্ নিহত হলে তাঁর পুত্র মহম্মদ জাহির শাহ্ (জন্ম ১৫ই

অক্টোবর, ১৯১৪ খ্রীঃ) ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের ৮ই নভেম্বর রাজা হন। প্রধানমন্ত্রী হন নূর আহমদ ইতেসাদি।

আফগানিস্তান ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে রাষ্ট্রসংঘের সভ্য হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়ার কাছ থেকে আফগানিস্তান নানাভাবে সাহায্য গ্রহণ করেছে।

এর আয়তন ৬,৫৭,৫০০ বর্গ কিলোমিটার (২,৫০,০০০ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ১,৩৮,০০,০০০ (১৯৫৯ খ্রীঃ)। রাজধানী কাবুল।

মঙ্গোলিয়া

এক সময়ে বহির্মঙ্গোলিয়া চীনের অধীন ছিল। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই মার্চ ইহা প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা করে। বোগদো গেগেন খান ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজা থাকেন। ঐ বৎসর তাঁর মৃত্যু হলে ইহা মঙ্গোলিয়া প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

মঙ্গোলিয়া ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের ২০শে অক্টোবর গণভোটের সাহায্যে চীনের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে।

মঙ্গোলিয়া কম্যুনিস্ট প্রভাবাধীন রাষ্ট্র। ইউ ৎসেদেনবল প্রধানমন্ত্রী।

এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী বৌদ্ধ। এর আয়তন ১৫,৬৫,০০০ বর্গ কিলোমিটার (৬,০৪,০৯৫ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ১১,২০,০০০ (১৯৬৬ খ্রীঃ)। রাজধানী উলান বেতর।

লেবানন

লেবানন এক সময়ে তুর্ক সাম্রাজ্যের একাংশ ছিল। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর ইহা সিরিয়ার সহিত সংযুক্ত হয় এবং ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ফ্রান্সের আশ্রিত রাজ্য হিসাবে থাকে। ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্স সিরিয়া ও লেবাননের উপরকার কর্তৃত্ব তুলে নেয়। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে ফরাসী সৈন্য অপসারিত হয়।

লেবাননে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের আদবকায়দায় শাসনকার্য চলতে থাকে। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে এক অন্তর্বিদ্রোহ দেখা দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লেবাননের সভাপতি চামুনের আহ্বানে নৌবাহিনী পাঠিয়ে দেয়। ব্রিটেন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই কার্যে পূর্ণ সমর্থন জানায়। এর ফলে বিদ্রোহ প্রশমিত হয়। অক্টোবর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনী সরিয়ে নেয়।

লেবানন রাষ্ট্রসংঘ এবং আরব লীগের সদস্য।

জেনারেল ফুয়াদ চেহাব ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই প্রেসিডেণ্ট হন। চার্লস হেলো ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেণ্ট হন। প্রধানমন্ত্রী ডাঃ আবদুল্লা ইয়্যাফি।

এখানকার অধিবাসীদের অর্ধেক খ্রীষ্টান এবং বাকী অর্ধাংশের প্রায় সবই মুসলমান। এর আয়তন ১০,৪০০ বর্গ কিলোমিটার (৩,৪০০ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ১৭,৫০,০০০ (১৯৬৩ খ্রীঃ)। রাজধানী বেইরুট।

জর্ডন

ষোড়শ শতাব্দী থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত জর্ডন অটোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা স্বাধীন হয়। আমীর আবদুল্লা রাজা হন। তিনি ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুলাই নিহত হন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রথম তালাল ৫ই সেপ্টেম্বর রাজা হন। পার্লামেণ্ট চিকিৎসকের নির্দেশমত তাঁকে অপসারিত করে তাঁর পুত্র প্রথম হোসেনকে (জন্ম ১৪ই নভেম্বর, ১৯৩৫ খ্রীঃ) ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মে সিংহাসনে বসায়।

পুরাতন জেরুজালেম নগরী জর্ডনের নিয়ন্ত্রণাধীন।

জর্ডন ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হয়।

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে নাসেরপন্থী ও কম্যুনিস্ট দল হোসেনকে বিব্রত করে তোলে। ১৪ই জুলাই ইরাক বিদ্রোহে রাজা ফৈজল নিহত হলে রাজা হোসেন গ্রেট ব্রিটেনের কাছে সাহায্য চান। ব্রিটিশ প্যারাসুট সৈন্যদল ১৭ই জুলাই জর্ডনে অবতরণ করে।

হোসেন ইরাকের সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে। বাজাত তালহুনি প্রধানমন্ত্রী।

এখানকার অধিবাসীদের অধিকাংশ মুসলমান। এর আয়তন ৯৭,৭৪০ বর্গ কিলোমিটার (৩৭,৭৩০ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ২১,০০,৮০১ (১৯৬৬ খ্রীঃ)। রাজধানী আম্মান, জেরুজালেম।

ইরাক

টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যে অবস্থিত এই দেশের প্রাচীন নাম মেসোপোটেমিয়া। বাসরা, বাগদাদ ও মোসল এখানেই অবস্থিত।

প্রাচীন শহর ইরিদু, উর, নিনেভে ও ব্যাবিলন এখানে অবস্থিত ছিল। এখান থেকে সুমেরীয় সভ্যতা ৩০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ক্রীট, মিশর ও গ্রীসকে অনেকাংশে প্রভাবিত করেছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মেসোপোটেমিয়াকে (বর্তমানে ইরাক) তুরস্কের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ব্রিটেনকে দেওয়া হয়। ১৯৩২ খ্রীন্টাব্দ পর্যন্ত ইহা ব্রিটেনের আশ্রিত রাজ্যরূপে থাকে। তারপর ইহা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে গণ্য হয় এবং রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হয়।

১৯২১ খ্রীন্টাব্দে হেজাজের রাজা ফৈজল ইরাকের রাজা হন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র গাজি ইবন ফৈজল সিংহাসনে বসেন। তিনি ১৯৩৯ খ্রীন্টাব্দে মোটর দুর্ঘটনায় নিহত হলে তাঁর পুত্র দ্বিতীয় ফৈজল (২রা মে, ১৯৩৫ খ্রীঃ) রাজা হন।

১৯৫৮ খ্রীন্টাব্দের ১৪ই জুলাই রাজা দ্বিতীয় ফৈজল নিহত হন। জেনারেল আবদুল করিম ক্ষমতা অধিকার করেন। ইরাক পশ্চিমী শক্তিসমূহের বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হলেও ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েটের কাছ থেকে অস্ত্র সাহায্য গ্রহণ করে।

কর্নেল আবদেল সালাম আরিফের মৃত্যুর পর লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল আবদুল রহমান মহম্মদ আরিফ প্রেসিডেণ্ট হন। প্রধানমন্ত্রী তাহির ইয়াহিয়া।

এখানকার অধিবাসীদের অধিকাংশই মুসলমান। এর আয়তন ৪,৩৮,৪৪৬ বর্গ কিলোমিটার (১,৬৯,২৪০ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ৮২,৬১,৫২৭ (১৯৬৫ খ্রীঃ)। রাজধানী বাগদাদ।

ফিলিপাইনস

ফিলিপাইনস অনেকগুলি ছোট বড় দ্বীপের সমষ্টি। ১৫২১ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তুগিজ নাবিক ম্যাগেলান ফিলিপাইনে অবতরণ করেন। ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহা স্পেন কর্তৃক অধিকৃত হয়।

স্পেনীয় আমেরিকান যুদ্ধের পর প্যারিসে এক চুক্তি হয় (১০ই ডিসেম্বর,

১৮৯৮ খ্রীঃ)। সেই চুক্তি অনুযায়ী ফিলিপাইনস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকারে আসে।

১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর জাপান ফিলিপাইনস আক্রমণ করে এবং ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে ইহা অধিকার করে। জেনারেল ম্যাকআর্থারের বাহিনী পরাজিত হয়। ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে জাপানকে অধিকারচ্যুত করা হয়।

ফিলিপাইনের প্রেসিডেণ্ট ফার্দিনান্দ ই মার্কস

১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা জুলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফিলিপাইনসকে স্বাধীনতা দান করে।

কার্লস পি গ্রেসিয়া ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দের ১২ই নভেম্বর ফিলিপাইনস প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট হন। পরে ডি ম্যাকাপাগল (জন্ম ১৯১০ খ্রীঃ) এর প্রেসিডেণ্ট (১৯৬৩ খ্রীঃ) হন। বর্তমানে প্রেসিডেণ্ট ফার্দিনান্দ ই মার্কস।

এখানকার অধিবাসীদের অধিকাংশ খ্রীষ্টান। এর আয়তন ২,৯৯,৪০০ বর্গ কিলোমিটার (১,১৫,৬০০ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ২,৯৬,৯৮,০০০ (১৯৬২ খ্রীঃ)। রাজধানী কুইজন সিটি।

অস্ট্রেলিয়া

অস্ট্রেলিয়া এক মহাদেশতুল্য সুবৃহৎ দ্বীপ। ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজরা এখানে উপনিবেশ স্থাপন করে। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি ইহা ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ভাইকাউন্ট ডি লাইস্‌ল্‌ ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর

গভর্নর জেনারেল লর্ড কেসি

অস্ট্রেলিয়ার গভর্নর জেনারেল হন। লর্ড কেসি ১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দে গভর্নর জেনারেল হন। রবার্ট জি. মেঞ্জিস ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দে ১১ই নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী হন। বর্তমানে জন গর্টন প্রধানমন্ত্রী।

এখানকার অধিবাসীদের অধিকাংশ খ্রীস্টান। এর আয়তন ৭৬,৮৬,৯০০ বর্গ কিলোমিটার (২৯,৬৭,৯০৯ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ১,১৭,৫০,৮৩৮ (১৯৬৭ খ্রীঃ)। রাজধানী ক্যানবেরা।

প্রধান মন্ত্রী জন গর্টন

নিউজীল্যাণ্ড

১৬৪২ খ্রীন্টাব্দে আবেল টাসম্যান নামে একজন ওলন্দাজ নাবিক নিউ জীল্যাণ্ড আবিষ্কার করেন এবং ইহার সমুদ্রোপকূল ১৭৬৯—৭০ খ্রীন্টাব্দে ক্যাপ্টেন জেমস্ কুক কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়।

১৮৪০ খ্রীন্টাব্দে ইংরেজরা এখানে উপনিবেশ স্থাপন করতে আরম্ভ করে। ১৯০৭ খ্রীন্টাব্দে ইহা ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত হয়।

বহু শতাব্দী পূর্বে মাওরি জাতির লোকেরা এখানে বসবাস করতে থাকে। এরা খুব বুদ্ধিমান্। ইংরেজরা ছলে বলে এদের ক্ষমতাচ্যুত করে দেশের কর্তৃত্ব অধিকার করে। সহস্র সহস্র মাওরি নিহত হয়। ১৯৫৮ খ্রীন্টাব্দের হিসাবে দেখা যায়, এখানে ১,৫১,১৩৭ জন মাওরির বাস।

নিউজীল্যাণ্ডে ইন্দিরা গান্ধী বামদিক্ হইতে—প্রধানমন্ত্রী হোলিওক, মিসেস হোলিওক, ইন্দিরা গান্ধী, নিউজীল্যাণ্ডের গভর্নর জেনারেলের পত্নী লেডি পোরিট, সার পোরিট।

১৯৬২ খ্রীন্টাব্দে সার বার্নার্ড ফার্গুসন নিউজীল্যাণ্ডের গভর্নর জেনারেল হন। ১৯৬৭ খ্রীন্টাব্দে গভর্নর জেনারেল হন সার আর্থার পোরিট। প্রধানমন্ত্রী কে. জে. হোলিওক।

এখানকার অধিবাসীদের অধিকাংশই খ্রীন্টান। এর আয়তন ১,০৩,৭৩৬ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ২৬,৭৬,৯১৯ (১৯৬৬ খ্রীঃ)

ইয়েমেন

ইয়েমেন আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে অবস্থিত একটি দেশ। পূর্বকালে ইহা সেবা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইমাম আহ্‌মেদ ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই দেশ শাসন করেন। ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর তিনি নিহত হন। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবদুল্লা অল সালাল একে গণতন্ত্রী রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করেন। ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দে লেফটেন্যাণ্ট-জেনারেল হাসান অল-আমরি প্রধানমন্ত্রী হন।

এর রাজধানী সানা। আয়তন ১,৯৫,০০০ বর্গ কিলোমিটার (৭৫,০০০ বর্গ-মাইল), লোকসংখ্যা ৫০,০০,০০০ (১৯৫৮ খ্রীঃ)।

দক্ষিণ ইয়েমেন

১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট থেকে অক্টোবরের মধ্যে দক্ষিণ আরব ফেডারেশনের ১৭টি সুলতানী রাজ্যের বিরুদ্ধে ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রণ্ট যুদ্ধ ঘোষণা করে। সুলতানগণ শাসনকর্তৃত্ব ত্যাগ করেন বা পলায়ন করেন। ২৯শে নভেম্বর ব্রিটিশ সৈন্য এডেন ত্যাগ করে। ৩০শে নভেম্বর দক্ষিণ ইয়েমেন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র গঠিত হয়।

এর প্রেসিডেণ্ট কোয়াতান মহম্মদ অল-শাবি।

এর আয়তন ১,৬০,৩০০ বর্গ কিলোমিটার (৬১,৮৯০ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ১৫ লক্ষ। রাজধানী মদিনেত অল-শাব। প্রধান শহর এডেন।

প্রায় চারশ বছর আগে, উত্তর-আমেরিকার উর্বরা ভূমি এবং অফুরন্ত খনিজ সম্পদের সন্ধান পেয়ে **ইংরেজ** এবং **ওলন্দাজরা** আটলান্টিক মহাসমুদ্র পার হয়ে সেখানে গিয়ে বসবাস করতে আরম্ভ করে। আমেরিকার জমিতে ধান, তামাক, গম, তুলা, ভুট্টা প্রভৃতি ফসল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, আর তার খনিতে যে কয়লা, লোহা, পেট্রল প্রভৃতি পাওয়া যায়, তার শেষ নেই। এই বিশাল দেশে গিয়ে ইংরেজ এবং ওলন্দাজরা এক একজনে অনেকখানি করে জমি নিয়ে বাস করতে লাগল।

১৬২০ খ্রীস্টাব্দে, ইংলণ্ডে **ধর্মব্যাপারে সংঘর্ষের জন্যে,** একদল ইংরেজ পিউরিটান বা গোঁড়া-প্রোটেস্টান্ট তীর্থযাত্রী, "মে ফ্লাওয়ার" জাহাজে হল্যাণ্ড থেকে প্রথম আমেরিকায় যান। ক্রমে, দলে দলে ইংরেজ আমেরিকায় যাওয়ায় তাদের সংখ্যাই সেখানে সবচেয়ে বেশী বেড়ে গেল। ইংরেজরা ধীরে ধীরে উত্তর-আমেরিকার আটলান্টিকের উপকূলে দশটি আলাদা **উপনিবেশ** স্থাপন করে নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাতে লাগল। **ওলন্দাজদের** ছিল তিনটি উপনিবেশ, সেই তিনটির উপর ইংরেজদের নজর পড়ল। সংখ্যায় অল্প ওলন্দাজদের কাছ থেকে অনায়াসে তারা সেই তিনটি উপনিবেশ কেড়ে নিয়ে, **তেরোটি উপনিবেশই** নিজেদের করে নিল। এই উপনিবেশগুলোই পরে,

আমেরিকার **যুক্তরাষ্ট্রে** পরিণত হয়েছে, আমেরিকা বলতে সাধারণতঃ এই যুক্তরাষ্ট্রকেই বোঝায়।

আমেরিকায় যে সব ইংরেজ এবং অন্যান্য জাতির লোক এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, তাদের নাম হয়েছে **আমেরিকান।** তারা এখন আর নিজেদের ইংরেজ, ফরাসী বা ওলন্দাজ প্রভৃতি বলে পরিচয় দেয় না, আমেরিকান নামে একটা আলাদা জাতিই গড়ে উঠেছে।

"মে ফ্লাওয়ার" জাহাজ

উপনিবেশের লোকেরা বেশির ভাগ ইংরেজ ছিল বলে তারা ইংলণ্ডের রাজাকেই নিজেদের রাজা বলে স্বীকার করত। পার্লামেণ্টের তৈরী আইন-কানুন মোটামুটি ভাবে মেনে চলতে তাদের কোন আপত্তি ছিল না। প্রত্যেক উপনিবেশে একজন করে গবর্নর এবং গবর্নরকে পরামর্শ দেবার জন্যে একটা করে মন্ত্রণা-পরিষদ থাকত। উপনিবেশের সাধারণ আইন তৈরির জন্যে, সাধারণ লোকদের নির্বাচিত একটা ছোটখাটো পার্লামেণ্ট থাকত। গবর্নর এবং তাঁর মন্ত্রণা-পরিষদের সভ্যপদের লোক নিযুক্ত করবার ক্ষমতা কিন্তু আমেরিকানদের ছিল না, ইংলণ্ডের রাজা তাঁদের নিযুক্ত করতেন।

বিরোধের সূত্রপাত

এইভাবে বেশ দিন কাটছিল। অসুবিধার মধ্যে শুধু **রেড ইণ্ডিয়ান** নামক আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা মাঝে মাঝে এসে হানা দিয়ে উপদ্রব করত। ইংলণ্ডের যুদ্ধ-জাহাজ এদের উৎপাত থেকে রক্ষা করে আমেরিকার ঔপনিবেশিকদের অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্য করতে সাহায্য করত বলে ইংলণ্ড এক

দাবি তুলল যে, আমেরিকা তার সঙ্গে ছাড়া আর কোন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করতে পারবে না। **ক্রমওয়েলের শাসনকালে** ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে, ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এই ধরনের একটা আইনও পাস হয়। এই আইনকে বলে **'নেভিগেশন আইন'।**

'নেভিগেশন' শব্দের মানে হচ্ছে, সমুদ্রে যাতায়াত ; সুতরাং 'নেভিগেশন আইনে'র মানে, সমুদ্রে যাতায়াত-বিষয়ক আইন। এই আইনটা পাস হবার পর অবস্থাটা এই দাঁড়াল যে, আমেরিকা ইংলণ্ড ছাড়া আর কোন দেশ থেকে কোন জিনিস আমদানি করতে পারবে না, ইংলণ্ড ছাড়া অন্য কোথাও তার নিজের দেশের জিনিস রপ্তানি করাও চলবে না। উপনিবেশের ইংরেজরা এই সব ব্যাপারে দেশের ইংরেজদের উপর **অসন্তুষ্ট** হয়ে উঠতে লাগল।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরে **কানাডা** নামে একটি দেশ আছে। এই দেশটিরও প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল প্রচুর, তাই দেখে ফরাসীরা এখানে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল।

ইংলণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের তখন ভীষণ শত্রুতা চলেছে। আমেরিকানরাও মনে মনে ইংরেজদের উপর অসন্তুষ্টই ছিল, কিন্তু তবুও প্রকাশ্যে তাদের ঘাঁটাতে সাহস করত না এই ভয়ে যে, ইংরেজের সঙ্গে যদি তারা সম্পর্ক ছিন্ন করে, তা হলে কোনদিন হয়ত কানাডা থেকে ফরাসীরা এসে জোর করে তাদের উপনিবেশ দখল করে নেবে। ইংরেজরাই আমেরিকানদের এই সমস্যার সমাধান করে দিল। তারা অষ্টাদশ শতাব্দীতে 'সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে' ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ করে **কানাডা কেড়ে নিল।** আমেরিকানদের মনে যে ভয়টুকু ছিল, সেটাও দূর হয়ে গেল। তারা বুঝল যে, ইংলণ্ডের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলে এবার কানাডা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

স্ট্যাম্প আইন

এই সময় ইংলণ্ডের যিনি প্রধানমন্ত্রী, তাঁর নাম ছিল **জর্জ গ্রেনভিল।** তিনি হিসাব করে দেখলেন যে, রেড ইণ্ডিয়ানদের উৎপাত থেকে আমেরিকানদের রক্ষা করার জন্যে ইংলণ্ডের অনেক টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে, অথচ আমেরিকানরা এই টাকা দিতেও চায় না। তিনি তখন নির্দেশ দিলেন যে, ইংলণ্ডের ৭৫০০ সৈন্য আমেরিকায় এবং ২৫০০ সৈন্য

তার কাছেই, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ নামক দ্বীপে মোতায়েন থাকবে। তাদের কাজ হবে বাইরের শত্রুর উপদ্রব থেকে আমেরিকানদের রক্ষা করা। কাজেই তিনি বললেন যে, **ব্রিটিশ সৈন্যদের কিছু খরচ** আমেরিকানদেরই দেওয়া উচিত।

এই উদ্দেশ্যে তিনি ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে, এই বলে একটা আইন পাস করালেন যে, এই সৈন্যদের খরচ বাবদ আমেরিকা বছরে এক লক্ষ পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রায় দেড় কোটি টাকা দেবে। এই আইনের নাম **'স্ট্যাম্প আইন'**; কারণ, আমেরিকার লোকেরা যে সব দলিল সম্পাদন করবে, তার উপর স্ট্যাম্প বসিয়ে এই টাকা আদায় করা হবে।

কোন লোক যদি অপরের কাছ থেকে জমিজমা অথবা বাড়ি-ঘর কেনে, কিংবা যদি কাউকে টাকা ধার দেয়, তা হলে সে টাকা দেবার সময় একটা লেখাপড়া করে নেয়। যে কাগজে এই লেখাপড়া করা হয় তাকে বলে দলিল, আর এই লেখাপড়া করাকে বলে দলিল সম্পাদন করা। আমাদের দেশে আইন আছে যে, এই রকম সব দলিলে সরকারের কাছ থেকে স্ট্যাম্প কিনে সেটা এঁটে দিতে হবে। গ্রেনভিল আমেরিকার জন্যে যে আইন পাস করিয়েছিলেন, সেটা ঠিক এই জিনিসই।

স্ট্যাম্প আইন পাস হবার পর আমেরিকানরা গেল ভীষণ চটে। অধিকাংশ আমেরিকান জাতিতে ইংরেজ, তাদের মধ্যে গণ-অধিকারবোধ খুব প্রখর ছিল। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে আমেরিকানদের কোন প্রতিনিধি ছিল না, অতএব সে পার্লামেণ্ট কি করে আমেরিকানদের উপর ট্যাক্স বসাতে পারে, এই নিয়ে **জোর আন্দোলন** আরম্ভ হয়ে গেল। গ্রেনভিল সে ধাক্কা সামলাতে পারলেন না, এক বছরের মধ্যেই তিনি প্রধানমন্ত্রিত্ব ছাড়তে বাধ্য হলেন। তাঁর পরে প্রধানমন্ত্রী হলেন **লর্ড রকিংহাম।**

ইংলণ্ডে তখন **এডমাণ্ড বার্ক** নামে একজন বিখ্যাত উদারনৈতিক নেতা এবং বাগ্মী ছিলেন। তিনি নতুন প্রধানমন্ত্রী লর্ড রকিংহামকে বুঝালেন যে, আমেরিকানদের শান্ত করা একান্ত দরকার। রকিংহাম তাঁর কথা শুনে স্ট্যাম্প আইন তুলে দিলেন; কিন্তু এই সঙ্গে তিনি আর একটা আইন পাস করে আমেরিকানদের জানিয়ে দিলেন যে, আমেরিকার জন্যে আইন তৈরি করবার এবং ট্যাক্স বসাবার **অধিকার** ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের আছে। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট আমেরিকার জন্যে কেন সবরকম আইন তৈরি করবে এবং ট্যাক্স বসাবে, এই ধরনের প্রতিবাদ আমেরিকানরা তুলেছিল বলেই রকিংহাম ঐ আইন পাস করালেন।

১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে, বড় পিটের মন্ত্রিসভার রাজস্ব-সচিব **টাউনসেণ্ড,** উপনিবেশে চা, কাচ এবং কাগজের **আমদানির উপর শুল্ক** বসালেন।

স্ট্যাম্প আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

আমেরিকানরা আবার ক্ষেপে উঠল এবং মাসাচুসেট্স নামক উপনিবেশ তীব্র প্রতিবাদ জানাল। কিছুদিন এই নিয়ে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের মধ্যে

বিরোধ চলল। অবশেষে **লর্ড নর্থ** প্রধানমন্ত্রী হয়ে বাণিজ্য-শুল্ক তুলে দিলেন। আমেরিকানদের উপর কর বসাবার অধিকার যে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের আছে, শুধু এই কথাটা আমেরিকানদের স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেবার জন্যে তিনি **চায়ের উপর** একটা নামমাত্র শুল্ক রেখে দিলেন। আমেরিকানরা এটাও সহ্য করল না। এই শুল্ক তুলে দেবার জন্যে তারা একটা সমিতি গঠন করল এবং প্রতিজ্ঞা করল যে, বিলাতী পণ্য তারা কেউ কিনবে না।

আমেরিকানরা ইংলণ্ডের লোকদের জানাল যে, ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে তাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা জানাবার জন্যে কোন প্রতিনিধি যখন নেই, তখন তাদের উপর কর বসাবার অধিকার ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের থাকতে পারে না। ইংলণ্ড তার জবাবে বলল যে, আমেরিকা যখন ইংলণ্ডের অধীন উপনিবেশ, তখন তার জন্যে যে-কোন আইন তৈরি করবার এবং কর বসাবার ক্ষমতা, ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের নিশ্চয়ই আছে। এই তর্ক নিয়ে দুই দেশের **বিরোধ** চরমে উঠল। আমেরিকানরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হল যে, তাদের বাণিজ্য তারা অবাধে চালিয়ে যাবে, ইংলণ্ডের কোন প্রভুত্ব তারা কিছুতেই সহ্য করবে না।

স্বাধীনতা অর্জন

আমেরিকানদের মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আগে থেকেই ছিল। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট অন্যায় ব্যবহার না করলেও হয়ত তারা ক্রমে স্বাধীন হয়ে যেত। যা হক, স্ট্যাম্প আইন প্রভৃতি আইনে তাদের স্বাধীনতা-আন্দোলন উগ্র হয়ে উঠল। শীঘ্রই কয়েকটি অপ্রীতিজনক ঘটনা ঘটল, আর এরূপ একটি ঘটনা থেকেই ইংলণ্ডের সঙ্গে আমেরিকার **যুদ্ধের সূচনা** হয়।

১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে, ঔপনিবেশিকগণ একটি ইংরেজ জাহাজ পুড়িয়ে দিল। ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে কয়েকজন উপনিবেশবাসী, রেড ইণ্ডিয়ানের ছদ্মবেশে, **বোস্টন বন্দরে** কয়েকটি ইংরেজ জাহাজ হতে ৩৪০টি চায়ের বাক্স **সমুদ্রে ফেলে দিল।** ইংলণ্ডের অপরিণামদর্শী রাজা **তৃতীয় জর্জ** ও **লর্ড নর্থ** তখন চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করতে মনস্থ করলেন। বোস্টন বন্দর বন্ধ করে দেওয়া হল এবং ম্যাসাচুসেট্স প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন বাতিল করা হল; কিন্তু দমননীতি, ঔপনিবেশিকদের প্রতিরোধকে আরও প্রবল করে তুলল।

সকলের আগে বিদ্রোহ ঘোষণা করল, **মাসাচুসেট্স** নামক উপনিবেশ। জর্জিয়া নামক একটি উপনিবেশ ছাড়া অবশিষ্ট উপনিবেশগুলি মাসাচুসেট্সকে সমর্থন করল। ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে এই ঘটনা ঘটল। লর্ড নর্থ তখনও ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী। বিদ্রোহ যাতে সমস্ত আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়তে না পারে, সেজন্যে তিনি অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু ফল হল না। আমেরিকানরা একটা কংগ্রেস

ইংরেজ জাহাজ হতে চায়ের বাক্স সমুদ্রে নিক্ষেপ

গড়ে তুলল এবং এই কংগ্রেসের উপর স্বাধীনতা-আন্দোলনের ভার ছেড়ে দেওয়া হল।

পরের বছর লেক্সিংটন নামক একটি বড় শহরে, ব্রিটিশ সৈন্যদের সঙ্গে উপনিবেশের সৈন্যদের একটা ছোটখাটো রকমের **যুদ্ধ** হয়ে গেল। এই ব্যাপারের পর আমেরিকান কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হল এবং **জর্জ ওয়াশিংটন** (১৭৩২—১৭৯৯ খ্রীঃ) নামক একজন নেতার উপর জাতীয় সৈন্যদল গঠনের ভার দেওয়া হল।

জর্জ ওয়াশিংটন ছিলেন **ভার্জিনিয়া** নামক উপনিবেশের এক

জমিদারের ছেলে। তাঁদের নিজেদের জমিতেই প্রচুর তামাক উৎপন্ন হত এবং তাই থেকে তাঁদের যথেষ্ট টাকা আয় হত। ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াশিংটনের জন্ম। ছেলেবেলা থেকেই তিনি অত্যন্ত সত্যবাদী, সাহসী ও কর্মঠ ছিলেন। তাঁর বয়স যখন এগার বছর তখন তাঁর বাবা মারা যান। একুশ বছর বয়সে তিনি যুদ্ধবিদ্যা শিখতে আরম্ভ করেন। ধীরে ধীরে তিনি দেশের রাজনীতিতে যোগ দিতে আরম্ভ করেন এবং দেশের লোকের অশেষ বিশ্বাস অর্জন করেন। জর্জ ওয়াশিংটনের হাতে স্বাধীনতা-যুদ্ধের নেতৃত্ব-ভার তুলে দিয়ে, আমেরিকানরা মনপ্রাণ দিয়ে তাঁর প্রত্যেকটি আদেশ পালন করতে লাগল।

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে, ব্রিটিশ সৈন্যদের সঙ্গে আমেরিকানদের প্রকাশ্য যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে, আমেরিকানরা অপূর্ব বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল এবং প্রত্যেকটি যুদ্ধেই তারা জয়লাভ করল। তবুও আমেরিকানরা বুঝতে পারল যে, বাইরের কোন দেশের সাহায্য না পেলে শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ডের সঙ্গে তারা লড়ে উঠতে পারবে না।

জর্জ ওয়াশিংটন

ফ্রান্সের সঙ্গে ইংলণ্ডের শত্রুতা তখনও চলেছে। কানাডা হারিয়ে ফ্রান্স ইংরেজদের উপর ভীষণ চটে রয়েছে। আমেরিকানরা তাদের সাহায্য চাইতেই তারা রাজী হয়ে গেল, কিন্তু ঐ সঙ্গে তারা দাবি করল যে, তাদের সাহায্য নিতে হলে আমেরিকাকে ইংলণ্ডের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে হবে। আমেরিকানরা এই শর্তে সম্মত হয়ে, ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই **পূর্ণ স্বাধীনতা** ঘোষণা করল।

ইংলণ্ডের তখন বড় দুঃসময়। ইওরোপের প্রায় সব দেশ তখন তার শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফ্রান্স, স্পেন, প্রাসিয়া, রাশিয়া, সুইডেন, ডেনমার্ক, অস্ট্রিয়া, নেপলস্‌, পোর্তুগাল এবং হল্যাণ্ড তখন ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে। এই অবস্থায়

লাফায়েৎ নামক একজন ফরাসীর নেতৃত্বে, ফ্রান্সের একদল স্বেচ্ছাসেবক আমেরিকানদের হয়ে যুদ্ধ করতে গেল।

ইংলণ্ডের জাহাজ যাতে আমেরিকায় এসে ঢুকতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখলেন লাফায়েৎ, আর ভিতরে স্থলযুদ্ধে জর্জ ওয়াশিংটন, ইংরেজ সৈন্যদের নাস্তানাবুদ করে তুললেন। **ইংলণ্ড হেরে গেল**। ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দে **"ভার্সাইয়ের সন্ধি"** দ্বারা এই সংগ্রামের অবসান হল। ইংলণ্ড আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা স্বীকার করল। বর্তমান পৃথিবীতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রের সৃষ্টি হল এই ভাবে।

আমেরিকা তো স্বাধীন হল, কিন্তু তার নতুন শাসনতন্ত্র কি রকম হবে তাই নিয়ে এবারে নিজেদের মধ্যে মন-কষাকষি আরম্ভ হয়ে গেল। তেরটি উপনিবেশ এ সম্বন্ধে একমত হতে পারছিল না। চার বছর ধরে এই গোলযোগ চলল। অবশেষে ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দে, জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে, **ফিলাডেলফিয়া নামক শহরে** আমেরিকার ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনার জন্যে এক সভার অধিবেশন হল। এই সভাতেই আমেরিকার শাসনতন্ত্র রচিত হয়, তেরটি উপনিবেশই তা মেনে নেয়। এই শাসন-সংবিধান রচনায় আমেরিকার যে নেতাগণ অংশগ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। তাঁরা হলেন **বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন** (১৭০৬—১৭৯০ খ্রীঃ), রবার্ট মরিস, জেমস মাডিসন, আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন (১৭৫৭—১৮০৪ খ্রীঃ), জর্জ ওয়াশিংটন প্রভৃতি।

প্রায় পৌনে দুশ বছর হল আমেরিকা এই শাসনতন্ত্র অনুসারেই শাসিত হচ্ছে। তবে তেরটি উপনিবেশের সংখ্যা বেড়ে এখন একান্নটি দাঁড়িয়েছে। উপনিবেশের বদলে এখন তাদের 'স্টেট' বা রাজ্য বলা হয়।

আমেরিকার শাসনতন্ত্র মোটামুটি এই :—দেশে একজন রাষ্ট্রপতি থাকবেন ; দেশের লোকেরা ভোট দিয়ে একটি পরিষদ গঠন করবে ; এই পরিষদ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করবেন। রাষ্ট্রপতি চার বছর পর্যন্ত ঐ পদে বহাল থাকবেন। প্রত্যেক স্টেটে একজন গবর্নর থাকবেন এবং একটি করে আইন-সভা থাকবে। সমস্ত দেশের জন্যে একটা বড় আইন-সভা থাকবে, তার নাম **কংগ্রেস**। এই কংগ্রেসে দুটি ভাগ থাকবে, একটি **সিনেট,** অপরটি **প্রতিনিধি-পরিষদ**। প্রত্যেক স্টেটের আইন-সভা থেকে দুজন করে প্রতিনিধি নিয়ে সিনেট গঠিত হবে, আর প্রতিনিধি-পরিষদে থাকবেন দেশের জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত একদল প্রতিনিধি। রাষ্ট্রপতি তাঁর নিজের ইচ্ছামত মন্ত্রী নিযুক্ত করবেন, তাঁরা

তাঁদের কাজের জন্যে কংগ্রেসের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন না। তবে যুদ্ধ ঘোষণা এবং সন্ধি করতে হলে, রাষ্ট্রপতিকে কংগ্রেসের অনুমতি নিতে

প্রথম রাষ্ট্রপতি জর্জ ওয়াশিংটনের শপথ গ্রহণ

হবে। জর্জ ওয়াশিংটন আমেরিকার **প্রথম রাষ্ট্রপতি** নির্বাচিত হলেন।

আব্রাহাম লিঙ্কন ও দাসপ্রথা-উচ্ছেদ

আমেরিকানরা প্রথমে আটলান্টিক উপকূলের কাছে উপনিবেশ স্থাপিত করেছিল। ক্রমে ঊনবিংশ শতাব্দীতে, তারা দলে দলে আমেরিকার বিস্তৃত পশ্চিম অংশে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে অনেক নতুন রাজ্যের সৃষ্টি হয় এবং সেগুলি যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত হয়।

দাসপ্রথা আমেরিকার ইতিহাসের একটি কলঙ্কময় অধ্যায়। প্রথম অবস্থায় আমেরিকার উপনিবেশগুলিতে ইক্ষু ও তামাকের চাষ হত। এই চাষের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে মজুর না পাওয়াতে ক্রীতদাস নিয়োগের ব্যবস্থা হল। আর আমেরিকানদের এই প্রয়োজন মেটাতে দাস-ব্যবসায়ীরা আফ্রিকা থেকে নিগ্রোদের ধরে এনে তাদের কাছে বিক্রি করতে লাগল।

যা হক, আমেরিকা যত বিস্তৃত হতে থাকে, দাসপ্রথার বিরুদ্ধেও জনমত ততই প্রবল হতে থাকে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের **দক্ষিণ অংশের** কয়েকটি রাজ্যে বিশেষ করে **দাসপ্রথা** বিদ্যমান ছিল। সেখানকার আমেরিকানরা **নিগ্রোদের ক্রীতদাস** করে রাখত এবং চাষ-আবাদের সমস্ত কাজ তাদের দিয়ে করাত। ক্রীতদাসদের তারা ভাল করে খেতে দিত না, কুকুর বিড়ালের মত তাদের সঙ্গে ব্যবহার করা হত। সামান্য খাবার এবং মাথা গোঁজবার একটুখানি জায়গা ছাড়া তাদের আর কিছুই দেওয়া হত না। কথায় কথায় মনিবরা চাবুক দিয়ে তাদের পিঠের ছাল তুলে ফেলত, কেউ পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে তাকে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হত না।

উত্তরাঞ্চল-রাজ্যের অধিবাসীরা এসব পছন্দ করত না, বস্তুতঃ তাদের অংশে কোন লোক ক্রীতদাস রাখত না। দরকার হলে রীতিমত মজুরি দিয়ে, নিগ্রোদের দ্বারা কাজ করিয়ে নিত।

এই দাসপ্রথা নিয়ে, **উত্তর** ও **দক্ষিণদিকের** রাজ্যগুলির মধ্যে মন-কষাকষি শুরু হয়ে গেল। উত্তর দিকের লোকেরা বলল, যে বর্বর-প্রথা মানুষকে পশু করে রাখে, সেটা কোন সভ্য সমাজে থাকা উচিত নয়। দক্ষিণ দিকের লোকেরা প্রতিবাদ করল। তারা দেখল যে দাসপ্রথা খুব সুবিধাজনক। ক্রীতদাস দিয়ে যত কম খরচে বেশী কাজ করিয়ে নেওয়া যায়, স্বাধীন মজুরদের দিয়ে ততখানি করানো সম্ভব নয়। তারা ক্রীতদাস-প্রথা তুলে দিতে ভীষণ আপত্তি করল।

এই মত-বিরোধ ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠল। অবশেষে দক্ষিণ দিকের লোকেরা জানাল যে, তারা উত্তর দিকের অধিবাসীদের থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে, একটা **নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তুলবে।**

আব্রাহাম লিঙ্কন (১৮০৯—১৮৬৫ খ্রীঃ) তখন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি। তিনি দাসপ্রথাকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করতেন। দক্ষিণ দিকের লোকদের তিনি বলে দিলেন যে, আমেরিকান গবর্নমেণ্টের বাইরে গিয়ে আলাদা দেশ গঠন

করা চলবে না। দরকার হলে, তিনি তাদের জোর করে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে রাখতেও কুণ্ঠিত হবেন না।

আব্রাহাম লিঙ্কন অত্যন্ত দৃঢ়-চরিত্র ও সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। গরিবের ঘরে তাঁর জন্ম। তাঁর বাবা ছিলেন কৃষক, ছুতোর-মিস্ত্রীর কাজও মাঝে মাঝে করতেন। ছোটবেলা থেকেই লিঙ্কন খুব বলিষ্ঠ ছিলেন, তিনি সব সময় বাবার কাছে কাছে থেকে তাঁকে সাহায্য করতেন। বড় বড় গাছ কুঠার দিয়ে কেটে ফেলতে তাঁর একটুও কষ্ট হত না। তাঁর বাবা লেখাপড়া একেবারেই জানতেন না, লিঙ্কন কিন্তু নিজে লেখাপড়া শিখলেন। যে-কোন বই পেলেই তিনি সেটি মন দিয়ে পড়তেন।

আব্রাহাম লিঙ্কন

বড় হয়ে লিঙ্কন এক গ্রামে, তাঁর একজন বন্ধুর সঙ্গে বখরায় একটি দোকান খুললেন। দোকানটা বেশী দিন চলল না, উঠে গেল। এতে তাঁর অনেক টাকা দেনা হয়ে গেল। তিনি এত সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন যে, পাওনাদারদের তিনি ফাঁকি দিলেন না। পনের বছর ধরে, নিজে কষ্ট সহ্য করে থেকে সেই দেনা তিনি শোধ করলেন। এরই মধ্যে তিনি আইন পরীক্ষা পাস করে ছোট একটি শহরে ওকালতি আরম্ভ করলেন।

ওকালতি করতে গিয়েও তিনি কিন্তু তাঁর সততা বজায় রেখে চলতেন। যারা অপরকে ঠকাবার জন্যে মিথ্যা মকদ্দমা করত, তিনি কিছুতেই তাদের পক্ষ সমর্থন করতেন না। একবার এক মকদ্দমা হাতে নিয়ে কিছুদিন পর তিনি টের পেলেন যে, তাঁর মক্কেল অন্যায় করছে। তাঁকে সব কথা সে আগে বলে নি, কাজেই আসল ব্যাপারটা তিনি বুঝতে পারেন নি। প্রকৃত ঘটনা জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সে মকদ্দমা ছেড়ে দিলেন। ধীরে ধীরে তাঁর সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তিনি মানুষকে কখনও ঘৃণা করতেন না, তাঁর সঙ্গে কেউ শত্রুতা করলেও

তিনি তাকে ক্ষমা করতেন ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে ৫১ বছর বয়সে তিনি আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

লিঙ্কন যখন দক্ষিণ দিকের লোকদের জানিয়ে দিলেন যে, তাদের আলাদা গবর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করবার অনুমতি তিনি কিছুতেই দেবেন না, তারা তখন যুদ্ধ আরম্ভ করে দিল। চার বছর ধরে (১৮৬১—১৮৬৫ খ্রীঃ) যুদ্ধ চলল। আমেরিকানদের নিজেদের মধ্যে, দুই দলে এই যুদ্ধ হয়েছিল, তাই একে বলে **আমেরিকার গৃহযুদ্ধ।** আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে ভাঙ্গতে দেওয়া হবে না এবং দাসপ্রথা উচ্ছেদ করে ক্রীতদাসদের মুক্তি দিতে হবে,—এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে লিঙ্কন যুদ্ধ চালাতে লাগলেন।

স্বাধীনতার বিজয়-স্তম্ভ

চার বছর যুদ্ধ করবার পরে দক্ষিণ দিকের লোকেরা বুঝল, আব্রাহাম লিঙ্কনকে দমানো চলবে না; তখন তারা পরাজয় স্বীকার করল। এই যুদ্ধে তারা প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছিল। লিঙ্কন তাদের ক্ষমা করলেন, এবং **ক্রীতদাসদের মুক্তি** দিয়ে, যাতে তারা উত্তর দিকের লোকদের মত সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে, তার আয়োজন করতে লাগলেন। কিন্তু লিঙ্কনের এই ইচ্ছা সফল হবার আগেই, এক থিয়েটারগৃহে জন উইলকিস বুথ নামে এক ব্যক্তি গুলি করে তাঁকে হত্যা করল। ক্রীতদাস-প্রথা দূর করা এবং **যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য** বজায় রাখার জন্যে আব্রাহাম লিঙ্কনের নাম পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বর্তমান আমেরিকা

আমেরিকার গৃহযুদ্ধ শেষ হবার পর শুরু হল আমেরিকার সম্পদের দিন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রপতি মনরোর বিঘোষিত **"মনরো-নীতি"** অনুসারে ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার নীতি ছিল, ইওরোপীয় ব্যাপারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রেখে, সে স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে, নিজের পথে এগিয়ে
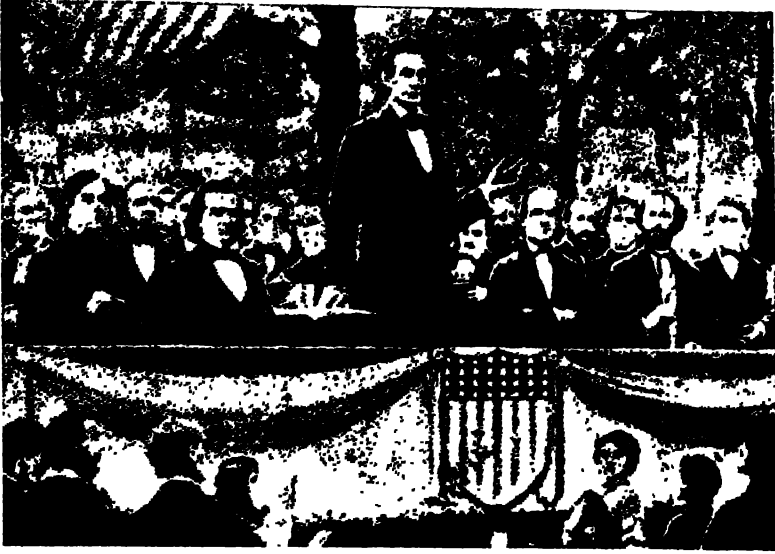
আব্রাহাম লিঙ্কন দাসপ্রথা নিয়ে মন্ত্রিসভার সঙ্গে আলোচনা করছেন

যাবে। যুক্তরাষ্ট্র ইওরোপকেও আমেরিকা মহাদেশের কোন স্থানে হস্তক্ষেপ করতে দেয় নি। মনরো-নীতি থেকে সমগ্র আমেরিকার উপর, যুক্তরাষ্ট্রের একটা অভিভাবকত্বের ভাব গড়ে ওঠে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ও বিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার নীতি ক্রমেই সাম্রাজ্যবাদী হয়ে ওঠে। স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে, আমেরিকা কিউবা, পোর্টোরিকো, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, গুয়াম, হাওয়াই দ্বীপমালা প্রভৃতি লাভ করে। শীঘ্রই আমেরিকা প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে, জাপানের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। শিল্পে ও ঐশ্বর্যে আমেরিকার সর্ববিধ উন্নতি ক্রমাগত বাড়তেই থাকে।

আজ আমেরিকা পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশ। এখানে **এডিসনের** (১৮৪৭—১৯৩১ খ্রীঃ) **মত বিজ্ঞানী** জন্মগ্রহণ করেছেন। টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করে তিনি পৃথিবীর এক দেশ হতে অপর দেশে খবর পাঠাতে শিখিয়েছেন। **রকফেলার** (১৮৩৯—১৯৩৭ খ্রীঃ), **এনড্রু কার্নেগীর** (১৮৩৫—১৯১৯ খ্রীঃ)

মত লোক কোটি কোটি টাকা উপার্জন করেছেন, তা থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা তাঁরা দান করে গিয়েছেন—জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্যে।

দাসপ্রথা উঠে যাবার পর, আমেরিকায় **একটা নতুন সভ্যতা** গড়ে উঠেছে। সেখানে বড় বড় ধনী লোক এবং গরিব লোক যথেষ্ট আছে বটে, কিন্তু তারা একে অপরকে ঘৃণা করে না। সামান্য একজন দরিদ্র লোকও আশা রাখে, হয় ত একদিন সে-ও আমেরিকার রাষ্ট্রপতি হতে পারবে। লেখাপড়া শিখে উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন করতে পারলে আমেরিকার **যে-কোন লোক** যুক্ত-রাষ্ট্রের **রাষ্ট্রপতি** হতে পারে; এ সম্বন্ধে কোন বাধা নেই, শুধু যিনি রাষ্ট্রপতি হতে চান তিনি আমেরিকান হলেই হল।
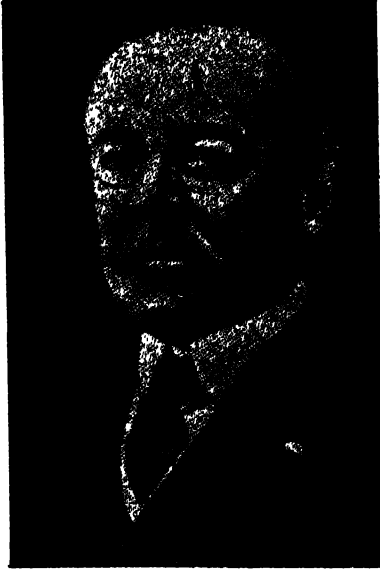
উড্রো উইলসন

স্বাধীনতা লাভের পর, আমেরিকার সঙ্গে ইংরেজদের আগের সেই শত্রুতা ঘুচে গিয়ে আবার বন্ধুত্ব হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা এসে ইংলণ্ডের দিকে যোগ দেওয়াতে, ইংলণ্ডের পক্ষে যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব হয়েছিল। **উড্রো উইলসন** (১৮৫৬—১৯২৪ খ্রীঃ) তখন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আর কখনও যাতে যুদ্ধ হতে না পারে, সেজন্যে উড্রো উইলসন চেয়েছিলেন—পৃথিবীর সব দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে এমন একটা শক্তিশালী জাতিসংঘ গড়ে তুলতে, যার ভয়ে কোন দেশই অপরকে আক্রমণ করতে সাহস পাবে না। উইলসনের ইচ্ছানুযায়ী, এই রকম একটা **জাতিসংঘ** বা **'লীগ অব নেশনস'** সুইটজারল্যাণ্ডের জেনেভা শহরে গঠিত হয়েছিল বটে, কিন্তু কার্যকালে, তিনি যা চেয়েছিলেন, এই সংঘ সে-রকমটি হয়ে উঠতে পারে নি।

রুজভেল্ট

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন আরম্ভ হয়, **ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট** তখন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারি ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট আমেরিকার
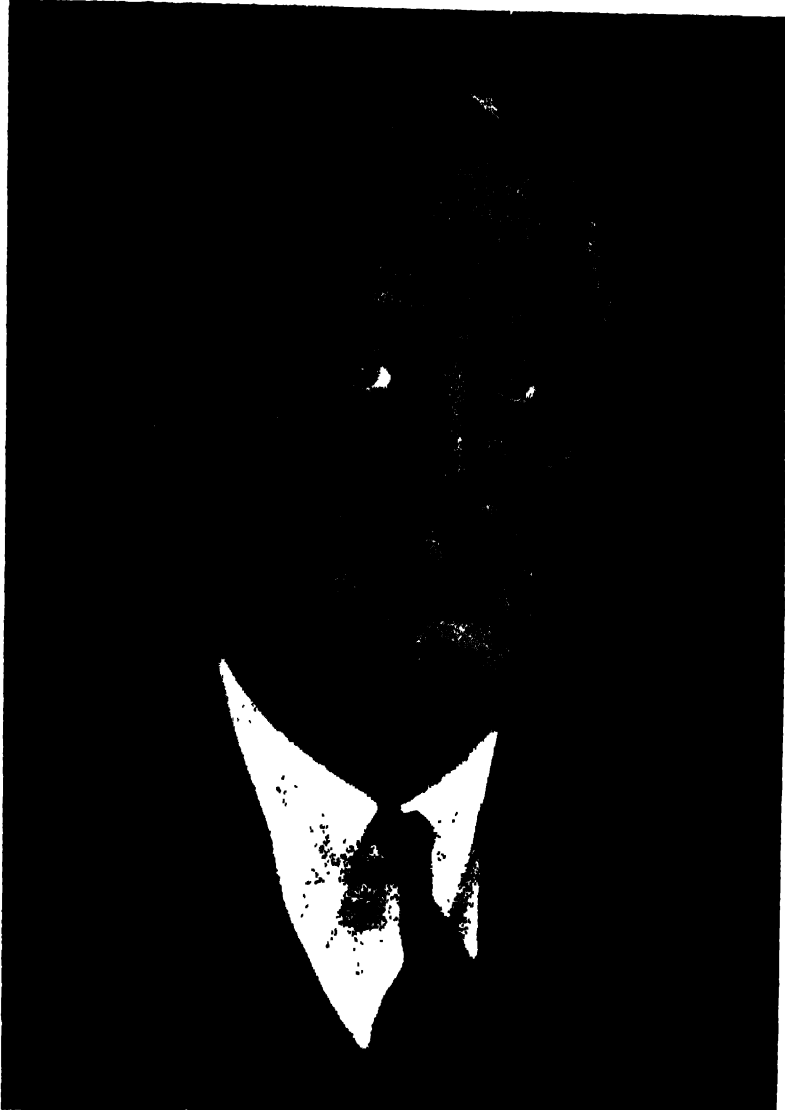
প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট

এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। রুজভেল্ট পঁচিশ বৎসর বয়সে আইন পরীক্ষা পাস করে তিন বৎসর ওকালতি করেন। এই সময় হতেই তিনি দেশের রাজনীতিতে যোগ দেন। তিনি দুবার নিউ ইয়র্ক রাষ্ট্রের গবর্নর-

পদে নির্বাচিত হন। কিছুদিন তিনি আমেরিকার নৌ-বিভাগের সহকারী সেক্রেটারীর কাজও করেছিলেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথম আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের পর, পৃথিবীর সব দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যও অনেক কমে গিয়েছিল, তার ফলে দেশের কৃষকদের উৎপন্ন ফসল ভাল দরে বিক্রি হত না। কারখানার কাজ কমে যাওয়াতে শ্রমিকরাও খুব বেশী সংখ্যায় বেকার হয়ে পড়েছিল। এই বিপদ্ থেকে আমেরিকানদের বাঁচাবার জন্যে রুজভেল্ট প্রাণপণে চেষ্টা করেন এবং অনেকটা সামলিয়ে নিতেও সমর্থ হন। তাঁর কাজ অসম্পূর্ণ থাকতেই নির্বাচনের দিন এসে পড়ে, তাই আমেরিকানরা তাঁকে দ্বিতীয় বারের জন্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করে তাঁর অসমাপ্ত কাজ শেষ করবার সুযোগ দিল। সত্যি-সত্যিই তাঁর আপ্রাণ চেষ্টায় আমেরিকার আর্থিক অবস্থার অনেক উন্নতি হল।

রুজভেল্টের দ্বিতীয় দফা রাষ্ট্রপতিত্বের মেয়াদ শেষ হবার এক বছর আগে, ইওরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হল। এই যুদ্ধ নিয়ে আমেরিকানদের মধ্যে দুটো মত প্রবল হয়ে ওঠে। রুজভেল্টের দল বললে, "এ যুদ্ধে ইংরেজদের সর্বরকমে সাহায্য না করলে আমেরিকা নিজেই ভীষণ বিপদে পড়বে। হিটলার যদি একবার ইংরেজদের কাবু করতে পারেন, তা হলে তিনি আমেরিকাকে ছেড়ে দেবেন এ-কথা কিছুতেই মনে করা চলে না। সুতরাং যুদ্ধে না নেমে, দূর থেকে যত রকমে সম্ভব, অর্থাৎ টাকা, অস্ত্রশস্ত্র এবং রসদপত্র দিয়ে ইংরেজকে সাহায্য করা উচিত।"

রুজভেল্টের **বিপক্ষে** আমেরিকায় একটা মস্ত বড় দল ছিল, তার নাম **রিপাবলিকান দল।** রুজভেল্টের দলের নাম ছিল **ডেমোক্রাট দল।** বর্তমানেও এ-দুটি দল আমেরিকায় প্রধান। রিপাবলিকান দলের নেতা ছিলেন **ওয়েণ্ডেল উইলকি** নামে একজন কোটিপতি বণিক। তাঁরা রুজভেল্টের দলের উত্তরে বললেন, "ইংরেজকে সাহায্য করার অর্থই হচ্ছে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া। ইওরোপের ব্যাপারে আমেরিকার মাথা গলাতে যাবার কোন দরকারই নেই। ইওরোপের রাজনীতি থেকে আমেরিকানদের দূরে থাকাই ভাল।"

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় রুজভেল্ট এবং উইলকি দুজনেই দাঁড়ালেন। রুজভেল্ট অনেক ভোটে উইলকিকে পরাজিত করে

তৃতীয়বার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন। আমেরিকার কোন রাষ্ট্রপতির পক্ষে দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার নির্বাচিত হওয়া উচিত নয় বলে যে রীতি প্রচলিত ছিল, এই তার প্রথম ব্যতিক্রম হল। উইলকি পরাজিত হয়ে তাঁর মত পরিবর্তন করলেন। তিনি নিজে ইংলণ্ডে গিয়ে সেখানকার অবস্থা দেখে এলেন এবং বললেন যে, ইংরেজদের খুব বেশি করে সাহায্য পাঠানো উচিত।

রুজভেল্ট নানারকম আইন পাস করিয়ে নিয়ে, ইংলণ্ডকে অস্ত্রশস্ত্র, ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেন, যন্ত্রপাতি, রসদ প্রভৃতি তো দিলেনই, টাকাও ধার দিলেন। জার্মেনীর বোমারু বিমানের জ্বালায় ইংলণ্ডের কল-কারখানাগুলি প্রায় অকেজো হয়ে উঠেছিল, আমেরিকা থেকে সাহায্য পাওয়ায় তাদের অনেক সুবিধা হল। এই সাহায্যের জোরে ইংলণ্ড জার্মেনীর সঙ্গে পূর্ণ তেজে যুদ্ধ করতে পারল।

ওয়েণ্ডেল উইলকি

১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজ সরকার, উত্তর-আমেরিকার বহু শহর, বন্দর, নৌ ও বিমান-ঘাঁটি ইত্যাদি নিরানব্বই বছরের জন্যে ইজারা দিয়ে দেন মার্কিন গবর্নমেণ্টকে। উদ্দেশ্য—আমেরিকা সেখানে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে ব্যূহ গড়ে তুলবে। ফলতঃ, নাৎসী-আক্রমণ পাছে আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হয়ে আমেরিকায় এসে পড়ে, এই ভয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা উভয়েই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। তারই প্রতিরোধের জন্যে এইসব জায়গা ইজারা নেওয়া এবং কানাডা-মার্কিনের ভিতর মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন।

এই ইজারার বিনিময়ে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পঞ্চাশখানা ডেস্ট্রয়ার দিয়ে দেয় ইংলণ্ডকে। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বরেই এগুলি ইংলণ্ডে এসে পড়ে। বলা বাহুল্য, এইসব যুদ্ধ-জাহাজ পাওয়ার দরুন ইংলণ্ডের প্রভূত শক্তিবৃদ্ধি হল।

১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে, পর পর দুখানা মার্কিন জাহাজ সুয়েজ-

প্রণালীর মুখে **বোমার আঘাতে জলমগ্ন** হল। এই মাসের শেষভাগে মস্কো নগরে রাশিয়া, ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন আহূত হয়। কিভাবে এই তিন শক্তি একত্রে, জার্মান অগ্রগতির প্রতিরোধ করতে পারে, তাই ছিল এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য।

৩০শে অক্টোবর, আইসল্যাণ্ডের অদূরে, মার্কিন ডেস্ট্রয়ার "রুবেন জেমস" টর্পেডোর আঘাতে জলমগ্ন হল।

জাপানের মতিগতি ক্রমশঃ আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছে দেখে, প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্ট ৬ই ডিসেম্বর তারিখে, ব্যক্তিগত শান্তি-আবেদন পাঠিয়েছিলেন জাপ-সম্রাটের কাছে। কিন্তু **৭ই ডিসেম্বর** সকালে, কোন চরমপত্র প্রদান না করেই জাপ-বিমান থেকে বোমাবর্ষণ হল মার্কিন-অধিকৃত বন্দর **পাল হারবারের উপর।** ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী ম্যানিলাতেও বোমা পড়ল। ঐ দিনই জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। প্রত্যুত্তরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও **জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা** করল। ১১ই ডিসেম্বর, জার্মেনী আর ইতালিও যুদ্ধ ঘোষণা করল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে।

২৩শে ডিসেম্বর, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল, ওয়াশিংটনে গিয়ে প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্টের সঙ্গে এক মন্ত্রণা-বৈঠকে মিলিত হলেন।

১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি, ওয়াশিংটনে সম্মিলিত ২৬টি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গ **একত্র ঘোষণা** করলেন যে, তাঁরা একযোগে যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে, এবং কেউই স্বতন্ত্রভাবে অক্ষশক্তির সঙ্গে সন্ধি করবেন না। ২রা জানুয়ারি জাপানীরা **ম্যানিলা অধিকার** করল।

২৬শে জানুয়ারি মার্কিন-সৈন্য আয়র্লণ্ডের উত্তরাংশে আলস্টারে এসে অবতরণ করল। ৩১শে জানুয়ারি, মার্কিন নৌ ও বিমানবহর গিলবার্ট ও মার্শাল দ্বীপে জাপানীদের আক্রমণ করল।

২রা ফেব্রুয়ারি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার ২৫ কোটি পাউণ্ড ঋণ দান করল তখনকার চীন-গভর্নমেণ্টকে।

জানুয়ারির শেষভাগেই, প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিভিন্ন দ্বীপে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থল, জল ও বিমানশক্তি **জাপানী বাহিনীর সম্মুখীন** হয়েছিল। প্রধান যুদ্ধ চলছিল ফিলিপাইন দ্বীপের নানাস্থানে। যুক্তরাষ্ট্রের সেনাপতি **ম্যাকআর্থার** (—১৯৬৪) এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ জাপ-সৈন্যের সম্মুখীন হয়েও, বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

মার্কিন **সেনাপতি স্টীলওয়েলকে** চীন-সরকার নিযুক্ত করলেন চীনা-বাহিনীর সর্বাধিনায়ক-পদে। জেনারেল ম্যাকআর্থার গ্রহণ করলেন সর্বাধিনায়ক-পদ প্রশান্ত মহাসাগর-অঞ্চলে।

২রা মে, মার্কিন "ইজারা ও ঋণ" (Lease and Lend) আইনের পরিধি
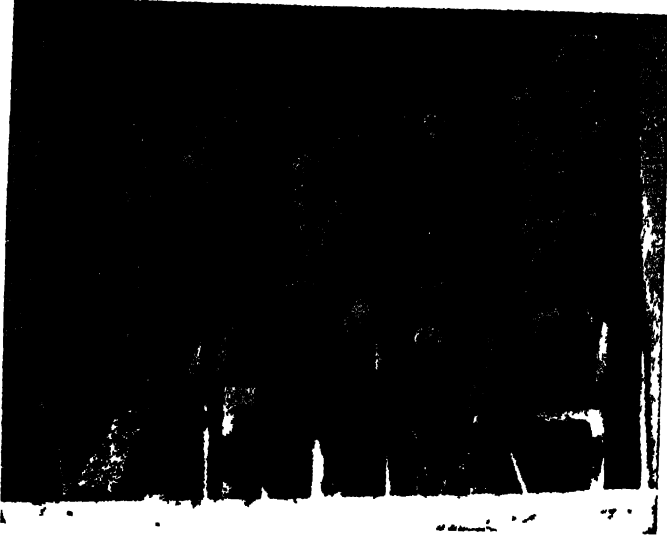
স্টালিন, রুজভেল্ট ও চার্চিল—তিন প্রধানের সাক্ষাৎ

ইরাক ও ইরান পর্যন্ত বিস্তৃত হল। চীনকেও মার্কিন "ইজারা ও ঋণ" আইনের আওতায় আনয়ন করা হল জুন মাসের প্রথমেই। ৫ই জুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হাঙ্গারী, বুলগেরিয়া ও রুমানিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

২৫শে জুন, **জেনারেল আইসেনহাওয়ারকে** নিযুক্ত করা হল ইওরোপীয় রণাঙ্গনে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় সেনার প্রধান সেনাপতি-পদে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে মিত্রশক্তি মুখ্যতঃ যে সাহায্য পাচ্ছিল, তা হল সমরোপকরণ, খাদ্য-সামগ্রী ও আর্থিক সাহায্য।

এই সময়েই **রাষ্ট্রসংঘ** প্রতিষ্ঠার প্রথম পরিকল্পনা প্রস্তুত হতে শুরু হয়।

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের গোড়াতেই, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট কাসাব্লাঙ্কায় এসে চার্চিলের সঙ্গে মিলিত হলেন এক বৈঠকে। এইখানে তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন যে, জার্মেনী বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত তাঁরা যুদ্ধ বন্ধ করবেন না।

উত্তর-আফ্রিকা রণাঙ্গনের সর্বময় কর্তৃত্ব, মার্কিন সেনাপতি আইসেন-

হাওয়ারের উপর ন্যস্ত হল। ওদিকে প্রশান্ত মহাসাগরে সলোমন দ্বীপপুঞ্জের গুয়াদাল ক্যানাল মার্কিন সেনার করায়ত্ত হল।

মার্কিন সেনা উত্তর-আফ্রিকার টিউনিসিয়ায় তীব্র যুদ্ধ চালাতে লাগল। ২৯শে জুলাই, সিসিলির নিকোসিয়া দখল করল মার্কিন বাহিনী।

(বাম দিক্ হতে) প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ও জেনারেল ম্যাকআর্থার

২রা সেপ্টেম্বর, চার্চিল ওয়াশিংটনে গিয়ে সাক্ষাৎ করলেন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের সঙ্গে। ১৯শে অক্টোবর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড ও রাশিয়ার পররাষ্ট্র সচিবগণ মস্কোতে এক বৈঠকে মিলিত হলেন।

২২শে নভেম্বর, রুজভেল্ট ও চিয়াং-কাইশেকের এক সম্মেলন হল কাইরোতে। আবার ২৮শে তারিখে তেহারানে এক সম্মেলন হল রুজভেল্ট, চার্চিল ও স্টালিনের ভিতর।

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারি, পশ্চিম-রণাঙ্গনে মিত্রশক্তির সর্বাধিনায়ক-পদে বরণ করা হল জেনারেল আইসেনহাওয়ারকে।

২১শে ফেব্রুয়ারি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরপেক্ষ আয়ার-রাষ্ট্রকে এই অনুরোধ করে পাঠায়, যেন অক্ষশক্তির সমস্ত প্রতিনিধিদের আয়ার থেকে বিদায় দেওয়া হয়।

৯ই জুন, মার্কিন সেনা ফ্রান্সের অন্তঃপাতী ইসিনী অধিকার করল।

তারপর ফ্রান্সের নানা ঘাঁটি থেকে তারা জার্মান সৈন্যকে বিতাড়িত করল। মার্কিন প্রথম বাহিনী ১১ই সেপ্টেম্বর, লাক্সেমবুর্গ-জার্মান সীমান্ত পার হয়ে জার্মেনীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। আকেনের নিকটে সীগফ্রিড-লাইন বিচূর্ণ হল তাদের আক্রমণে। ২৩শে অক্টোবর, জেনারেল দ্য'গল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত **নতুন ফরাসী গবর্নমেণ্টকে** স্বীকার করে নিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন সপ্তম বাহিনীর সম্মুখে জার্মান সেনা ক্রমাগত পশ্চাৎপদ হতে লাগল।

প্রথম বাহিনী সীগফ্রিড-লাইনের দুই মাইল দূরে, জার্মান সীমান্ত পার হল। ১লা ফেব্রুয়ারি (১৯৪৫), মার্কিন সপ্তম বাহিনী মোজার নদী পার হল। প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম মার্কিন বাহিনী, অব্যাহত গতিতে অগ্রসর হয়ে চলল বার্লিনের অভিমুখে।

ক্রিমিয়ার অন্তর্গত **ইয়াল্টাতে** রুজভেল্ট, চার্চিল ও স্টালিনের এক সাক্ষাৎকার হল, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি। রাইন নদীর পশ্চিম তীরে, সর্বত্রই মিত্রশক্তির প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। জার্মান-প্রতিরোধ একেবারেই ভেঙে পড়ল। ১৯শে এপ্রিল লিপজিগ, ২৮শে এপ্রিল রগসবার্গ এবং ৩০শে এপ্রিল মিউনিক অধিকার করল মার্কিন সেনা।

তৃতীয় বাহিনী চেকোস্লোভাক সীমান্তে পৌঁছে গেল প্যাসোর নিকটে। নবম বাহিনী ব্যালোতে মিলিত হল রুশ সৈন্যের সঙ্গে। বার্লিনের পতন হল ২রা মে, রুশ সৈন্য প্রবেশ করল বার্লিনে। সর্বত্রই জার্মান বাহিনীসমূহ **মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ** করতে লাগল। মার্কিন নবম বাহিনী নিরস্ত্র করল জার্মান নবম ও দশম বাহিনীদ্বয়কে। মার্কিন সপ্তম বাহিনী, বার্কেটস্‌গ্যাডেন, স্যালজবার্গ প্রভৃতি অধিকার করে ব্রেনার-গিরিবর্ত্ম পার হয়ে **ইতালিতে প্রবেশ** করল। ৮ই মে বার্লিনে জার্মেনীর বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ স্বাক্ষরিত হল। ৯ই মে গোয়েরিং ও মার্শাল কেসারলিং বন্দী হলেন ইতালিতে,—মার্কিন সেনার কাছে। **জার্মান যুদ্ধের অবসান** হল।

১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে ১২ই এপ্রিল, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের মৃত্যু হয় আকস্মিকভাবে। এর মাত্র তিন মাস আগে, তিনি চতুর্থবারের জন্যে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান প্রেসিডেণ্ট-পদ লাভ করলেন।

জার্মেনীর পতনের পর ইওরোপীয় যুদ্ধের অবসান হল; কিন্তু অন্যতম দুর্ধর্ষ শত্রু জাপান তখনও অপরাজিত রয়েছে। জাপানের সঙ্গে আর পেরে না উঠে

শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক ভীষণ মারণাস্ত্র প্রয়োগ করল সে দেশের উপর। এর নাম 'অ্যাটম বোমা' (atom bomb) বা আণবিক বোমা। জাপানের **হিরোসিমা** ও **নাগাসাকি** বন্দরের উপর দুটি মাত্র বোমা নিক্ষিপ্ত হল। তারই ফলে, ঐ দুটি শহর সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে গেল। এই সাংঘাতিক বোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সম্ভব নয় বুঝতে পেরে, জাপান তখনই যুদ্ধ-বিরতির

(ডান দিক্ হতে) প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ও জেনারেল আইসেনহাওয়ার

জন্যে আবেদন জানায়। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর, বেলা ১০॥ টার সময় "মিসৌরী" জাহাজের উপর, জাপান **বিনাশর্তে আত্মসমর্পণের চুক্তি-পত্র** স্বাক্ষর করল।

অতঃপর মিত্রপক্ষের সামরিক শাসনের অধীনে আনীত হল জাপান রাষ্ট্র। **জেনারেল ম্যাকআর্থার** নিযুক্ত হলেন মিত্রপক্ষের তরফ থেকে সামরিক শাসনকর্তা। তিনি জাপান শাসন করতে লাগলেন জাপ মন্ত্রিসভার সাহায্যে। যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী **হিদেকী তোজো** ও তাঁর সহকর্মিগণ, যুদ্ধাপরাধী বলে গণ্য হয়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। কিছুদিন পরে **কোরিয়ার যুদ্ধের** ব্যাপারে মতবিরোধের জন্যে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান, সেনাপতি ম্যাকআর্থারকে জাপান ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের সামরিক কর্তৃত্বপদ থেকে অপসারিত করেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা আমেরিকার প্রভাব এখন সারা পৃথিবীতে প্রসারিত হয়েছে। কম্যুনিস্ট নীতির কেন্দ্রশক্তি, সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে, আমেরিকাই এখন পশ্চিম-ইওরোপীয় ধনবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের প্রধান ভরসাস্থল। উত্তর-অতলান্তিক-সংস্থা ও ইওরোপ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্যে আমেরিকা অকাতরে অর্থব্যয় ও সামরিক সাহায্য করে যাচ্ছে। রাষ্ট্রসংঘে আমেরিকার আধিপত্যই সবচেয়ে বেশী। দক্ষিণ-আমেরিকার সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবাধীন। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে, কম্যুনিস্ট-প্রভাবমুক্ত রাষ্ট্রগুলিকেও আমেরিকা আর্থিক সাহায্য করছে—যাতে তাদের দেশে কম্যুনিস্ট মতবাদ মাথা চাড়া দিয়ে না ওঠে।

জন এফ কেনেডি ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

কেনেডি

প্রেসিডেন্ট হন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট কেনেডির নেতৃত্বাধীনে মার্কিন সরকারের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, কম্যুনিস্ট মতের প্রচার প্রতিরোধ করা। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে নভেম্বর কেনেডি আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। তাঁর পরে লিণ্ডন বি জনসন প্রেসিডেন্ট হন। তিনি ৩৬তম প্রেসিডেন্ট। তাঁর পরে নিক্সন প্রেসিডেন্ট হয়েছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মনে করে, কম্যুনিস্ট মতবাদের ফলে জনসাধারণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লোপ পায়, স্বচ্ছন্দ ধর্মাচরণের স্বাধীনতা না থাকায় মানুষ নীতিজ্ঞানহীন হয়ে পড়ে, শুধু বাস্তব জগতের উপর নির্ভর করে মানুষ যন্ত্রের সামিল হয়ে পড়ে। তা ছাড়া শ্রমিক ও কৃষকদের জীবনধারণের

ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট লিণ্ডন বি জনসন

সুব্যবস্থা যখন আমেরিকা রাশিয়ার চেয়ে অনেক ভালভাবেই করেছে তখন পরীক্ষামূলক সাম্যবাদী মতবাদকে জোব করে রাশিয়ার বাইরের অনিচ্ছুক রাষ্ট্রসমূহের উপরে চাপানো উচিত নয়। তাই মানুষকে মুক্ত রাখতে হলে কম্যুনিস্ট মতবাদের প্রচার প্রতিরোধ করা একান্ত প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে উক্ত সরকার পৃথিবীব বিভিন্ন স্থানে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে চলেছে।

স্বাধীন ভারতকে মার্কিন সরকাব নানাভাবে অর্থ-সাহায্য করে চলেছে। খাদ্যশস্যাদি ও নানা যন্ত্রপাতি দান ও বহু বৎসরে পরিশোধযোগ্য ঋণ হিসাবে অর্থ দিয়ে মার্কিন সরকার ভারতের প্রভূত উপকার করে চলেছে। এমন অকুণ্ঠ সাহায্য অন্য কোন রাষ্ট্রই করে নি। পূর্বে মার্কিন সরকার অস্ত্র সাহায্য করতেও চেয়েছিল। সে সময়ে ভারত তা গ্রহণ করে নি। অনেকটা এই জন্যে মার্কিন সরকাব পাকিস্তানকে অস্ত্র সাহায্য করে। তা ছাড়া পাকিস্তান আমেরিকান

গোষ্ঠীভুক্ত হয়। চীনের ভারত আক্রমণের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বহু কোটি টাকার সমরোপকরণ দিয়ে ভারতকে সাহায্য করেছে।

ভারত দলনিরপেক্ষ রাষ্ট্রই থাকতে চায়। পাকিস্তান রাষ্ট্রকে মার্কিন সরকার যেভাবে সামরিক অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত করে তুলছে, তাতে ভারতের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরা খ্রীস্টধর্মাবলম্বী। এর আয়তন ৩৬,০৮,৭৮৭ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ১৯,৬৮,৪২,০০০ (১৯৬৬ খ্রীঃ)।

ক্যানাডা

ক্যানাডা উত্তর আমেরিকার একটি বিশাল দেশ। এর ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। চতুর্দশ শতাব্দীতে ইওরোপীয় নাবিকেরা এদেশের নানা স্থানে গমন করে। ইতালীয় নাবিক জন ক্যাবট ও সেব্যাস্টিয়ান ক্যাবল ইংলণ্ড থেকে যাত্রা করে ১৪৯৭—১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দে ক্যানাডার একাংশে অবতরণ করেন। তারপর ১৫০০-১৫০২ খ্রীঃ পোর্তুগিজ কোর্টি রিয়েল এবং ফরাসী মণ্ট রিয়েল এখানে আগমন করেন।

ফরাসীরা ১৫৩৪ খ্রীস্টাব্দে ক্যানাডায় গিয়ে ব্যবসায় শুরু করে দেয়। তারপর নানাস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে। ফ্রান্স ১৭৫৫ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়। ক্যানাডা ব্রিটিশের অধিকারে যায়।

ক্যানাডা বর্তমানে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অধীনে এক স্বাধীন রাষ্ট্র। লিস্টার বি পিয়ার্সন প্রধানমন্ত্রী (১৯৫৯ খ্রীঃ, ১৫ই সেপ্টেম্বর)। রোল্যাণ্ড মিবেনার গভর্নর-জেনারেল। ক্যানাডা রাষ্ট্রসংঘের সদস্য। এখানকার অধিবাসীরা অধিকাংশই খ্রীস্টধর্মাবলম্বী।

ক্যানাডার আয়তন ৩৮,৫১,৮০৯ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা ২,০৬,৩০,০০০ (১৯৬৮ খ্রীঃ)। রাজধানী ওটাওয়া।

মেক্সিকো

কলম্বসের বহুপূর্বে এখানে উন্নত আদিবাসীর বাস ছিল। মায়া-সভ্যতার বহু নিদর্শন আজও মেক্সিকোর নানা স্থানে দেখতে পাওয়া যায়।

স্পেনীয় জেনারেল হার্মাণ্ডো কোর্টিস, আজটেক সাম্রাজ্য ধ্বংস করেন (১৫১৯—১৫২১ খ্রীঃ)। আজটেকরা ১৩২৫ খ্রীস্টাব্দে যে শহর পত্তন করেন, তারই নাম আজ মেক্সিকো।

স্পেনীয়রা তিন শত বৎসর ধরে নিদারুণ অনাচার চালায়। মিগুয়েল কস্টিলা, প্যাভন, ইতুরবাইড প্রভৃতির চেষ্টায় (১৮১০—১৮২১ খ্রীঃ) মেক্সিকো স্বাধীন হয় (২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৮২১ খ্রীঃ)। ইতুরবাইড প্রথম অগাস্টিন নাম নিয়ে নিজেকে সম্রাট্ বলে ঘোষণা করেন। তিনি ১৯২৪ খ্রীঃ অপসারিত ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন।

ফরাসী সৈন্যের সহায়তায় একজন অস্ট্রিয়ান আর্চডিউক প্রথম ম্যাক্সি-মিলিয়ান নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৮৬৪—১৮৬৭ খ্রীঃ)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপে পড়ে ফরাসী সৈন্যরা চলে গেলে বেনিটো জুয়ারেজের অধীনে মেক্সিকোর দেশপ্রেমিকেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং ম্যাক্সিমিলিয়ানকে হারিয়ে দিয়ে তাঁকে ফাঁসি দেয়।

তারপর নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মেক্সিকোতে ১৯১৭ খ্রীঃ, ৫ই ফেব্রুয়ারি নূতন শাসনতন্ত্রের প্রবর্তন হয়। মেক্সিকো বর্তমানে একটি সংযুক্ত প্রজাতন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র। এখানে মোট ২৯টি রাষ্ট্র আছে।

১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দের ৬ই জুলাই অ্যাডলফো লোপেজ ম্যাটিওস প্রেসিডেন্ট হন। গুস্তাভো দিয়াজ অর্দাজ ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দে ছয় বৎসরের জন্য প্রেসিডেন্ট হন।

অধিকাংশ অধিবাসী রোমান ক্যাথলিক। এর আয়তন ১৯,৬৭,১৮৩ বর্গ কিলোমিটার (৭,৬১,৫৩০ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ৪,৫৬,৭১,০০০ (১৯৬৭ খ্রীঃ)। রাজধানী মেক্সিকো সিটি।

দক্ষিণ আমেরিকা

আমেরিকায় ইওরোপীয়দের আগমনের বহু পূর্বে, মধ্য-আমেরিকা, মেক্সিকো ও দক্ষিণ-আমেরিকার পেরুতে উন্নত ধরনের সভ্যতা বিরাজ করত।
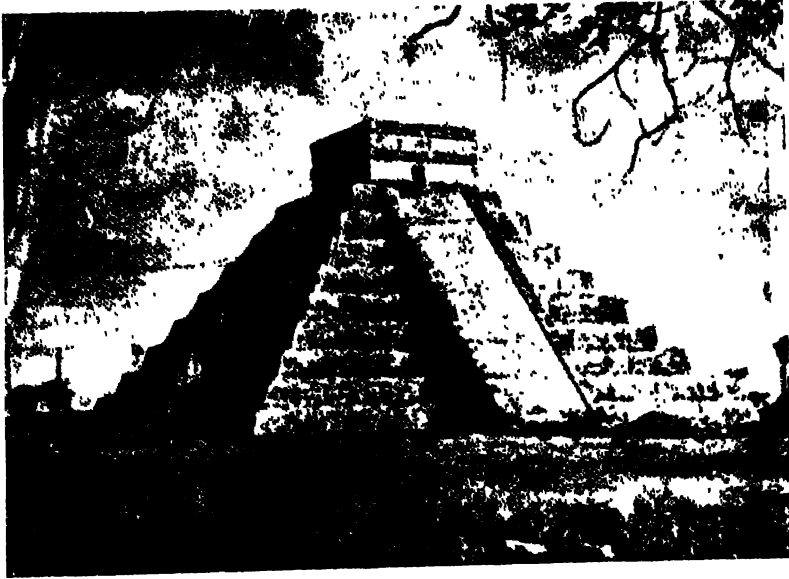
মায়া-সভ্যতার যুগের একটি প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ

এই সভ্যতা **"মায়া-সভ্যতা"** বলে অভিহিত হয়। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের অনেক আগে থেকেই এই সভ্যতা শুরু হয়।

দ্বিতীয় শতাব্দীতে অনেক নগর গড়ে ওঠে। এই সময় প্রস্তরকার্য, মৃৎপাত্র-শিল্প, বয়নশিল্প ও সুন্দর রঞ্জনশিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। নগরগুলিতে বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণের প্রতিযোগিতা ছিল। তাদের লেখা কতকটা জটিল ধরনের ছিল। মায়া-সভ্যতার লোকেরা বিভিন্ন শিল্পে, বিশেষ করে, ভাস্কর্যে খুব নৈপুণ্য লাভ করেছিল।

এই সকল সভ্য অঞ্চলে অনেক রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। তাদের অনেক ভাষা

মায়া-সভ্যতার আর একটি নিদর্শন

ও উন্নত ধরনের সাহিত্য ছিল। তাদের গবর্নমেণ্ট ছিল সুনিয়ন্ত্রিত ও প্রত্যেক নগরে শিক্ষিত সমাজ ছিল। দশম শতাব্দীতে উক্সমল একটি শ্রেষ্ঠ নগরী ছিল। অন্যান্য বড় নগরীর মধ্যে লাবুয়া, মায়াপন এবং সাওমুলতুনের নাম উল্লেখ করা যায়।

মধ্য-আমেরিকার তিনটি বড় রাষ্ট্র মিলে "মায়াপন-সংঘ" নামে একটি যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার সৃষ্টি করেছিল। এই সভ্যতায় পুরোহিতশ্রেণীর খুব আধিপত্য

ছিল। মায়াপন-সংঘ একশত বৎসরের বেশী স্থায়ী হয়। তারপর বোধ হয়, একটা সামাজিক বিপ্লব হয় এবং মেক্সিকো ও সীমান্তদেশ থেকে বিদেশীরা এসে, এই দেশ আক্রমণ করে জয় করে। মেক্সিকো হতে যে আক্রমণকারীরা এসেছিল, তাদের নাম **আজটেক্‌স্‌।**

চতুর্দশ শতাব্দীতে, এই আজটেক্‌স্‌রা একটি বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপিত করে। তাদের রাজধানী ছিল **তেনেকতিতলন** নামে বড় নগরী। তারা সামরিক জাতি ছিল এবং মায়া-রাজ্যের প্রজাদের উপর অত্যাচার করত। এই সাম্রাজ্য বাইরে খুব শক্তিশালী ছিল, কিন্তু ভিতরে তাদের ঘুণ ধরে গিয়েছিল। স্পেনের দুঃসাহসিক বীর **হারনান কর্টেস,** বন্দুক ও অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে এই আজটেক্‌স্‌ সাম্রাজ্য জয় করেন। শীঘ্রই মায়া-সভ্যতা ও মেক্সিকো-সভ্যতার অনেক কিছুই ধ্বংস হয়ে যায়।

দুইজন ইনকা নরপতি

দক্ষিণ-আমেরিকার পেরুর অধীশ্বরকে বলত **'ইনকা'।** তিনি দৈব-নরপতির মত ছিলেন। একটা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পেরু-সভ্যতার সঙ্গে মেক্সিকো-সভ্যতার কোন যোগাযোগ ছিল না। **পিজারো** (১৪৭১—১৫৪১ খ্রীঃ) নামক আর একজন স্পেনিশ-যোদ্ধা ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে এই পেরু রাজ্য জয় করেন।

উত্তর-আমেরিকায় যেমন ইংলণ্ডের উপনিবেশ ছিল, দক্ষিণ-আমেরিকা ও মধ্য-আমেরিকায় তেমনি গড়ে উঠে স্পেনের উপনিবেশ। দক্ষিণ-আমেরিকার প্রায় সবটাই ছিল স্পেনের অধীন—শুধু ব্রেজিল ছাড়া। পোর্তুগিজরা এসে ব্রেজিল দখল করেছিল। প্রায় তিনশ বছর দক্ষিণ-আমেরিকা স্পেনের অধীন ছিল। ইংলণ্ডের রাজা যেমন উত্তর-আমেরিকার উপনিবেশগুলোতে গবর্নর নিযুক্ত করে পাঠাতেন, স্পেনের রাজাও তেমনি দক্ষিণ-আমেরিকার উপনিবেশ শাসন করবার জন্যে গবর্নর নিযুক্ত করে পাঠাতেন।

দূর থেকে এইভাবে, এক দেশ অপর দেশকে বেশীদিন অধীনে রেখে শাসন করতে পারে না। উত্তর-আমেরিকা ক্রমে ক্রমে ইংলণ্ডের হাতছাড়া

হয়ে গেল। দক্ষিণ আমেরিকাতেও স্পেনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ জমে উঠতে লাগল। উত্তর-আমেরিকা স্বাধীন হবার পর, তারাও একবার স্বাধীনতা লাভের

স্পেনিয়ার্ডদের সঙ্গে দক্ষিণ-আমেরিকানদের যুদ্ধ
(একখানি অতি প্রাচীন চিত্র হতে)

জন্যে চেষ্টা করল, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হল না। স্পেনের কুশাসন, নিজেদের আর্থিক দুর্গতি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেরণা ও ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা—দক্ষিণ-আমেরিকার লোকদের মনে স্বাধীনতার স্পৃহাকে জাগরিত করেছিল।

সাইমন বলিভার

সাইমন বলিভার (১৭৮৩—১৮৩০ খ্রীঃ) নামক দক্ষিণ-আমেরিকার এক যুবকের মনে, দেশকে স্বাধীন করবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল। বলিভার ইওরোপ ভ্রমণে বেরোলেন। প্রথমেই তিনি গেলেন স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে। সেখান থেকে গেলেন ফ্রান্সে।

ফরাসী বিপ্লবের পর, **নেপোলিয়ন** তখন ফরাসী সম্রাট্‌রূপে সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েছেন, তারই উৎসব ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস শহরে

চলেছে। সাইমন বলিভার সেই উৎসব দেখে দুঃখিত হলেন। তাঁর মনে ধারণা হল যে, অত্যাচারী বুরবন রাজাদের পরিবর্তে নেপোলিয়ন ফ্রান্সের একচ্ছত্র অধীশ্বর হলেন। ফ্রান্স তো সত্যিকারের স্বাধীনতা লাভ করল না। নেপোলিয়নকে সম্রাট্ হতে দেখে সাইমন বলিভার খুব দুঃখিত হয়ে ইতালিতে গেলেন।

নেপোলিয়ন ইতালি জয় করেছিলেন। কাজেই সেখানেও তিনি দেখলেন যে, নেপোলিয়ন ইতালির রাজা হয়েছেন বলে সেখানেও খুব উৎসব চলেছে। সাইমন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, তিনি দক্ষিণ-আমেরিকাকে স্পেনের রাজার অধীনতা থেকে মুক্ত করবেন এবং কাউকে রাজা করবেন না; প্রজাদের গবর্নমেণ্ট গঠন করে দেশের লোকের হাতে দেশ-শাসনের ভার তুলে দেবেন। এই দৃঢ় সংকল্প করে সাইমন বলিভার বিদেশ থেকে দেশে ফিরে এলেন।

সাইমন বলিভার

সাইমন বলিভার দেশে ফেরার অল্পদিন পরেই সংবাদ এল যে, নেপোলিয়ন স্পেন জয় করেছেন। স্পেনের রাজা সিংহাসন ত্যাগ করে চলে গেছেন। নেপোলিয়ন স্পেনের সিংহাসনে বসিয়েছেন তাঁর বড় ভাই জোসেফ বোনাপার্টকে।

সাইমন দেখলেন, এই সুযোগ। স্পেনের রাজবংশের প্রতি দক্ষিণ-আমেরিকার লোকদের একটা অন্তরের টান হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু নেপোলিয়নের উপর তাদের কোন ভক্তি ছিল না। কাজেই সাইমন বলিভারের উৎসাহে, **জোসেফ নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে** যুদ্ধ করতে অনেকেরই আপত্তি হল না।

ভেনিজুয়েলা নামক কলোনীটিতে **সর্বপ্রথম বিদ্রোহ** ঘোষণা হল। স্পেনের রাজা ভেনিজুয়েলায় যে গবর্নর নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন, সেখানকার লোকেরা তাঁকে তাড়িয়ে দিয়ে, ভেনিজুয়েলায় প্রজাদের গবর্নমেণ্ট গঠন করল। এই ঘটনার পর থেকে, দক্ষিণ-আমেরিকার বিদ্রোহীদের সঙ্গে স্পেনের যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। সাইমন বলিভার হলেন এই **বিদ্রোহের নেতা**।

যুদ্ধের প্রথম ধাকায় সাইমন হেরে গিয়ে পলায়ন করলেন; কিন্তু তার অল্পদিন পরেই, তিনি আরও বেশী লোকজন নিয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করে দিলেন। দক্ষিণ-আমেরিকার অধিকাংশ লোকই তাঁকে সাহায্য করতে লাগল।

বছরের পর বছর ধরে এই যুদ্ধ চলল। সাইমন বলিভারই শেষে জয়লাভ করলেন, স্পেনের অধীনতা থেকে দক্ষিণ-আমেরিকার উপনিবেশগুলো মুক্তিলাভ করল। দুর্বল ও অক্ষম স্পেন আর তার উপনিবেশগুলোকে অধীনে রাখতে পারল না।

আমেরিকায় স্পেনের যে কয়েকটি উপনিবেশ ছিল, তার মধ্যে পাঁচটি ছিল বড়। এই পাঁচটির নাম মেক্সিকো, ভেনিজুয়েলা, কলম্বিয়া, পেরু এবং ইকুয়াডর। এই উপনিবেশগুলি একসঙ্গে করলে স্পেনের আকারের দশগুণ বড় হয়। শেষের চারটি উপনিবেশকে স্বাধীন করবার পর, তার প্রত্যেকটিতে **প্রজাদের গবর্নমেণ্ট গঠিত হয়।** সাইমন তার একটিতেও কাউকে রাজা হতে দেন নি। এই চারটির পর তিনি আরও একটি উপনিবেশকে মুক্ত করেন; তাঁর নামানুসারে এই দেশটির নাম হয় **বলিভিয়া।**

উত্তর ও দক্ষিণ-আমেরিকার সব দেশের প্রতিনিধি নিয়ে, দুই দেশে মিলে, একটি বিরাট শক্তিশালী গবর্নমেণ্ট গঠন করবার ইচ্ছা সাইমন বলিভারের মনে ছিল, কিন্তু তাঁর সে স্বপ্ন সফল হয় নি। দক্ষিণ-আমেরিকায় সাইমন বলিভারের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। তারা তাঁকে "**পাঁচটি দেশের স্বাধীনতার জন্মদাতা**" বলে শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকে।

মনরো নীতি

ভেনিজুয়েলা, কলম্বিয়া, পেরু, ইকুয়াডর এবং বলিভিয়াতে প্রজাদের গবর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হতে দেখে, ইওরোপের রাজা ও শাসক-সম্প্রদায় দস্তুরমত ভয় পেলেন। তাঁদের মনে ধারণা হল যে, দক্ষিণ-আমেরিকার লোকেরা নিজেদের গবর্নমেণ্ট নিজেরা চালিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করছে এই দৃষ্টান্ত দেখে, ইওরোপের লোকেরাও যদি সেই পথ ধরতে আরম্ভ করে, তাহলে তাঁদের রাজত্বই তো আর থাকবে না। এই বুঝে ইওরোপের রাজারা, বিশেষ করে **অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার মেটারনিক** দক্ষিণ-আমেরিকার বিদ্রোহ দমন করবার জন্যে, স্পেনকে সাহায্য করবেন বলে ঠিক করতে লাগলেন।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের তখন যিনি রাষ্ট্রপতি, তাঁর নাম ছিল **মনরো** (১৭৫৮—১৮৩১ খ্রীঃ)। রাষ্ট্রপতি মনরো ইওরোপের রাজাদের এই মতিগতি বুঝতে পেরে ঘোষণা করলেন যে, দক্ষিণ-আমেরিকার দেশগুলো তাদের নিজেদের ইচ্ছামত গবর্নমেণ্ট গঠন করবে, এ-অধিকার তাদের আছে। এতে অপর কোন দেশের, গায়ে পড়ে বাধা দেওয়া উচিত নয়। সুতরাং ইওরোপের কোন দেশ যদি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসে, তা হলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র তা সহ্য করবে না। মনরোর এই ঘোষণা **মনরো নীতি** নামে আজও বিখ্যাত হয়ে রয়েছে।

রাষ্ট্রপতি মনরো ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে এই নীতি ঘোষণা করেন এবং এর পর ইওরোপের কোন দেশ আর দক্ষিণ-আমেরিকায় বা আমেরিকার অন্য কোন অংশে যুদ্ধ করতে আসবার সাহস পায় নি। মনরো ঐ সঙ্গে একথাও বলে দিয়েছিলেন যে, আমেরিকার কোন দেশ, ইওরোপ বা এশিয়ার ব্যাপারে কখনো হাত দিতে যাবে না। ইংলণ্ডও দক্ষিণ-আমেরিকার দেশগুলিকে স্বাধীনতায় উৎসাহ দিয়েছিল।

দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয়

আর্জেন্টিনা

১৫১৫ খ্রীস্টাব্দে আর্জেন্টিনা স্পেনের অধিকারভুক্ত হয়। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মে আর্জেন্টিনা স্পেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীন হয়।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে **জুয়ান ডি পেরন** আর্জেন্টিনার প্রেসিডেণ্ট ও ডিক্টেটর হন। দেশবাসী তাঁকে ১৯৫৫ খ্রীঃ ১৬ই সেপ্টেম্বর অপসারিত করে।

১৯৫৮ খ্রীঃ ডাঃ এ ফ্রণ্ডিজি প্রেসিডেণ্ট হন। ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দে প্রেসিডেণ্ট হন আর্তুরো ইলিয়া। ১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দে প্রেসিডেণ্ট হন লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল জুয়ান কার্লস অঙ্গানিয়া।

আর্জেন্টিনার অধিবাসীরা রোমান ক্যাথলিক। এর আয়তন ২৮০৮৬০২ বর্গ কিলোমিটার (১০,৮৪,১২০ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ২,২৭,০০,০০০ (১৯৬৬ খ্রীঃ)। রাজধানী বুয়েনস আইরেস।

বলিভিয়া

বলিভিয়া একসময়ে ইনকা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারপর কয়েক শতাব্দী স্পেনের অধীন থাকবার পর ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে সাইমন বলিভারের চেষ্টায় স্বাধীন হয়।

বলিভিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে বহু টাকা সাহায্য পেয়ে থাকে।

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুন হার্নান জুয়াজো বলিভিয়ার প্রেসিডেণ্ট হন। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুন ডাঃ ভিক্টর পাজ এস্টেনসোরো প্রেসিডেণ্ট হন।

জেনারেল আলফ্রেডো ওভাণ্ডো ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেণ্ট হন।

অধিবাসীরা রোমান ক্যাথলিক।

বলিভিয়ার আয়তন ১০,৯৮,৫৮০ বর্গ কিলোমিটার (৪,২৪,১৬০ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ৩৫,৪৯,০০০ (১৯৬২ খ্রীঃ)।

ব্রেজিল

ব্রেজিল দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম দেশ। ব্রেজিল পঞ্চদশ শতাব্দীতে পোর্তুগিজ অধিকারে যায়। পরে বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর 'ব্রেজিল যুক্তরাষ্ট্র' নামে সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র গঠিত হয়।

ব্রেজিল প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষে যোগদান করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এ দেশ বিভিন্নভাবে জড়িত।

১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারি জুস্কেলিনো কুবিৎশেচক ব্রেজিলের প্রেসিডেণ্ট হন। ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর প্রেসিডেণ্ট হন জে গৌলার্ট। মার্শাল হাম্বার্টো ডি এ ক্যাস্টেলো ব্র্যাঙ্কো ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দে প্রেসিডেণ্ট হন।

অধিবাসীরা অধিকাংশ খ্রীস্টধর্মাবলম্বী। ব্রেজিলের আয়তন ৮৫,১১,৯৬৫ বর্গ কিলোমিটার (৩২,৮৬,০০০ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ৮,৭২,০৯,০০০ (১৯৬৭ খ্রীঃ)। রাজধানী ব্র্যাসিলিয়া।

চিলি

১৫৪০ খ্রীস্টাব্দে চিলি স্পেনের অধিকৃত হয়। ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে চিলি স্বাধীন হয়। বানাডো ও'হিগিন্স ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত চিলির ডিক্টেটর থাকেন।

জর্জ আলেসাণ্ড্রি রোড্রিকোয়েজ ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দের ৩রা নভেম্বর চিলির প্রেসিডেণ্ট হন। এডুয়ার্ডো ফ্রেই মণ্টালাভা ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দে প্রেসিডেণ্ট হন।

এখানে রোমান ক্যাথলিকদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। এর আয়তন ৭,৪১,৭৬৭ বর্গ কিলোমিটার (২,৮৬,৩৯৬ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ৮৭,৫০,০০০ (১৯৬৬ খ্রীঃ)। রাজধানী স্যাণ্টিয়াগো।

কলম্বিয়া

কলম্বিয়া তিন শত বৎসরের অধিক কাল স্পেনের অধীন থাকে। ১৮১০ থেকে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কালে সাইমন বলিভারের নেতৃত্বে যে স্পেন-বিরোধী বিদ্রোহ দেখা দেয় তাতে দক্ষিণ আমেরিকার বহু দেশ স্বাধীন হয়। নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ৫ই অগস্ট কলম্বিয়া সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। তখনও পর্যন্ত পানামা তার সঙ্গে এক ছিল। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে পানামা সম্পর্ক ছিন্ন করে অন্য রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

আলবার্টো কামার্গো ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা মে কলম্বিয়ার প্রেসিডেণ্ট হন। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মে জি এল ভ্যালেসিয়া প্রেসিডেণ্ট হন। ডাঃ কার্লস এল রেস্ট্রেপো ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেণ্ট হন।

অধিবাসীদের অধিকাংশই রোমান ক্যাথলিক। এখানে প্রায় এক লক্ষ হিন্দুর বাস।

কলম্বিয়ার আয়তন ১১,৩৮,৯১৪ বর্গ কিলোমিটার (৪,৩৯,৫৩৫ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ১,৯৩,০০,০০০ (১৯৬৭ খ্রীঃ)। রাজধানী বোগোটা।

প্যারাগুয়ে

১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এ দেশ স্পেনের অধীন হয়। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে ইহা স্বাধীন হয়।

জেনারেল আলফ্রেডো স্ট্রোয়েসনার ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্যারাগুয়ের প্রেসিডেন্ট হন। ১৯৫৮ খ্রীঃ দেশে এক বিরাট দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি হলে প্রেসিডেন্ট স্ট্রোয়েসনার ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মে সামরিক আইন জারি করেন। তিনি ১৯৫৮, ১৯৬৩ ও ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট হন।

এখানকার অধিবাসীরা বেশির ভাগ রোমান ক্যাথলিক। এর আয়তন ১,৫৯,৮২৭ বর্গ কিলোমিটার (৬১,৭৫৫ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ১৮,১৯,১০৩ (১৯৬২ খ্রীঃ)। রাজধানী অ্যাসুনসিওন।

পেরু

অর্থের সন্ধানে ফ্র্যান্সিস্কো পিজারো ১৫৩২ খ্রীঃ যখন পেরুতে হানা দেন তখন শক্তিশালী ইনকা সাম্রাজ্য এখানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। পিজারো পেরু জয় করেন। ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে ইনকাদের সঙ্গে যুদ্ধে ও প্রতিদ্বন্দ্বী স্পেনীয়দের সঙ্গে সংঘর্ষে পিজারো নিহত হন। তাঁর ভাই গঞ্জালো ১৫৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন।

প্রায় তিনশ বছর স্পেনের অধীন থাকবার পর ১৮২৪ খ্রীঃ পেরু স্বাধীন হয়। স্পেনের কবলমুক্ত হলেও প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে পেরুর সংঘর্ষ লেগেই থাকে। একবার চিলি পেরুকে যুদ্ধে পরাস্ত করে।

সীমানা নিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের সঙ্গে দীর্ঘকাল পেরুর যে বিরোধ চলে আসছিল রাষ্ট্রসংঘের মধ্যস্থতায় তার মীমাংসা হয়। কলম্বিয়া ও ইকোয়েডর রাষ্ট্রসংঘের নির্দেশ মেনে নেয়।

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুন ম্যানুয়েল প্রেডো উগার্টেচি এর প্রেসিডেন্ট হন। ফার্নাণ্ডো বেলাউণ্ডে টেরি ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট হন।

পেরুর বেশির ভাগ লোক রোমান ক্যাথলিক। এর আয়তন ১২,৮৫,২১৫ বর্গ কিলোমিটার (৪,৯৬,০৯৩ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ১,১৭,৫০,৪০০ (১৯৬৫ খ্রীঃ)। রাজধানী লিমা।

উরুগুয়ে

উরুগুয়ে এক সময়ে স্পেনের অধীন ছিল। কিছুকাল ইহা ব্রেজিলের একটি প্রদেশ বলে গণ্য হয়। ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে অগস্ট উরুগুয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ব্রেজিল ও আর্জেন্টিনা তার স্বাধীনতা মেনে নেয়।

১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর দক্ষিণপন্থী ব্ল্যাঙ্কো (জাতীয়) দল নির্বাচনে জয়লাভ করে। তার আগে একাদিক্রমে ৯৩ বৎসর ধরে কলরেডো দল ক্ষমতা অধিকার করে ছিল। জর্জ পি আরেকো ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দে প্রেসিডেন্ট হন।

অধিবাসীরা অধিকাংশ রোমান ক্যাথলিক। এর আয়তন ১,৮৬,৯২৬ বর্গ কিলোমিটার (৭২,১৭২ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ২৭,৫০০,০০০ (১৯৬৬ খ্রীঃ)। রাজধানী মন্টিভিডিও।

ভেনেজুয়েলা

১৪৯৯ খ্রীস্টাব্দে এ ডি ওজেডা এই দেশের নাম দেন ভেনেজুয়েলা অর্থাৎ ছোট ভেনিস। ১৮২১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই দেশ স্পেনের অধীন থাকে। ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে এই দেশ স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে মার্কস পেরেজ জিমেনেজ সভাপতি হন। তিনি ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারিতে সামরিক অনুশাসনে অপসারিত হন। ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর রোমুলো বেতানকোর্ট প্রেসিডেন্ট হন। ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর ডাঃ রাউল লিওনি প্রেসিডেন্ট হন।

এখানকার বেশির ভাগ লোক রোমান ক্যাথলিক। এর আয়তন ৯,১২,০৫০ বর্গ কিলোমিটার (৩,৫২,১৪৩ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ৭৮,৭২,০০০ (১৯৬২ খ্রীঃ)। রাজধানী কারাকাস।

———

ইকোয়েডর

প্রায় তিন শতাব্দী কাল স্পেনের অধীন থাকবার পর ইকোয়েডর কলম্বিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয় (১৭ই ডিসেম্বর, ১৮১৯ খ্রীঃ)। ১৩ই মে, ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইকোয়েডর স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

জে ভি ইবারা ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুন প্রেসিডেন্ট হন। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জুলাই ক্যাপ্টেন র‍্যাসন ক্যাস্ট্রো জিজন প্রেসিডেন্ট হন। ডাঃ অটো অ্যারোসেমেনা গোমেজ ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট হন।

· এখানকার অধিবাসীরা বেশির ভাগ রোমান ক্যাথলিক। এর আয়তন ২,৭০,৬৭০ বর্গ কিলোমিটার (১,০৪,৫০৫ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ৫৫,৮৫,৪০০ (১৯৬৫ খ্রীঃ)। রাজধানী কিটো।

কোস্টারিকা

কোস্টারিকা মধ্য আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্তবর্তী একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। দেশটি ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে পুরাপুরি স্বাধীন। ডাঃ যোসে জোয়াকুইন ট্রেজস ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট হন।

আয়তন ৫০,৯০০ বর্গ কিলোমিটার (১৯,৬৫৩ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ১৪,৯০,০০০ (১৯৬৬ খ্রীঃ)। রাজধানী সান যোসে।

গায়েনা

গায়েনা আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে অবস্থিত দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর-পূর্বের একটি দেশ। দেশটি ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ওলন্দাজ অধিকারে থাকে, পরে ব্রিটিশ অধিকারে যায়। তখন তার নাম হয় ব্রিটিশ গায়েনা। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে মে ব্রিটিশ গায়েনা 'গায়েনা' নামে পরিবর্তিত হয় ও স্বাধীনতা লাভ করে।

এর গভর্নর জেনারেল সার ডেভিড রোজ। প্রধানমন্ত্রী এল. এফ. এস. বার্নহাম।

গায়েনার আয়তন ২,১০,০০০ বর্গ কিলোমিটার (৮৩,০০০ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ৬,৭৪,৬৮০ (১৯৬৬ খ্রীঃ)। রাজধানী জর্জ টাউন। গায়েনায় বহুসংখ্যক হিন্দুর বাস।

মধ্য আমেরিকার কয়েকটি দেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

গোয়াটেমালা

এই স্থানই প্রাচীন মায়া সভ্যতার কেন্দ্রস্থল ছিল। ১০০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এখানে মায়া সভ্যতা বর্তমান ছিল। ওয়াশকতিউন, টিকল, জ্যাকিউলু্ প্রভৃতি স্থানে মায়া সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

১৮২১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত গোয়াটেমালা স্পেনের অধীন ছিল। তারপর মধ্য আমেরিকা সংযুক্ত প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে ইহা স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

১৯৫০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দেশে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। বেশির ভাগ সময়েই সামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকে।

১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দে জেনারেল মিগুয়েল ফুয়েন্টিস ছ বৎসরের মেয়াদে প্রেসিডেণ্ট হন। ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দে কর্নেল এনরিক পেরাল্টা আজুর্ডিয়া প্রেসিডেণ্ট হন।

জুলিও মেণ্ডেজ মণ্টেনেগ্রো ১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দে প্রেসিডেণ্ট হন।

এর বেশির ভাগ লোকই রোমান ক্যাথলিক।

গোয়াটেমালার আয়তন ১,০৮,৮৮৯ বর্গ কিলোমিটার (৪২,০৪২ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ৪৫,৭৫,০০০ (১৯৬৬ খ্রীঃ)। রাজধানী গোয়াটেমালা।

হণ্ডুরাস

স্পেনের অধীনতা পাশ ছিন্ন করে হণ্ডুরাস ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮২১ খ্রীঃ সংযুক্ত মধ্য আমেরিকার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়।

ডাঃ জুলিও লোজানো ডিয়াজ ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর শাসনক্ষমতা গ্রহণ করেন। ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দের ২১শে অক্টোবর সামরিক শাসনের প্রবর্তন হয়। ডিয়াজ পদত্যাগ করেন।

ডাঃ র‍্যামন ভিলেডা মোরেলস ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর প্রেসিডেন্ট হন। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুন কর্নেল অসভ্যাল্ডো লোপেজ অ্যারেল্যানো প্রেসিডেন্ট হন।

অধিবাসীরা রোমান ক্যাথলিক। হণ্ডুরাসের আয়তন ১,১২,০৮৮ বর্গ কিলোমিটার (৪৩,২২৭ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ২৩,৬২,৮১৭ (১৯৬৬ খ্রীঃ)। রাজধানী টেগুসিগাল্পা।

নিকারাগুয়া

১৮২১ খ্রীস্টাব্দে নিকারাগুয়া স্পেনের অধীনতাপাশ ছিন্ন করে। কিছুকা ইহা মেক্সিকোর সহিত যুক্ত থাকে। ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে ইহা সম্পূর্ণ স্বাধী রাষ্ট্র হয়।

অ্যানাস্টেসিও সোমোজা ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে সেপ্টেম্বর মারা গে তাঁর পুত্র লুই সোমোজা ডিবেলি প্রেসিডেন্ট হন। ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দে রেনি এ গুটিয়ারেজ প্রেসিডেন্ট হন। জেনারেল অ্যানাস্টেসিও সোমোজা ডিবেল ১৯৬ খ্রীস্টাব্দে প্রেসিডেন্ট হন।

এখানকার অধিবাসীরা অধিকাংশই রোমান ক্যাথলিক। এর আয়ত ১,৪৮,০০০ বর্গ কিলোমিটার (৫৭,১৪৩ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ১৭,০০,০০ (১৯৬৬ খ্রীঃ)। রাজধানী ম্যানাগুয়া।

পানামা

পানামা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে প্রায় তিনশ বছর স্পেনের অধী থাকে। ১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে পানামায় পিজারোর কেন্দ্রীয় কার্যালয় অবস্থিত ছি **ফ্র্যান্সিস ড্রেক** ১৫৭২ থেকে ১৫৯৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত পানামার উপর লুঠতর চালান। **হেনরী মরগান** ১৬৬৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৬৭১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত পানাম উপর অত্যাচার চালান। ১৫১৯ খ্রীঃ যে শহর গড়ে উঠেছিল তিনি সে পুরাতন পানামা শহর ধ্বংস করেন।

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে পানামা স্পেনের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে কলম্বিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পানামা স্বাধীনভাবে অবস্থান করে। পরে পুনরায় কলম্বিয়া থেকে সরাসরি শাসনকার্য চলতে থাকে।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা নভেম্বর পানামা কলম্বিয়ার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কলম্বিয়াকে পানামায় যুদ্ধ করতে বাধা দেয়। ১৮ই নভেম্বর পানামা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে খাল অঞ্চলের অধিকার প্রদান করে।

১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মে ডাঃ রবার্টো এফ চিয়ারি প্রেসিডেন্ট হন। মার্কো এ রোব্‌ল্‌স্‌ ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট হন।

এখানকার অধিবাসীরা বেশির ভাগ রোমান ক্যাথলিক। এর আয়তন ৭৫,৬৫০ বর্গ কিলোমিটার (২৯,২০১ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ১৩,২৮,৭০০ (১৯৬৭ খ্রীঃ)। রাজধানী পানামা।

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ

কিউবা

কিউবা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বৃহত্তম দ্বীপ। ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর কলম্বস ইহা আবিষ্কার করেন। ১৭৬২—১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ব্রিটিশ শাসনাধীনে থাকে। পরে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহা স্পেনের অধীনে থাকে।

স্পেনীয়গণ কিউবার অধিবাসীদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালায়। তার ফলে নানা সময়ে দেশব্যাপী প্রবল বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিভিন্ন সময়ে বিদ্রোহীরা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ চালাতে থাকে। কিন্তু তাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

হাভানা বন্দরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজ ডুবে গেলে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। স্পেন পরাজিত হয়। ১০ই ডিসেম্বর প্যারিসে এক চুক্তি হয়। তার ফলে স্পেন কিউবার উপরকার কর্তৃত্ব ত্যাগ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মে কিউবা থেকে সৈন্য সরিয়ে নেয়। কিউবায় সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়।

১৯৫২ খ্রীঃ ১০ই মার্চ মেজর জেনারেল ফুলগেনসিও ব্যাটিস্টা জালদিভার ডিক্টেটরী শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। তাঁর শাসনকালে নানা দুর্নীতি দেখা দেয়। ১৯৫৬ খ্রীঃ **ডাঃ ফিডেল ক্যাস্ট্রোর** অধিনায়কত্বে বিরোধী আন্দোলন দেখা দেয়। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তীব্র গেরিলা যুদ্ধ চলতে থাকে। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি ব্যাটিস্টা পদত্যাগ করে লিসবনে পলায়ন করেন।

ডাঃ ক্যাস্ট্রো ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী হন।

কিউবার ইক্ষুচাষের বিস্তৃত ভূখণ্ড ও বিরাট চিনির কারখানা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকারে ছিল। কিউবার কর্তৃপক্ষ লক্ষ লক্ষ একর জমি দখল করে। নানাভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্পর্কের অবনতি ঘটে। সোভিয়েট রাশিয়া সুযোগ বুঝে কিউবাকে বিভিন্ন প্রকারে সাহায্য করতে আরম্ভ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চিনি কেনা বন্ধ করে দিয়েছে।

প্রেসিডেণ্ট উরুটিয়া কম্যুনিস্ট প্রভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করে ১৯৫৯ খ্রীঃ ১৭ই জুলাই পদত্যাগ করেন এবং ডাঃ ও অসভ্যাল্ডো ডি টর‍্যাডো প্রেসিডেণ্ট হন। প্রধানমন্ত্রী ডাঃ ফিডেল ক্যাস্ট্রো।

এখানকার অধিবাসীরা অধিকাংশ রোমান ক্যাথলিক। এর আয়তন ১,১৪,৫২৪ বর্গ কিলোমিটার (৪৪,২০৬ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ৭৯,৩০,০০০ (১৯৬৭ খ্রীঃ)। রাজধানী হাভানা।

———

জ্যামাইকা

জ্যামাইকা কিউবার ৯০ মাইল দক্ষিণে ক্যারিবিয়ান সাগরে অবস্থিত। ইহা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত।

জ্যামাইকা পূর্বে ব্রিটিশের অধীন ছিল। ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দের ৬ই আগস্ট ইহা স্বাধীন হয়েছে। জ্যামাইকা ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত।

সার কেনেথ ব্ল্যাকবার্ন ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দের ৬ই আগস্ট জ্যামাইকার গভর্নর জেনারেল হন। তাঁর পরে সার ক্লিফোর্ড ক্যাম্পাবেল গভর্নর জেনারেল হন। প্রধানমন্ত্রী হিউ শিয়ারার।

এর আয়তন ১১,৫২৫ বর্গ কিলোমিটার (৪৪১১ বর্গমাইল) এবং লোক-সংখ্যা ১৬,৪১,০০০ (১৯৬১ খ্রীঃ)। রাজধানী কিংসটন।

ত্রিনিদাদ ও টোব্যাগো

ত্রিনিদাদ ও টোব্যাগো পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত দ্বীপরাজ্য। কলম্বস ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দে ত্রিনিদাদ আবিষ্কার করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেনীয়রা এখানে উপনিবেশ স্থাপন করে। ফরাসী বিপ্লবের সময় বহুসংখ্যক ফরাসী পরিবার এখানে বসতি স্থাপন করে। ১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দে স্পেনের সঙ্গে গ্রেট ব্রিটেনের যুদ্ধ বাধলে গ্রেট ব্রিটেন ত্রিনিদাদ দখল করে নেয়। ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে ত্রিনিদাদ ও টোব্যাগো একসঙ্গে যুক্ত হয়।

১৯৬২ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে আগস্ট ত্রিনিদাদ ও টোব্যাগো স্বাধীন হয়।

ত্রিনিদাদ ও টোব্যাগোর প্রধানমন্ত্রী ডাঃ এরিক ই উইলিয়ামস।

ত্রিনিদাদের আয়তন ৪৮২৮ বর্গ কিলোমিটার (১৮৬৪ বর্গমাইল) এবং টোব্যাগোর আয়তন ৩০০ বর্গ কিলোমিটার (১১৬ বর্গমাইল)। জনসংখ্যা ত্রিনিদাদের ৭,৯৪,৬২৪ এবং টোব্যাগোর ৩৩,৩৩৩ (১৯৬০ খ্রীঃ)। রাজধানী পোর্ট অব স্পেন।

বারবাডস

বারবাডস পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত দ্বীপরাজ্য। বারবাডস ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ব্রিটিশের অধিকারে থাকে। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর দেশটি আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করে এবং ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর স্বাধীন হয়।

বারবাডসের গভর্নর জেনারেল সার উইনস্টন স্কট এবং প্রধানমন্ত্রী এরল ওয়ালটন ব্যারো।

বারবাডসের আয়তন ৪৩০ বর্গ কিলোমিটার (১৬৬ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ২,৫০,০০০ (১৯৬৭ খ্রীঃ)। রাজধানী ব্রিজটাউন।

ডোমিনিক্যান রিপাবলিক

১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর কলম্বস সাণ্টো ডোমিঙ্গো দ্বীপ আবিষ্কার করেন। তিনি একে বলতেন লা এসপ্যানোলা। লোকে হিসপ্যানিওলা বলে থাকে। সাণ্টো ডোমিঙ্গো শহর আমেরিকার প্রাচীনতম। ডোমিনিক্যান রিপাবলিক নামকরণ হয় ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে। ইহা হিসপ্যানিওলার পূর্বাংশ (প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ)।

ডোমিনিক্যান রিপাবলিকের প্রেসিডেণ্ট জে বালাগুয়ের।

এর আয়তন ৪৮,৪২২ বর্গ কিলোমিটার (১৮,৭০০ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ৩৫,৭২,৭০০ (১৯৬৫ খ্রীঃ)। রাজধানী সাণ্টো ডোমিঙ্গো।

হাইতি

হাইতি হিসপ্যানিওলার পশ্চিমাংশ। স্পেনীয়দের সাহায্যে ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বহুসংখ্যক আফ্রিকা মহাদেশীয় নিগ্রো পরিবার এখানে বসতি স্থাপন করে। হাইতির অধিকাংশ অধিবাসী তাদেরই বংশধর। হাইতিকে বলা হয় ব্ল্যাক রিপাবলিক।

হাইতি একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র। এর প্রেসিডেণ্ট ডাঃ ডুভালিয়ের।

এর আয়তন ২৭,৭৫০ বর্গ কিলোমিটার (১০,৭০০ বর্গমাইল) এবং লোকসংখ্যা ৪০,০০,০০০ (১৯৬৪ খ্রীঃ)। রাজধানী পোর্ট অ প্রিন্স।

সমাপ্ত